

বঙ্গভাষা-সাহিত্য ।

প্রথম ভাগ ।

(ইংরেজ প্রভাবের পূর্ব পর্য্যন্ত ।)

“ নানান দেশের নানান ভাষা ।

বিনে বঙ্গের ভাষা মিটে কি আশা ? ”

নিখুয়াব ।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, প্রণীত ।

শ্রীহেমচন্দ্র সেন বি, এ, প্রকাশিত ।

PRINTED BY GOPAL CHANDRA DAS.
•
AT THE CHAITANYA PRESS
Comilla.

উৎসর্গ-পত্র ।

অশেষ গুণ-সম্পন্ন চন্দ্রবংশাবতংশ প্রজারঞ্জক

স্বাধীন-ত্রিপুরার শ্রীশ্রীমন্মহারাজ

বীরচন্দ্রমাণিক্য দেব-বর্মাণ বাহাদুরের

শ্রীশ্রীচরণ কমলে,—

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ

এই সামান্য পুস্তক

উৎসর্গ করিলাম ।

প্রস্থকার ।

PRINTED BY GOPAL CHANDRA DAS
•
AT THE CHAITANYA PRESS
Cmilla

উৎসর্গ-পত্র ।

অশেষ গুণ-সম্পন্ন চন্দ্রবংশাবতংশ প্রজারঞ্জক

স্বাধীন-ত্রিপুরার শ্রীশ্রীমন্মহারাজ

বীরচন্দ্রমাণিক্য দেব-বর্মাণ বাহাদুরের

শ্রীশ্রীচরণ কমলে,—

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ

এই সামান্য পুস্তক

উৎসর্গ করিলাম ।

‘অস্থকার ।

গ্রন্থগুলিতে বাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রথম তিন অধ্যায়ে ভাবার উৎপত্তি, বিস্তৃতি চিহ্ন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছি। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সাহিত্যের আলোচনা করিয়া অধ্যায়ের পরিশিষ্টে ভাষা, সামাজিক আচার, ঐতিহাসিক বিবরণগুলি ও অপ্রচলিত শব্দার্থের তালিকা প্রদান করিয়াছি। যে সব শব্দ ভিন্নার্থ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাও সেই সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। এই কার্যের জন্য বহু বৎসর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে; ছাপা পুস্তক হইতে হস্তলিখিত পুস্তকেরই অধিক আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে, ম্যাগিকাইংগ্রাস দ্বারা দুই তিন শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত তাম্রকুটপত্র-সমস্তির নাম পুঁথির পাঠ্যকার করা হুকটিন ব্যাপার, রোগীর দেহে হস্তক্ষেপ করার ন্যায় অতি সাবধানে পত্রগুলি উন্টাইয়া অগ্রসর হইয়াছি। এই ছয় বৎসর নানারূপ পারিবারিক অশান্তিতে মন উষ্ম থাকার সত্ত্বেও বিষয় কর্ত্ত করিয়া প্রতিদিন ধৈর্য্য সহকারে নিয়মিত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এই পুস্তক লিখিতে যত্নে ত্রুটি হয় নাই, আমার অমুপযুক্ততাহেতু যে সমস্ত দোষ রহিয়া গিয়াছে, আশা করি পাঠকগণ তাহা মার্জনা করিবেন।

পুস্তক রচনার সময় আমি অনেক সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছি, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি; আমি বঙ্গভাষার ইতিহাস লিখিব শুনিয়া তিনি আমাকে সর্বদা উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত তিনি ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে ‘কবিকুসুম’ শীর্ষক প্রবন্ধে সাহিত্যে আমার পুস্তক সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। এই ত্রিপুরায় বসিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ স্মরণ ভিন্ন বৈষ্ণব সাহিত্যের আর কোনরূপ চর্চা করা আমার পক্ষে সুবিধাজনক হইত কি না সন্দেহ; কিন্তু হুগলী বদনগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিবি মহাশয় বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে আমি বধন যে প্রশ্ন করিয়াছি, অগৌণে তাহার উত্তর দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন; তাহার বয়স এখন ৬৫ বৎসর কিন্তু আমার জন্য তিনি যুবকের ন্যায় শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীহট মৈনাবাসী গৌরভূষণ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় অবাচিত ভাবে আমার নিকট পত্র লিখিয়া পরিচয় স্থাপন করিয়াছেন, তিনি বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী সম্বন্ধে নানা বিষয় জানাইয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন; তাহাকে আমি দেখি নাই, কিন্তু তাহার মূর্ত্তি আমার কল্পনায় দেবমূর্ত্তির স্তায় নির্মল—পর উপকার ব্রতের হুধা তাহা হইতে ক্ষরিত হইতেছে। আমার পরম শ্রদ্ধেয় আত্মীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সেন মহাশয় আমার জন্য নানা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সাহিত্য সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—রামগতি সেন, জয়নারায়ণ সেন, ও আনন্দময়ী গুপ্তা এই তিন কবির পুঁথি আমি তাহারই অনুগ্রহে পাইয়াছিলাম, তাহার কৃতজ্ঞতা ঋণ আমি আজীবন বহন করিব। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় আমাকে নানারূপ পুস্তকাদি ও উপদেশ দ্বারা উপকৃত করিয়াছেন, তিনি ১৩০১ সালের চৈত্র মাসের সাহিত্যে আমার এই পুস্তক রচনার উদ্যোগের বিশেষ রূপ প্রশংসা করিয়া আমার অকিঞ্চনকর গুণাপেক্ষা স্বীয় স্নেহেরই বেশী পরিচয় দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের ১২ই মার্চ তারিখে হোপ পত্রিকায় সম্পাদক আমার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন। ঐ সনের ১৭ই আগষ্টে য় হিতবাদীতে, ১৯০০ সালের ৩২ আবারের অনুসন্ধান এবং সেই সালের ২০ শে কৈশোরের দৈনিক ও সমাচার চত্রিকায় আমার উদ্দেশ্য উৎসাহ বর্ধক কথা প্রকাশিত হয়। ১৯০১ সালের আবারের পরিষদ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমার পুস্তক সংগ্রহের বিষয় উল্লেখ করেন। ১৯০১ সনের মাঘ মাসের ও ১৯০২ সনের কার্তিক মাসের পরিষদ পত্রিকায় সাময়িক প্রসঙ্গে এবং ১৮৯৫ খৃঃ অব্দের ৬ই মার্চের ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় আমার পুস্তক সংগ্রহ সম্বন্ধে নানারূপ উৎসাহ হৃদক সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া পরম প্রচেষ্টা হকবি শ্রীযুক্ত বরদনারায়ণ মিত্র, সি, এম মহোদয়, প্রিয় হৃদয় সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র সমাজপতি, দাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মাইকেলের জীবন চরিত প্রণেতা শ্রীযুক্ত শোভেন্দ্রনাথ বসু এবং কলিকাতা পিস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত প্রবোধ প্রকাশ সেন গুপ্ত প্রভৃতি মহাশয়গণ আমাকে মধো মধো পত্র লিখিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন, আমি ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম।

পূর্ববঙ্গের সাহিত্য গৌরব শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এই পুস্তক রচনাকালে আমাকে যে অনুগ্রহ ও স্নেহ দেখাইয়াছেন, তাহা এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। বঙ্গসাহিত্যের জ্ঞান এখনও তাঁহার পূর্ণ উদ্যম, আমার সংগৃহীত সবগুলি পুঁথিই তিনি সাহিত্য সমালোচনী হইতে মুদ্রিত করিবেন, এই তাঁহার সম্বন্ধ; এইজন্য তিনি আমাকে চাকার আহ্বান করিয়া সাক্ষাতে নানারূপ উৎসাহিত করিয়াছেন ও পুস্তক রচনা সময়ে প্রতি সপ্তাহে পত্র লিখিয়া নানারূপ উপদেশ দিয়াছেন; বলিতে কি, তাঁহার অবিরত উৎসাহ না পাইলে আমার উদ্যম শিথিল হইয়া পড়িলার আশঙ্কা ছিল। কলেজে অধ্যয়নকালে যখন সভা মণ্ডপে তাঁহার বক্তৃতা শুনিলাম, তখন তাঁহার প্রতিভাপূর্ণ মূর্তি রাক্ষিয়ের অঙ্কিত একখানা গ্রীক দেবতার ছবির স্থায় বোধ হইত, আমার চক্ষে এখন তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে।

বস্তুতঃ এই গ্রন্থ রচনার প্রবৃত্তি হইয়া আমার এই এক বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে যে বঙ্গদেশে সহৃদয়তার অভাব নাই। আমার উপযুক্ততার এখন পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই, তথাপি সংকল্পের রবে মাত্র আহত হইয়া সদাশয় ব্যক্তিগণ আমাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পুস্তকের মুদ্রাণ ব্যয় সম্বন্ধে আমি প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করি। ত্রিপুরার তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট ও ত্রিপুরা রাজ্যের পোলিটিকেল এজেন্ট শ্রীযুক্ত আর, টি, ব্রীয়ার সাহেব আমার আবেদন সমর্থন করিয়া পত্র লিখেন। কিন্তু সেই আবেদন পত্রের উপর হুকুম হইতে একটু পৌণ্ড হওয়াতে আমি কলিকাতা শোভাঝাঙ্গারের রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নিকট আর একখানা আবেদন পত্র পাঠাই। তিনি আমার পুস্তকের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া পুস্তকের প্রথম দেখার ভার পর্য্যন্ত বন্মোবত্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময়

মুখ-বন্ধ ।

অদ্য ছয় বৎসর গত হইল একদিন আমার পুস্তকাধারস্থিত অতি জীর্ণ, গলিত-পত্র, প্রেক্ষার নীরব বিবেকজন চণ্ডীদাসের কবিতাখানা পড়িতে পড়িতে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একখানা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা জন্মে; ভিত্তোরিয়া স্কুলের সেই সময়ের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত ৮ চন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থের সাগ্রহ প্রার্থনার এই ইচ্ছা সূদৃঢ় হয়। বৈকব-করিগণের গীতি, কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কেতকাদাস ও ক্ষেমা-নন্দনের মনসার ভাসান ও অপর কয়েকখানা বটভট্টের ছাপা পুঁথিমাত্র আমার সম্বল ছিল, আমি তাহা পড়িতাম ও কিছু কিছু নোট সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। ১৮৯২ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতার পিস এসোসিয়েশন হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে “বিদ্যাসাগরপদক” অস্বীকার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, এই সুযোগ পাইয়া তিন মাস কাল মধ্যে আমি সংক্ষেপে বঙ্গভাষা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখি, উক্ত সমিতি আমার প্রবন্ধটি মনোনীত করিয়া “বিদ্যাসাগর পদক” আমাকে প্রদান করেন।

এই প্রবন্ধ রচনার সময় রতিন্দেব কৃত ‘বৃগলঙ্কার’ একখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি দৈবক্রমে আমার হস্তগত হয়, এবং বিশ্বস্ত হুজে অবগত হই যে, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের গরীতে পল্লীতে অনেক অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি আছে; এই সংবাদ পাইয়া নিজে নানা স্থানে পৰ্য্যটন করিয়া সঙ্করকৃত মহাভারত, গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব, রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলা, বিজ কংসারির প্রহ্লাদচরিত, রাজরাম দত্তের দণ্ডীপর্ব, স্বতীন্দ্র ও গঙ্গাদাসের মহাভারতভাষ্য উপাখ্যান, প্রভৃতি বিবিধ হস্তলিখিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ করি। তখন বঙ্গভাষার একখানা বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার সম্ভব মনে হির হয়। কিন্তু মুদ্রাবস্তুর আশ্রয় হইতে সূদূরে দরিলের পর্ণকুমীরে যেসব প্রাচীন পুঁথি কীটগণের করালকণ্ট্রাবিদ্ধ হইয়া কথকিং প্রাণরক্ষা করিতেছে সেগুলিকে রক্ষা করিবার উপায় কি? কীট কর্তৃক বিনষ্ট হওয়া ব্যতীত প্রতিবৎসর কাল তাহাদিগকে বহিষ্কৃত আচ্ছাদিত দিতেছেন—যাহা এখনও আছে, তাহা কিরূপে রক্ষা হয়? আমি এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে একদিন এসিয়াটিক সোসাইটির খাতনামা সেবক ডাক্তার হোরনলি সাহেবের নিকট সমস্ত অবস্থা জানাইয়া এক পত্র লিখি। তিনি প্রত্যুত্তরে আমাকে বিশেষরূপে যত্নবান ও উৎসাহ দিয়া সাহায্য অস্বীকার করেন; এই হুজে শ্রীযুত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার পত্রদ্বারা পরিচয় হয়; তিনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য উদ্ধার করিতে ইতিপূর্বেই উদ্যোগী ছিলেন,—আমার প্রণীত তিনি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাঁহার উপদেশানুসারে এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত শ্রীমান বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ আমার সহায়তার জগু কুমিল্লায় আগমন করেন। আমরা উভয়ে মিলিয়া পরাগলী (কবীন্দ্র পরমেস্বর রচিত) মহাভারত, ছুটিখার (শ্রীকর নন্দীর রচিত) অশ্বমেধপর্ব প্রভৃতি আরও অনেক পুঁথি সংগ্রহ করি। বিনোদবাবু মধ্যে মধ্যে আসিয়া কতকদিন কাজ

করিয়া চলিয়া যাইতেন; কিন্তু আমি বৎসর ডরিয়া জিপুরা, নোয়াখালী, শ্রীহট, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের নানা জেলা হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি, মধ্যে মধ্যে আমার ধুলতাত শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর সেন ডিপুটি মেক্সিষ্ট্রেট মহাশয়ের সঙ্গে মঞ্চঃস্থলে কাম্পে বাস করিয়া ক্রমাগত পর্দাটন করিয়াছি। এই সময় কবি আলোয়াল কৃত পদ্মাবতী, রাঙ্গা জয়নারায়ণ ঘোষাল কৃত কাশীখণ্ড, রাঘবের নন্দীর মহাতারত, মধুসূদন নাথিত প্রণীত নল দময়ন্তী, প্রভৃতি গ্রন্থ আমাকর্তৃক সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত পুস্তকের কয়েকখানা ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অপরাপর কোন কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় মন্ত্রিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।* পল্লীগ্রামে হস্তলিখিত পুঁথি খোজ করা অতি দুষ্কর ব্যাপার— বিশেষত প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথির অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের ঘরে রক্ষিত, আমাদের সাগ্রহ যুক্তি তর্ক ও বুদ্ধির কোশল অনেক সময়েই তাহাদের কুসংস্কারের দৃঢ়ভিত্তি বিচলিত করিতে পারে নাই, তাহারা কোন ক্রমেই পুস্তক দেখাইতে সম্মত হয় নাই; দৈবাৎ পুস্তক ধরা পড়িলে কেহ কেহ ট্যাঙ্কের ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন দিন ১০ মাইল পদব্রজে গমন ও সেই ১০ মাইল পুনঃ প্রত্যাবর্তন কেবল গমনাগমন সার হইয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়া ও কোন সময় নানারূপ বিপদে পতিত হইয়াছি, একদিন রাত্রি ১০টার সময় জিপুরা জেলার গৈলারা গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্তনকালে পথ হারাইয়া ফেলি; ভয়ানক বৃষ্টি, ঝড় ও অন্ধকারে বিরলবসতি জঙ্গলের পথে প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল যে ভাবে হাটিয়াছিলাম, তাহা সেই দিনের সন্ধ্যা শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বর্ধন ও আমার মনে চিরদিন মুদ্রিত থাকিবে। কিন্তু এইসব বহুদর্শিতার মধ্যে মধ্যে হৃৎকের কথা না আছে এমন নয়; পাহাড় বেষ্টিত দেশের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ মধ্যে মধ্যে বড় ঐতিকর হইয়াছে। ঘন শ্রাম পত্রাচ্ছাদিত চিত্রপটের স্থায় সারি সারি তরুশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে নির্মল পুকুরের জলে ঝাপটা বাতাসে নির্মল চেউ উঠিতেছে, তাহাতে পদ্মফুলগুলি পাতা লইয়া এক একবার ডুবিয়া যাইতেছে, ও কিঞ্চিৎ পরে হৃন্দরীগণের ন্যায় মুখ দেখাইতেছে— দূর নীল গগনের সঙ্গে মিশিয়া ভূসংলগ্ন মেঘ পংক্তির ন্যায় পাহাড়রাজি বিরাজিত, পল্লী-ললনাগণের সরল অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য, পল্লী কুবকগণের সরল কোড়ুহলাক্রান্ত দৃষ্টি, এইসব এখনও কোন অভিনয়ের দৃশ্যপটে অঙ্কিত চিত্রের স্থায় স্মৃতিতে জাগরক রহিয়াছে।

এই ছয় বৎসরের চেষ্টায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম ভাগ অন্য পাঠক-গণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই পুস্তকে ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া, সাময়িক আচার ব্যবহার দেশের ইতিহাস ইত্যাদি নানারূপ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচ্য

* ১৩০১ সনের শ্রাবণে “পরাগলী মহাতারত”, ভাদ্রে “প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ও ঘনরাম”, আশ্বিনে “মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম”, অগ্রহায়ণে “ছুটিখার মহাতারত”, পৌষে “কুঙ্কমল ঘোষারী”, মাঘে “মুসলমান কবির বাঙ্গলা কাব্য” এবং ১৩০২ সনের জ্যৈষ্ঠে “হুইজন প্রাচীন কবি”, ভাদ্র ও আশ্বিনে “ভূকলাসের রাজকবি” ও চৈত্রে পরাগলী মহাতারত সম্বন্ধীয় “প্রতিবাদ” প্রকাশিত হয়।

কিন্তু নিত্যানন্দ ঘোষ নামক এক কবির ভণিতায়ুক্ত আদি পূর্বের অনেকাংশ আমরা পাইয়াছিলাম, সেই অংশের একটি স্থলের ভণিতা এইরূপ “কাম্য করি যে শুনিল ভারত পাঁচালী। সকল আপদ তরে বাড়ে ঠাকুরালী। নিত্যানন্দ ঘোষ বলে শুন সর্বজন। আগে এই তষ্টাদশ পর্ব বিবরণ।” এই মহাভারতখানা এক শত বৎসর পূর্বের হস্তলিখিত ও ইহার অধিকাংশ স্থল সঙ্গ্রহ রচিত; ত্রিপুরা সদরের নিকটবর্তী রাজাপাড়া নামক গ্রামে এক ধোপার বাড়ীতে আমরা এই পুঁথি পাইয়াছিলাম। আমি ও এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত শ্রীমান বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ এই পুস্তকের জন্ত ধোপাকে ২৫ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিলাম, কিন্তু সে পৈত্রিক পুঁথি দিতে স্বীকার করে নাই; চূড়াপাত্রমে তাহার কিছুদিন পরেই গৃহদাহে এই পুঁথি নষ্ট হইয়া যায়। নজির লুপ্ত হওয়াতে, তাহা হইতে যে নোট সংগ্রহ করিয়াছিলাম, উহা আর আমি ব্যবহার করি নাই। পূর্বোক্ত নিত্যানন্দ ঘোষ, গৌরীমঙ্গলে উল্লিখিত নিত্যানন্দ হইতে পারেন। আমরা এই পুস্তকে যে সব প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে লোকনাথ দত্ত প্রণীত নৈবদ্য, অন্নস্বরাম প্রণীত ক্রিয়াযোগসার, দ্বিজ কংসারী প্রণীত পরীক্ষিত সন্বাদ, রাজা রামদত্তের দণ্ডীপর্ব, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রণীত (পরাগলী) মহাভারত, জাতক সন্বাদ, রামেশ্বর নন্দীর অসম্পূর্ণ মহাভারত, ইন্দ্রদাম চরিত, কালিকাপুরাণ, প্রাচীন কৃষ্ণবাসী রামায়ণ, সঙ্গ্রহ কৃত মহাভারত, ষষ্ঠিবরের স্বর্গারোহণ পর্ব, গোপীনাথ দত্তের দ্বৈতপর্ব, রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলা, গঙ্গাদাসের অশ্বমেধ পর্ব, শ্রীকর নন্দী প্রণীত (ছুটিখার আদেশে রচিত) অশ্বমেধ পর্ব, প্রভৃতি পুস্তক বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত হওয়া বাইবে, এইজন্য উৎসুক পাঠকবৃন্দের আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা উক্ত অংশের নিয়ে পত্র নির্দেশ করিয়াছি। পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া গ্রন্থভাগে উল্লিখিত অপরাপর পুঁথির কতকগুলি আমার নিকট আছে, তদ্ব্যতীত অন্যান্যগুলি কোথায় আছে, তাহা কেহ জানিতে চাহিলে আমরা বলিতে পারিব। পুস্তক মুদ্রিত না হইলে, হস্তলিখিত পুঁথি দৃষ্টে আলোচনা করা বড় কঠিন ব্যাপার, পাঠকের ও কৌতুহল নিবৃত্তির পথ নিতান্ত অসুবিধা জনক হয়। যেসব প্রাচীন পুঁথি পাওয়া বাইতেছে, তাহার সমস্তই প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক; তন্মধ্যে কোন কোন পুস্তকের কবিত্ব হুম্মর, তাহা কীৰ্ত্তি স্বরূপ হুপ্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য; কিন্তু প্রাচীন সমস্ত পুস্তকই ভাষা ও ইতিহাস পর্যালোচনার জন্ত প্রয়োজনীয় হইবে। এই বৃহৎ কার্য সম্পাদন করিতে বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বিদ্রোহাৎসাহী জয়দেব পুরাণিপতির পক্ষে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ত্রীতী হইয়াছেন, ইহা সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ শ্রুত লক্ষণ বলিতে হইবে।

পুস্তক রচনার সম্বন্ধে কতকটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। পুস্তক সমাধা করিয়া বস্ত্রস্থ করিতে পারি নাই; কিছু কিছু করিয়া লিখিয়াছি ও ছাপাইতে দিয়াছি, এইজন্য ছাপা হইতে প্রায় ২ বৎসর লাগিয়াছে। পুস্তক লেখা শেষ না করিয়া ছাপাইতে দেওয়ার কতকগুলি দোষ হইয়াছে; তন্মধ্যে প্রধান এই পুস্তকের আশ্রয়স্থল করিতে পারি নাই।

প্রথম হইতে তৃতীয় অধ্যায় পৰ্য্যন্ত ভাবার উৎপত্তি, বিভক্তি ও ক্রিয়া প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছি, এই কয়েকটি অধ্যায় অতি ছোট ও পঞ্চাত্তের অধ্যায়গুলি অতি বড় হইয়াছে। তাহা সম্বন্ধীয় অধ্যায়গুলি উপক্রমণিকার অন্তর্ভুক্ত করিলে এই দোষ বর্জিত হইতে পারিত। অন্যান্য যে দোষ দৃষ্টিগোচর, তাহা প্রথম সংস্করণে একরূপ অপরিহার্য।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের ১৪২৩ শকের হস্তলিখিত পুঁথির বিষয় এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হারাধর দত্ত মহাশয়ের পত্রের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই পুস্তকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। এখন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ও কয়েক জন প্রাক্তন বন্ধু প্রকাশভাবে জানাইতেছেন, ভক্তি-নিধি কথিত উক্ত পুস্তকের অস্তিত্ব নাই। ভক্তি-নিধি মহাশয়কে এই বিষয় জ্ঞাপন করাতে তিনি এখনও দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন পুস্তক আছে। বাহা হউক ১৪২৩ শকের লিখিত হস্তলিখিত পুঁথি না থাকিলেও কৃত্তিবাসের যে আত্ম-বিবরণটি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আর কোন প্রাচীর পুস্তক হইতে সংগৃহীত, সে বিষয়ে, আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুতরাং উক্ত পুঁথি না থাকিলেও কৃত্তিবাস সম্বন্ধে আমাদের সমস্তবোত কোন অংশ সংশোধন বা পরিবর্তন যোগ্য মনে করি না।

সচরাচর যে রচনা ব্রজবুলি বলিয়া পরিচিত, আমি তাহা 'ব্রিজবুলি' সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছি, এসম্বন্ধে Calcutta Review, Vol. C. Jan. 1895 P. Xiii অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি—"The language in which Bidyapaty wrote is commonly known as Brijbuli. This has confounded many who think that Bidyapaty wrote in the language of Braja or eightyfour krosches of land sacred to the followers of Krishna near Brindaban. But Brijbuli has nothing to do with Braja. Brij is the ancient name of Mithila or rather one of the three powerful Kshatriya tribes holding sway in Mithila." এই ক্ষত্রিয় বংশ বর্জিতব্য বংশ বলিয়া পরিচিতছিল। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ভারতী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের "লিচ্ছবী রাজগণ" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বৈশালীর অধিপতি উক্ত লিচ্ছবী ক্ষত্রিয়গণ ত্রাতা কিংবা পরিত্যক্ত বলিয়া বর্জিত আখ্যা প্রাপ্ত হন। তদনুসারে তাহাদের অধিকৃত রাজ্যও বর্জিত নামে অভিহিত হইত; ক্রমে সেই বর্জিত শব্দ হইতে সংস্কৃত বর্জি—পালি বজ্জি শব্দের উৎপত্তি। বিদ্যাপতি ব্যবহৃত ভাষা এই বর্জি দেশের ভাষা; ইহাকে পাঠকগণ বজ্জিবুলি কিংবা ব্রিজবুলি বলিতে পারেন। কিন্তু ইহা ব্রজধামের (বুলাবনের) ভাষা নহে। সুতরাং ইহাকে ব্রজবুলি বলিতে আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে।

জগৎরাম রায়ের কাল সম্বন্ধে আমরা ৩০২ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছি, তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। আমরা জগৎরামের কাব্য দেখি নাই, দালীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলি হইতে তদবিবরণ সংগ্ৰহ করিয়াছি। বলরাম বাবুর নির্দিষ্ট সময়ই আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এই পুস্তক উক্ত কবির বিবরণ মুদ্রিত হওয়ার পূর্বে

ত্রিপুরেশ্বরের সাহায্য হস্তগত হওয়াতে শোভাবাহুরের রাজা বাহাদুরের সাহায্য গ্রহণ করার আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু তাঁহার নিম্ন অমায়িক ব্যবহার, বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও তৎসম্বন্ধীয় প্রত্যেক শুভাসুষ্ঠানে আন্তরিক সহানুভূতি গুণে তিনি বঙ্গীয় নূতন লেখক সম্প্রদায়ের অবলম্বন স্বরূপ হইয়াছেন, কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি তিনি এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে স্বীকার করিয়াছেন। রাজা বাহাদুরের ভাগিনেয় আমার পরম প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বহু মহাশয় আমাকে সর্বদা উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তিনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

পরিশেষে গুণ্ডার কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, ত্রিপুরার শ্রীশ্রীমন্ মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য দেব বর্ষণ বাহাদুর আমার পুস্তকের এই বণ্ডের সমস্ত মুদ্রাক্ষণ ব্যয় বহন করিয়াছেন; সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার দানশীলতা বঙ্গদেশ-প্রসিদ্ধ। আমার এই সামান্য পুস্তক তাঁহার পবিত্র নামের সঙ্গে সংগ্রথিত করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এই দান প্রাপ্ত বিবরে ত্রিপুরেশ্বরের প্রাইভেট সেক্রেটারী বৈকব চূড়ামণি শ্রীযুক্ত রাধারমণ ঘোষ, এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারি আমার সহাধারী শ্রীযুক্ত অধিনীকুমার বহু ও প্রান্তঃস্মরণীয় ৮ রাজমোহন মিত্র দেওয়ানজি মহাশয়দিগের নিকট হইতে যে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ যোগ্য।

পুস্তক প্রণয়নকালে নানা গ্রন্থেরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তৎসমস্ত উল্লেখ করার স্থান নাই। বঙ্গীয় আধুনিক লেখকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অশ্বরামনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি লেখকগণের মাসিক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং ৮ রামধতি স্তায় রত্ন মহাশয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বহু মহাশয়ের বঙ্গভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক ইংরেজী পুস্তিকা ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র নন্দ সি, এস মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যের ইংরেজী ইতিহাস পাঠে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

এই পুস্তকে নানারূপ ত্রুটি দৃষ্ট হইবে। এখনও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সময় হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির উদ্ধার কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; আশা করা যায় আর কয়েক বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রাচীন অজ্ঞাত কাব্য সুপরিচিত হইবে। বোধ হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, বঙ্গদেশে এমন পদী নাই, বাহাতে প্রাচীনকালে দুইকজন পদী কবির আবির্ভাব হয় নাই, বৈকব-সাহিত্য অতি বিরাট—সুতাত্ত্ব জড়িত, জীর্ণ গলিত পত্র শত শত বৈকবগ্রন্থ এখনও অজ্ঞাতভাবে পড়িয়া আছে। আর কয়েক বৎসর প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান চেষ্টা অব্যাহত থাকিলে প্রাচীন সাহিত্যের একখানা সর্বঙ্গ হুম্বর ইতিহাস লিখিবার উপকরণ হস্তগত হইতে পারে। আমার এই পুস্তক ভাবার ভাবী ইতিহাস রচনাকালে যদি কিঞ্চিৎ আশুক্য করিতে সমর্থ হয়, তবেই স্নান্য জ্ঞান করিব। পুস্তক আকারে

বৃহৎ হইল, এইজন্ত তিন শত বৎসর পূর্বের কবি অনন্তরাম মৈত্রেয় পুত্র জীবন মৈত্র রচিত
 গদ্যাপুরাণ, বিপ্রদাস কবি কৃত মনসামঙ্গল, চুড়ামণি দাস কৃত চৈতন্য চরিত্র ও বিজয় পণ্ডিত
 প্রণীত কাব্য এবং দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ প্রণীত মুক্তালতাবলী প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় গ্রহণে উল্লেখ
 করিতে পারিলাম না। কিন্তু ১৩০৩ সালের বৈশাখের পরিষদ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র
 ত্রিবেদী মহাশয় ‘গৌরীমঙ্গল’ নামক একখানা পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্বিবরণ পূর্বে
 অবগত না থাকায় উহা উল্লেখ করি নাই। এই পুস্তক ১৭২৮ শকে (১৮০৬ খৃঃ অব্দে)
 পাকুড়ের রাজা পৃথীচন্দ্র কর্তৃক বিরচিত হয়। ইহার কবিত্ব মোটামুটি বেশ হ্রস্ব, কিন্তু
 আমরা এই কাব্যের কবিত্ব দেখাইতে আগ্রহান্বিত নহি। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যরূপ ফুলের
 বনে গৌরীমঙ্গল রূপ একটি সামান্য সেউতি ফুল অদৃশ্য হইলে বিশেষ ক্ষতির কারণ নাই;
 কিন্তু এই গ্রন্থের অবতরণিকায় কবি প্রাচীন সাহিত্যের একটি সামান্যরূপ ইতিহাস দিয়াছেন,
 তাহা আবশ্যকীয় মনে করি; সেই অংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল;—“সত্যযুগে বেদ অর্থ
 জানি মুনিগণ। সেইমত চলাইল সংসারের জন। ত্রেতাযুগে বেদ অর্থ জানিতে নারিল।
 তেজারণে মুনিগণ পুরাণ রচিল। অনেক পুরাণ উপপুরাণ হইল। দ্বাপরে মনুযাগণ
 ধারণে নারিল। স্মৃতি করি মুনিগণ সংগ্রহ করিল। কলিযুগে তাহা লোকে বুঝা ভার
 হইল। মতে ভাষা আশা করি কৈল কবিগণ। স্মৃতিভাষা কৈল রাখাবল্লভ শর্দূল।
 বৈদ্যক করিয়া ভাষা শিখে বৈদ্যগণে। জ্যোতিষ করিয়া ভাষা শিখে সর্বজনেন। বায়ীকি
 করিল ভাষা দ্বিজ কৃষ্ণিবাস। মনসা মঙ্গল ভাষা হইল প্রকাশ। মুকুল পণ্ডিত কৈল শ্রীকবি-
 কল্পণ। কবিচন্দ্রে গোবিন্দ মঙ্গল বিরচন। ভাগবত ভাষা করি শুনে ভক্তিমান।
 চৈতন্যমঙ্গল কৈল বৈষ্ণব বিজ্ঞান। বৈষ্ণবের শাস্ত্র ভাষা অনেক হইল। অন্নদামঙ্গল ভাষা
 ভারত করিল। মেঘ ঘটা যেন ছটা তড়িতের পাতা। শিবরাম গোস্বামী করিল ভক্তিলতা।
 অষ্টাদশ পর্বভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ। চোর চক্রবর্তী
 কীর্ত্তি ভাষায় করিল। বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি পয়ার রচিল। দ্বিজ রঘুদেব চণ্ডী পাঠালী
 করিল। কবিচন্দ্রে চোর কবি ভাষায় হইল। গঙ্গানারায়ণ রচেন ভবানী মঙ্গল। কীরীট
 মঙ্গল আদি হইল সকল। এসকল গ্রন্থ দেখি মম আশা হইল। গৌরী মঙ্গলের পুঁথি ভাষায়
 রচিল।” এখন দেখা যাইতেছে, রাখাবল্লভ প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থ, শিবরাম গোস্বামী কৃত
 ‘ভক্তিলতা’ চোর চক্রবর্তী প্রণীত ‘বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান’ গঙ্গানারায়ণ কৃত ‘ভবানী মঙ্গল’,
 এবং ‘কীরীটমঙ্গল’ প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। উনবিংশ শতাব্দীর
 পূর্বভাগে সেগুলি বিদ্যমান ছিল, অসুসন্ধান করিলে তাহা পাওয়া অসম্ভব নহে।
 শ্রবণ লেখক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয় উদ্ধৃত অংশে উল্লিখিত কাশীদাসের
 পূর্ববর্তী নিত্যানন্দ কবির সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—“গত চৈত্রেয় সাহিত্যে বাঙ্গলা সাহিত্যের
 ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন যে কয়েকখানা বাঙ্গলা মহাভারতের নাম দিয়াছেন,
 তাহার মধ্যে নিত্যানন্দ প্রকাশিত মহাভারতের উল্লেখ দেখিলাম না।” (পরিষদ পত্রিকা
 ১৩০৩, বৈশাখ ৫১ পৃঃ)। আমরা এই পুস্তকে ও নিত্যানন্দ কবির উল্লেখ করি নাই,

১৮৯৬ খৃঃ অব্দের মে মাসের দাসীতে প্রবৃত্ত সত্যাব্দার রায়, বলরাম বাবুর নির্দিষ্টকাল সংশোধন করিয়াছেন, আমাদের মতে সেই সংশোধিত কালই গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হইতেছে, তদনুসারে লগৎরাম রায় ১৮৯২ শকে (১৭৭০ খৃঃ অব্দে) দুর্গাপঞ্চরাত্রি এবং ১৭১২ শকে (১৭৯০ খৃঃ অব্দে) রামায়ণ রচনা করেন। 'তাপর পুস্তক দুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম' অর্থ তাপর দুর্গাপঞ্চরাত্রি নামক গ্রন্থ বিরচিত হইল, নির্দিষ্ট হওয়াতে রামায়ণের পরে দুর্গাপঞ্চরাত্রি রচিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হয়, এইজন্য ১৭১২ শককে সম্বৎ নির্দেশ করিয়া কাল নির্ণয় করা হইয়াছিল। কিন্তু সত্য বাবু দেখাইয়াছেন, 'তাপর পুস্তক দুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম', অর্থে 'তাহার অপর পুস্তকের নাম দুর্গাপঞ্চরাত্রি' সুতরাং দুর্গাপঞ্চরাত্রি রামায়ণের পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দিষ্ট হয় নাই। এতদ্বির জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা সত্য বাবু স্বীয়মত সুন্দররূপে সমর্থন করিয়াছেন।

২১ পৃষ্ঠায় মালাধর বহুর প্রকৃত বিজয়রচনার কাল উল্লিখিত হইয়াছে। ১৪৮০ খৃঃ অব্দে এই পুস্তক রচনা শেষ হয়, কিন্তু মুসলমান লেখকগণের নির্দেশ অনুসারে ১৪৮৯ খৃঃ অব্দে হুসেন সাহ গোড়ের সম্রাট হন, অথচ আমরা "গোড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজধান" পদের উল্লিখিত গোড়েশ্বরকে হুসেন সাহ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং এসম্বন্ধে একটু ঐতিহাসিক গোল রহিয়া গেল। কিন্তু এবিষয়ে আমরা বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত মতই গ্রহণ করিয়াছি, এরূপ হইতে পারে পুস্তক সমাধার ২১০ বৎসর পরে কবি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থ শেষে তাহা জুড়িয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক এইমত ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইলে আমরা ভবিষ্যতে তাহা সংশোধন করিব।

১৫২ পৃষ্ঠায় চৈতন্যদেবের শতর নীলাচর চক্রবর্তীকে নবদ্বীপবাসী বলিয়া উল্লিখিত করা হইয়াছে। নীলাচর চক্রবর্তীর পূর্ব নিবাস শ্রীহট।

২০ এবং ২২৪ পৃষ্ঠায় ক্রিয়াযোগসার প্রণেতা অনন্তরামের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাকে অনন্তরাম শর্মা বলিয়া পরিচয় দিয়াছি, কিন্তু ইনি অনন্তরাম শর্মা নহেন, অনন্তরাম দত্ত।

এই পুস্তকে অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সমস্ত ভ্রম দৃষ্ট হইবে, পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইলে আমরা তাহার বখাসাধ্য সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। নানা কারণে বর্ণাশুদ্ধি অনেক রহিয়া গিয়াছে; দীর্ঘ শুদ্ধিপত্র দিতে পারিলাম না।

উপসংহারে বল্লেখ্য, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে এখনও শিক্ষিত সমাজের একরূপ উদাসীন আছেন। আরেখিক ও ট্রাকেরিক প্রভৃতি ছন্দের মনোহারিত্বে প্রীত যুবকগণ অবিরত পয়াস ও দোখছন্দে বিরক্ত হইয়া পড়েন, পারাডাইস লষ্ট কিংবা টাক্সের অবতরণিকায় বাঁহারা কল্পনার স্তোত্র পড়িয়া সুখী, তাঁহারা প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের 'লক্ষ্মীলক্ষ্মী' ইত্যাদি রূপ গণেশ বন্দনা পড়িতে সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহারা জুলিয়েট ও এণ্ড্রেমেকি প্রভৃতি নামের পক্ষপাতী কিন্তু বেহলা, লহনা, কাণেড়া প্রভৃতি সেকলে নাম শুনিয়া প্রীতি বোধ করেন না। প্রাচীন সাহিত্য পড়িতে কতকটা ধৈর্য ও ক্ষমা চাই; আমরা সাহস সহকারে বলিতে পারি, পয়াসছন্দ ও গণেশ বন্দনা উত্তীর্ণ হইয়া বাঁহারা প্রাচীন

বঙ্গসাহিত্য অধ্যয়নের সঙ্গে আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে না; অজ্ঞতঃ বাঙ্গালী পাঠক তাহাতে বিশেষরূপ উপভোগের সামগ্রী পাইবেন, কারণ বাঙ্গালীর মন যে উপাদানে গঠিত, সেই উপাদানে উক্ত কাব্যগুলিও গঠিত। আমরা এইমূলে যোদ্ধামূল্যের এই কয়েকটি বহুমূল্য বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকার পরিসমাপ্তি করিতেছি,—

“যে দেশের লোকবৃন্দ স্বীয় প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য অন্বেষণ করিয়া গৌরবান্বিত না হয়, তাহারা জাতীয় চরিত্রের প্রধান অবলম্বন শূন্য হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। বখন জার্মেনী রাজ্য রাজনৈতিক অবনতির নিম্নতম গহ্বরে পতিত হইয়াছিল, তখন তৎদেশীয় লোকবৃন্দ স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এবং প্রাচীন সাহিত্য পাঠে ইহাদের হৃদয়ে ভাবী উন্নতির নূতন আশা সঞ্চারিত হইয়াছিল।”

কুমিল্লা,
১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৬

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সূচীপত্র ।

প্রথম অধ্যায় ।

বঙ্গভাষার উৎপত্তি ।

(১—৪ পৃঃ) ।

বঙ্গভাষা ও বঙ্গাঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত মতের সমালোচনা । আৰ্য্যাপ্রাণের ভাষা ও অঙ্গের স্বতন্ত্রতা, বিম্ব সাহেবের মত । গোড়ীয়ভাষা সমূহ । কথিত ভাষার আদি নির্ণয়ের প্রবৃত্তি । লিপিত ভাষার পরিবর্তনের কারণ । ডাক্তার হোরনলি সাহেবের মত ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গলা ।

(৫—১৮ পৃঃ) ।

বৌদ্ধাধিকারে সমাজ, শাস্ত্র ও ভাষার অবস্থা । হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ও ভাষা সংশোধনের চেষ্টা । কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে রত্নাকরদস্যুর বিবরণ । অস্তান্ত গোড়ীয় ভাষার সঙ্গে বঙ্গভাষার তুলনা । বঙ্গভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের নৈকট্য । প্রাকৃত হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, উদাহরণ স্বরূপ দীর্ঘ শব্দ তালিকা সংকলন । প্রাকৃত ও বাঙ্গলার ক্রিয়াগত সাদৃশ্য—প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্য সমূহ হইতে উদাহরণ প্রয়োগ । অপভ্রংশ ভাষার সহিত হুলে হুলে বাঙ্গলার নৈকট্য । শব্দগুলির বঙ্গভাষায় পরিণতির নিয়ম । সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গলার পরস্পর সম্বন্ধ । সংস্কৃত হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষা পুষ্ট করিবার চেষ্টা ও তৎসমালোচন ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

পাশ্চাত্যমত । বিভক্তি চিহ্ন ও ছন্দ ।

(১৮—৩২ পৃঃ) ।

“বঙ্গভাষা অনাৰ্য্যভাষা হইতে উদ্ভূত” ক্রকোর্ড, ল্যাথাম, এণ্ডারসন, কে এবং কন্ডওয়েল প্রভৃতি যুরোপীয় পণ্ডিতগণের এই মতের আলোচনা । ডাক্তার হোরনলি সাহেবের যুক্তি । বিভক্তি চিহ্নের বিচার ও বাঙ্গলা প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি সমস্ত বিভক্তিই যে কোন না কোন রূপে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাহা বহু সংখ্যক উদাহরণ দ্বারা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা ।* অসত্যাপ্রাণের ভাষার সঙ্গে বঙ্গভাষার কথঞ্চিৎ মিশ্রণ । ছন্দ সমালোচনা । বঙ্গীয় প্রাচীন কাব্যগুলির সমস্তই পূর্বে গীত হইত, তজ্জন্ত প্রথমতঃ অঙ্গের নিয়ম ছিল না ; প্রাচীন কাব্যগুলির অনেক স্থলেই পদ্যাদি ছন্দের পরিবর্তে রাগ রাগিণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, উদাহরণ । সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সঙ্গে বাঙ্গলা ছন্দাদির নৈকট্য ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

(১) মাণিক চাঁদের গান । (২) ডাক ও খনার বচন ।

(৩৩—৪২ পৃঃ) ।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ঐতিহাসিক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের কল,—মুত্তরাং বৌদ্ধাধিকারের নিদর্শন তাহাতে বড় বিরল, তথাপি কিছু আছে, তাহা (১) মাণিকচাঁদের গান ও (২) ডাক

ও খনার বচন, মাণিকচাঁদের গান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, প্রসিদ্ধ অংশগুলির বিচার, বৌদ্ধাধিকারের নিদর্শন, মাণিকচাঁদের সময় নির্ধারণ, কবিদের নমুনা। ডাক ও খনার বচন, বৌদ্ধাধিকারের প্রভাব;—ডাক ও খনার ঐতিহাসিক, ডাকের বচন ও খনার বচনে প্রভেদ, বর্ণিত বিষয় সমালোচন, জ্যোতিষের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা, বৌদ্ধাধিকারে অপ্রচলিত শব্দের বিস্তৃত তালিকা। এই সময়ের বহুভাষা সংস্কৃতির প্রভাব বর্জিত, উদাহরণ; সামাজিক আচার ব্যবহার, 'সাদিনা', 'দশা', 'ত্রিশা' প্রভৃতি আচারের উল্লেখ।

পঞ্চম অধ্যায়।

(১) ধর্মকলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। (২) প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ।

(৪৯—৬৩ পৃঃ)।

নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম সমর্থন জন্য ভাষার তাহাদের মাহাজা প্রচারের প্রয়োজন, ও তদুপলক্ষে মনসা, চণ্ডী, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীসংগের গীতি প্রচার,—শাস্ত্র চর্চার প্রভাব ও নিরন্তরগীতে শাস্ত্র জ্ঞানের বিস্তার; হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে ব্রাহ্মণ্য শক্তি প্রচারিত হইলেও ব্রাহ্মণগণ সর্বদাই ধর্মের নায়ক হইতে পারেন নাই, উদাহরণ। এই ধর্মকলহে বৈষ্ণবগণের নেতৃত্ব, বৈষ্ণবগণের প্রতি নানারূপ বিরুদ্ধতা সহেও তাহাদের প্রভাব বিস্তার ও তাহাদের দ্বারা বঙ্গভাষার পরিপুষ্ট। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ,—ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে প্রভেদ, বঙ্গীয় প্রাচীন লেখকগণের অনুকরণ বৃত্তি, তৎসম্বন্ধে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে বহুবিধ উদাহরণ। সমগ্র কাব্য অনুকরণের চেষ্টার সঙ্গে অংশ বিশেষের অনুকরণের উদাহরণ। এই অনুকরণ বৃত্তির দোষ ও গুণ। বৈষ্ণব সাহিত্যে স্বাধীনতার নব বিকাশ ও তদুপলক্ষে জয়দেব, জ্ঞানদাস এবং কৃষ্ণকমল প্রভৃতি কবিগণের রচনা হইতে দৃষ্টান্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৌড়ীয়বৃগ অথবা শ্রীচৈতন্য পূর্ব সাহিত্য।

(১) পঞ্চগোড়। (২) অনুবাদশাখা। (৩) লৌকিক ধর্মশাখা।

(৪) পদাবলীশাখা (৫) কাব্যোতিহাসের সূত্রপাত শাখা।

(৬৪—১২৭ পৃঃ)।

পঞ্চগোড়ের প্রসঙ্গ, ও বঙ্গসাহিত্য হইতে পঞ্চগোড়ের গৌরবের উদাহরণ। পৌণ্ড্রব্রহ্মণ্যের উৎসাহে বঙ্গভাষা সর্ব প্রথম পুষ্ট হয়। কৃত্তিবাসের আত্ম বিবরণ। কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে প্রসিদ্ধ অংশের যোজন। ঝটিলার মুদ্রিত রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূলত: প্রভেদ। (এই সম্বন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে ২২৯ পৃষ্ঠা ও ৩৪৮বা)। কৃত্তিবাসের রামায়ণের সমালোচনা। কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপর শেষ সময়ের কবিগণের হস্তক্ষেপ জনিত পরিবর্তনকে বিকৃতি বলা যায় কি না। মহাভারতের অনুবাদ প্রসঙ্গ। সম্ভ্রমকৃত মহাভারত। সম্ভ্রমের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। সম্ভ্রমের মহাভারত হইতে কবিদের দৃষ্টান্ত। কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দীর মহাভারত। হুসেন সাহার প্রসঙ্গ, পদাংশল বাঁর আদেশে কবীন্দ্রের মহাভারতের

সমুদায় হস্তক্ষেপ। কবীজ্ঞের মহাত্ম্যরত হইতে রচনার দৃষ্টান্ত। ছুটি শীর আদেশে রচিত অশ্বমেধ পর্ব; কবি শ্রীকর নন্দী কৃত সেই সময়ের সামান্য রূপ একটু ঐতিহাসিক বিবরণযুক্ত অবতরণিকা। শ্রীকর নন্দীর কবিত্বের দৃষ্টান্ত। সঞ্জয় কবীজ্ঞ পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের মহাত্ম্যরত জৈমিনী ভারত দৃষ্টে সঙ্কলিত। মালাধর বহর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, মালাধর বহর বৃন্দাশ্রম, মূলের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের তুলনা, ও শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের কবিত্বের সমালোচনা। লৌকিক ধর্ম প্রসঙ্গ, লৌকিক দেবতা মনসা, চণ্ডী, সত্যনারায়ণ, দক্ষিণের রায় প্রভৃতির পূজা প্রচারের প্রয়োজন। মনসা পূজার প্রসঙ্গ। চাঁদ সদাপ্রসন্ন, বেহুলা ও মনসার চরিত্র সমালোচনা। কাশা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নান্দায়ণ দেব প্রভৃতি মনসামঙ্গল রচক কবিগণের বিস্তৃত প্রসঙ্গ। মনসার গীতের বিষয়ের ঐতিহাসিকত্ব। চণ্ডীর পাঁচালী লেখক কবি জনাৰ্দ্দনের প্রসঙ্গ। রতিদেব কৃত মৃগলঙ্কার বিষয়। পদাবলীশাখা। বাঙ্গালী কবিগণের পদাবলী রচনায় শ্রেষ্ঠত্ব—পদাবলীর বিষয়। বিদ্যাপতি, বিদ্যাপতির জীবনী। মিথিলার সহিত বঙ্গদেশের সম্বন্ধ। বিদ্যাপতির কবিত্বের সমালোচনা। বিদ্যাপতির প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁহার তুলনা। চণ্ডীদাস, ও তাঁহার পদ সমালোচনা। কাব্যোক্তি-হাসের সূত্রপাত শাখা, শ্রীধর্মমঙ্গলের প্রসঙ্গ, খেলারাম কবির ধর্মমঙ্গল। রাজমালা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

(১২৮—১৪৬ পৃঃ)।

ষষ্ঠ অধ্যায়োক্ত কবিগণের সময় নির্দেশ সহিত সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ। প্রাচীন কবিগণের স্বপ্ন কিঞ্চিদেব বরের ভাগ করিয়া কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপপ্রথা, বৈষ্ণব কবিগণের সত্যতা। পঞ্চগৌড়ের পরস্পর সম্বন্ধ পূর্বে বেশী ঘনিষ্ঠ ছিল ভাষা ও সাহিত্যে নির্দিষ্ট আচার ব্যবহার হইতে তাহার উদাহরণ। পূর্ববঙ্গ ও প্রাচীন বঙ্গের ভাষাগত পার্থক্য ও তৎসম্বন্ধে সূত্র-সঙ্কলনের চেষ্টা। সংস্কৃতের প্রভাবের নিদর্শন। গোড়ীয়যুগ অধ্যায়ের অপ্রচলিত ও দুর্লভ শব্দের বিস্তৃত তালিকা। বিতত্তি ক্রিয়া ও ছন্দাদি সম্বন্ধে আলোচনা। পরিচ্ছদ, আচার, ব্যবহার, বাণিজ্য ইত্যাদির প্রসঙ্গ।

“শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য” যুগের পূর্বাভাস; বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের জয়, চণ্ডীদাসের নির্ভীক প্রেমের কথা। শ্রীচৈতন্য প্রভুর প্রসঙ্গ।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীচৈতন্য সাহিত্য বা নবদ্বীপের ১ম যুগ।

- (১) শ্রীচৈতন্যদেব ও এই যুগের সাহিত্য, (২) শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন,
(৩) পদাবলীশাখা, (৪) চরিতশাখা।

(১৪৭—২১২ পৃঃ)।

চণ্ডীদাসের গানে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বাভাস। পদাবলীর সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের সম্বন্ধ। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন, তাঁহার আতিষ্ঠানের সময় নবদ্বীপের অবস্থা, ভক্তির অভাব,

ভিন্ন ভিন্ন দেশী অপরাপর বৈক্যবর্ণের উল্লেখ, শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের কৃতকাৰ্য্যতার মূল কারণ। জগৎ ও দেশব, দেশবের চাপলা। নিমাই ছাত্র ও নিমাই অধ্যাপক। গদাধর, ঈশ্বরপুরী ও শ্রীহটবাসীগণের সঙ্গে চাপলা। দিবিজয়ী জয়। নিমাইর চরিত্রে ভক্তির পূৰ্ব্বাভাস, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, গরার গমন ও তথা হইতে প্রতাগমন, ভক্তির বিস্তারতা। শ্রীচৈতন্য দেবের প্রতি লোকবৃন্দেয় অমুরাগ। তাঁহার জীবনে ধৰ্ম্মনীতি, কোমলতা ও কঠোরতার সংমিশ্রণ। সোহঃ। শ্রীচৈতন্যদেবের বিনয়। সমাজে শ্রীচৈতন্যদেব কৃত নবজীবন প্রতিষ্ঠা। বঙ্গসাহিত্যে চরিতাখ্যানের সৃষ্টি। পদাবলী সাহিত্য। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত বৈক্য কবিগণের নাম ও পদ সংখ্যার তালিকা। মৎ সংগৃহীত অতিরিক্ত তালিকা। একাধিক ব্যক্তির এক নাম ও তদন্তে দাস শব্দ গ্রহণে পরিচয়ে বিঘ্ন, এই প্রসঙ্গে 'গোবিন্দ দাস' 'বলরাম দাস', 'বহ্ননন্দন দাস', 'নরহরি দাস' প্রভৃতি এক নামে অভিহিত ভিন্ন ভিন্ন কবিগণের পরিচয়ের চেষ্টা। নরজয় মুসলমান বৈক্য কবির নাম। গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, বহ্ননন্দন, পুরুষোত্তম (প্রমদাস) গৌরীদাস, নরহরি সরকার, বহ্ন রামানন্দ, রায় রামানন্দ, যনশ্রাম, বাশীবদন ঠাকুর, চৈতন্য দাস, পরমেশ্বর দাস, বীর হাশীর, নৃসিং দেব, মাধবী প্রভৃতি বৈক্য পদকর্তৃগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বৈক্য কবিগণের পদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি কবিগণের তুলনায় সমালোচন। পদ সংগ্রহ সমূহের প্রসঙ্গ, বাবা আউল মনোহর দাস কৃত, পদ সমুদ্র। বৈক্য দাস (কাহারও কাহার মতে এই ব্যক্তির নাম গোবিন্দচন্দ্র সেন) কৃত পদকল্পতরু। অপরাপর পদ সংগ্রহ ও তৎ সম্বলন কর্তৃদিগের নাম। পদকল্পতরু সম্বন্ধে আলোচনা। যে প্রণালীতে পদের যোজনা করা হইয়াছে, তাহার সমালোচনা ও উদাহরণ স্বরূপ পদকল্প তালিকা হইতে এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন। পদাবলী সাহিত্য সম্বন্ধে শেষ কথা। চরিতশাখা। গোবিন্দ দাসের করচা ইত্যাদি। চরিতশাখা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা। গোবিন্দ দাসের করচার সমালোচনা, মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের প্রসঙ্গ এবং ফুটনোটে আধুনিক মানচিত্রোদ্ভিধিত স্থান সমূহের সঙ্গে চৈতন্যদেব অমুদিত পথের একা স্থাপনের চেষ্টা। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, গ্রন্থকারের বিবরণ ও উক্ত পুস্তকের বিবৃত সমালোচন। লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল। গ্রন্থকারের বিবরণ ও চৈতন্যমঙ্গলের বিবৃত সমালোচনা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্য চরিতামৃত। গ্রন্থকারের বিবরণ ও চৈতন্য চরিতামৃতের বিবৃত সমালোচন। নরহরি চক্রবর্তীর পরিচয়। তদ্রচিত ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা। রূপ গোবামীর বংশাবলী। অপরাপর বৈক্য মহাজনের সংক্ষিপ্ত চরিত। ভক্তিরত্নাকরের সমালোচনা, তৎ প্রসঙ্গে বৈক্য চরিতাখ্যান সমূহের লক্ষ্য সম্বন্ধে মন্তব্য। ভক্তিরত্নাকরের অধ্যায় বিভাগ ও গ্রন্থোক্ত বিষয়ের আলোচনা। নরহরি চক্রবর্তী রচিত অপরাপর পুস্তকের নাম, নরোত্তম বিলাসের বর্ণিত বিষয় ও তৎসমালোচন। নরহরির ইতিহাস রচনার প্রদর্শন। 'গৌরচরিত চিন্তামণি' হইতে কবিত্বের দৃষ্টান্ত। নিত্যানন্দ দাস কৃত 'প্রেম বিলাস' সমালোচনা। রচনার নমুনা প্রদর্শন। বহ্ননন্দন দাস কৃত 'কর্ণামৃত',

প্রেমদাস (পুরুষোত্তম) রচিত বংশীশিক্ষা, ও চৈতন্যচন্দ্রোদয়, জগজীবন মিশ্র প্রণীত মনঃসম্ভোদিনী, মহাপ্রসাদ বৈভব, ও বৈষ্ণবচার দর্পণ প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ।

৭ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

(২১২—২৪১ পৃঃ)।

আগর দাসের শিষ্য নাভাজী রচিত ভক্তমালের কৃষ্ণদাস বাবাজি কৃত বঙ্গানুবাদের সমালোচনা। মাধবাচার্য্য বিরচিত ভাগবতের অনুবাদ। মাধবাচার্য্যের পরিচয়। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস রচিত ভাগবতের অনুবাদ। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের পরিচয়। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের “অষ্টৈত সূত্র করচা।” ঈশান নাগর প্রণীত “অষ্টৈত প্রকাশ।” যদুনন্দন দাস কৃত গোবিন্দলীলামৃত। যদুনন্দন দাস কৃত অপরাপর অনুবাদ পুস্তকের উল্লেখ। নরোত্তম দাসের প্রেমভক্তি চল্লিকা, সাধনভক্তি চল্লিকা, হাটপত্তন প্রভৃতি পুস্তকের উল্লেখ। বিবর্ত বিলাসের প্রসঙ্গ। বৈষ্ণব গ্রন্থগুলির আদর্শের ঐক্য। বঙ্গভাষায় হিন্দীর প্রভাব। গোবিন্দ দাসের মৈথিলভাষা অনুকরণ। শ্রীহট্টের সত্যরাম কবির রচনা হইতে দৃষ্টান্ত সঙ্কলন। চরিত-সাহিত্যে হিন্দীর প্রভাব। চরিতাখ্যান সমূহে নানারূপ ভাষার মিশ্রণ, চৈতন্য চরিতামৃতের মিশ্র ভাষার দৃষ্টান্ত। বঙ্গসাহিত্যে উর্দু, সংস্কৃত, ও খাটি বাঙ্গলা এই তিন শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বঙ্গভাষার ‘প্রাকৃত’ অভিধান। এই যুগের অপ্রচলিত ও ভিন্নার্থে ব্যবহৃত শব্দের তালিকা। ছন্দ ও বিভক্তি বিচার। সমাজের অবস্থা। শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের কলহ। অবতার বাদের প্রচার। বৈষ্ণবগণের ক্রমশঃ বিলাসের প্রতি রুচিপ্রবণতা। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের প্রসঙ্গ। শ্রীনিবাসের জীবনের প্রথম ভাগের উন্নত ভক্তি বিহ্বলতা, কিন্তু পরে কক্ষিৎ অবনতি। জাহ্নুবাদেবীর বিষয়। বৈষ্ণব সমাজের সংস্কারের অবনতি। সমাজের অপরদিকের দুর্গতি। নরহত্যা, প্রভৃতি ব্যক্তিচার। এই সময়ের রাজার ব্যয়। বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারের খরচ। এই সময়ে চৈতন্যপ্রভুর বিবাহের প্রসঙ্গ। সেকেলে নামের সঙ্গে অসঙ্গত উপাধির যোজন। রাজনৈতিক অবস্থা, দম্ভাগণের প্রাভুত্ব ও বিখ্যাত দম্ভাগণের নাম। মৈথিল শব্দগুলির কতকটির অর্থযুক্ত তালিকা। বাঙ্গলা ভাষার উপর হিন্দীর স্থায়ী চিহ্ন। বৈষ্ণবগণের ‘শ্রী’ শব্দ প্রিয়তা। বৈষ্ণবগণের শিরোমুণ্ডনের সমালোচনা। বৌদ্ধগণের প্রভাবের শেষ চিহ্ন। সুবুদ্ধি রাণের বিষয়। বৈষ্ণবযুগের সম্বন্ধে শেষ কথা। সংস্কারযুগের প্রসঙ্গ।

অষ্টম অধ্যায়।

সংস্কারযুগ। (১) লৌকিক ধর্মশাখা। (২) অনুবাদশাখা।

(২৪১—৩১৭ পৃঃ)।

সংস্কারযুগ কেন বলি? প্রাচীন কাব্যগুলির অনুকরণ। এই অনুকরণ সর্বত্রই চৌধা আখ্যায় বাচ্য কি না? লৌকিক ধর্মশাখা। মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি ও ঘনরাম। বলরামের চণ্ডীকাব্য। মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম

এই দুই কবিকে তুলনায় সমালোচন। মাধবাচার্যের রচনার স্বাভাবিকত্ব। মাধবাচার্যের রচিত বৈষ্ণবগদ। মাধবাচার্যের যুদ্ধ বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের যুদ্ধ বর্ণনায় পূর্বাভাস। কবিকঙ্কণের সময় দেশের অবস্থা, মুসলমানগণের অত্যাচার, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নানা স্থান হইতে দৃষ্টান্ত সংকলন। প্রচলিত মুসলমানী শব্দ দ্বারা সমাজের অবস্থা প্রদর্শন। মুকুন্দ রামের পরিচয়। চণ্ডীকাব্যের সময় নির্ধারণ। মুকুন্দ রামের ভ্রাতাগণের প্রসঙ্গ। চণ্ডীকাব্যের সমালোচনা। কবিকঙ্কণের মনুবা চরিত্রে অন্তর্দৃষ্টি। তাঁহার রচনায় পুরুষ চরিত্রের খর্বকতা। ঘটনার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ কাব্যোচিত মূল কেন্দ্রের অভাব। কালকেতুর গল্প, শৈশব, বিবাহ, পুণ্ড্রগণের সঙ্গে বন্দ, চণ্ডীর পুণ্ড্রগণকে আশ্রয় প্রদান। কালকেতুর হৃদয় পোষিকা আনয়ন; ক্ষুরার সন্দেহজনিত কষ্ট, স্বামীকে ভর্ৎসন, ভগবতীর স্বরূপ গ্রহণ, কালকেতুর রাজ্য হওয়া ও কলিঙ্গাধিপতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়। কলিঙ্গাধিপতির সঙ্গে মিত্রতা। কালকেতু ও ক্ষুরার স্বর্গারোহণ। ভাদু দত্তের বিস্তৃত বিবরণ। শ্রীমন্তের গল্প। ধনপতি সঙ্গারের পায়রা উড়ান। খুলনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পূর্বরাগ। খুলনার সঙ্গে বিবাহ, লহনাকে প্রবোধ প্রদান। খুলনার প্রতি লহনার স্নেহ। দুই সতিনে কলহ। খুলনার ছাগ রক্ষণ। বনের শোভা দেখিয়া খুলনার বিরহ। চণ্ডীর কৃপা। ধনপতির প্রত্যাগমন। ধনপতি ও খুলনার মিলন। খুলনার পরীক্ষা। ধনপতির সিংহল গমন, কমলে কামিনী দর্শন ও কারাবাস। শ্রীমন্তের বাল্যকাল। শ্রীমন্তের সিংহল গমন। সিংহলে কষ্ট। শ্রীমন্তের মশান। হুশীলার বারমাস্তা। পিতা পুত্রের দেশে প্রত্যাগমন। শ্রীমন্তের দেশীয় রাজার কন্যাকে বিবাহ। স্বর্গারোহণ। মুকুন্দরামের শিব বিবাহাদির বর্ণনা ও তৎপ্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তুলনা। রামেশ্বর ভট্টাচার্য। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের পরিচয়, তৎপ্রণীত শিব সংকীর্ণনের সমালোচনা। সতাপীরোপাখ্যান। কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি ৩১ জন মনসার ভাসান রচক কবি। বেহলার চরিত্র। কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দের যৎ সামান্য পরিচয়। বর্দ্ধমান দাসের কবিত্বের নমুনা। ঘনরাম। ময়ূর ভট্ট, বেলারাম ও রূপ রামের ধর্মমঙ্গল। ঘনরামের পরিচয়। ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্যের বিস্তৃত সমালোচনা। অনুবাদশাখা। (ক) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানাদি। (খ) রামায়ণ ও মহাভারতাদি। সংস্কৃতের অনূকরণ চেষ্টা। সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ পুস্তক, তৎপ্রসঙ্গে বিজয়কংসারি প্রণীত প্রহ্লাদ চরিত্র, পরীক্ষিত সম্বাদ, লোকনাথ দত্ত প্রণীত নৈষধ, বিজয়মুকুন্দ প্রণীত ইন্দ্রদ্রুম উপাখ্যান, রাজারাম দত্ত-প্রণীত দত্তীপক, মধুসূদন নাগিত প্রণীত নল দময়ন্তী, বিজয়ভবানন্দ প্রণীত হরিবংশ, অনন্তরাম দত্ত রচিত ক্রিয়াযোগসার, বিবিধ লেখক সংকলিত রঘুবংশের অনুবাদ, গরুড় পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি অনুবাদ পুস্তকের উল্লেখ। এইসব কবির রচনা হইতে কবিত্বের দৃষ্টান্ত। মধুসূদন নাগিত রচিত নল দময়ন্তীর সমালোচনা। দত্তী কাব্যের বিষয় ও অনন্তরাম দত্ত প্রণীত ক্রিয়াযোগসারের প্রসঙ্গ। ঘোষাল বংশীর রাজা জয়নারায়ণ রচিত কাশীখণ্ডের অনুবাদের বিস্তৃত সমালোচনা। প্রেমানন্দ দাস লেখকের বিষয়। রামায়ণ ও মহাভারতাদির অনুবাদ। কৃষ্ণিবাসের রামায়ণে পরবর্তী যোজনা। বলীধর ও গঙ্গাদাস

সেনের রচিত রামায়ণ। ভবানীদাস বিরচিত লক্ষ্মণবিধিজয়। বিজ় ভূগায়াম প্রণীত রাশায়ণ। অজুতাচার্যের রামায়ণ। জগৎরাম রায়ের রামায়ণ। রামমোহনের রামায়ণ। রঘুনন্দন গোস্বামী রচিত রামরসায়ণ। মহাভারত। মহাভারতে গজেন্নর বাহুল্য ও বোজনর সুবিধা। পূর্ববর্তী মহাভারত রচকগণের পরে রাজেন্দ্রদাস কৃত শকুন্তলোপাখ্যান। গদ্যদাস সেনের আদিপর্ব ও অশ্বমেধপর্ব। ষটীবরের রচিত স্বর্গারোহণ পর্ব। গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব। কাশীদাসের মহাভারত। কাশীদাসের পরিচয়। পূর্ববর্তী মহাভারত রচকগণের রচনা হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়া কাশীদাসী মহাভারতের সেই সেই অংশের সহিত তুলনা ও সাদৃশ্য প্রদর্শন। কাশীদাসের কবিত্বের সমালোচনা। কাশীদাস বিরচিত অপর তিন খানা কাব্যের উল্লেখ। গদ্যদাস দাস বিরচিত 'সারণ বিরাট'। রামেশ্বর নন্দী বিরচিত মহাভারত ও ত্রিলোচন চক্রবর্তী বিরচিত মহাভারতের প্রসঙ্গ।

অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

(৩১৭—৩২৬ পৃঃ)।

বাঙ্গালীর বীরত্ব, কর্তব্যকার পাইক, চামার পাইক, নট পাইক প্রভৃতির উল্লেখ। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রকৃত বীরত্ববর্ণনার অভাব। রাজনৈতিক বৃত্তান্ত। সামাজিক আচার ব্যবহার, পরিচ্ছাদি। শিক্ষার অবস্থা। নিম্ন শ্রেণীতে শিক্ষার অনুশীলন। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা। সামাজিক অপরাধের কথা। অপ্রচলিত ও দুর্জহ শব্দার্থের তালিকা। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কয়েকটি বাঁধাবিষয়ের সমালোচনা। দেব দেবীর প্রসঙ্গোপলক্ষে সামাজিক অবস্থা উদ্ঘাটন। সংস্কৃতের অনুকরণের ক্রমবর্ধিষ্ণু চেষ্টা ও পরবর্তী যুগের পূর্বাভাস।

নবম অধ্যায়।

কৃষ্ণচন্দ্রীয়যুগ অথবা নবদ্বীপের দ্বিতীয়যুগ।

(১) নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র। (২) সাহিত্যে নূতন আদর্শ। (৩) কাব্যশাখা।

(৪) গীতিশাখা।

(৩২৭—৩৮৯ পৃঃ)।

নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা, ও চরিত্র। তাঁহার রহস্য প্রিয়তা। চৈতন্যোপাসক প্রতি বিষেব। সাহিত্যে নূতন আদর্শ। পার্শ্বের অনুকরণ। জেলেখা, বদরচাচ্ প্রভৃতি পুস্তক হইতে দৃষ্টান্ত সংকলন। সৌন্দর্য্যের আদর্শের খর্ব্বতা। লয়লা-মজমু, জেলেখা প্রভৃতি পুস্তকের রচনার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাহুঙ্করের স্থলে স্থলে সাদৃশ্য। নৈতিক আদর্শের অবনতি কিন্তু শব্দ প্রয়োগে পটুতা। কাব্যশাখা। সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপর পরস্পরের প্রভাব। পদ্মাবতী। আলোরাল কবির পরিচয়। পদ্মাবতী কাব্যের বিস্তৃত সমালোচনা। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাহুঙ্কর। কৃষ্ণরাম ও রাধাপ্রসাদের বিদ্যাহুঙ্করের সহিত ভারতচন্দ্রের বিদ্যাহুঙ্করের তুলনা। কবি

কুঙ্করাম দাশের পরিচয়। রামপ্রসাদের পরিচয়। রামপ্রসাদের বিদ্যাহন্দর। রামপ্রসাদের বৈষ্ণব নিন্দা। রামপ্রসাদের গানের প্রসঙ্গ। ভারতচন্দ্র দাশের পরিচয়। ভারতচন্দ্রের কবিত্বের সমালোচনা। কামিনীকুমার, জীবনতারা, ও চন্দ্রকান্তের প্রসঙ্গ। রামগতি সেন, জয়নারায়ণ সেন ও আনন্দময়ী গুপ্তার পরিচয়। রামগতি সেনের 'মারাতিমির চল্লিকার' সমালোচনা। জয়নারায়ণ সেনের চণ্ডীকাব্যের সমালোচনা। "হরিলীলার" কবিত্ব। আনন্দময়ী গুপ্তার কবিত্বের নমুনা। রসময় দাস কৃত গীতগোবিন্দের অনুবাদ। গিরিধর কৃত গীতগোবিন্দের অনুবাদ। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী। গীতিমাধা। গীতি কবিতার বাঙ্গালীর মনোবাধা জ্ঞাপন। রামপ্রসাদের গান। অপরাপর শাক্ত বিষয়ক সংগীত রচকগণের প্রসঙ্গ। রামবহু, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, রামমুলাল রায়, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, মৃজাহসেন আলি সৈয়দ জাফর এবং এটনিকিরিজির গানের উল্লেখ। উক্ত বিষয়ে অপরাপর গান রচকগণের উল্লেখ। বিদ্যাহন্দর প্রসঙ্গ। গোপালচন্দ্র উড়ের গান। মধুকানের গান। দাশরথী দাশের পাঁচালীর সমালোচনা। বৈষ্ণব কবিওয়ালাগণ। রামনিধি দাশের (নিধুবাবুর) গান। রামবহুর বৈষ্ণবগীতি। হরঠাকুর, রাহ ও নৃসিংহ, নিতানন্দ বৈরাগী, গোজলা শুই, বজ্রেশ্বরী, গৌর কবিরাজ, গোরক্ষ নাথ, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় নবাই ঠাকুর, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিওয়ালাগণের বিবরণ। ভোলাময়রাও মধুকান। পূর্ববঙ্গের কবিওয়লা রামরূপ ঠাকুর। কৃষ্ণ যাত্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কৃষ্ণকমল গোস্বামী। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী। কৃষ্ণকমলের সংগীতের প্রকৃত লক্ষ্য ও বৈষ্ণবধর্মসম্বন্ধে কয়েকটি কথা। দিব্যোদাদ প্রভৃতি গীতিকাব্যের সমালোচনা।

৯ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

(৩৮৯—৪০৩ পৃঃ)।

কবিওয়লা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ছন্দ বিচার, বৃন্তগন্ধী, ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, দীর্ঘ চোপদী, লঘু চোপদী, মালমাপ, তুণক প্রভৃতি ছন্দের উদাহরণ। সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম লঙ্ঘন। প্রাচীন গদ্য সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। রূপ গোস্বামীর কারিকা, কৃত্তদাস কবিরাজের রাগময়ীকণা, নরোত্তম দাস কৃত গদ্যগ্রন্থ, দেবডায়র তন্ত্র প্রভৃতি হইতে রচনার উদাহরণ। রাজ-দরবারের ভাষা। কামিনীকুমার হইতে গদ্যের উদাহরণ। পত্রাদির ভাষা। বঙ্গাক্ষরের প্রসঙ্গ, প্রাচীন তাম্রশাসনের অক্ষর। অপ্ৰচলিত শব্দ। কতকগুলি শব্দের ভিন্নার্থ গ্রহণ। খেউর গান। বাণিজ্য দ্রব্য। স্থলীলোক সমাজে শিক্ষার চর্চা। তত্ত্বলোকগণের শিক্ষা প্রসঙ্গ, জয় নারায়ণের চণ্ডী হইতে উদাহরণ। ইংরেজ আগমনে সাহিত্যে নূতন আদর্শ।

সাক্ষেতিক শব্দের অর্থ।

সাক্ষেতিক শব্দ	অর্থ
অঃ য	ভারতচন্দ্রের অন্বাদমঙ্গল।
উঃ চঃ	উত্তর চরিত।
কবীন্দ্র	কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কৃত মহাভারতের অনুবাদ (পরাগলী মহাভারত।)
ক, ক, চ,	কবিকল্প চণ্ডী।
চ ; কৌ	চও কৌশিক।
টৈ, চ,	টৈতনা চরিতামৃত।
টৈ, ভা,	টৈতনা ভাগবত।
টৈ, ম,	টৈতনা মঙ্গল।
প, ক, ত,	পদকল্পতরু।
বিঃ	বিদ্যাসুন্দর।
বেঃ গঃ পুঁধি	বেঙ্গল গভর্নমেন্টের পুঁধি।
ভা, বি	ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।
মাঃ চ, গা,	মাণিক চাঁদের গান।
মা, গা	ঐ
মা, চ	মাধবাচার্যের চণ্ডী।
মুঃ কঃ	মুচ্ছ কটিক।
মুঃ রাঃ	মুর্দারাক্ষস।
রা, বি	রাম প্রসাদের বিদ্যাসুন্দর।
সঞ্জয়	সঞ্জয়কৃত মহাভারত।
শবুঃ	শকুন্তলা।

বঙ্গভাষা-সাহিত্য ।

প্রথম ভাগ ।

প্রথম অধ্যায় ।

বঙ্গভাষার উৎপত্তি ।

বঙ্গভাষা* কোন সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে । ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যেমন কোন ধর্মবীর কি কর্মবীরের আবির্ভাবসময় সম্বন্ধে অল্পপাত দৃষ্ট হয়, পাঠকগণের মধ্যে হয়তঃ কেহ কেহ এই অধ্যায়-ভাগে সেইরূপ একটা খৃষ্টাব্দ কি শকাব্দের প্রত্যাশা করিতেছেন, কিন্তু ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রশ্নের তরুণ সহজ উত্তর দেওয়া যায় না । কোন কোন লেখক, এইরূপ পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াসী হইয়া বলিয়াছেন, ১০০০ বৎসর হইল বঙ্গ-ভাষা ও বঙ্গাক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে । ললিতবিস্তরে দেখা যায়, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, ব্রাহ্মী, সৌরাষ্ট্রী ও মাগধলিপি শিখিতেছেন ; ইহা ৫৫০ খৃঃ পূর্বের কথা । গৌড়ের সেনরাজাগণের তাম্রশাসন, এবং ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম তাম্রশাসন সমূহের অক্ষর বাঙ্গালা ; সেই সকল তাম্রশাসন ন্যূনতম ৮ শত বৎসরের প্রাচীন । গোপীচাঁদের গান সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে, পাঠক দেখিবেন উহা বহু প্রাচীন রচনা ; প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্বে মহারাজা লক্ষ্মণসেন বঙ্গদেশে রাজত্ব

* উত্তরে রাজমহল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পশ্চিমে উড়িষ্যা এবং পূর্বে আসাম হইতে আরকান পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্বত শ্রেণীর মধ্যবর্তী ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার উপত্যাকাসী প্রায় ৫০ লক্ষলোক বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিয়া থাকে । এই বৃহৎ ভূভাগের প্রচলিত ভাষার নানারূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তথাপি ভাষা তথ্যালোচনাকালে ইহাকে এক ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে ।" হার্কনের ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, ৩৪৭ পৃঃ ।

করিতেছিলেন, কথিত আছে লক্ষ্মণ সেনের কল্পনাগ্রন্থত কয়েকটি বাঙ্গলা-পদ পদ-সমুদ্রে গ্রন্থে সংগৃহীত আছে; এইরূপ নানা কারণে বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষরের সহস্রবৎসরপূর্ব উৎপত্তির স্বত্ব কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না।

আর্য্যগণ যখন ব্রহ্মাবর্ত ত্যাগ করিয়া ভারতের নানাপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, তখন তাঁহাদের ভাষা ও অক্ষর ক্রমশঃ স্বতন্ত্র হইতে লাগিল। দেশের অবস্থা ও অন্যান্য কারণে, এই স্বাতন্ত্র্য ঘটিয়াছিল। বিম্‌স সাহেব বলেন উড়িষ্যার অক্ষর গঠনে উক্তদেশমূলভ তালপত্র সমূহ বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে, তিনি একটি সপত্র তালপত্র ছবি স্বীয় পুস্তকে* মুদ্রিত করিয়া এই বাখ্যা দিয়াছেন যে, উড়িয়াগণ সর্বদা সেইরূপ গোলাকৃতি কুক্ষিতাগ্র তালপত্র দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ তালপত্রে লৌহসূচির অগ্রভাগে পুস্তকাদি লিখিতেন, সুতরাং তালপত্রের ভাব তাঁহাদের মনে এরূপ ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহাদের অক্ষরগুলি ও তালপত্রের মায় কুক্ষিতাগ্র গোলাকৃতি ছন্দ ধারণ করিয়াছে। হিন্দু স্থানের নানা দেশ-প্রচলিত অক্ষর গুলি এইভাবে পরস্পরের সহিত স্বতন্ত্র হইয়াছে। বিম্‌স সাহেবের মত যে সম্পূর্ণ গ্রহণীয়, আমরা তাহা বলিতেছি না। হয়ত উহাতে ইতিহাস-বিরোধী একটু কল্পনা, একটু কবিত্ব খেলিয়াছে; কিন্তু দেশভেদে ও অবস্থা ভেদে যে অক্ষর ও ভাষার বৈষম্য দাঁড়াইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে আর্য্যগণ আসিলে পর, তাঁহাদের ভাষার সঙ্গে নিকটবর্তী অন্যান্য প্রদেশের ভাষা মিশ্রিত হইল এবং দেশের স্বাভাবিক কতকগুলি কারণ বশতঃ ও বঙ্গদেশ-কথিত-ভাষা রূপান্তরিত হইয়া গোড়ীয়া অন্যান্য ভাষা হইতে পৃথক হইল। কিন্তু বঙ্গভাষার কবে উৎপত্তি হইয়াছে, কে বলিবে? আদি দেখিবার ঔৎসুক্য আমাদের নাই, বিজ্ঞান ও সে প্রশ্ন করে না; যাহা হইতেছে, তাহা কি ভাবে হইতেছে, তাহাই দর্শনীয়।

* Comparative Grammar Vol I.

+ হরমলি সাহেব নিম্নলিখিত ভাষাগুলিকে গোড়ীয়া ভাষার অন্তর্গত স্থির করিয়াছেন,—
উড়িয়া, বাঙ্গলা, হিন্দি, নেপালী, মহাবঙ্গী, গুজরাটী, সিন্ধিয়া, পাঞ্জাবী, এবং কান্দীরী। আমরা সেই শব্দ ঐক্য অর্থেই ব্যবহার করিলাম।

আর্য্য-জাতির প্রথম ভাষা বেদে, তৎপরবর্তী ভাষা রামায়ণাদির সংস্কৃতে, তৎপরবর্তী ভাষা বৌদ্ধদিগের পালি ও গাথা প্রভৃতি প্রাকৃত, চতুর্থ প্রকার, বাংলা হিন্দি প্রভৃতি গোড়ীয় ভাষাগুলিতে দৃষ্ট হয়; ইহা শুধু লিখিত ভাষার কথাই বলিতেছি। আমরা বঙ্গভাষার সময় নির্ধারণ করিতে যাইয়া, ইহার লিখিত ভাষায় পরিণতির কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। ভাষার আদি নির্ণয় করিবার ভার, কল্পনা-শীল কবি ও দার্শনিকদিগের হস্তে দিয়া, ঐতিহাসিকগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

বোধ হয়, যে ভাষায় আদিম হিন্দুগণ কথা কহিতেন, বেদে ঠিক সেইরূপ ভাষাই রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে ভাষার শ্রীরক্ষির চেষ্টা ও ব্যাকরণের সৃষ্টি হইতে কথিত ও লিখিত ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই, রামায়ণের ভাষা, ঠিক কথিত ভাষা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যখন কালিদাস, বালেদুবক্র পলাশ-পত্ণের বর্ণনা করিতেছিলেন, কি জয়দেব, মদন মহাপতির কনক-দণ্ড-রুচি কেশরকুম্বের কথা লিখিতেছিলেন, তখন তাঁহারা সে ভাষায় কথা বলিতেছিলেন না। এখন ও বঙ্গের কত কবি, মুখে বিদ্বাং কি মেঘের ডাক বলিয়া, লেখনী দ্বারা ইরমদ কি জীমূতমঙ্গের সৃষ্টি করিতেছেন; তাই বলিতেছিলাম, লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে, একটা প্রভেদ আছে ও চিরদিনই থাকিবে।

লিখিত ভাষার সঙ্গে, কথিত ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও, সে ব্যবধানের একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে, লিখিত ভাষা মৃত হইয়া পড়ে ও তৎস্থলে কথিত ভাষা একটু বিগুহ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হয়। লিখিত ভাষার উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়া উহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়। ক্রমশঃ বাক্য-পল্লব ও শব্দের শ্রীরক্ষির প্রতি রুচি প্রবল হওয়াতে—ভাষা জনসাধারণের অনধিগম্য হইয়া পড়ে,—তখন ভাষা বিপ্লবের আবশ্যক হয়। যখন সংস্কৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার সেইরূপ প্রভেদ ঘটিল তখন কথিত পালি-ভাষা, কিঞ্চিৎ বিগুহ হইয়া, লিখিত ভাষা হইয়া দাঁড়াইল; যখন পুনশ্চ প্রাকৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ বেশী হইল, তখন বর্তমান গোড়ীয় ভাষাগুলি কিঞ্চিৎ পরিগুহ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হইল। ব্যাকরণ, শিল্প ও অকৃতির বাক্য চেষ্টা শাসন করে বলিয়া, উহা চির-প্রবাহ-শীল ভাষার

গতি স্থির রাখিতে পারে না। ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য করিয়া ভাষা রূপান্তর গ্রহণ করে। ব্যাকরণ, যুগে যুগে ভাষার পদাঙ্কস্বরূপ পড়িয়া থাকে। ভাষা যে পথে বহিয়া যায়, ব্যাকরণ সেই পথের সাক্ষী মাত্র। বিলুপ্ত মাহেশ ব্যাকরণের পর পাণিনি, তৎপর বররুচি, পুরন্দর, শাকটায়ন, যাস্ক, ইঁহাদের পর রূপসিদ্ধি, লঙ্কেশ্বর, শাকলা, ভরত, কোহল, ভামহ, বসন্তরাজ, মার্কণ্ডেয়, ক্রমদীপ্তর, দীপঙ্কর, মোগ্গল্যায়ন, শিলাবংশ—ব্যাকরণ রচনা করেন। পূর্ববর্তী যুগে যাহা ভাষার দোষ বলিয়া কীর্তিত হয়, পরবর্তী যুগের ব্যাকরণ তাহাই ভাষার নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তাই পাণিনির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও মহাবংশ ও ললিতবিস্তর শুদ্ধ বলিয়া গণ্য, এবং বররুচির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও ঠাদ কবির গাথা কি চৈতন্যচরিতামৃত নিন্দনীয় হয় নাই। সময় সম্বন্ধে যেরূপ প্রাচীন, সন্ধ্যা, রাত্রি,—ভাষা সম্বন্ধে ও সংস্কৃত, প্রাকৃত, বাঙ্গলা, কি হিন্দি তদ্রূপ—পূর্ববর্তী অবস্থার রূপান্তর।

বঙ্গভাষা আমরা এখন যেরূপ বলি, তাহার মূখ্য চিহ্নগুলি কোন্ সময় গঠিত হইয়াছিল, নিরূপণ করা সহজ নহে। বঙ্গভাষা জননীর গর্ভ হইতে শিশুর ন্যায়, কোন শুভ লগ্নে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। বহুদিন হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার বর্তমান রূপ গঠিত হইতেছিল। কথিত ভাষা, ব্যাকরণানুযায়ী লিখিত প্রাকৃত হইতে বহুদূর হইয়া পড়িল—তাহা একদিনে নহে। হরন্‌লি সাহেবের মতে, ৮০০খৃঃ হইতে ১২০০খৃঃ অব্দের মধ্যে প্রাকৃতির যুগ লুপ্ত ও গোড়ীয় ভাষাগুলির ত্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-শক্তির পরাভবে, হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানে, হিন্দু-জাতির নব চেষ্টার ক্ষুরে, ও সংস্কৃতের নববিকাশে, সেই পরিবর্তন এত দ্রুত হইল, প্রাকৃতির সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ এত বেশী হইল, যে উক্ত ভাষাকে বিদায় দিয়া, গোড়ীয়ভাষা গুলিকে লিখিত ভাষার শ্রেণীভুক্ত করা আবশ্যক হইল। ইতিহাসে ও বৌদ্ধাধিকারের লোপকাল ও হিন্দু ধর্মের অভ্যুত্থান কাল ৮০০খৃঃ হইতে ১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে বলিয়া বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সংস্কৃত প্রাকৃত ও বাঙ্গলা ।

ধর্মবিপ্লবে প্রাচীনভাব ও ভাষার সংস্কার এবং নবভাব ও ভাষার প্রতিষ্ঠা হয়। রোমান যাজকদিগের প্রভুত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে, ল্যাটিনের একাধিপত্য নষ্ট হয়। বুদ্ধদেব মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, খ্রীষ্ট শিষ্যগণকে তাঁহার বাক্য ও কার্যাবলি পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে অমুজ্ঞা করেন।* ভারতের ভাষার ইতিহাসে সেইদিন এক নবযুগ প্রবর্তিত হয়। যদিচ বৌদ্ধগণ ও মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন, তথাপি সেই অনুজ্ঞা প্রচারের সময় হইতে সংস্কৃতের অখণ্ড প্রভাব তিরোহিত হয়। দেবভাষা, দেব ও ঋষিগণের জন্য সেইদিন স্বর্গারোহণ করেন।

বৌদ্ধাধিকারে প্রাচীন ভাষা ও ভাব দলিত হয়। ব্রাহ্মণগণ কৃষিকার্য্য আরম্ভ করেন, কত্তু বা বৌদ্ধদিগের জীবে দয়া স্মরণ করিয়া, হলকর্ষণ কার্য্যে নিবৃত্ত হইবার বিধি প্রণয়ন করেন যথা,—

“বৈশ্বরূপাণি জীবন্ত ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিরোহপি বা। হিংসাপ্রাণাং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জয়েৎ ॥ কৃষিং সাক্ষিতি মমুন্তে সা বৃত্তিঃ সধিগর্হিতা। ভূমিং ভূমিশয়াং চৈব হস্তি কাষ্ঠময়োরুণম্ ॥” মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায় ৮৪ শ্লোক।

হল-চালনায় পাছে কোন ক্ষুদ্র জীব নষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় এই নিষেধ। ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ মুঞ্জত্নী শ্রমণদিগের সঙ্গে একত্র বাস করিয়া, হিন্দু-ধর্মকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিবিম্ববৎ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আদি চতুর্ভুজ হইতে নানা প্রকার সঙ্কর জাতি উদ্ভূত হয়, ব্রাহ্মণ বৈশ্যকে বিবাহ করিয়া সমাজে গৃহীত হইতেন—চারুদত্ত মুচ্ছকটিকের শেষাঙ্গে বসন্ত সেনাকে বিবাহ করিলেন, একরূপ দেখা যাইতেছে; যে ভাবে বৌদ্ধগণ রামায়ণ নষ্ট করেন, তাহাতেই দৃষ্ট হইবে, বৌদ্ধাধিকারে হিন্দুশাস্ত্রের ভগ্নতির একশেষ হইয়াছিল। রাজা দশরথের দুই পুত্র

* “আমার বাক্য সকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিও না, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যেমত প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক সেইরূপ ভাষা গ্রহণান্তে ব্যবহার করিবে।” বুদ্ধবাক্য। ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত হইয়াছিল, এবং ইহার ভীকাকারও কেহন বুদ্ধবাক্য সকল মকণিকান্তি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় রচিত।”

এবং এক কন্যা—পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ এবং কন্যা সীতা । রামায়ণের শেষে রাম সহোদরা সীতাকে বিবাহ করেন* । ইহা শুধু রামায়ণের বিকৃতি নহে, ইহা দ্বারা সমাজে বিবাহ-পদ্ধতি যে যথেষ্টাচারে পরিণত হইয়াছিল, তাহার ও আভাষ পাওয়া যায় ।

শুধু সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়াছিল, এরূপ নহে,—ভাষা ও বিশৃঙ্খল এবং প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছিল । কথিত ভাষার উপর লিখিত ভাষার সর্বদাই প্রভাব দৃষ্ট হয় । সংস্কৃতের আদর্শ, লোক-চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইল ও তৎস্থানে শিথিল প্রাকৃত রাজসভায় প্রচলিত হইল । কথিত ভাষা ও পূর্বাশ্রয় মৃদুভাব অবলম্বন করিল যথা,—

১। “পণবহ জন্ম চরণে ॥” মুদ্রারাক্ষস ১ম অঙ্ক ।

২। শূলং বিরক্তে ? পণ্ডবে বৈরকেন্দ্র ? পুস্তে লাঘাএ ? লাবণে ? ইন্দ উত্তে ? অহো কুন্তীএ তেণ লামেণ জাদে ? অশ্বামে ? ধর্মপুতে ? জড়াউ ?” মুচ্ছকটীক ১ম অঙ্ক ।

৩। “পলিতাঅহু দাশীএ পুস্তে দলিদ চালুদন্তকে তুমং ॥ ঐ ৮ম অঙ্ক ।

সংস্কৃতজ্ঞ মাঝেই এইরূপ লেখা বহুরার পড়িয়াছেন । চারুদত্ত, রাম, রাবণ, দরিদ্র, চরণ স্থল, চালুদত্ত, লাম, লাবণ, দলিদ ও চলণ হইয়াছে । এখন ভারতবর্ষের কোন স্থানেই নিরক্ষর কৃষক ও গ্রামকে লাম বলিলে ক্ষমাই হইবে না । কথিত ভাষাও এখন অনেক পরিমাণে বিকৃত হইয়াছে । ইহা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিক্রিয়া । জৈমিনি ও ভট্টপাদ এই প্রতিক্রিয়ার কার্য আরম্ভ করেন । সাহসরামের প্রস্তরলিপিতে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অশৌকের যে অত্যাচার বর্ণিত আছে, রাজা সুধর্ম সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন । যথা লক্ষর বিজয়ে,—

“ছুষ্টমতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনান্ অসংখ্যান্ রাজমুখাননেকবিদ্যাশ্রমভেদৈর্নৈর্জিত্য তেযাং শীর্ষাণি পরভূতিহিহা মহত্ উল্খলেন্ নিক্ষিপ্য কঠিনমগ্নৈশ্চূণীকৃত্য চৈব ছুষ্ট-মত-প্রসমাচরন্ নির্ভয়ো বর্ততে ॥”

হিন্দু-ধর্মের এই উত্থান কেবল উৎপীড়ন মাঝেই পর্যাবসিত হইল না । চতুর্দিকে প্রাচীন শাস্ত্রের চর্চা প্রারম্ভ হইল । খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আজ-

* অথ বায়বংশ্যঃ দশরথ মহারাজ নাম অগতি গমনমপহায় ধর্ম্মেণ রাজ্যমকোরসি । তন্ত বোলসন্ন মহিষি সহস্রনম জ্যেষ্ঠিকা অগমহেযি য পুত্র একণ সধিরম বিজয়ি । জ্যেষ্ঠ পুস্তো রাম পড়িডো অহোদি । দ্বিতীয় লক্ষ্মণ কুমারোদিডা সীতাদেবী নাম ॥” ইত্যাদি ।

বৌদ্ধ ভাষকঃ ।

মিরের রাজপুত্র সারঙ্গদেব বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা রাজা বিশালদেব, হিন্দু-শাস্ত্র শুনাইয়া তাঁহার মতি গতি স্থির করিলেন। চাঁদকবি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।*

সংস্কৃতের আদর্শ ভাষাক্ষেত্রে পুনঃ প্রবর্তিত হইলে, লিখিত ও কথিত ভাষা উভয়ই বিগত হইতে লাগিল। লাম পুনঃ রাম হইলেন। রত্নাকর দত্ত্যার উচ্চারণ সংশোধন সহজে শ্রৌতিক বিশ্বাস, কৃত্তিবাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

“পাপে জড় জিহ্বা রাম বলিতে না পারে। কহিল আমার মুখে ও কথা না ক্ষুরে। শুনিয়া ব্রহ্মার তবে চিন্তা হইল মনে। উচ্চাৰিবে রাম নাম এমুখে কেমনে। মকার করিল অগ্রে রা করিল শেষে। তবে বা পাণীর মুখে রাম নাম আইসে। ব্রহ্মা বলিলেন তারে উপার চিন্তিয়া। মানুষ মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়া। শুনিয়া ব্রহ্মার কথা বলে রত্নাকর। মৃত মানুষেরে সবে মড়া বলে নর। মড়া নয় মরা বলি জপ অবিশ্রাম। তবে মুখে তখনি ক্ষুরিবে রাম নাম। শুক কাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে। অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্মা দেখান তাঁহারে। বহুক্ষেণে রত্নাকর করি অনুমান। বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠ খান। মরা মরা বলিতে আইল রাম নাম। পাইল সকল পাপে মূর্খ পবিত্রাণ। তুলা রাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়। একবার রাম নামে সর্বপাপ ক্ষয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

যাহার জিহ্বা পাপে জড়, এবং যে পরস্বহারক দত্ত্য, তাহার মুখে রাম নাম বিকৃত হয়। ইহাতে বৌদ্ধদিগের প্রতি একটুকু কটাক্ষ আছে। ব্রহ্মার (না ব্রাহ্মণের?) এত দোহাই ও যত্নের সহিত এই নূতন স্পেলিং শিক্ষা দেওয়ার পরে, আর কোন্ চাষা রামকে লাম বলিতে সাহস করিবে? তাই লকারের প্রভাব লুপ্ত হইল ও চাঁলদত্ত, লাম, লাংগ, দলিদ্ধ স্থলে, চারুদত্ত, রাম, রাংগ, দরিদ্র পুনরায় কথিত ভাষায় ফিরিয়া আসিল। সংস্কৃতানুযায়ী স্পেলিং প্রচার কার্য অদ্যাবধি চলিতেছে। প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকগুলির ভাষা ক্রমশঃ পরিশুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। সেইসব পুঁথিতে অনেক শব্দ দৃষ্ট হয়, যাহা এখন লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যথা,—

* অতি দুচিও ভট্টে সারংগ দেব। পিত প্রতি কট্টে অবিহিতং সেব। বুধ ব্রাহ্ম লিট্টে বাধেন তেগ। হুশি ব্রহ্ম রাজ মন ভৈ উপেগ। বুলাই কুবের সগমাধ কীন। কিহি কাজ তুমং ইহ ব্রহ্ম লীন। তুমং ছাড়ি সরস ইম কহৈ বত। বানিক পুত্র হন তেং দুচিও। ইহ নষ্ট জ্ঞান হুনিয়গ কাণ। পুরষাতন ভৈজ কিস্তী হান। তুম রাজবংশ রাজ নহ সংগ। মৃগয়া সর খেলো বন কুরংগ। পরমোধ ভজো বোধক পুরাণ। রামায়ণ হুমহ ভারত নিদাম। ইত্যাদি।” চাঁদমাধ্য।

পথা—পথ, কাতি—কার্তিকমাস, নিমল—নির্মল, নথ্য—নক্ষত্র, মুগ্ধক—মৃগ, বিভা—বিবাহ, পুনি—পুনঃ, শুকুল—শুভ, বগা—বক, দে—দেহ, সজাই—সবাই, বিনি—বিনা ।*

বস্তুতঃ বাঙ্গলার সঙ্গে কালে সংস্কৃতের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইল যে, বাঙ্গলা প্রাচীন কবিতা স্থলে স্থলে সংস্কৃত কবিতা বলিয়াও গণ্য হইতে পারে, ভারতচন্দ্রের এই কবিতাটি দেবনাগর অক্ষরে ছাপা হইলে কাশী কি পুণার পণ্ডিতগণ ঠিক বাঙ্গালীর মতই তাহার রসাস্বাদ করিতে পারিবেন,—
“জয় শিবেশ শঙ্কর, বুধ ধ্বজেশ্বর, মুগাঙ্ক শেখর দিগ্বেশ্বর । জয় শ্বশান নাটক, বিবাণ-বাদক, হতাশভালক মহত্তর । জয় হরারি নাশন । বৃশেয বাহন, ভুজঙ্গ ভূষণ জটধর । জয় ত্রিলোক কারক, ত্রিলোক পালক, ত্রিলোক নাশক মহেশ্বর ।”

বিম্ সাহেব বঙ্গভাষাকে গোড়ীয় অগ্রাগ্র ভাষা হইতে সংস্কৃতের অতি সন্নিহিত মনে করেন । তিনি প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের মতামুসারে, হিন্দি, পাঞ্জাবী ইত্যাদি ভাষাকে ‘তৎসম’ ও বাঙ্গলাকে ‘তদ্ভব’ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন + এবং এই নির্দেশ করেন, যে পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে মুসলমানগণের প্রভাব বশতঃ ভাষা শীঘ্রই পরিবর্তিত হইয়াছিল, কিন্তু বঙ্গভাষা সুদূর সীমান্তে নিরুপদ্রবে সংস্কৃতের ভাবে গঠিত হইতে অবকাশ পাইয়াছিল ।

বঙ্গদেশে সংস্কৃতের শক্তি কখনই লুপ্ত হয় নাই । যখন সমস্ত আর্য্য্য-বর্গে বৌদ্ধধর্ম প্রবল, তখন ও হিউনসাঙ, সমতট এবং বঙ্গদেশের অগ্রাগ্র স্থলে হিন্দুধর্মের প্রভাব দেখিয়া গিয়াছেন । তিনি এই দেশের লোকদিগকে পরিশ্রমী ও শিক্ষাভিমানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । বঙ্গদেশে সংস্কৃতের গর্ভ চিরদিনই রক্ষা করিতে পারিয়াছিল । গোড়ীয় রীতি বৃথা শকাড়ম্বর-পূর্ণ বলিয়া অলঙ্কার শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ অনাদর করিয়াছেন । বৈদর্ভীরীতির প্রসাদ গুণ, মাধুর্য্য ও সুকুমারত্ব ও গোড়ীয়রীতির সমাস বহুলত্ব, দণ্ডাচার্য্য উদাহরণ দ্বারা দেখাইয়াছেন । যথা বৈদর্ভীরীতি,—

“মালতীমালা লোলালিকলিলা যথা ।

গোড়ীয় রীতি,—

যথা নভাৰ্জুনোজ্জয় সন্মুখাকো বলক্ষণঃ ।”

কিন্তু এইসব ঐতিকটু সমাসাবদ্ধ পদদ্বারা, বোধ হয়, সংস্কৃত এদেশে বহুমূল হইয়াছিল । তাই গোড়ীয় ভাষা গুলির মধ্যে, বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অতি-সন্নিহিত ।

* ইহার আর সবগুলিই ডাক ও খনার বচনে পাওয়া যাইবে ।

† Beames Comparative Grammar VOL. I. P. 29.

কেহ কেহ বলেন, বঙ্গভাষা প্রাকৃত হইতে আসে নাই; কিন্তু একবারে এক সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। আমরা বাঙ্গলাকে গোড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে সংস্কৃতের অতি সন্নিহিত মনে করিলে ও উক্ত মত কখনই সমর্থন করিতে পারি না। দেখা যাইবে, ডাক ও খনার বচনের ভাষা ও পরাগলী মহাভারতের ভাষাই স্থলে স্থলে এত কঠোর যে, তাহার অর্থ পরিগ্রহ করা সহজ নহে। এই সকল রচনা হইতে ৫০০।৬০০ বৎসর পূর্বের ভাষা অবশ্য সংস্কৃত ছিল না, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। তাহা বর্তমান ভাষা হইতে এত দূরবর্তী ছিল যে, তাহাকে বঙ্গভাষা আখ্যা প্রদান করা ও মঙ্গত নহে; সুতরাং প্রাকৃত ছাড়া কি বলা যাইতে পারে? হয়ত যে সব প্রাকৃত রচনা আমরা পাইয়াছি, এইদেশ-প্রচলিত প্রাকৃত ঠিক সেরূপ ছিল না; কিন্তু উহা ও সাহিত্য-দর্পণনির্দিষ্ট ১৮ প্রকার প্রাকৃতিক ভেদের অন্তর্গত ছিল, অনুমান করা বোধ হয় অসম্ভব নহে। দণ্ড্যাচার্য্য-বিরচিত কাব্যদর্শে গোড়দেশীয় প্রাকৃতের উল্লেখ আছে;—

শৌর-সেনীচ গোড়ীচ লাটীচালাচ তাদৃশী ।

যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম্ ॥

বঙ্গভাষার ঠিক প্রাগবস্থা আমাদের পরিচিত প্রাকৃতগুলির কোনটিতেই পাই না, কিন্তু অনেকরূপ সাদৃশ্য পাই। নিম্নে শব্দগত সাদৃশ্য দেখাইতে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। যদিও এই সব শব্দ নানাপুস্তকেই দৃষ্ট হইবে, তথাপি আমি যে পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত তালিকায় উল্লেখ করিলাম।

প্রাকৃত (সংস্কৃত)—বাঙ্গালা—যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।

+পথর (প্রস্তরঃ) ... পাথর।

+লোগ* (লবণম্) ... লুন।

বিজ্জুলী (বিহ্যৎ) ... বিজুলী ... মৃঃ কঃ ।

+ এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট শব্দগুলি বাঙ্গলা ও ইংরেজী পুস্তকাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহার অধিকাংশই স্ত্রীরস মহাশয়ের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিবরণ প্রস্তাবে’ বিদ্যমান। ‘Comparative grammar’ এ ও রামদাস সেন মহাশয়ের প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যাইবে।

* ‘লুন’ শব্দ পূর্বে ‘লোন’ রূপেই ব্যবহৃত হইত; যথা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে,—

“বায়ান পুঙ্খ বার লোনের ব্যাপার। সে বেটা আমার কাছে করে অহকার।”

প্রাকৃত (সংস্কৃত) — বাঙ্গালা — যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল ।

বাড়ী (বাটী)	... বাড়ী	... মৃ: ক:
ঘর (গৃহম্)	... ঘর	... ঐ
ছয়ার (ছারম্)	... ছয়ার	... ঐ
ঠাণ (স্থানম্)	... ঠাই	... ঐ
বহ* (বধুঃ)	... বউ	... মৃ: রা:
বকল (বকলম্)	... বাকল	... শকু:
ভাত (ভক্তম্)	... ভাত	...
লাটী (যষ্টিঃ)	... লাঠী	...
খাড়া (স্তম্ভঃ)	... খাড়া	...
চক (চক্রং)	... চাকা	...
ঘিঅ (ঘৃতম্)	... ঘি	... মৃ: ক:
দহী (দধিঃ)	... দই	... ঐ
হুধ (হৃদম্)	... হুধ	...
অন্ধআর (অন্ধকারঃ)	... আঁধার	... মৃ: ক:
শিআল (শৃগালঃ)	... শিয়াল	... ঐ
হথী (হস্তী)	... হাতি	... ঐ
ঘোড়ও (ঘোটকঃ)	... ঘোড়া	... গাধা ।
চন্দ (চন্দ্রঃ)	... চাঁদ	... মৃ: ক:
সঞাঝা (সন্ধ্যা)	... সাঁঝ	... ঐ
হথ (হস্তঃ)	... হাত	... শকু ।
মথঅ (মন্তকং)	... মাথা	... মৃ: ক:
উত্ত (পুত্রঃ)	... স্নাত	... উ: চ:
কল (কর্ণঃ)	... কাণ	... মৃ: ক:
হিঅঅ (হৃদয়ঃ)	... হিয়া	... ঐ
অভাণ (মাতা)	... আই	... ঐ

* প্রাকৃত 'বহ' প্রাচীন বঙ্গীয় অনেক পুস্তকে দৃষ্ট হয় । যথা,—

'যাহার বহ থি দুরে বাস্তি । তাহার নিকট বসে অসতী ।' ভাকের বচন, বেণীমাধব দের সংস্করণ ।

৷ বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে 'আতার' ব্যবহার দৃষ্ট হয় । যথা,—

'আছিল আমার আতা কিছুই না জানি । কুন্তল ভরেতে সেই হিন্দুমানী মানি ।'

প্রাকৃত (সংস্কৃত)—বাঙ্গালা—সে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল ।

রাও, রায় (রাজা) ... রায় ... চঃ কোঃ ও পিজল ।

†চ্চুরা (ক্ষুরঃ) ... ছুরি ...

†মসাগ (মশানম্) ... মশান ...

বক্ষণ (ব্রাহ্মণঃ) ... বামুন ... মৃঃ কঃ ।

চেড়ী* (চেটী) ... চেড়ী ... ঐ

সহি (সধি) ... সহি ... ঐ

†জেট্ঠা (জ্যেষ্ঠ) ... জেট্ঠা ...

উবজ্জাঅ (উপাধ্যায়ঃ) ওঝা ... মৃঃ রাঃ

†কজ্জ (কার্য্যম্) ... কাষ ...

†কম্ম (কর্ম্ম) ... কাম ...

বহিণী (ভগ্নী) ... বোন ... মৃঃ কঃ

রাই (রাধিকা) ... রাই ... অপভ্রংশ ভাষা য়

কাণ্ণ (কৃষ্ণঃ) ... কাণ্ণ ... ঐ

গোয়াল (গোপঃ) ... গোয়াল ... ঐ

†বস্তা (বার্তা) ... বাত ...

অপ্পি (আত্মা) ... আপন ... মৃঃ রাঃ

আন্ধি† (অহং) ... আমি ... মৃঃ কঃ

তুম্মি (ত্বং) ... তুমি ... উঃ চঃ

শে (সঃ) ... সে ... মৃঃ কঃ

তুএ (ত্বয়া) ... তুই ... ঐ

তুহ (তব) ... তাহার ... শকুঃ

এহ (এষঃ) ... এই ... ঐ

ইমিণ (অনেন) ... এমনে ... মৃঃ রাঃ

* এই শব্দ পূর্বে খুব প্রচলিত ছিল । কৃত্তিবাসী রামায়ণ দেখ ।

† অপভ্রংশভাষামাত্র আত্মীয়াদিগিরঃকাব্যোবপত্রংশগিরঃ স্মৃতাঃ ।

† বাঙ্গালা ও প্রাকৃতের সান্নিধ্য দেখাইতে এই ‘আন্ধি’ ও ‘তুম্মি’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ত্রিশূরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত ১৫০ বৎসরের পূর্বের সমস্ত হস্তলিখিত পুঁথিতেই আমি ও তুমি স্থলে সর্বত্রই আন্ধি ও তুম্মি দৃষ্ট হয় । বেঙ্গাল দর্পণমোহের পুস্তকানুসারে পরাধীন মহাভারত, সঙ্কম-রচিত মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকে এই বৌদ্ধ-শব্দক বিদ্য । বৃষ্ট হইবে ।

প্রাকৃত (সংস্কৃত) — বাঙ্গালা — যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল ।

অজ্জ (অদ্য)	... আজ	... উঃ চঃ
গা (ন)	... না	... গাথা
অ (চ)	... ও	... ঐ
দঢ় (দৃঢ়)	... দড় *	... শকুঃ
সচ্চ (সত্যাম্)	... সাত্তা	... মৃঃ কঃ
অদ্ধ (অর্দ্ধম্)	... আধ	... ঐ
বুডঢ়া (বৃদ্ধঃ)	... বুড়া	... ঐ
হুঅ (হুয়ং)	... হুই	... পিঙ্গল
হুণা (দ্বিগুণ)	... হুনা	... ঐ
তিম্মি (ত্রি)	... তিন	... ঐ
চারি (চতুর)	... চারি	... ঐ
ছট্ঠ (ষষ্ঠ)	... ছয়	... মৃঃ কঃ
সত্ত (সপ্ত)	... সাত	... পিঙ্গল
অট্ট (অষ্ট)	... আট	... মৃঃ কঃ
বার (দ্বাদশ)	... বার	... পিঙ্গল
চোদ্দ (চতুর্দশ)	... চৌদ্দ	... ঐ
সোলা (ষোড়শ)	... ষোল	... ঐ
বাইসা (দ্বাবিংশ)	... বাইশ	... ঐ
+কেত্তক (ক্রিয়ং)	... কত্তক	...
+এত্তক (ইয়ং)	... এত্তক	...
+জৈত্তক (যাবৎ)	... জৈত্তক	...
জথ (যত্র)	... যথায়	... উঃ চঃ
এথ (অত্র)	... এথায়	... মৃঃ কঃ

বাঙ্গালা আর প্রাকৃতের ক্রিয়ার নৈকট্য, অতি স্পষ্টই দেখা যায়। যে কোন প্রাকৃত রচনা হইতে ঐ সব ক্রিয়া খুঁজিয়া বাঙ্গলার সঙ্গে তুলনা করিলেই পরস্পরের সম্বন্ধ অঙ্কুরিত হইবে। প্রাকৃতের বর্তমান কালের, হোই, পড়ই, কিংই,

এই 'দড়' শব্দ পূর্বে দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইত। কথা,—

"মরে কাবে প্রকর উদ্ধত বিজ্ঞবর। কোনদিন আমাকে কিলার পাছে মড়া।" চৈতন্য ।

এই "দড়" অর্থ এখন নিপুণ হইয়াছে।

করই, বোলই, গচ্ছই ইত্যাদি স্থলে আমরা বাঙ্গলা হয়, পড়ে, করে, কেনে, বলে, নাচে, ইত্যাদি পাইতেছি। প্রাকৃত গুনিঅ, লভিঅ, লই, ভবিঅ, করিঅ ইত্যাদি বাঙ্গলার গুনিয়া, লভিয়া, লইয়া, হইয়া, করিয়া ইত্যাদি রূপ হইয়াছে। প্রাকৃত ‘অচ্ছি’র সঙ্গে ভূ ধাতুর অসমাপিকা ‘হইয়া’র মিলনে ‘হইয়াছে’ গঠিত। দেখিতেছে, করিতেছে ইত্যাদি ও ঐরূপেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখনও পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে দুইটি শব্দ পৃথক ভাবে উচ্চারিত হয়, যথা—‘দেখিতে—আছে’ ‘করিতে—আছে’। অতীত কালের ‘আসীং’ এর অপভ্রংশ, ‘আছিল’ পূর্বোক্তরূপে অস্থায়ী ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়।*

শব্দের রূপান্তরবল্বননের ক্রিয়া অতি বিচিত্র। শুধু অমুকরণপ্রিয়তাতেই সময়ে সময়ে কোন ব্যাপক পদ্ধতি প্রচলিত হয়। ‘চল,’ ‘খেল’ ইত্যাদি ধাতুর ‘ল’ অস্থায়ী ক্রিয়ায় প্রবর্তিত হইয়াছে। যেখানে ‘র’কারের সংশ্রব আছে, সেখানে ‘ল’ তে পরিবর্তন স্বাভাবিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে, ‘ডলমোরভেদঃ’—কিন্তু তন্নিম্ন ও অনেক স্থলে ‘ল’ প্রচলিত আছে। চলিলাম (চলামঃ) খেলিলাম (খেলামঃ) এর সঙ্গে সঙ্গে হাসিলাম, দেখিলাম ইত্যাদিতে ‘ল’ প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ‘ক্রমঃ’ স্থলে প্রাকৃত ‘বোলাম’ দৃষ্ট হয় :—‘৭ ভগামি এস লুকো গেহম রসেণ বোলামো’ মৃঃ কঃ ৬ অঙ্ক।

করসি, খায়সি, করেস্তি, জানেস্তি ইত্যাদি প্রাকৃতের অমুযায়ী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় পূর্বে বিস্তর পরিমাণে প্রচলিত ছিল। শুধু কয়েকটিমাত্র উদাহরণ দিয়া দেখাইব। পরবর্তী অধ্যায়গুলির উদ্ধৃতাংশে সেইরূপ আরও অনেক শব্দ দৃষ্ট হইবে।

- (১) “ভিকুরের কছা তুমি কহসি আমারে।
স্বেবধানী পলাইল কুশের ভিতরে ॥” সঙ্গর, আশিপক্ক।
- (২) “সঙ্গর না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভএ বোলেস্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥” কবীন্দ্র, ভীষ্মপর্ব।
- (৩) “প্রসিক বৈকুণ্ঠী হৈল পরম মহাস্তী।
বড় বড় বৈকুণ্ঠ তার দর্শনেতে বাস্তি ॥” চৈ, চৈ,—অস্তা।
- (৪) “চতুর্দিকে নরসিংহ অকুণ্ড শরীর।
হিরণ্যকশিপু সারি পিবন্তি রুধির ॥” ঐকুণ্ড বিজয়।

‘করোমি’র অপভ্রংশ করোম ললিতবিস্তরে অনেক স্থলে পাওয়া যায়, এবং সর্বত্রই ঐ শব্দ করিয়ায়ির অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। পূর্ববঙ্গের কোন

কোন স্থলে এখনও করম ক্রিয়া কথায় ব্যবহৃত হয়। ‘মৃগলক’ পুঁথির ভূমিকায় এইরূপ আছে,—

“পিতা গোপীনাথ বন্দ্য মাতা বহুমতী । জয়হান সূচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি ॥”

‘করিমু’ প্রাচীন বাঙ্গলা পুস্তকে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। ‘কুর্কঃ’ হইতে ‘করিব’ ও ঐরূপেই হওয়া সম্ভব। ‘করিমু’র স্থলে কচিৎ ‘করিবু’ শব্দ ও প্রাচীন রচনায় দৃষ্ট হয়, যথা,—

“নিতি নিতি অপরাধ করে। বলে ডাক কি করিবু তারে ॥” ডাক ।*

প্রাকৃত ‘হউ’ (সং, ভবতু) ‘দেউ’ (সং, দদাতু) স্থলে হউক দেউক বাঙ্গলাতে প্রচলিত। এই ‘ক’ কোথা হইতে আসিল? বাঙ্গলা অনেক ক্রিয়ার পরই ঐরূপ ‘ক’ এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথা করিবেক, খাইবেক, দেখুক ইত্যাদি। এই সকল শব্দের প্রাকৃতের মত (অর্থাৎ ‘ক’ ছাড়া) ব্যবহার প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থে ও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়—

“জয় জয় জগন্নাথ পুত্র বিজয়রাজ । জয় হউ তোর যত ভকত সমাজ ॥” চৈ, ভা—আদি।

“সর্বলোকে শুনিয়া হইল হরষিত । সবে বলে জীউ জীউ এ হেন পণ্ডিত ॥” চৈ, ভা—আদি।

সংস্কৃতের ‘হি’ যথা ‘জানিহি’ বাঙ্গলায় শুধু ‘হ’তে পরিণত। পূর্বে ‘করিহ’ ‘বাইওহ’ রূপ বাঙ্গলায় প্রচলিত ছিল। প্রাকৃতে ও অমুজ্জা বুঝাইতে ‘হ’র ব্যবহার দৃষ্ট হয়,—

“আঅচ্ছ পুণে জুদংরমহ ।” মৃঃ কঃ ২অঙ্ক ।

কোথাও ‘হ’ দৃষ্ট হয়, যথা পিঙ্গলে “মইন্দ করেহ।” এই হ(হঁ) হিন্দি ভাষায় প্রচলিত আছে। পূর্বে বাঙ্গলায় প্রাকৃতের মতই ‘ষ’ স্থানে ‘জ’ ‘ন’ স্থানে ‘অ’ বা ‘এ’ লিখিত হইত। প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মুদ্রিত অনেক পুস্তকে ও ঐরূপ লেখার সংশোধন হয় নাই, যথা,—

“উচিত বলিতে পাড়ে গালি। পোয়ে বিয়ে হয় বেআলি ॥” ডাক ।

“পৌষে বার নাহিক ভাত। তার কভু নাহিক সেআখ ॥” ডাক ।

হস্তলিখিত পুস্তকে,—যথা,—

“ভীষক মারিতে জাএ দেব জগন্নাথে । নির্ভএ বোলন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥”

কবীন্দ্র—বেঃ গঃ পুঁথি, ১৩৭ পত্র ।

পূর্বে ভারতের কথিত ভাষামাত্রই বোধ হয় ‘প্রাকৃত’ সংজ্ঞায় অভিহিত হইত। এই বঙ্গভাষাকেও একজন প্রাচীন লেখক ‘প্রাকৃত’ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। সঞ্জয়রচিত মহাভারতের ২০০ বৎসরের প্রাচীন হস্ত-লিখিত একখানি পুঁথি আমার নিকট আছে, তাহার আদি পর্বে রাজেন্দ্র দাসের ভণিতাবুক্ত অনেকগুলি পদ আছে,—একটি এইরূপ,—

“ভারতের পুণ্য কথা শ্রদ্ধা দূর নহে। পরাকৃত পদবন্ধে রাজেন্দ্র দাসে কহে ॥”

অপ্রভঞ্জন ভাষার রচনা স্থানে স্থানে বাঙ্গলার সঙ্গে ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায়,—

যথা,—“রাই দোহারি পঠণ গুণি হাসিয়া কাণু গোয়াল।”

(রাই এর দোহারি পাঠ গুনি হাসিয়া কাণু গোয়াল।)

ছন্দমঞ্জরী, ৭ম স্তবক।

এখন দেখা যাইবে, প্রাকৃত ও বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে তুলনায় সংস্কৃতের সম্বন্ধ অতি কোতূহল-জনক। প্রাকৃত, বৌদ্ধজগতে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল; বৌদ্ধধর্ম, হিন্দু ধর্মের অবাধ্য সন্তান, বৌদ্ধাধিকারে প্রচলিত প্রাকৃত ও সংস্কৃতের অবাধ্য সন্তান; সংস্কৃতের বিরাট শব্দের ঐশ্বর্য্য প্রাকৃত উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু গোড়ীয় ভাষাগুলি তাহা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম পুনঃ প্রবর্তিত হইলে পর, গোড়ীয় ভাষাগুলি প্রাধান্য লাভ করে। সংস্কৃতের পুনরুদ্ধারহেতু তদীয় বৈভবে গোড়ীয়ভাষাগুলি গৌরবান্বিত হইল; প্রাকৃত হইতে উদ্ধৃত হইয়া ও ঐ সব ভাষা প্রাকৃতের ঋণচিরু স্থালন করিতে চেষ্টিত হইল। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। কেহ ভিন্নদেশীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার বর্ণ, কথা, ভাবভঙ্গি তাহাকে চিনাইয়া দেয়। পরিচ্ছদ দৃষ্টে ভ্রম অতি স্থূলচক্ষুরই হইয়া থাকে। সংস্কৃতের অধ্যাপকগণ গোড়ীয় ভাষাগুলিকে অপরিপাক সংস্কৃত শব্দে ধনী করিলেন। লাম, চন্দ, লাধা লেখা দূরে থাকুক, এখন আর কেহ মুখেও বলে না। তবে যে সকল শব্দ বৎসরে একবার মাত্র ব্যবহার করিলে চলে, সেখানে আচার্য্যের কথা মানিয়া লোকসাধারণের উচ্চারণ সংশোধন করা স্বাভাবিক, কিন্তু যাহা দিনে দণ্ডে শতবার ব্যবহার করিতে হইবে, সেখানে উপাচার্য্যের অহরোধ ও প্রয়াস বৃথা। ক্রিয়াগুলি, বিভক্তি চিহ্নগুলি সংস্কৃত হইতে অনেক ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আর সংশোধন হইল না। প্রতি ছত্রের

গঠনে প্রাকৃতের ভাব মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা এখনও সেইরূপই রহিয়াছে । শুধু নামশব্দ পরিবর্তনে, এ ঋণ হইতে অব্যাহতি অসম্ভব । গোড়ীয় ভাষাগুলির কচিৎব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে অনেক স্থলেই সংস্কৃতের সাদৃশ্য প্রাকৃত অপেক্ষা অধিক, কিন্তু প্রাতি ছত্রের গঠনগত, ক্রিয়াগত, বিভক্তিচিহ্নগত এবং নিত্য ব্যবহৃত শব্দগত সাদৃশ্য প্রাকৃত হইতে অল্প । বলা বাহুল্য, বঙ্গভাষা যে প্রাকৃতের অধিকতর সন্নিহিত, ইহাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ ।

সংস্কৃত শব্দগুলি যে ভাবে পরিবর্তিত হইয়া, প্রথম প্রাকৃত তৎপরে গোড়ীয়-ভাষাগুলিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি নিয়মের ক্রিয়া দৃষ্ট হয় ; আমরা কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিতেছি ।

আদ্য বর্ণের পরে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে, সংযুক্ত বর্ণের আদ্যাক্ষর লুপ্ত হয়,—যথা,—

হস্তি—হাতি ; হস্ত—হাত ; সপ্ত—সাত ; কক্ষ*—কাথ ; মল—মাল ; লক্ষ—লাখ ; অম্র—আম ; বজ্র—বাজ ; পক্ষ—পাখ ; হট্ট—হাট ; অষ্ট—আট ; কর্ণ—কাণ ; কজ্জল—কাজল ; অক্ষি—আঁখি । কখনও কখনও শেষ বর্ণের পরে আকার যুক্ত হয়, যথা,—ছত্র—ছাতা ; চক্র—চাকা ; চন্দ্র—চান্দা † পক্ষ—পাকা ; পত্র—পাতা । কখন ও বর্ণের শেষ আকার লুপ্ত হয়, যথা,—লজ্জা—লাজ ; সজ্জন—সাজ ; ঢকা—ঢাক । আদ্য বর্ণের পরস্থিত সংযুক্ত বর্ণের আদ্যে ২ কি নকার থাকিলে তাহা চন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়, যথা,—বংশ—বাঁশ ; বণ্ড—বাঁড় ; হংস—হাঁস ; দন্ত—দাঁত ; চন্দ্র—চাঁদ ; । ‘অ’ স্থানে আর উদাহরণ পূর্বে দেওয়া গিয়াছে, অনেক স্থলে স্বরবর্ণ অত্যন্তরূপে ও পরিবর্তিত হইতে দেখা যায় । যথা,—

‘অ’ স্থানে ‘এ’ ;—বঙ্গন—বেগুন ।

‘আ’ স্থানে ‘ই’ ;—পঞ্জর—পিঞ্জর ; সজ্জান—সিয়ান ।

‘অ’ স্থানে ‘উ’ ;—ব্রাহ্মণ—বামুন ।

* কক্ষ, পক্ষ, লক্ষ ইত্যাদির ‘ক্ষ’র উচ্চারণ ‘থ’ এইরূপ ধরা হইয়াছে ।

† প্রাচীন বাঙ্গলা পুস্তকে ‘চান্দার’ প্রয়োগ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয় । যথা:—

(১) “দেখিয়া বরুরূপ লেগে গেল বাঁধা । কি ভাগ্য সাপের মাঝে আলো করে চান্দা ॥” ক, ক, চ ।

(২) “জিনিয়া প্রভাত রবি, সিন্দুর কোটার ছবি, তার কোলে চন্দ্রনের চান্দা ॥” ক, ক, চ ।

(৩) “তোমার বদন চান্দা, মোর ঘন হৃৎ বাঁধা, তিল অর্ধ না দেখিলে মরি ॥” ক, ক, চ ।

(৪) “কাঁথি আঁধার, কলঙ্ক চাঁদার, স্বরণ লইল আসি ॥” চণ্ডীকাস ।

(৫) ‘লগন চান্দা’ বলা ।

দ্বিপ্রহর—দুপুর ; ঔষধ—ঔষধ ।

ইহা ব্যতীত অত্যন্ত অনেক সূত্র সঙ্কলিত হইতে পারে ।*

ট ও ড স্থানে স্থানে 'ড়'তে পরিণত হয়, যথা,—ঘোটক—ঘোড়া ;
ঘট—ঘড়া† ; ষণ্ড—ষাঁড় ; চণ্ডাল—চাঁড়াল ; ভাণ্ড—ভাঁড় ।

'ধ' অনেক স্থলে 'য' কি 'ক'তে পরিণত হইয়াছে যথা,—উপাধ্যায়—ওষা ;
বন্দ্যোপাধ্যায়—বাড়ুয়া ।

স্থানে স্থানে বর্ণ পরিত্যক্ত হইতে দেখা যায়, যথা 'ক'—সুবর্ণকার—
সোণারু ; চর্ম্মকার—চামার ; কুম্ভকার—কুমার ; নৌকা—নাও ।

'থ'—মুথ—মু†

'গ'—দ্বিগুণ—দুগা ; ভয়ী—বোন ।

'ত'—ভ্রাতা—ভাই ; মাতা—মা ; শত—শ ।

'দ'—হৃদয়—হিয়া ; কদলী—কলা ।

'প'—কূপ—কুয়া ।

'ভ'—নাভী—নাই ; গাভী—গাই ।

'ম'—গ্রাম—গাঁ ।

কথিত ভাষা এইরূপে সর্ব্বত্র সহজ হইতেছে । বিম্‌স সাহেবের অভিপ্রায়, এই ভাষা লিখিত রচনায় ও প্রবর্তিত হউক । তিনি বঙ্গদেশের সাধু সুলেখক-গণের প্রতি একটুকু কোপাঘিত । যাহাদের সহজ ভাষা মুখে না বলিয়া উপায় নাই, তাঁহারা লিখিতে বসিলেই সংস্কৃতের কথা স্মরণ করেন কেন ? তখন খাওয়ার স্থলে আহার করা, ভাত স্থলে অন্ন ও জল স্থানে নীর ব্যবহার না করিলে তাহাদের মনঃপূত হয় না । আমাদের মতে এই আড়ম্বরপ্রিয়তা সর্ব্বদাই নিন্দনীয় নহে । বাঙ্গলা ভাষার কল্যাণ সাধন হেতু সংস্কৃতের নিকট সততই ইহার শব্দ ভিক্ষা করিতে হইবে । যদি বিষয় গৌরবজনক হয়, তবে একটুকু আড়ম্বরে ভাষার সৌষ্ঠব-বৃদ্ধি ব্যতীত ক্ষতি নাই । বিশেষতঃ ঠিক কথিত ভাষা কখনই লিখিত ভাষায় পরিণত হইতে পারে না । দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রচলিত ভাষার একীকরণ জন্য লিখিত ভাষা স্বতন্ত্র থাকা আবশ্যিক ।

* Beames' Comparative Grammar দেখ ।

† মনে মনে মহাবীর করেন যুক্তি । ধন খড়া লয়ে পাছে পালার পার্কণ্ডী । ক, ক, চ ।

‡ নাহি রাখে নাহি বাড়ি নাহি দেয় সু । পরের রাঁধন ঘেয়ে চাঁদপানী সু । ক, ক, চ ।

কলিকাতার কথিত ‘গেলুম’ লিখিত রচনায় স্থান পাইলে শ্রীহট্টের ‘গ্যাছলাম’ কি ‘যাইবাম’ অপরাধী কিসে ? স্বদেশবৎসলগণ তাহা ও চালাইতে কৃত-সংকল্প হইতে পারেন। বঙ্গভাষা তবে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পৃথক ভাব অবলম্বন করিয়া বহুরূপী হইয়া দাঁড়াইবে। লিখিত ভাষার বিপুলতা রক্ষা করা সেই জন্য প্রয়োজন হইতেছে, কিন্তু লেখনী লইয়া বসিলেই যে স্বর্গারোহণপূর্ব্ব স্বরণ করিতে হইবে, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। মাইকেল তাঁহার সুহৃদ মন্মোহন বাবুর মাতার নিকট পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

“আপনি পরম জ্ঞানবতী, সুতরাং ইহা কখনই আপনার নিকট অবিলম্বিত নহে যে, একগ ভীত শব্দ-স্বরূপ শোক এ সংসারে সর্ব্বদাই মানব কুলের হৃদয় বিকল করিবে। পিতৃ-চরণ-দর্শন-সুখ প্রিয়বর যে পৃথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত দুঃখমান।”

এই রচনাকে সহসা পাণ্ডিত্যাভিধান দিতে প্রবৃত্তি হয় না।

তৃতীয় অধ্যায় ।

পাশ্চাত্য মত,—বিভক্তি-চিহ্ন ও ছন্দ ।

এই সকল গোড়ীয় ভাষা সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতে আসে নাই, কিন্তু অপর কোন অনার্য্য ভাষা হইতে ইহারা উদ্ভূত হইয়াছে, অনেক পণ্ডিত, এইরূপ সূত্র প্রচার করিয়াছিলেন। ক্রফোর্ড, ল্যাথাম, এণ্ডারসন, কে এবং কল্ডওয়েল, এই মতাবলম্বী। ইহারা বলেন, বঙ্গীয়, হিন্দী, কি অত্যাশ্রিত গোড়ীয় ভাষার আদিকালে সংস্কৃতের সহিত কোন সংশ্রব ছিল না। বিভক্তি ও ছন্দগুলির বিস্তারপ্রণালী দ্বারাই কোন ভাষার আদি স্থির করা সম্ভব। কেবল শব্দগত সাদৃশ্য দ্বারাই সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া উচিত নহে। তাঁহারা বলেন, আৰ্য্যজাতি ক্রমে দক্ষিণপূর্বে অবতরণ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, কিন্তু বিজিত অনার্য্যদিগের সঙ্গে থাকা হেতু, তাঁহাদের ভাষা পরিগ্রহ করিলেন। সংস্কৃতের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব ভাষায় বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিল। কিন্তু বিভক্তি-চিহ্ন ও বিস্তারপ্রণালীতে উহাদের আদিম অনার্য্য সম্বন্ধ বর্তমান আছে। এতদনুসারে ভাস্কর কে বিবেচনা করেন যে হিন্দীর “কো” (যথা ‘হামকো’) ও বাঙ্গলার “কে” (যথা ‘রামকে’) তাতার অন্ত্যবর্ণ “ক” হইতে আগত

হইয়াছে। ডাক্তার কল্ডওয়েল, দ্রাবিড়* ভাষার বিভক্তি-চিহ্ন “কু” হইতে হিন্দির “কো” আসিয়াছে, এক্রপ অনুমান করেন ও হিন্দী ইত্যাদি ভাষা যে দ্রাবিড়-ভাষা-সম্বৃত তাহাই প্রচার করেন। ডাক্তার হরনলি ও রাজা রাজেন্দ্রবাল মিত্র এই সব মতের অর্থোক্তিকতা দেখাইয়াছেন। ফুটনোটে কল্ডওয়েলের বৃক্তি ও তদ্বিরুদ্ধে হরনলির খণ্ডনকারী বৃক্তি উদ্ধৃত হইল।† গোড়ীয় ভাষাগুলির বিভক্তি যে সমস্তই সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, তাহা মিত্র মহোদয়, হরনলি, দিট্যাছি ও জার্মান

* দ্রাবিড়ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ধৃত হয় নাই, অনেক পণ্ডিতই এই মতাবলম্বী।
See—Comparative Grammar of the Dravidian Languages by Bishop Caldwell. P. 46. Ed. 1875, also Hunter's British Empire P. 327.

† Dr. Caldwell—The change which took place when Sanskrit acquired predominance as the Aryans gradually extended their conquests and their colonies, was rather a change of vocabulary than of grammar.

Dr. Hœrle—As up to this time, the Aryan population of North India, who had emigrated many centuries before, had used exclusively Sanskritic languages (Sanskrit, Prakrit and Pali) it would be a most remarkable phenomenon, if they had exchanged their native grammar for that of the uncultured and despised aboriginal population, supposing that the language of the latter was really a non-Aryan one and that it had really survived the long Non-Aryan occupation (both suppositions by no means established yet). It had happened more than once, that a conquering nation (especially of inferior culture) while retaining more or less its native vocabulary, adopted the grammar of the conquered people (as the Normans in England, the Arabs and the Turks in North India, the Franks in Gaul) under the condition that this progress commenced from the very beginning of the conquest. But the conquerors after having resided for centuries in the country and retained their native language (both in grammar and vocabulary, trifling instances in the latter excepted) entirely unmixed with the aboriginal languages, should abandon their grammar in favour of the conquered, requires strong proofs to be credited, especially as it is by no means certain, whether the aboriginal at all survived at so late a date. For according to evidence afforded by the Prakrit of the plays, Prakrit was spoken by the low class population, which was composed no doubt principally of the subjugated aboriginal people, who spoke a Sanskritic language from the first or adopted the vulgar dialect of the conquerors.
J. A. S. 1872. Part I. No. II. P. 123.

পণ্ডিতগণ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গভাষার বিভক্তিশুলি সম্বন্ধে এখন ও কেহ সম্পূর্ণরূপে স্থির সিদ্ধান্ত করেন নাই। আমরা এই অধ্যায়ে সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব।

ফরাসী ইত্যাদি ভাষার মিত্রাক্ষর যোজনা, বর্কর ভাষার দৃষ্টান্তে উদ্ধৃত, এণ্ড্রেস এবং ছয়েট এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। এ মত অবশ্য এখন সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। গোড়ীয় ভাষাগুলি ও অনার্য্য কোন ভাষা হইতে নিঃসৃত হইয়া সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে এই মতও এখন সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত। এই সব অদ্বুত মতপ্রচারকদিগের যুক্তি—সেক্সপীয়র ও বেকন এক ব্যক্তি, বুদ্ধ কোন লোকবিশেষের নাম নহে, কশ্মীরাদিপি মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস একই ব্যক্তি—এই মতবাদীদিগের যুক্তির সঙ্গে এক সেল্ফে বন্ধ হইয়া থাকিবে। ছ এক জন গ্রন্থ-কীট দৈবাৎ কোন প্রাচীন আলমারীস্থ পুঁথিতে তাঁহাদের বিচিত্র যুক্তি-কুহক ও তর্কশক্তির পরিচয় পাইয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন, কিন্তু শিক্ষিত-জগত সেই সব মত আর গ্রহণ করিবেন না। সেই সব প্রাচীন যুক্তির শব, চিরদিন তরে ভূপ্রোথিত হইয়াছে।

বাঙ্গলা প্রথম বিভক্তি, সংস্কৃতের মত ; অনুস্বার কি বিসর্গ বর্জিত হয় এই প্রভেদ। কিন্তু তথাপি উহা যে প্রাকৃতের অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। প্রথমার এক বচনে প্রাকৃতে কোথাও ‘এ’ সংযুক্ত দেখা যায়, যথা, ‘ও অণেছ ভিচ্চাণকম্পকে শামীএ গিদ্ধগকেবি শোহেদি।’ মৃঃ কঃ ৩অঙ্ক। কর্তৃবাচক তৃতীয়াতেও প্রাকৃত ঐরূপ ‘এ’ অমেক স্থানে দৃষ্ট হয়। এই ‘এ’ বাঙ্গলা কর্তৃকারকে পূর্বে ব্যবহৃত হইত। যথা,—

(১) “গুনিয়া রাজাএ বোলে হইয়া কৌতুক।

হৃগ্গা অগ্হরা কেন হৈল যুগরূপ।” সঞ্জয়, আদি।

(২) “কনাচিৎ না দেখেছি হেনরূপ ঠান।

কোনমত বিধাতাএ করিছে নিদ্রাণ।”

রামেশ্বরী মহাভারত, বেঃ পঃ পৃঃ ৮০ পত্র।

প্রথমার দ্বিবচন ও বহুবচনের প্রভেদ, প্রাকৃতে রক্ষিত হয় নাই। অনেক স্থলেই প্রাকৃতে, দ্বিবচন কি বহুবচনে কেবল আকারযুক্ত প্রয়োগ দেখা যায়।

যথা,—‘ভবঅদি তমসে অঅং দাব পরিসো জাদো দেউগ ৭’ আগামি কুশলবা।’—উঃ চঃ ৩য় অঙ্ক। ‘কহিংমে পুত্ৰআ,’—উঃ চঃ ৭ম অঙ্ক।

প্রাচীন বাঙ্গলায় বহুবচন-বোধক নামশব্দে অনেক স্থলে ঐরূপ আকার দেখা যায়। যথা,—

“নরা, গজা বিশেষয়, তার অর্ধেক বাঁচে হয়। বাইশ, বলদা তের ছাগলা” খনা।

টম্প অহুমান করেন, বাঙ্গলা কর্ম ও সম্প্রদান কারকের ‘কে’ সংস্কৃতের সপ্তমীতে প্রযুক্ত ‘কৃতে’ শব্দ হইতে আগত।* এই ‘কৃতে’র’ নিমিত্তার্থ উদাহরণ স্থলে স্থলে পাওয়া যায়। যথা,—

“বালিশোবত কামাত্মা রাজা দশরথো ভূশং।

প্রস্থাপয়ামাস বনং জীকৃতে যঃ প্রিয়ং স্নতম॥”

রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড।

ম্যাক্সমুলার বলেন সংস্কৃতের স্বার্থে ‘ক’ হইতে বাঙ্গলা ‘কে’ আসিয়াছে। শেষ সময়ের সংস্কৃতে স্বার্থে ‘ক’এর বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আমাদের মতে ম্যাক্সমুলারের মতই সম্পূর্ণ গ্রহণীয়। বাঙ্গলা প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথি আলোচনা করিলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের উদয় হইতে পারে না। এই ‘ক’ (যথা বৃক্ষক, চারুদত্তক, পুত্রক,) প্রাকৃত্তে অনেক স্থলে ব্যবহৃত দেখা যায়।† গাথা ভাষায় এই ‘ক’এর প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা বেশী, যথা ললিতবিস্তর-একষিংশাধ্যায়ে,—

“স্ববসন্তকে ঋতুবরে আগতকে।

রতিমো প্রিয়া ক্লান্ত পাদপকে ॥

বশবর্ত্তি হলক্ষণ বিচুত্রিতকে।

তবরণ হরূপ হশোভনকে ॥

বয়ংজাত স্নাত হুসংস্থিতিকাঃ।

হৃথ কারণ দেব নারায় বসন্ততিকাঃ ॥

* এই ‘কৃত’ শব্দ প্রাকৃত্তে ‘কিতো’, ‘কিও’ এবং ‘কো’ এই তিন রূপেই ব্যবহৃত হইত। টম্প অহুমান করেন, শেবোক্ত ‘কে’র সঙ্গে হিন্দীর ‘কো’ ও বাঙ্গলা ‘কে’র সাদৃশ্য।

† “তাত্র-শাসনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে স্বার্থে ‘ক’এর ব্যবহার কিছু বেশী। ‘দুত’ স্থানে ‘দুতক’ ‘হট’ স্থানে ‘হটিকা’, ‘বট’ স্থানে ‘বটক’, ‘লিখিত’ স্থানে ‘লিখিতক’ এইরূপ লক্ষ্যপ্রয়োগ কেবল উক্ত অংশ মধ্যেই দেখা যায়। সম্ভব শাসনে আরো অনেক দেখা যাইবে।” শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল কৃত,—“ধর্ম্মশাসনের তাত্র-শাসন”

সাহিত্য, মাঘ ১৩০১, ৬৫৩ পৃঃ।

উখি লঘু পরিভুক্ত হুযোবনকং ।

দুর্লভ বোধি নিবর্তয় মানসকম্ ।” ইত্যাদি ।

বাক্যলার পূর্বে এই ‘ক’ সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মতই ছিল। পূর্ববঙ্গের ২০০ বৎসরের পূর্বের পুঁথিগুলিতে এই ‘ক’এর প্রয়োগ অসংখ্য। আমরা এই স্থলে কয়েকটিমাত্র ছত্র উঠাইয়া দেখাইব।

(১) “রথ হৈতে কাল (লাফ) দিয়া চক্র লৈয়া হাতে ।

ভীষ্মক মারিতে যায়, দেব জগন্নাথে ।” কবীন্দ্র বে: গ: ১০৫ পত্র: ।

(২) “ভীষ্মক ভয়ে যত সৈন্ত যায় পলাইয়া ।” ঐ

(৩) “সে সে ভাখ্যা অমুক্ষণ পতিক সেবয় ।” সঙ্গয় ।

(৪) “শিখতীক দেখিয়া পাইবা অমুতাপ ।” কবীন্দ্র বে: গ: ৭৫ পত্র: ।

(৫) “পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীক কুশল জানাইব ।” ঐ ৭৭ পত্র: ।

এই ভাবে কর্তা এবং কর্ম উভয় স্থলে ‘ক’ থাকিলে কোন্টি কর্তা কোন্টি কর্ম, পরিচয় পাওয়া কঠিন। ‘সৌরঙ্গীক কীচক বোলএ ততক্ষণ ।’* ছত্রে কে কাহাকে বলিল, নির্ণয় করা সহজ নহে। সেই জন্ত কর্ম এবং সম্প্রদানে বাক্যলার ‘কে’র ব্যবহার পরে প্রচলিত হইল। গাথা ভাষায় ও প্রাকৃতে মধ্যে মধ্যে ‘কে’র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা প্রাকৃতে,—

পালিও অহুদাসী এ পুত্তে মলিন্দ চালুদত্তাকে তুমং ।” মু: ক: ৮ম ।

কোন কোন স্থলে বাক্যলার কর্মকারকে কোন বিভক্তি—চিহ্নই প্রযুক্ত হয় না। যথা,—রাম গাছ কাটিয়াছে। এইরূপ ব্যবহার ও পূর্বোক্ত ‘ক’ যুক্ত ব্যবহারের সঙ্গে পূর্বে কোন পার্থক্যই ছিল না। কারণ ‘ক’ পূর্বে বিভক্তিবোধক চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত ছিল না, উহা শুধু শব্দের অন্ত্যবর্ণ ছিল। এই জন্ত প্রাচীন কালে কর্ম এবং সম্প্রদান ব্যতীত অন্যান্য বিভক্তিতে ও ‘কে’ ব্যবহার হইত, যথা,—

“মথুরাকে পাঠাইল রূপ সনাতন ।” চৈ, চ আদি, ৮ম পঃ ।

বহুবচন বুঝাইতে পূর্বে শব্দের সঙ্গে শুধু ‘সব’, ‘সকল’ প্রভৃতি সংযুক্ত হইত। যথা,—

“তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার ।

কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত ক্ষুদ্রক সবার ।” চৈ, ভা, (আদি) ।

ক্রমে “আদি” সংযোগে বহুবচনের পদ সৃষ্টি হইতে লাগিল। যথা,—
নরোত্তম বিলাসে,—

শ্রীচৈতন্যদাস আদি যথা উত্তরিল।

শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিল।

শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসা ঘরে।

করিলেন নিযুক্ত শ্রীবাস আচাধোরে।

আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়।

হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লভীকান্ত তায়।

এইরূপে “রামাদি” “জীবাদি” হইতে ষষ্ঠীর ‘র’ সংযোগে ‘রামদের’ ‘জীবদের’ হইয়াছে স্পষ্টই দেখা যায়।

আদি শব্দের উত্তর স্বার্থে ‘ক’ যুক্ত হইয়া ‘বৃক্ষাদিক’ ‘জীবাদিক’ শব্দের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ফলতঃ উদাহরণে ও তাহাই পাওয়া যায়। যথা,—
নরোত্তম বিলাসে,—

“রামচন্দ্রাদিক যৈছে গেলা বৃন্দাবনে।

কবিরাজ খ্যাতি তার হইল যেমনে।”

এই ‘ক’এর ‘গ’এ পরিণতি ও সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে।
সুতরাং ‘বৃক্ষাদিগ’ (বৃক্ষদিগ) ‘জীবাদিগ’ (জীবদিগ) শব্দ পাওয়া যাইতেছে।
এখন ষষ্ঠীর ‘র’ সংযোগে ‘দিগের’ এবং কৰ্ম্মের ও সম্প্রদানের চিহ্নে পরিণত
‘কে’র সংযোগে ‘দিগকে’ পদ উৎপন্ন হইয়াছে, নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।*

করণ কারকের পৃথক চিহ্ন বাঙ্গলায় নাই বলিলেও হয়। সংস্কৃত
‘রামেন’ স্থলে প্রাকৃত্তে ‘রামএ’ ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে বাঙ্গলায়
পূর্বে “রামে ডাকিয়াছে,” “রাজায়(এ) বলিয়াছে” ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ
প্রচলিত ছিল। এখনও “কুড়ালে পা কাটিয়াছে,” “নৌকায় বাড়ী
গিয়াছে” দৃষ্টান্তে প্রাকৃত্তের সঙ্গে বাঙ্গলার নৈকট্য দৃষ্ট হয়। “দ্বারা”
শব্দ সংস্কৃত ‘দ্বার’ শব্দ হইতে আগত, উহা কথিত ভাষায় ‘দিয়া’তে পরিণত।

* এই বিভক্তি-চিহ্ন প্রাকৃত হইতে আগত হয় নাই। ইহা সংস্কৃতের অভ্যাসের পরে গঠিত
হইয়াছে, তাই সংস্কৃতের সঙ্গে বেশী সংশ্লিষ্ট। কিন্তু পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুস্তকগুলিতে এইরূপ
প্রয়োগ আদৌ নাই। ‘দিগকে’ ‘দিগের’ এখনও পূর্ববঙ্গে কথায় প্রচলিত হয় নাই।

সম্প্রদান সম্বন্ধে ইতি পূর্বেই লিখিত হইয়াছে; বাঙ্গলায় কৰ্ম কারকের সম্বন্ধে সম্প্রদান কারকের কোন প্রভেদ নাই। প্রাকৃত 'হিংতো' শব্দ* পঞ্চমীর বহুবচনে ব্যবহৃত হইত। এই 'হিংতো' হইতে বাঙ্গলা 'হইতে' আসিয়াছে। এই 'হিংতো' পূর্বে বাঙ্গলায় 'হস্তে' রূপে প্রচলিত ছিল, যথা,—

“কা'কে ক'ল্ল নির্বলী কাহাকে বলী আর।

হাড় হস্তে নিশ্চিয়া করয় পুনি হাড়।”

আলোরাল কৃত পদ্মাবতী, ২পৃষ্ঠা।

এই 'হিংতো'র অপর রূপ 'হনে' ও পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। যথা,—

“তাকে দেখি মোহ পাইলুঁ, না দেখিলুঁ পুনি।

সেই হনে প্রাণ মোর আছে বা না জানি ॥” সঞ্জয়, আদি।

প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন 'ণ'† বাঙ্গলা 'র'কারে পরিণত হয়। প্রাকৃত 'অঘীণ' স্থলে আমরা বাঙ্গলায় 'অগ্নির' পাইতেছি। 'ণ' সচরাচরই 'র' বা 'ড়'তে পরিণত হয়, এই পরিণতি সম্বন্ধে যদি কেহ বিশেষ প্রবোধ চান, তবে উড়িষ্যা দেশ ঘুরিয়া আসিলেই তাঁহার প্রতীতি জন্মিবে। কিন্তু ষষ্ঠীর সম্বন্ধে মতান্তর আছে; বপ অমুমান করেন, হিন্দীর 'কা' এবং বাঙ্গলা ষষ্ঠীর চিহ্ন সংস্কৃত ষষ্ঠীর বহুবচনের 'অস্মাকম্', 'যুস্মাকম্' ইত্যাদির 'ক' হইতে আসিয়াছে।‡ কিন্তু হরন্‌লি সাহেব বপের অমুমানের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্চয়োজন্য। তাঁহার মতে সংস্কৃত 'কৃতে' প্রাকৃতের রূপান্তর হইতেই বাঙ্গলা এবং হিন্দীর ষষ্ঠীর চিহ্ন আসিয়াছে। 'কৃতে' হইতে প্রাকৃত 'কেরক' উৎপন্ন হইয়াছে। এই 'কেরকের' অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, সেই সেই স্থলে 'কেরকের' কোন স্বকীয় অর্থ দৃষ্ট হয় না, উহা শুধু ষষ্ঠীর চিহ্ন স্বরূপই ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। যথা,—

* “ভাসো হিংতো হুংতো।”—ইতি বররুচিঃ।

† টামোর্গঃ। অতোহনন্তরং টামোন্তৃতীয়েক বচন ষষ্ঠী বহুবচনযোগ্যকারো ভবতীতি।

বররুচিঃ।

‡ Bopp's comparative grammar. Para 340. Note.

¶ Journal Asiatic Society 1872. No. II. P. 125.

“তুমংপি অগ্নাণো কেরিকং জাদিং হুমন্তেসি।” যুঃ কঃ ৬ষ্ঠ অঃ।

“কস্ব কেরকং এদং পবণম্।”

ঐ

এই ‘কেরক’ (বা ‘কেরিক’) হইতে হিন্দী ‘কর’, ‘কেরে’, ‘কের’, ‘কেহি’ আসিয়াছে। যথা,—

তুলসীদাসের রামায়ণে—‘ক্ষত্রজাতিকের রোষ’ লক্ষ্যাকাণ্ড। ‘বন্দোং পদসরোজ সবকের’ বাণকাণ্ড। এই ‘কেরক’ হইতে যেরূপ হিন্দী ‘কের’ ইত্যাদি আসিয়াছে, সেইরূপ অতদিকে বাঙ্গলা ও উড়িয়া যষ্টির চিহ্ন ‘এর’ ও ‘র’ উদ্ভূত।* রাজা রাজেন্দ্রলাল অহুমান করেন, বাঙ্গলা যষ্টির ‘র’ সংস্কৃত ‘শ্র’ হইতে আগত। এই মতের সাপেক্ষে বলা যাইতে পারে যে, ‘স’ এবং ‘র’ উভয়ই বিসর্গে পরিণত হয়। অনেক স্থলে (যথা, বহির্গত) স, রেফ অর্থাৎ রকারে পরিণত হয়। সপ্তমীর ‘তে’ সংস্কৃত ‘তসিল’ হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃতের একার যথা গহনে, কাননে, প্রাকৃত ও বাঙ্গলার ঠিক তদ্রূপই আছে। কিন্তু বাঙ্গলার সপ্তমী একবারে প্রাকৃত-চিহ্ন-বর্জিত নহে। সংস্কৃত শালামাং, বেলামাং, ভূমাং এর স্থলে প্রাকৃত শালাএ, বেলাএ, ভূমিএ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন হস্ত-লিখিত বাঙ্গলা পুস্তকে ও ঐ সব শব্দ প্রাকৃতের মতই পাওয়া যায়। আধুনিক ‘শালায়’ ‘বেলায়’, ‘এ’, ‘য়’ হইয়াছে এই প্রভেদ।

বঙ্গভাষার ইতিহাসে বিভক্তির অধ্যায় অতি আবশ্যকীয়। আমরা তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। পণ্ডিত রামগতি ত্রায়রত্ন মহাশয় এ বিষয়ে একবারেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন “কিন্তু

* In using কের in composition with the word in the genitive case, the initial ‘ক’ of the former is elided regularly. Thus we arrive at এর, Take for instance the genitive of সন্তান a child. It would be সন্তানকেরকো this would change to সন্তানকের and this to সন্তান এর—সন্তানের which is the present genitive in Bengali. By analogy the other Bengali genitive post-position য which it shares with the Oriya, is probably a curtailment of the genitive case ‘কর’—as বোড়াকর, বোড়াকর—বোড়ার। Journal Asiatic Society 1872 No. II. P. 132—133.

এই সব বিভক্তি-চিহ্ন যে কোথা হইতে আসিল, তাহা ঠিক বলা যায় না ।*
আমরা ও হয়ত তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না । তবে চেষ্টা করিয়াছি,
এই মাত্র ।

বাঙ্গলার আদিম অসভ্যদিগের ভাষার সঙ্গে, আৰ্য্যদিগের কথিত
ভাষা কতক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে । অনাৰ্য্য শব্দ কোন্ গুলি, নির্ণয়
করা সহজ নহে । এই বাঙ্গলাভাষার সঙ্গে অনেক শব্দ মিশ্রিত আছে,
যাহা পার্শী, আরবী, কি উর্দুতে নাই, সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতে তাহাদের
উদ্ভবের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না । ৮ রামগতি জায়রত্ন মহাশয়
উদাহরণ দিয়াছেন, যথা,—কুলা, টেঁকি, ধুচনি ; এই ‘ধুচনি’ শব্দ সংস্কৃত
‘ধৌত’ শব্দ হইতে আগত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় । বঙ্গীয় অভিধানে
অনেক শব্দ ‘দেশজ’ সংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়াছে । প্রকৃতিবাদ অভিধানের
সমগ্র শব্দসংখ্যা প্রায় সপ্তবিংশ সহস্র হইবে, তন্মধ্যে অনূন অষ্টশত
শব্দ ‘দেশজ’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ।† এই ‘দেশজ’ সংজ্ঞা-বিশিষ্ট
শব্দগুলি ভালরূপ পর্যালোচনা করিলে, ইহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতের
ভ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । যথা,—আজ, হল, ওছা, পাণ্ডা, ফাঁপা, পোঁপে
ইত্যাদি শব্দ ‘দেশজ’ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ইহারা বোধ হয় অদ্য,
শূল, উচ্ছিষ্ট, পণ্ডিত, ক্ষীত, পাদোন ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে কোন
না কোনরূপে সংশ্লিষ্ট । দেশজ আখ্যা-বিশিষ্ট শব্দগুলির কতকটি অনাৰ্য্য
ভাষা হইতে গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত
বা প্রাকৃতের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয় । কোন্ শব্দ বিকৃত বা
পরিবর্তিত হইয়া কি আকার ধারণ করে তাহা অনেক সময় বুঝিয়া
উঠা দুষ্কর ; ইংরেজীতে মারগ্রেট হইতে ‘পেগ’, এলিজাবেথ হইতে
‘বেছ’ যে দুর্ভেদ্য নিয়মে সম্ভূত, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন । এই
প্রাকৃত-সম্ভূত বঙ্গভাষায় পার্শী, ইংরেজী, আরবী, পর্তুগিজ, মগী প্রভৃতি
নানা ভাষার শব্দ আছে, তবে অল্পকৃতি দ্বারা ও অনেক শব্দ আপনা
আপনি গঠিত হয়, যথা,—ময়ূরের ‘কেকা’, বানরের ‘কিচ্‌কিচ্‌’ কিঞ্চিৎ

* ৮ রামগতি জায়রত্ন প্রণীত বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—পৃঃ ২০ ।

† প্রকৃতিবাদ অভিধান, দ্বিতীয় সংস্করণ, সম্বৎ ১৯৩৩ ।

অনার্য শব্দের মিশ্রণ গ্রীকে আছে, ব্যাটিনে আছে, সংস্কৃতে আছে, বাঙ্গলায়ও আছে, তদ্ব্যতীত বাঙ্গলা ভাষার জাতি যার নাই।

এখন বাঙ্গলাভাষার ছন্দ পর্যালোচনা করা যাউক। ‘পয়ার’ শব্দটি ‘পাদ’ (চরণ) হইতে আসিয়াছে, জায়রঙ্গ মহাশয়ের এই মত গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গলা পয়ার কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্ন লইয়া একটুকু গোলে পড়িয়াছেন, এবং “করিমা ব্যবকসাই বরহেলমা” ইত্যাদি পার্শীর বয়েং তুলিয়া গবেষণা করিয়াছেন।

অতি প্রথমে ভাটগণ বিবাহাদির উপলক্ষে পাত্র পাত্রীর গৃহে যশোগান করিত। পাল রাজগণের স্তুতি-ব্যঞ্জক কবিতা বাঙ্গলাভাষার অতি প্রাচীন গীতি। তাহা ভাটগণের দ্বারাই প্রথম প্রচারিত হয়। এইরূপ গীতির প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন।* প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য খুঁজিলে ও অনেক স্থলেই এই ভাটগীতির উল্লেখ পাওয়া যায়।†

শুধু ভাট-সংগীত নহে, পূর্বে বাঙ্গলা রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবদিগ্গের গীতি সমস্তই গায়কেরা সুর সংযোগে গান করিত। চৈতন্যভাগবতের পূর্বে চৈতন্যমঙ্গল নাম ছিল। রামমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, মনসামঙ্গল এ সমস্তই গানের পালা ছিল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপদী স্থলে ‘লাচাড়ী’ (সম্ভবতঃ লহরী শব্দের অপভ্রংশ) ‘দীর্ঘছন্দ’ কি কোন রাগ রাগিনীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। লেখকগণ ও স্বস্থ ভণিতায় “রামায়ণ গান বিজয়ন অভিলারে” কি “পয়ার প্রবন্ধে গাহে কাশীরামদাস” ইত্যাদি ভাবে পাদ পূরণ করিয়াছেন। এই সব গান একজনে গাইয়া যাইত ও তাহার

* “The institution of Bhats, is as old as Indo-Aryan civilization.”
Indo-Aryans Vol. II. P. 293.

† “পহিলে শুনিমু অপরাগ ধনি কব্ব কানন হৈতে।

তার পর দিন ভাটের বর্ণনা শুনি চমকিত চিতে।

আর একদিন মোর প্রাণসখি কহিলে বাহার নাম।

শুনিগণ গানে শুনিমু শ্রবণে তাঁহার নাম।” প, ক, ত, ৩৩৫

“বাহার বুরলী ধনি শুনি

সেই বটে এই রসিক-মনি।

ভাটমুখে ধীর গুণ গাঁথা।

হুতিমুখে শুনি ধীর কথা।” প, ক, ত, ৩৩৫।

সঙ্গীতগণ গীতির একভাগ সমাপ্ত হইলে সমবেত কর্তে ধুয়া গাইত, প্রাচীন বাঙ্গলা যে কোন গ্রন্থে ঐরূপ ধুয়া অনেক পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের ধুয়াগুলি ভাষার মিষ্টত্বে অভুলনীয়, কিন্তু অজ্ঞাত প্রাচীন পুস্তকে ও ধুয়াগুলি বেশ মধুর, যথা,—

“দান দিয়া যাও মোরে বিনোদিনী রাই

বাজে বাজে ভাড়িয়াছ নাগর কানাই ।”

নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ,—(হস্তলিখিত পুঁথি) ।

রাম নামের মহিমা কে জানে,

নাম লুপ্যমর অতি, গঙ্গাতাগীরধী

উৎপত্তি ও রাসা চরণে ।

কুন্তিবাসী রামায়ণ, উদ্ভরকাণ্ড (হস্তলিখিত পুঁথি) ।

গানে অক্ষর লইয়া কোন বাঁধাবাদি থাকে না, মাত্রার দিকে বেশী দৃষ্টি থাকে। তাই পূর্বকালের পয়ারে কোন শৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয় না। আমরা বাঙ্গলা পদ্যের প্রাচীনতম যে নিবর্ণন পাইয়াছি তাহাতে কোন ছন্দ বা প্রণালী দৃষ্ট হয় না। ডাক ও ধনার বচন ছন্দোবদ্ধ কবিতা বলিয়া বোধ হয় না। উহাতে মিলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নাই। মাণিকচাঁদের গানে* অক্ষর, যতি বা মিলের কিছুমাত্র নিয়ম দৃষ্ট হয় না। ভাষ প্রকাশ করিতে প্রয়োজন হইলে, অক্ষর-সংখ্যা ২৪, ২৫ কি ২৬ ও অতিক্রম করিয়াছে, আবার স্থল বিশেষে তাহা সংক্ষিপ্ত হইয়া ১২ কি ১০ এ অবতরণ করিয়াছে, এরূপও দৃষ্ট হয়। মিলের প্রতি কথঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, কিন্তু অনেক স্থলেই নিয়ম লঙ্ঘিত, স্মৃতরাং মিল ও নিয়মাদীন ছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

(১) গরিবানের সাদী অন্ধখান মরহামতী দিল জলত বিছারা।

রোগ আসন ধরিল মরনা ধরন সরন করিয়া।

(২) মাত দিয়া মাত জনা পক্ষিয়া মোলাইল।

চালের গড়া দিয়া বাঁধিল।

(৩) তোর মাইরা পাইয়াছে ধৌরক নাথের ঘর।

নাগাইল পাইলে অমলা না করে কুমল।

(৩) তোমার বুদ্ধি নয় বধু সকলর চক্র ।

যত বুদ্ধি সিথিয়া সেম নিরাসী সকল ।

কিন্তু এই গীতি ও ডাকের বচন ছাড়িয়া দিলে, পরবর্তী যে কবিতা দৃষ্ট হয়, তাহাতেও ত্রিপদী এবং পয়ারাখ্য কবিতার চরণ বর্তমানরূপ সীমাবদ্ধ দৃষ্ট হয় না। চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি হুএক থানা পুস্তকে পয়ার অনেক পরিমাণে নিয়মিত দেখা যায়। অত্র সমস্ত পুস্তকেই ঐরূপ নিয়মের ব্যতিক্রমই অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হয়। হস্তলিখিত পুঁথি যত প্রাচীন, যতি ও অক্ষরের ব্যতিক্রম তত বেশী। ত্রিপদীর মত পয়ার ও ভিন্ন ভিন্ন রাগ রাগিনী সংজ্ঞায় বাচ্য দৃষ্ট হয়। নিম্ন-লিখিত পয়ার 'গান্ধার রাগ' অভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাগশ্রী গান্ধার ।

“বুদ্ধেত মরা হৈলে হয় স্বর্গগতি ।

গলাইলে অশ হয় নরকে বসতি ॥

এ বুলিয়া বৃহন্নলা ধরিবারে জাএ ।

অস্তরে থাকিয়া সব কুরুবলে চাএ ॥

নড়এ মাথার বেণী নপুংশক বেশে ।

দশপদ অস্তরে ধরিল গিয়া কেশে ॥

কাকূতি করএ তবে উত্তর কুমার ।

না কর না কর মোর প্রাণের সংহার ॥

হুণ বৃহন্নলা মুই করম বিবেদণ ।

২৭ বাহড়ই আমার রাখহ জীবন ॥

একশত হুর্ণ দিমু শুদ্ধ হুগঠিত ।

অষ্টশত মণি দিমু কাঞ্চন ভূষিত ॥

বৈদূষ্য বিচিত্র দিমু মণি মনোহর ।

দশ হস্তি দিমু ভোক পরম হৃন্দর ॥”কবীন্দ্র—বেঃ,গঃ পুঁথি ৬৫ পত্র ।*

* আমরা উক্ত অংশের অনেক স্থলেই বর্ণান্তক্ৰি সংশোধন করিব না। প্রথমতঃ প্রাকৃতের সঙ্গে বঙ্গভাষার নৈকট্য দেখাইতে মূল হাতের লেখা অমিকৃত রাখা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ উদ্ধৃতকারীর প্রাচীন রচনা সংস্কার করিবার অধিকার আছে কি না, তাহা সন্দেহহীন। বার্ষা আমরা অম বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিতে প্রয়াসী, তাহাই হয়ত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিবার একমাত্র পন্থা, শুদ্ধ করিতে গেলে সেই পথ বদ্ধ হয়।

এই পয়ার,—গান্ধার রাগে কেমন শুনায়, জানিতে জনৈক ভাল গায়ককে
নিযুক্ত করা আবশ্যক ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে গানে চৌদ্দ অক্ষরের নিয়ম পালনের প্রয়োজন
ছিল না, উপরি উক্ত অংশ আমরা অক্ষর-নিয়ম-ভঙ্গের উদাহরণ স্বরূপ
বাছিয়া উঠাই নাই, তথাপি উক্ত ১৪ চরণের মধ্যে ৫ চরণে পয়ারের
নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। প্রাচীন বাঙ্গলা যে কোন পুঁথি খুঁজিলেই
১১ হইতে ১৭ অক্ষরের পয়ার বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইবে। আমরা কয়েকটি
উদাহরণ দিতেছি; পাঠক সেগুলিতে অমিল পদ ও অক্ষরের ব্যতিক্রম
উভয়ই দেখিবেন।

(১) সম্মুখে রাখিয়া করে বসনের বা । (১৩)

মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা । (১৩) চণ্ডীদাস ।

(২) ভৈরব স্তূর্ত গজপতি বড় ঠাকুরাল । (১৪)

বারানসী-পর্ধ্যন্ত কীর্তি ঘোষণা যাহার । (১৫)

রামায়ণ ৪০০ বৎসরের হস্তলিখিত পুঁথি ।

(৩) যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম । (১৫)

তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান । (১৪) চৈঃ চৈঃ ১৬ পঃ ।

(৪) খই কদলক আর তৈল হরিদ্রা (১৩)

প্রত্যেকে সব্বারে দিল শচী হুচরিত্র (১৪) চৈ, ম, আদি ।

(৫) ক্ষৌণি-কল্পতরু শ্রীমান দীন দুর্গতি বারণ (১৭)

পুণ্য-কীর্তি গুণান্বাদী পরাগল ধান (১৪)

কবীন্দ্র বেঃ গঃ পুঁথি । ৪৫ পত্র ।

(৬) নারায়ণ নাম কস কহিব একে একে । (১৫)

অজানিল মুক্তিপদ পাইল যেমতে ॥ (১৪) শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ।

(৭) চৈতন্তচন্দ্রের পুণ্য বচন চরিত্র । (১৪)

ভক্ত প্রসাদে ক্ষুরে জানিহ নিশ্চিত ॥ (১৩) চৈ, ভা ।

(৮) আজ্ঞা নাহি দেয় রাজা করি মায়া মো । (১৩)

শ্রীমন্তের নাহি রহে লোচনের লো ॥ (১৩) ক, ক, চ ।

এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ত্রিপদীর (লাচাড়ীর)
অবস্থা ইহা হইতেও শোচনীয় ছিল। কবীন্দ্র-রচিত ভারত হইতে নিয়ে

ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ইহা পদ্য কি গদ্য এবং কিরূপে
সেকালের কাব্যান্বাদীগণ ইহা পড়িয়া স্থখী হইতেন, নিরূপণ করা অকঠিন।

দীর্ঘছন্দ ।

শিশু হোতে পুত্র, দেব গুরু পুত্রস্ত,

নাহিক যে পরস্পর ভেদ ।

বিপ্রতর্পস্ত, সত্য করেস্ত,

অভ্যাস করেস্ত ধর্ম্মবেদ ॥

সত্য সত্য ছাড়ি, অসত্য না বোলেস্ত ।

প্রতিবর্গের, প্রাণ সমসর,

বিচিত্র যোদ্ধা মহাবীর ।

মাস্তী গর্ভে হৈল, মোহর শির পুত্র,

নকুল কোমল শরীর ॥

বহু শত্রু ক্ষয়, করিল পুত্র মোর,

পুনি কি দেখিমু নয়নে ।*

কহত গোবিন্দ, হাহা শিশু পুত্র,

নকুল চলিয়া গেল বনে ॥

কবীন্দ্র, বেং, গঃ, পুঁথি ৭২ পত্র ।

এইরূপ দৃষ্টান্ত অল্প নহে, অনেক পাওয়া যায়। যে অবধি গান আর
কবিতার অধিকার পৃথক হইয়াছে, সেই অবধি কবিতায় যতি ও অক্ষরের
নিয়ম এত বাঁধাবাঁধি হইয়াছে।

এই সমস্ত ছন্দই যে সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের অমুকরণে, তাহা বলা
নিম্প্রয়োজন। যদি আদি হইতেই বাঙ্গলা পয়ারে চতুর্দশ অক্ষর থাকিত,
তবে ও কি ইহার আদি খুঁজিতে আমাদের পার্শীর ব্যয়ে তালাস করিতে
হইত! এক অক্ষর হইতে ২৭ অক্ষর পর্য্যন্ত পদ সংস্কৃতে বহুল পরিমাণে
রহিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গলা ছন্দের কাঙ্গাল নহে। নিম্নোক্ত চতুর্দশ-
অক্ষর-যুক্ত সংস্কৃত কবিতার যতি ও প্রায় বাঙ্গলার মত।

“কুলং বসন্ত তিলকং তিলকং বনাগা

লীলাপয়ং পিককুলং কলমত্র রৌতি ।

বাতোষ পুষ্প সুরভির্মলয়াত্রিবাতে

বাতো হস্তিঃ সমধুরাং বিধিবা হতাঃস ।” হলো বঙ্গরী, বিজয় স্তবক ।

পদান্ত' মিলাইতে বাঙ্গালী কোথায় শিখিল, এই প্রশ্নের উত্তর জঙ্গ
বহুদূর খুঁজিতে হইবে না। বোধ হয় যমক অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যবশতঃ
শেষ সময়ের সংস্কৃতে মিলের দিকে একটুকু বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছিল। ল্যাটিন
ও ঐরূপ কারণেই সমিল হইয়া দাঁড়ায়।* শঙ্করের 'অর্থমনর্থ' ও জয়দেবের,—

“বসতি বিপিন বিতানে, তাজ্জতি ললিতধাম ।

লুঠতি ধরণীতলে বহু বিলপতি তব নাম ॥”

প্রভৃতি রাশি রাশি মিত্রাক্ষরযুক্ত কবিতা হইতে বঙ্গীয় মিত্রাক্ষর কবিতার
প্রথা সূচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রাকৃত কবিতায় ও মিল দেওয়ার প্রথা
প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত “চরণগণবিপ্ল, পচম লইথপ্ল” বা “সহা দীহাজাগেহী,
কয়াতিগ্না মাগেহী”† ও জয়দেবের ‘রতি সুখ সারে, গতমভিসারে’ প্রভৃতি
পদগুলির অনুকরণে বঙ্গীয় ত্রিপদী গঠিত হইয়া থাকিবে। লঘু ত্রিপদী,
লঘু চোপদী ইত্যাদি ছন্দে নূতন উদ্ভাবনের কোশল কিছুই নাই। কেবল
সংস্কৃতের অনুযায়ী পদ বিন্যাসের কোশল দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতের ছন্দ অনন্ত
প্রকার ও সে ভাষার অসীম ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক, বাঙ্গালী কিণুকে সেঁচিয়া
এক লহরী আনিয়াছে মাত্র।

* “But the Latin Language abounds so much in consonances that those who have been accustomed to write verses in it well know the difficulty of avoiding them as much as an ear formed on classical model demands ; and as this jingle is certainly pleasing in itself, it is not wonderful that the less fastidious vulgar should adopt it in their rythmical songs.”

Hallam's History of the European Literature Vol. I. P. 32.

† পিঙ্গল

চতুর্থ অধ্যায় ।

বৌদ্ধ-যুগ ।

(১) মাণিকচাঁদের গান (২) ডাক ও খনার বচন ।

৮০০ খৃঃ হইতে ১২০০ খৃঃ ।

বৌদ্ধ-ধর্ম ভারতবর্ষের ত্রিদশীমা হইতে তাড়িত হইয়াছে। যে অধ্যায়ে আমরা অশোক, শীলভদ্র ও দীপঙ্করকে পাইয়াছিলাম, সেই অধ্যায় ভারত ইতিহাসে স্বতন্ত্র ভাবে পড়িয়া আছে; জয়দেবের ললিত গীতগোবিন্দের ভাব প্রাচীন-বঙ্গ-সাহিত্যে অলঙ্ঘ্যভাবে জড়িত, কিন্তু তাঁহার উদার বুদ্ধ-দেব-স্তোত্র বঙ্গ-ভাষায় গৃহীত হয় নাই। বাঙ্গলায় হিন্দু-গ্রন্থগুলির মধ্যে সেই স্তোত্রাংশ বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়িয়া আছে। হুঁ একজন কবি ভগবানের দশ অবতার বর্ণনার সময়ে জয়দেবের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা অতি সংক্ষেপে-যেন অনিচ্ছাক্রমে। প্রাচীন সাহিত্যে গণেশ, রামচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মনসা ও দক্ষিণারায়ের বন্দনা অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়, কিন্তু যাহার লোকমধুর চরিত্র-কাহিনীতে পাষণ গলে, যাহার অপূর্ব বৈরাগ্য প্রকৃতই মহাকাব্যের বিষয়, সেই বুদ্ধ-দেবের একটি সামান্য বন্দনা ও প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে নাই। পূর্বে উক্ত হইয়াছে হিন্দু-ধর্মের অভ্যুত্থানই বঙ্গভাষা ও গৌড়ীয় অন্যান্য ভাষার শ্রীবৃদ্ধির কারণ, এই জন্যই সেই সব ভাষার সাহিত্যে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি এই অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়। ভগবান বিষ্ণু বুদ্ধরূপ গ্রহণ করিয়া বেদ নিন্দা করিয়াছেন, সেই ক্রোধে এক লেখক বিষ্ণু-বিগ্রহ পূজা ও তুলসীপত্র স্পর্শ করাও নিষেধ করিয়াছেন।* শ্রীচৈতন্যদেব বুদ্ধ কাণীতে বৌদ্ধদিগের শেষ শক্তি নির্মূল করিয়াছিলেন, চৈতন্য-চরিতামৃত এই জয়ের ভেরী-বাদন উপলক্ষে বৌদ্ধগণের উল্লেখ করিয়াছেন, এই মাত্র।

‘বৌদ্ধ-যুগ’ অধ্যায়ে বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ কিছু লিখিবার সামগ্রী নাই,

* “বেদ বিনিমিত্তা বন্দ্যঃ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।

ন স্পর্শেৎ তুলসী-পত্রং শালগ্রামঞ্চ সার্চ্ছয়েৎ।” কুলার্ণব তন্ত্র

তথাপি কিছু নিদর্শন আছে, সেগুলি আমরা একবারে উপেক্ষা করিতে পারি না ।

সম্ভবতঃ হিন্দু-ধর্মের প্রভাববিস্তারের পূর্বেই বঙ্গভাষায় কতকগুলি নীতি-সূত্র ও প্রশংসা-গীতি রচিত হইয়াছিল। চৈতন্যভাগবতে যোগীপাল, গোপীপাল ও মহীপালের গীতির কথা উল্লিখিত আছে। উঁহারা বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী ছিলেন ও সম্ভবতঃ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতে ছিলেন। তাঁহাদের স্ততিব্যঞ্জক গীতি ও তাঁহাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রচিত হইবার কথা ।

(১) মাণিকচাঁদের গান ।

বিজ্ঞবর গ্রীয়ারসন সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্যালে* মাণিকচাঁদের-গীতি-শীর্ষক একটি কাব্যপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মাণিকচাঁদ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। আমরা বাঙ্গলা যে সকল রচনা পাইয়াছি, তাহা হইতে ভাব ও ভাষায় ঐ গীতি সম্পূর্ণরূপে পৃথক। সেই গীতির রচনাপ্রণালী নানাকারণে আমাদের নিকট হিন্দু-ধর্মের অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী বণিয়া বোধ হইয়াছে। এই জন্য আমরা মাণিকচাঁদকে চতুর্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম। চতুর্দশ শতাব্দী কৃষ্টিবাসের কাল, ঐ গীতি ও কৃষ্টিবাসের গীতি কতদূর স্বতন্ত্র, উঁহারা যেন দুই ভিন্ন জগতের বস্তু! সুখের বিষয় ইতিহাস আলোচনায় জানিতে পারিলাম মাণিকচাঁদ খুব সম্ভব, মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্বেই রাজত্ব করিতেছিলেন। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রক্টের বন্ধু ইতিহাস লেখক বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের মত ফুটনোটে উদ্ধৃত করিলাম ।†

* Journal Asiatic Society of Bengal 1878. Part I. No 3. P. 149. গ্রীয়ারসন সাহেব এই গান রঙ্গপুর অঞ্চলে কুসীদের বাড়ীতে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন; ইহা ১৩৪ স্নোকে সম্পূর্ণ।

† “বিজ্ঞবর গ্রীয়ারসন সাহেব মাণিকচন্দ্রের গীতের আরম্ভে যে উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি ধর্মপাল হইতে সুলতান হুসেনসাহের সমসাময়িক রাজা নীলাধর পর্য্যন্ত একটি রাজ-তালিকা প্রদান করিয়াছেন; যে প্রবাদ হইতে ডাক্তার বক্‌নু এইরূপ একটি তালিকা সংগ্রহ করিয়া ছিলেন, গ্রীয়ারসন সাহেব ও সেই প্রবাদবাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ বুদ্ধ গঙ্গ-নবীশগণ এরূপ প্রবাদ প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন। কোন ইতিহাস লেখক ইহা বিশ্বাস

গ্রীয়ারসন সাহেব ও প্রকারান্তরে ঐ গীতের প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, শৈব-ধর্মের প্রাবল্য সময় ঐ গীতি রচিত হইয়াছিল। ইতিহাসের স্বাক্ষ্যে প্রমাণ হয়, চতুর্দশ শতাব্দীর বহু পূর্বে শৈব-ধর্ম বঙ্গদেশে প্রবল ছিল।

এই গীতে শিব, যম প্রভৃতি দেববৃন্দ হইতে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্ত-বৃন্দের পর্য্যন্ত নাম পাওয়া যাইতেছে। গ্রীয়ারসন সাহেব বলেন, ইহার মধ্যে অনেক নাম, ঘটনা, ও যাবনিক শব্দ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রক্ষিপ্ত অংশ ওলি অপেক্ষাকৃত পয়ারের নিয়মে নিয়মিত ও সহজ বাঙ্গলার রচিত দেখা যায়, গীতির প্রারম্ভ বৈষ্ণব-প্রক্ষিপ্তকারীর হস্ত-গন্ধ-যুক্ত, তাহা গোপন করা যায় না;—

“ভাবিও রামের নাম চিন্তিও একমনে ।
নাইলে রামের নাম কি করিবে মনে ॥
অধমে না নৈল নাম জিভের আলিসে ।
অমৃতের ভাণ্ড তনু গরাসিল বিবে ॥
হেঁটে যাইতে যে জন রামের নাম লয় ।
ধনুক বাণ লৈয়ে রাম ভক্ত সঙ্গ যায় ॥
রাম নামের নৌকা খান শ্রীগুরুকাণ্ডারী ।
ছুইবাহ পসারিয়া ডাকে আস পার করি ॥

এই রচনার পরেই,—

ধুইয়া রামের গুণ সিদ্ধার গুণ গাই ।
বাকে বলিলেই সিদ্ধি পাই ॥

করিতে পারেন না। আমাদের বিবেচনায় গোড়েশ্বর মহারাজ ধর্মপাল শকাব্দার অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। যে মাণিকচন্দ্র রাজার গীতি গ্রীয়ারসন সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মাণিকচন্দ্রের সঙ্গে গোড়েশ্বর ধর্মপালের কোন সম্পর্ক ছিল, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। তবে ইহা আমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে মহিম্মদ বখতিয়ার খিলজির নবদ্বীপ বিজয়ের পূর্বে রাজা মাণিকচন্দ্র জীবিত ছিলেন। কিন্তু মাণিকচন্দ্রের গীতগুলি তাঁহার সমসাময়িক কিবা কিঞ্চিৎ পরবর্তী, তাহা নির্ণয় করা হুকটন। ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে মাণিকচন্দ্রের গীতি অতি প্রাচীন বাঙ্গলার আদর্শ স্বরূপ। মাণিকচন্দ্র রাজার গীতে কড়ি দ্বারা রাজ-কর আদায়ের কথা নির্দিষ্ট আছে, এইরূপ কড়ি দ্বারা রাজ-কর আদায়ের কথা হিন্দু শাসনকালে প্রচলিত ছিল। কিন্তু গ্রীয়ারসন যে গীত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে পরবর্তী বোঝনা (interpolation) দৃষ্ট হইয়া থাকে।” শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

মাণিকচাঁদ রাজা বলে বড় সতি ।

হাল খানায় মাসড়া সাথে দেড় বুড়ি কড়ি ।

দেড় বুড়ি কড়ি লোকে খাজনা যোগায় ।

তার বদলী ছয়মাস পাল খায় ।

এত মাণিকচন্দ্র রাজা সক্রয়া নলের বেড়া ।

একতন বেকতন করি যে খাইছে তার দুয়ারত খোড়া ।

ধিনে বালি নাহি পিন্ধে পাটের পাছড়া ।”*

সুতরাং প্রক্ষিপ্ত অংশ গুলি প্রাচীন জটিল রচনার কাণ্ড কি শাখায় বট-বৃক্ষ-সংলগ্ন ভিন্ন উদ্ভিদের ত্রায় জড়িত হইয়া আছে। তাহারা যে স্বতন্ত্র বস্তু, সে বিষয়ে দৃষ্টি মাত্রই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই গীতির ভাব বৌদ্ধ জগতের। আধুনিক হিন্দুগণের পূর্বপুরুষগণই অনেকে বৌদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস ও ধর্মভেদ হেতু তাহারা আমাদের সহানুভূতি ও বন্ধমূল-সংস্কার হইতে, চীন ও জাপানবাসীদের ত্রায় সম্পূর্ণ দূরবর্তী হইয়া রহিয়াছেন। তাই মাণিকচাঁদের গান সলিলে সলিল-বিন্দুর ত্রায় এখনকার দেশীয় ভাবের সঙ্গে মিশ্রিত হয় নাই, সলিলে তৈল বিন্দুর ত্রায় স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়া আছে। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য খুঁজিলেই পঙ্ক-বিষ, দাড়িষ, কদম্ব, পদ্ম-পলাশ, খগরাজ, তিলফুল প্রভৃতি উপমার বস্তু দেখিতে পাই। গ্রাম্যগীত গুলি ও এই উপমা হইতে মুক্ত নহে; মুসলমান রচিত বাঙ্গলা গ্রন্থে ও এই সব উপমার ছড়াছড়ি। রূপ বর্ণনার সহিত ইহারা প্রাচীন সাহিত্যে অলঙ্ঘ্য ভাবে জড়িত, এস্থলে সত্যের অহুরোধে বলা উচিত, সর্বত্রই এই যোগ মণিকাঞ্চন যোগের ত্রায় উৎকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু মাণিকচাঁদের গীতের রূপ বর্ণনায় বুদ্ধ ব্যাপ্তি বাস্তবিকি কি কবি কালিদাসের কোন হাত নাই। সেগুলি সংস্কৃত-প্রভাব শূন্য; সুতরাং সংস্কৃতের প্রভাবের পূর্ববর্তী বলিয়া বোধ হয়। দ্বীপ দর্শন পংক্তি অতিশূন্য, গোপীচাঁদ সোনার সঙ্গে তাহার উপমা দিতেছেন, সংস্কৃতের অজ্ঞতা হেতু দাড়িষবীজ কি মুক্তাপংক্তির কথা তাহার মনে উদয় হয় নাই। স্থলে স্থলে দুকথায় ছবিটি সুন্দর আঁকা হইয়াছে, রূপের

* উক্ত অংশ গুলিতে যে সব কঠিন ও অপ্রচলিত শব্দ পাওয়া যাইবে, তাহার অর্থ পূর্বে দেওয়া গেল। পাঠক তাহার সাহায্যে উহা বুঝিতে পারিবেন।

প্রতিবিম্ব ভাসিয়া উঠিয়াছে, অথচ দাড়িষ কদম্বাখ্যক রূপ বর্ণনা হইতে তাহা পৃথক; হীরার দাসী রাজপুত্রকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া হীরাকে জানাইল;—

“যেমন রূপ আছে রাজার চরণের উপর

ভেমন রূপ নাই তোমার মুখের উপর ।”

দ্বীর বাক্যে পুত্র মেহময়ী মাতাকে ৬০ মণ লৌহকটাহে ৮০ মণ তৈল পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং নয় দিন অগ্নিকুণ্ডের উপর উক্ত কটাহ উত্তপ্ত রাখিতেছেন। যে হিন্দুর গৃহে গৃহে রামায়ণী ও মহাভারতীয় নীতি, সেই হিন্দুর চক্ষে এই ঘটনা বিজাতীয়, ইহা হিন্দু-জগতের বলিয়া বোধ হয় না।

রাণী ময়নামতীর ভয়ে কৈলাসে শিবকম্পিত, যমপুরে যম লুঙ্কায়িত। ময়নামতী দেব-বৃন্দকে দারুণ লাজনা করিতেছেন, গোদা যম গ্রাহি গ্রাহি ডাকিতেছে, এসব কথায় কেমন একটা বিজাতীয় ছাণ আছে, উহা হিন্দুর ঘরের কথার মত বোধ হয় না। ইতিহাসে গাওয়া যায় প্রসিদ্ধ অতীশ* (দীপঙ্কর) একাদশ শতাব্দীতে তন্ত্র মন্ত্রাদির চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন,— বৌদ্ধগণ শেষ সময়ে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই তন্ত্র মন্ত্রের প্রভাব মাণিকচাঁদের গানে বিশেষ দৃষ্ট হইবে। হাড়িসিদ্ধা ইন্দ্রকে ডাকিয়া পথ প্রস্তুত করিতেছেন, অপ্সরাদিগকে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে আদেশ দিতেছেন, অথচ তিনি জাতিতে চণ্ডাল। বস্তুতঃ এই গীতে নানারূপ ভীষণ, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ঘটনার বর্ণনা আছে। তাহা আমরা আরব্যোপন্যাসের গল্পের ন্যায় পাঠ করিরাছি। অনুবাদ গ্রন্থ গুলি ছাড়িয়া দিলে ও কবিকঙ্কণ-চণ্ডী হইতে ভারতের অল্পদামদুল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা কোন্ গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই? সেই সব ঘটনা হইতে মাণিকচাঁদের গীতে বর্ণিত ঘটনা স্বতন্ত্র। সে গুলির পশ্চাতে দেবশক্তি তাই সে গুলি হিন্দুর নিজস্ব বলিয়া পরিচিত, আর ইহার পশ্চাৎ শুধু মন্ত্রশক্তি। গ্রীয়ারসন সাহেবের মতে হাড়িসিদ্ধার ইষ্টদেবতা

* “In 1042. The famous Atish, native of Bengal came to Tibet. He wrote a great number of works which may be found in the Bstanhgyur and translated many others relating principally to Tantrik theories and practices.”

গোরকনাথ ও জনৈক নেপালী বৌদ্ধ-সাধু । বৌদ্ধ জগতের এই সংগীত বোধ হয় এতদিন লুপ্ত হইয়া যাইত, কিন্তু প্রকৃষ্ট অংশ গুলিতে দেবদেবীর কথা সংযোজিত হওয়াতে ঐ গীতি দ্বয় পরিমাণে হিন্দুদের আভা ধারণ করিয়াছে, এবং সেই হিন্দুদের আভাটুকুই বোধ হয় এই গানের পরমায়ু বৃদ্ধির কারণ ।

এই গীতে বাঙ্গালী হৃদয়ের একটি কথা আছে, শুধু সেই স্থানে আমরা জাতীয় ভাবের তত্ত্ব খুঁজিয়া পাই । বাঙ্গালী কবি-কল্পনায় রড় নহেন, তিনি যুদ্ধের ভেরী বাজাইতে অসমর্থ । পাহাড়ের ছায় উচ্চ, শরদাভ্রের ছায় স্বচ্ছ, বিদ্যুতের ছায় প্রথর প্রতিভাব্যঞ্জক কি আত্মনির্ভরে তেজস্বী কোন কাব্য এদেশে রচিত হয় নাই, কিন্তু প্রেমের কাটি হাতে লইলে বাঙ্গালী মস্ত-সিদ্ধ, গোপীচাঁদ সন্ন্যাসী হইতে উদ্যত, তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতেছেন, ভাষা জটিল ও গ্রাম্য হইলে ও সেই স্থলে একটুকু স্বাভাবিকতা আছে । গ্রীয়ারসন সাহেব সেই স্থলের কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন ।

“না যাইও না যাইও রাজা ছয় দেশান্তর ।

কারে লাগিয়া বাম্বিলাম সীতল মন্দীর ঘর ।

বাম্বিলাম বাঙ্গলা ঘর নাই পাড় কালী ।

এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুবাণী ।

নিম্নের স্বপনে রাজা হব দরিসন ।

পালঙ্কে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন ।

হস গিরির মাও বইন রবে আমি লইবে কোলে ।

আমি নারী রোদন করিব খালী ঘর মন্দিরে ।

খালীঘর জোড়া টাটি মারে লাঠির ঘা ।

বয়স কালে যুবতী রাড়ী নিতে কলঙ্ক রাও ।

আমাক সঙ্গে করি লইয়া যাও

জীবর জীবন ধন আমি কছা সঙ্গে গেলে ।

রাধিয়া দিমু অন্ন দুখার কালে

পিপাসার কালে দিমু পানী ।

হাসিয়া খেলিয়া পোহানু রজনী ।

আইল পাতার বধিলে কথা কহিয়া বাম্ব ।

গিরি লোকের বাড়ী গেলে গুরু স্ত্রাম বলিমু ।

সিঁতল পাটি বিছাইয়া দিমু বালীসে হেলান পাও ।

বাউল সঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও ।

হাত খানি ছঃখ হইলে পাও খানি বাড়িমু ।
 এরকর কোতুকর বেলা হুতি ভুলিমু এহতি ভুলাইমু ।
 ঐসকালে বদনত দিমু দণ্ডপাখার বাও ।
 মাঘ মাসি সিতে ঘেসিয়া রমু গাও ।

গোপীচাঁদ বনের বাঘের ভয় দেখাইতেছেন, স্ত্রী উত্তরে বলিতেছে,—

কে কয় এগুলো কথা কে আর পইতায় ।
 পুরসর সঙ্গে গেলে কি স্ত্রীক বাঘে ধরে খায় ।
 • ওগুলো কথা খুটমুট পালাবার উপায় ।
 খায় না কেনে বনের বাঘ তাক নাই ডর ।
 নিত কলকে মরণ হউক শ্রামির পদতল ।
 তুমি হবু বট বৃক্ষ আমি তোমার লতা ।
 রান্ধা চরণ বেড়িয়া লমু পালাইয়া যাবু কোথা ।
 যখন আছিহু আমি মা বাপের ঘর ।
 তখন কেন ধর্মি রাজা না গেলেন সম্মাসি হইয়ে ।
 এখন হইহু রূপর নারী তোরে যোগ্যমান ।
 মোকে ছাড়িয়া হবু সম্মাস মুই তেজিম পরান ।”

মাণিকচাঁদের গীতি ভিন্ন আমরা আর ও কিছু রচনা এই অধ্যায়ের
 অন্তর্গত করিব, তাহা,—

(২) ডাক ও খনার বচন।

এই সব বচন রচনার সময় বুদ্ধের প্রভাব বঙ্গদেশ হইতে উৎপাটিত
 হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে পুঙ্করিণী খনন, বস্ত্রনির্মাণ
 বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সাধারণের উপকার-জনক ধর্ম যে অবশ্য পাক্ষণীয়,
 তাহা অনেকবার নির্দ্বারিত আছে,* কিন্তু একটিবারও হরি কি অশ্রু দেবতার

* “ধর্ম করিতে হবে জানি,।

শোধরি দিয়া রাখিব পানী ।

পাছ জইলে বড় কর্ম ।

মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম ।

যে দেয় ভাত শালা পানী শালী ।

সে না যায় বনের বাড়ী ।

ধর্ম তুমি কস্তা লান ।

বলে ডাক ধর্মে হান ।”

হানে হানে চাক্ষিকের হুত ও প্রচারিত দেখা যায়, বলা,—

নাম লইবার সূত্র গ্রন্থকে পালন করিতে আহ্বান করা হয় নাই। ভাষার জটিলতায় এই সব বচন মাণিকচাঁদের গান হইতে ও অনেক পূর্ববর্তী বলিয়া বোধ হয়। খনার বচনের প্রচলন অত্যন্ত অধিক, এই জন্য কালক্রমে তাহাদের ভাষা ক্রমশঃ সহজ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ডাকের বচন ততদূর প্রচারিত হয় নাই, এই জন্য সে গুলি ভাষার আদিমতা অনেকাংশে রক্ষা করিয়াছে। নিম্নলিখিত বচন গুলির* ভাষা খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| (১) বুন্দা বুঝিয়া এড়িব লুণ্ড । | তাতে দিও নানা শালি । |
| আপল হৈলে নিবারিব তুণ্ড । | (২) ভাষা বোল পাতে লেখি । |
| (২) আদি অন্ত ভুজসি । | বাটাহব বোল পড়ি সাধি । |
| ইষ্ট দেবতা যেহ পূজসি । | মধ্যস্থে যবে সমাধে স্থায় । |
| মরণের যদি ডর বাসসি । | বলে ডাক বড় সুখ পায় । |
| অসম্ভব কভু না খায়সি । | মধ্যস্থ যবে হেমাতি বুঝে । |
| (৩) ডাক্সা লিড়ান বান্ধন আলি । | বলে ডাক নরকে পচে । |

ডাক নামক জনৈক-গোপ ‘ডাকের বচন’ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। যে বংশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের গীলাবতার হইয়াছিল, সেই বংশে বঙ্গের সফ্রেতিস ডাকের জন্ম কল্পনা করা কিছু অনুচিত হয় নাই, তবে মিহিরের পত্নী উজ্জয়িনীর ভাষা ছাড়িয়া বাঙ্গলায় নীতি ও জ্যোতিষতত্ত্ব সংকলন করিতেছেন, একজন্যার দৌড় আর একটুকু বেশী। ডাক ও খনা দুর্ভেদ্য অন্ধকার-জাল হইতে জ্ঞান-রাশি বিকীরণ করিতেছেন। তাহাদের জীবনের উদয় অন্ত, পর্বতের ন্যায় অলজ্য কুসংস্কারের দ্বারা

“ভাল দ্রব্য যখন পাব
কালিকারে তুলিয়া না খোব ।
কথি ছুট করিয়া ভোগ
ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ ॥
যবে ডাক এই সংসার
আপনা হইলে কিসের আর ।”

ঈশ্বর-প্রসঙ্গে যে “ঈশ্বরের স্ত্রী সনে করে পরিহাস” তাহার নিদা ডাক করিয়াছেন। ঈশ্বরের স্ত্রী কে? গুরু পত্নী নন্ড ?

* বেণীমাধব দের সংস্করণ, ১২২৫ সাল ।

আবৃত। আমরা সে গুলির কিছুই প্রত্যয় করিতে পারিলাম না। কল্লনা-প্রিয় পাঠকগণ বটতলার সারসংগ্রহ হইতে তাঁহাদের সন্তোষার্থ বিবিধ সদনুষ্ঠানের আয়োজন খুঁজিয়া বাহির করিবেন।

বোধ হয় বঙ্গভাষা ক্ষুরণের এই গুলি প্রাক-চেষ্টা; ভাষা ও ভাব দুটো বোধ হয়, ৮০০-১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে এইসব বচন রচিত হইয়াছিল, যুগে যুগে ভাষার সংস্কার হওয়াতে সেগুলি বর্তমান সহজাকারে পরিণত হইয়াছে। উহারা, একজাতির সম্পত্তি; হয়ত প্রাচীন কালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই অজ্ঞাতসারে উহাদের রচনার সাহায্য করিয়াছে। কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা এ নমন্ত বচন রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।* কালিদাস ও গোপালভাঁড় যেমন বঙ্গীয় রসিকতা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, বঙ্গদেশের জ্ঞানে ও সেইরূপ সেকালে ডাক ও খনা নামধেয় প্রকৃত কবিতা কল্পিত ব্যক্তিব্যয় একাধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন।

এইসব বচনে কবিত্ব কিছুই নাই, উহার কল্লনা-সার সত্য, ভাষা উহাদিগকে সাজাইয়া বাহির করে নাই, স্মৃতির সাহিত্য-সেবীদিগের প্রীতিকর হইবে কি না জানি না। অনাড়ম্বর অতি সংক্ষেপে কথাগুলি প্রচারিত হইয়াছে, বহু পুস্তক খুঁজিলে যে জ্ঞান লাভ হয়, ঐ সব বচনের দ্বারা তাহা আছে,—উহারা এতদূর সত্য যে রেখা-গণিত কি অঙ্ক-গণিতের প্রশ্নের মত কবিতা দেখ,—ফলে মিলিয়া যাইবে।

খনা ও ডাকের বচন দুইরূপ সামগ্রী। খনা ক্লষক ও গ্রহাচার্যের নজির। ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে মানব-চরিত্রের ব্যাখ্যা বেশী। আমরা নিম্নে কতকটি উদ্ধৃত করিতেছি; বাঙ্গালী পাঠক, আপনারা হামাগুড়ির সঙ্গে যে পাঠ অভ্যাস করিয়াছিলেন, এগুলি তাহার পুনরাবৃতিমাত্র, কিছুই নূতন নহে।

(১) খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।

তার অর্কে কীধে ছাতি ॥

যরে ব'সে পুছে বাত।

তার ভাগ্যে হুভাত ॥† খনা

* ডাক অর্থ প্রচলিত বাক্যও হইতে পারে। “এখনও ডাকের কথার বলে” প্রভৃতি কথায় কোন কোন স্থানে ডাক অর্থ প্রচলিত বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

† “বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী” তুলনা করুন।

- (২) খনা ডেকে বোলে যান ।
 রোদে ধান ছায়ায় পান ।
 (৩) দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ ।
 কমে না বাড়ে না বারমাস ॥ খনা
 (৪) দিনে রোদ, রাতে জল ।
 তাতে বাড়ে ধানের বল ॥
 কাতিকের উনজলে ।
 খনা বলে দুন ফলে ॥
 (৫) ঘরে আখা বাইরে রাঁধে ।
 অন্ন বেশ ফুলাইয়া বাঁধে ॥
 ঘন ঘন চায় উলটি যায় ।
 ডাক বলে এনারী ঘর উজার ॥
 (৬) নিয়র পোখরি দূরে যায় ।
 পথিক দেখিয়া আউড়ে চায় ॥

- পর সম্বাধে বাটে শিক্কে ।
 ডাকে বলে এনারী ঘরে না টিকে ॥
 (৭) রাঁধে বাড়ে গায় না লাগে কাতি ।
 অতিথ দেখিয়া মরে লাজে ।
 তবু তার পুজার সাজে ॥
 হুশীলা শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি ।
 মিঠা বোল স্বামীতে ভকতি ॥
 রোদ্রে কাঁটা কুটায় রাঁধে ।
 খড়কাট বর্ধাকে বাঁধে ॥
 কাখে কলসী পানীকে বায় ।
 হেট মুণ্ডে কাকহো না চায় ॥
 ঘেন বায় তেন আইসে ।
 বলে ডাক গৃহিণী সেইসে ॥

বঙ্গভাষার মুখবন্ধেই এইরূপ সারগর্ভ কথার হুচনা হইয়াছিল, ইহা আমাদের সৌভাগ্যের কথা । ঘরের বউ ও কৃষকগণ এই সব চরণ কর্তৃক করিয়াছে বলিয়া উহাদিগকে অবজ্ঞা করিও না । ফুল কি জঙ্গলে জঙ্গলে মিলে না ? তারা কি মেঘে মেঘে ফোটে না ? কিন্তু তাহাদের মত সুন্দরকে ?

এইসব বচন পড়িতে পড়িতে আমাদের আর একটি কথা মনে হয় । এখন আমাদের ভিক্ষা করিতে হইলেও বিলাত হইতে ঝুলি কিনিয়া আনিতে হইবে । কিন্তু যখন ঐসব বচন রচিত হইয়াছিল, তখন বাদ্যলী ভালরূপ গৃহস্থালী জানিত ও পরমুখাপেক্ষী ছিল না । কৃষক সারা জীবন পরিশ্রম করিয়া, রোজ রুটি সহ্য করিয়া যে সত্যের আভাস পাইয়াছিল সেই জ্ঞান এসব বচনে প্রচুর আছে । কৃষক জানিত, জ্যৈষ্ঠে ধরা ও আষাঢ়ে ধারা হইলে শস্ত ধরায় আঁটে না । আষাঢ় মাস ভরিয়া দক্ষিণা ঝাতাস বহিলে সে বৎসর বন্ডা হয় । ফাল্গুন মাসে রুটি হইলে চিনা কাঙন দ্বিগুণ হয় । “ধাত্তের খোর জন্মিলে একমাস, ফুলিলে অর্থাৎ গর্ভে শীঘ্র জন্মিলে ২০ দিন, ঘোড়াঘুণ্ডে অর্থাৎ শীঘ্রভরে অবনত হইলে ১৩ দিন মাত্র পরেই কাটিবার উপযুক্ত হয় । অগ্রহায়ণে কাটিলে পূর্ণ ফসল হয়, পৌর্ষে কাটিলে স্থানে স্থানে ফসল, মাঘে কাটিলে অল্পমাত্র ফসল এবং ফাল্গুনে কাটিলে কৃষকের কোনরূপ ফসল হয়

না।** এগুলি তাহাদের পুস্তক শিক্ষার ফল নহে, তাহারা হাল কাঁধে করিয়া প্রকৃতির নিকট এই শিক্ষা পাইয়াছিল। বড় বড় অধ্যাপকও ইহারা অতিরিক্ত তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে পারিতেন না। এখনও বঙ্গের কৃষক এই সব তত্ত্ব জানে, কিন্তু পূর্বে ঘরে ঘরে সকলেই ইহা জানিত। আমরা শুধু জুলিয়েটের বিরহ ও ওথেলোর সন্দেহ বিষয়ে প্রাজ্ঞ হইতেছি ও পোপো-কেটিপেটল কোথায় তাহা মানচিত্রে দেখাইতে শিখিয়াছি, যাহাদের নিবাস বিচিত্র হস্ত্যায়ুশিতে, যাহারা নিজদেশের প্রভু, পরের দেশের প্রভু,—তাহাদের সঙ্গে ঘেঁষিয়া সমকক্ষ হইতে চাহিতেছি, কিন্তু গৃহস্থালী বুদ্ধিটুকু একবারে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই দুদ্দিনে তাই এইসব বচন ওলি বড় প্রিয় বোধ হয়।

কিন্তু এই সব বচনের আঁধার দিক আছে। দৃষ্ট হইবে, বাঙ্গালী গৃহস্থালী করিতেছিল সত্য, কিন্তু টিকটিকির ভয়ে, ইঁচির ভয়ে, আকার ভয়ে, বাঁকার ভয়ে, কুঁজোর ভয়ে স্বীয় কুটীরে থাকিয়া জড়সর হইয়াছিল। পা বাড়াইতে হা করিতে বঙ্গীয় বীর পাঞ্জির দোহাই দিত; তাহারা কাকমুখে জ্যোতিষের বার্তা শুনিয়া কার্যের ফলাফল নিরূপণ করিত। এই অপূর্ণ শব্দার্থের কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল।

শব্দ—কল

ক ক—কল্যাণলাভ . .

কঃ কঃ—রাজোপদ্রব

করকং করকং—বহুজনের সহিত সাক্ষাৎ।

কেতংকেতং—রত্ন হানি।

করকো করকো—কলহ। *

কোলো কোলো—নিশ্চল বা ক্ষতি।

কোয়ং কোয়ং—রাজা বা প্রভু বিনাশ।

ক্রেং ক্রেং ক্রেং—দ্রব্য লাভ।

কঃকুরুং কঃকুরুং—শব্দ দর্শন ইত্যাদি।

জ্যোতিষ রত্নাকর, ৪৪৫ পৃঃ।

জ্যোতিষ শাস্ত্র বিজ্ঞানরূপে অধীত হইতেছিল না,—সংসারক্লিষ্টের হস্তে পড়িয়া এইরূপ ছদ্মশাপ্রস্থ হইয়াছিল। যে জাতি এরূপ ভীক তাহাদের জীবনে স্বাধীন চিন্তার ক্ষুণ্ণি কিরূপে থাকিবে? এইরূপ জ্যোতিষে ভক্তি জাতীয় প্রতিভা-বিকাশের প্রতিবন্ধক। তাই ঐ সব বচনে একদিকে বাঙ্গালীর অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া সুখী হই, অন্তরিকে তাহাদিগের জড়তা দেখিয়া দুঃখিত হই।

* খনার বচন, জ্যোতিষ রত্নাকর।

কিন্তু শব্দ-প্রণোদিত হিন্দু ধর্মের চোট বঙ্গে প্রবেশ করিল—অনড় টলিল; বাহা নড়ে না, তাহা নড়িতে শিথিলে দৌড়ায়। যে বঙ্গদেশের প্রতিভা কুমসংস্কারেও জড়তার মলিন ও নিম্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, তাহা কয়েক শতাব্দীর মধ্যে খাঁড়া ধরিয়া বহুযুগ-সঞ্চিত কুমসংস্কারের স্তূপ চ্ছেদন করিতে দাঁড়াইল। আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সেই প্রতিভার ক্রমিক বিকাশ দেখাইব।

আমরা ‘বৌদ্ধযুগের’ রচনার যে সব অপ্রচলিত শব্দ পুঁইয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম।*

শব্দ	অর্থ	পুস্তকের নাম।
অক	... উহাকে ...	মা, চ, গা।
অচুসিতের	... আশ্চর্যের ...	ঐ
অফিণা	... যাহা উৎপাটিত হয় নাই ...	ঐ
অবুধ	... বুদ্ধিশূন্য ...	ডাক।
আউটাউ	... হাবুডুবু ...	মা, চ, গা।
আউ	... জাহ্নু ...	ঐ
আউল	... সিদ্ধ ব্যক্তি ...	ঐ
আউড়ে	... বক্রভাবে ...	ঐ
আও	... ব্রব ...	ঐ

* এইসব শব্দের সকল অর্থই যে ঠিক হইল তাহা বলিতে পারি না। কোন কোন শব্দ কেবল স্থলবিশেষে একবার পাইয়াছি, সেই স্থলে যে অর্থে তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ধারণা হইয়াছে, তাহাই দিয়াছি। একই শব্দের ব্যবহার অনেক স্থলে না লক্ষ্য করিলে তাহার প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না। ইহার কোন কোন শব্দ সম্পূর্ণ প্রাদেশিক, তাহা বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের শব্দার্থ-বোধ-সৌকর্য্যার্থ কোন অভিধান এখনও রচিত হয় নাই, কিন্তু তাহার রচনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমি এই পুস্তকে সেই বিষয়ের কথঞ্চিৎ অবতারণা মাত্র করিব, ধারাবাহিক কিছু এখানে আরম্ভ করা যায় না। এখানে বলা উচিত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ‘পুঁহ’ ও ‘নিছনি’ শব্দের অর্থ লইয়া “সাধনায়” ও শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় “সাহিত্য” পত্রিকায় এই বিষয়ের ইতিপুর্বেই কিঞ্চিৎ পুত্রপাণ্ড করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভট্ট মহাশয় তাহার বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সংস্করণে ভ্রতকগুলি হিন্দী শব্দের অর্থের তালিকা দিয়াছিলেন।

আধার*	...	খাদ্য	...	ডাক
আপহর	...	পাহারা	...	ঐ
আপ্ত	...	আপন	...	মা, চ, গা
আছিল	...	উপস্থিত	...	ঐ
আইল পাতার	...	বৃহৎক্ষেত্র	...	ঐ
আরিকল	...	আয়ু	...	ঐ
আসা নড়ি	...	হাতের লাঠি	...	ঐ
একতন থেকেতন...	...	যে কোন প্রকারে	...	ঐ
একলা	...	এক	...	ঐ
এলায়	...	এখন	...	ঐ
উকা	...	অগ্নি	...	ঐ
উলী	...	কুশল	...	ডাক
কা	...	কাক	...	খনা
কাউ	...	কাক	...	ঐ
কাউশিবার	...	তাগাদা করিতে...	...	মা, চ, গা ।
কাতি	...	কালী ; কার্তিক মাস...	...	ঐ
কালী	...	ছোট	...	ঐ
কোনটি	...	কোথায়	...	ঐ
কোটেকার	...	কোথাকার	...	ঐ
কুশলানী	...	মদলাকাজী	...	ডাক
কৈতরা†	...	পায়রা	...	মা, চ, গা ।
খপরা	...	কুটার	...	ঐ
খোচা	...	তৃণ পল্লব	...	ঐ
গাভূর‡	...	যুবক, বলশালী	...	ডাক

* আধার শব্দ পূর্বে সমুদ্রের খাদ্য ও বুঝাইত ; এখন ইহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়া শুধু পক্ষীর খাদ্য মাত্র বুঝায় ।

† এখনও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ।

‡ বিক্রমপুর জেলায় এখনও চলিত ।

গাবুরাগী*	...	যৌবন •	...	মা, চ, গা ।
গিরি	...	গৃহ	...	ঐ
গোবিন	...	গভীর	...	ঐ
গোধলা	...	গোময়	...	ডাক
ঘরজুয়ান	...	চিরযৌবন	...	মা, চ, গা ।
চতুরা	...	চতুর্দার	...	ঐ
চাষর	...	চামর	...	ঐ
চরিচর	...	চরিত্র, উপায়	...	ঐ
ছায়ুর	...	সম্মুখের	...	ঐ
ছুই	...	শূত্র	...	ডাক
জীউ	...	জীবন	...	মা, চ, গা ।
জ্ঞাস্তা	...	জ্ঞাতি	...	ঐ
ঝোলাঙ্গা	...	ঝুন্ডি	...	ঐ
ডাক	...	কাটি	...	ঐ
ডারিয়া	...	বাঁধিয়া	...	ঐ
ডাঙ্গাইবার	...	গ্রহণ করিতে	...	ঐ
ডাঙ্গাডোল	...	বহুজনতার শব্দ	...	ঐ
ঢেবা ডোরা	...	ঢোলের দ্বারা ঘোষণা	...	ঐ
ঢলমল	...	ঝলমল	...	ঐ
তেতকে	...	তত	...	ঐ
তৈল পাঠের খাড়া	...	পাঠা কাটার ছুরি	...	ঐ
দায়ী	...	ডাক	...	ঐ

* গ্রীষ্মরসন গাবুরাগী অর্থ করিয়াছেন 'গর্ব' (vanity)। এসিয়াটিক সোসাইটির আয়ত্তাংশ ১৮৭৮ প্রথম সংখ্যা ৩য় খণ্ড ২১৩ পৃঃ দেখ। কিন্তু পূর্ববঙ্গে কোন কোন স্থলে গাবুরাগী, উত্তরবঙ্গে রূপই প্রচলিত আছে ও যৌবন বুঝায়। পাঠক এই পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠায় উক্ত স্থল গাবুরাগী শব্দ দেখিবেন; তাহাতে যৌবন অর্থই সঙ্গত দৃষ্ট হইবে।

† এই দায় শব্দ পূর্বে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইত। শাণিকচাঁদের গানে আছে,—

“যেন মতে কলাই বেচি রাজাকে দেখিল,

ঘরের শ্রামক আইল বাপ দায় দিয়া” ।

রাজার রূপে মুগ্ধ হইয়া ঘরের স্বামীকে বাপ বলিয়া আছিল। অনেক গল্পে চৈতন্যভাগবতে পাইতেছি, “অন্তের কি দায় বিকৃত্রোহী যে যবন” অর্থাৎ অন্তের কথা বুঝে থাকুক ইত্যাদি।

দোয়াদস	...	করঙ্গ	...	মা, চ, গা।
দামরা	...	ঢোল	...	ঐ
দোন	...	ছুই	...	ঐ
ধবীরা	...	স্ববির	...	ডাক
ধরেক	...	ধরিও	...	ঐ
ধওল	...	ধবল	...	মা, চ, গা।
নঠ	...	নষ্ট	...	ডাক
নিন্দ	...	নিদ্রা	...	মা, চ, গা।
নিতে	...	বিনা	...	ঐ
নেওয়া	...	প্রলেপ	...	ঐ
নেয়াই	...	শ্রায়	...	ঐ
পইতায়	...	প্রতায় করে	...	ঐ
পোখরি	...	পুকুরিণী	...	খনা।
পাহাড়	...	পার	...	ডাক।
পাকেয়া	...	ঘুরাইয়া	...	মা, চ, গা, !
বাবন	...	ব্রাহ্মণ	...	ঐ
বারুণ	...	ঝাঁটা	...	ঐ
বাদে	...	জন্তু	...	ঐ
বেন্না মুখ	...	মুখ ফিরাইয়া	...	ঐ
বুন্দা	...	বৃষ্টি-বিন্দু	...	ঐ
ভুসঙ্গ	...	ভস্ম	...	ঐ
বেআলি	...	অনৈক্য	...	ডাক।
মাও	...	মাতা	...	মা, চ, গা।
মধুকর*	...	নৌকা বিশেষ	...	ঐ

* ‘মধুকর’ নৌকা বিশেষের নাম। পদ্মপুরাণে নৌকার অনেকগুলি নাম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ‘মধুকর’ নৌকাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়; স্বয়ং সদাগর ‘মধুকরে’ যাইতেন। বিক্রমপুরবাসীদের মুখে শুনিয়াছি, এখনও মধুকর অর্থে একরূপ নৌকাকে বুঝায়। মাণিক চাঁদের গানে “চৌদ্ধখান মধুকর ভাসিয়া উঠিল” পদে ‘মপটই মধুকর’ অর্থ নৌকা দেখা যায়, কিন্তু গ্রীষ্মরসন সাহেব এই পদের অর্থ করিয়াছেন, “A swarm of bees flew up” J. A. S. Part I. No. 3, 1878. P. 235.

মালি	...	পথ্য	...	ঐ
মাড়াল	...	পথ	...	ঐ
মিঠ	...	মিষ্ট	...	ডাক ।
মুর্ছল	...	বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ	...	মা, চ, গা ।
যেটে	...	যে স্থানে	...	ঐ
যেত্কে	...	যত	...	ঐ
যোগ্যবান	...	যোগ্য	...	ঐ
যেনমত	...	যখন মাত্র	...	ঐ
লহড়(লড়)	...	দোড়	...	ঐ
সমাধে	...	বোঝে	...	ডাক
সাধে	...	সংগ্রহকরেন	...	মা, চ, গা ।
সানে	...	ইঙ্গিত		ঐ
সরুয়া	...	সরু	...	ঐ
সাঁও	...	সাপ	...	ঐ
সেঁওয়ালী	...	সন্ধ্যাকালীয়	...	ঐ
হীন	...	শূন্য, বিয়োগ	...	খনা ।

এই সময়ের ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব একবারেই দৃষ্ট হয় না, তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি। মাণিকচাঁদের গানে রাজ্য ভাল হইলে তাঁহাকে ‘সতী’ এবং দুষ্ট হইলে তাঁহাকে ‘অসতী’ বলা হইয়াছে। খনা শনিকে ‘ভানুতলুজা’ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বহু-পূর্ব-রচিত মেয়েলী ছড়ার ‘গুণবতী ভাই’ গুনিয়াছিলাম, সেও বুঝি এই যুগের রচনা হইবে। মাণিকচাঁদের গানে ক্রিয়ার গুরু লঘু ভাব এখনকার প্রচলিত ভাব হইতে স্বতন্ত্ররূপ ছিল। ‘যাইস না ধর্মি রাজা পরদেশক লাগিয়া ।’ (মা, চ, গা ২২২ শ্লোক) প্রভৃতি পদে সম্মানীয় পাত্রে লঘু ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে; অথচ ভৃত্য নেকাকে রাণী বলিতেছেন,— ‘কেন কেন নেজা আইলেন কি কারণ’ (৪২ শ্লোক) মাণিকচাঁদরাজ্য তাঁহার প্রহারক যমদূতের প্রতি জিজ্ঞাস্ত হইয়াছেন, ‘কে মারেন আমারে বিস্তর করিয়া’ (৭২ শ্লোক) কোন কোন স্থানে আধুনিকমতে নিতান্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন ‘ভুসি চাইলেন ছা’ (৩০০ শ্লোক) প্রভৃতি রচনা দৃষ্ট হয়।

এই সময়ে রাজারা শোণার খাটে বসিয়া রূপার খাটে পদ স্থাপন

(৩০৭ শ্লোক) ও স্বর্ণ খালে ৫০ ব্যঞ্জনসহ অন্ন আহার (৪৬৭ শ্লোক) করিলেও নিত্য জীবন-বাড়া-ঘটিত দ্রব্যে খুব উচ্চ অঙ্গের বিলাসের ভাব প্রদর্শন করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। ‘ইন্দ্রকঙ্কল’ (৫৫৫ শ্লোক) ‘দণ্ডপাখা’ (২৫৫ শ্লোক) ও ‘পাটের সাড়ী’ (৫৮০ শ্লোক) বিলাসের দ্রব্য মধ্যে গণ্য ছিল। পরবর্তী এক অধ্যায়ে দেখিব কুন্তিবাস পণ্ডিত গোড়েখরের নিকট একখানা ‘পাটের পাছড়া’ পাইয়াই ধন্ত হইতেছেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ ‘মেঘ ডম্বুর কাপড়’ ও ‘জগন্নাথী খান’ নামক একরূপ বস্ত্রের কথা গর্কের সহিত উল্লেখ করিতেছেন* ও চৈতন্য প্রভুর সময় তিন টাকা মূল্যের ভোট কঙ্কলই মহার্ঘ বলিয়া গণ্য হইতেছে (চৈ, চ মধ্যমখণ্ড, ২০ প)। সে সব এসময়েরও অনেক পরে। খাদ্যের মধ্যে ‘ইন্দ্রমিঠা’ (২৫৫ শ্লোক মা, চ, পা) নামক একরূপ মিষ্ট দ্রব্য উপাদেয় ছিল ও ‘বংশ-হরির গুয়া’ (২৫৭ শ্লোক) খাইয়া মুখ শুদ্ধি করা হইত। ‘বংশ-হরির গুয়া খাইয়া’ দত্ত শুভ্র হইয়াছে বলিয়া গোপীচাঁদ জীর মুখের প্রশংসা করিতেছেন।

মাণিকচাঁদের গানে এবং ডাক ও খনার বচনে দৃষ্ট হয় ব্রাহ্মণ ভক্তলোকগণও কৃষি-ব্যবসা করিতেন ও স্ত্রীলোকগণ পর্যন্ত অক্ষক্রিয়াসক্ত ছিলেন। স্ত্রীলোক-গণের অক্ষক্রিয়াসক্তি কবিকঙ্কণের সময়েও বিদ্যমান ছিল।

সন্তান জন্মিলে সাতদিন পরে ‘সাদিনা’ দশদিন পরে ‘দশা’, এবং ত্রিশদিন পরে ‘ত্রিশা’ নামক উৎসব করা হইত (মা, চ, পা ২১০—২১১ শ্লোক)।

পঞ্চম অধ্যায় ।

১। ধর্মকলহে ভাষার শ্রীরুদ্ধি।

২। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ।

বঙ্গে হিন্দুধর্মের উত্থানে নানা মতাবলম্বী অধ্যাপক স্বীয় স্বীয় মত প্রচারে নিয়োজিত হইলেন। ইহাদের তর্ক-বুদ্ধি অতীব কৌতূহল-উদ্দীপক। গোড়-বাসী প্রাচীন পণ্ডিত চিরজীব ভট্টাচার্য এই কলহ ব্যাপারের একখানা

* রাজার অস্ত্র সাধু “নিল জগন্নাথী খান দশ জোড়া।” ক, ক, চ।

সাধুর স্ত্রী “বাছিয়া পরিল মেঘডম্বুর কাপড়।” ঐ

চিত্রপট রাখিয়া গিয়াছেন; সে চিত্রখানি সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে—তাহার নাম “বিদ্যোদ্ভাদ তরঙ্গিণী”।*

হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থানকালে বোধ হয় শৈবধর্মই সর্বপ্রথম শির উত্তোলন করে। শৈব-ধর্ম কীর্তনোপলক্ষে ভাব্যর কোন বৃহৎ কাব্য রচিত হয় নাই। “ধান ভান্তে শিবের গীত” প্রভৃতি প্রবাদ কাব্য দ্বারা অনুমান হয়, শৈবমতের অধ্যাপকগণ সে বিষয়ে একবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। চট্টগ্রামের প্রাচীন ‘মৃগলক’ পুঁথিতে শিবমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে; এইরূপ হুএকখানা প্রাচীন পুঁথিই শৈবধর্মের ভগ্নকীর্তি স্বরূপ বর্তমান আছে। উহার ক্ষুদ্র-কলেবর হইলেও জঙ্গলে কুড়াইয়া পাইয়া আমরা আদরে রক্ষা করিয়াছি। রামেশ্বরের শিব সংকীৰ্তন আধুনিক সামগ্রী। উহাতে শিব অপেক্ষা দেবীর শক্তি সামর্থ্যের বর্ণনাই অধিক।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি সাধনে পদ্মাবতী ও চণ্ডীই বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছেন। সংস্কৃতের বচন স্পর্শ-মণি-তুলা, তাহার প্রভাবে লোষ্ট্র ও দেবদ্ব্য প্রাপ্ত হইতে পারে; এইজন্ত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে মনসামাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্তিত হইয়া এবং বৃহদ্রথ পুরাণে† কালকেতু ও শালবাহন প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা বঙ্গীয় পদ্মপুরাণ ও চণ্ডী কাব্যের কেন্দ্র দৃঢ় করা হইয়াছিল।

* প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইল শোভাবাজারের স্বর্গীয়রাজা কালীকৃষ্ণবাহাদুর নিজকৃত একটি ইংরাজী অনুবাদসহ এইগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

† ১৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে গ্রন্থকার রতিন্দেব সঙ্ককে এই বিবরণ পাওয়া যায়।

“পিতা গোপীনাথ বল্লম মাতা বহুমতী।

জয়হান হুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি ॥

জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা বল্লম রাম নারায়ণ।

ধরণী লোটায়ে বল্লম যত গুরুজন ॥

অন্নপূর্ণা শান্তডী যে যশুর শরর।

মন্ত্রদাতা নয়াদীল মোক্ষদা ঠাকুর ॥

গোপীনাথ দেব হুত রতিন্দেব গায়।

মৃগলক পুঁথি এহি হয় পৌরীর পায় ॥”

এই পুস্তক শিবচতুর্দশী ত্রয়ের মাহাত্ম্য কীর্তন উপলক্ষে এক ব্যাখ্যার বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

‡ “সং কালকেতুধরদা হলসোধিকাসি।

বাং গুতা তবসি মঙ্গলচণ্ডীকাখ্যা ॥” ইত্যাদি

শৈবধর্মের উপর এইসব পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্মতত্ত্ব উপযুক্ত পরি-
 আঘাত করিয়াছে। শিবোপাসক ধনপতি সদাগর ‘ডাকিনী দেবতা’ চণ্ডীর
 ঘটপদ-প্রহারে ভগ্ন করিয়া ‘মেয়ে দেব’-সেবিকা খুল্লনাকে ভৎসনা করিয়া-
 ছিলেন,* বিষহরিকে শিবোপাসক চাঁদ সদাগর শুধু রক্ত চক্ষু দেখা-
 ইয়া ক্রান্ত হন নাই, হেঁতালের বাড়ি দিয়া কক্ষদেশ ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন।†
 কিন্তু বঙ্গীয় কাব্যগুলিতে চণ্ডী ও মনসাকে স্বীয় স্বীয় উপাসকভক্তগণের জন্ত
 যেরূপ কার্য্য-তৎপর দর্শন করি, সে তুলনায় শিবঠাকুরকে নিতান্তই নিশ্চেষ্ট
 বলিয়া মনে হয়। খুল্লনার বিপদে, শ্রীমন্তের ক্ষেদে, লাউসেনের দুঃখে
 চণ্ডীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। স্বীয় পূজা প্রচারের জন্ত চণ্ডী ও বিষহরির
 দিনে শাস্তি ও রাত্রে নিদ্রা ঘটে নাই। সুন্দর দেবীর প্রসাদে কাব্য
 অপেক্ষা চৌর্য্যে ও কম কৃতিত্ব লাভ করেন নাই। বিষহরিকে পূজা করিয়া
 বিপুল কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন কে না জানে? ভক্তের অরণমাত্র
 ইহারা কখনও সাশ্রুনেত্র কখন ও খড়্গহস্ত। কিন্তু প্রায়শঃ ইহারা সামান্য
 মানবীর ভ্রায় রাগ, হিংসা ও দুঃখের পরিচয় দিয়াছেন। দু’এক স্থলে শুধু
 বর্ণনাগুণে চণ্ডী দেবী মহন্তর প্রভাব দেখাইয়াছেন। মুকুন্দরাম ব্রহ্ম চণ্ডীর
 যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা গম্ভীর রসে মিন্টনের লেখনী-যোগ্য।
 দেবীর ক্রোধ দেখিয়া বকণ পাশ, যম কালদণ্ড, ইন্দ্র বজ্র, শিব শূল, ব্রহ্মা
 কমণ্ডলু, বিষ্ণু চক্র, সূর্য্য রশ্মি লোকপালগণ তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় প্রহরণ
 দিয়া প্রণত হইতেছেন। ত্রিলোকের এই ভীতিকর শক্তি-পূজা একত্র
 সংগ্রহ করিয়া সংহার-রূপিণী সিংহের উপর দাঁড়াইলেন। ইজিপ্টের পিডামিড
 কি ব্যাবিলনের প্রস্তর-গৃহ ইহারা প্রস্তত করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভিন্ন
 এবিগ্রহ গঠন করিবে কে?

কিন্তু চণ্ডী ও পদ্মাবতীর উদ্যমশীলতা মহাদেবে দৃষ্ট হয় না। চাঁদসদাগরের
 সাতখানা ‘মধুকর ডিঙ্গা’ খান খান হইয়া সমুদ্রে পড়িল। চাঁদবেনে
 ‘শিব শিব’ বলিয়া সপ্তবার ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।‡ কিন্তু শিবঠাকুর

* ধনপতির সিংহল বাত্রা, ক, ক, চ।

† “হেঁতালের বাড়ি দিগগো আগো তাতে ব্যাধা পাইলাম বড়।

জানুয়া মন্টে দিয়া কাকালী কৈলাষ দড়। বিজয়ন্তের পদ্মপুয়াণ।

‡ “তেলার চাপিয়া মাধু পাইল সিরা তট।

শিব শিব বলি সাতবার করে গড়।” কেতকাদাস।

নিশ্চেষ্ট, নির্দয়। ধনপতির অঞ্জন মৌচন করিতেও তিনি হস্ত উত্তোলন করেন নাই। সুতরাং বিষহরি ও চণ্ডীর প্রতিপত্তি যে বঙ্গদেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? চৈতন্যভাগবতে দেখা যায়, উক্ত দেবতাদ্বয়ের পূজা বিশেষ অর্থকরী ও সম্মানিত ব্যবসা ছিল।*

এস্থলে বলা উচিত, ভারতচন্দ্র শৈব ও শাক্তের যে কলহ বর্ণনা করিয়াছেন ও দাশরথী বাহার আভাস দিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের সময়ের সামগ্রী নহে; তাঁহারা অতীত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা অঙ্কন করিয়াছেন মাত্র। ভারতচন্দ্র উক্ত কলহ বর্ণনা করিতে যাইয়া নানা মতের সামঞ্জস্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; তদ্বারাই দৃষ্ট হয়, শৈব শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় সে সময় পরস্পরের বিরোধ ভুলিয়া সকলেই যে এক পথের পথী, এই সত্য ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছিল; সুতরাং তাহারা ধর্ম্ম-বিদ্বেষের সীমা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল।

শৈব শাক্তের কলহ ভিন্ন এক সম্প্রদায়ে ও নানারূপ মতভেদ ও তর্ক-নিত বিদ্বেষ বর্ত্তমান ছিল। এখনও এক এক সম্প্রদায় হইতে কতরূপ বিরুদ্ধ মতের প্রভা বিকীর্ণ হইয়া জগতকে সংশয়াবিত করিতেছে। বিদ্যোদ্ভাস তরঙ্গিনীতে রামোপাসক ও শ্রামোপাসকের দ্বন্দ্ব বর্ণিত আছে, বটতলার কুস্তিবাসী রামায়ণে সেইরূপ একটি কলহের অল্প মাত্রায় আভাস আছে,—

“এতক মন্ত্রণা করি বিনতা নন্দন ।
পাখাতে করিল যর অদ্ভুত রচন ॥
ভক্ত বৎসল রাম তাহার ভিতরে ।
লাঙাইলা দ্বিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ ধরে ॥
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে ।
হুম্মান দেখে তবে ভাবিছে অস্তরে ॥
ধনু বলে প্রাণপণে করি প্রভু হিত ।
পক্ষীর সঙ্গিতে এত কিসের গীরিত ॥

দেখিলেন হুম্মান মহাযোগে বসি ;
ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বাঁশী ॥
হুম্মান বলে পক্ষী এত অহঙ্কার ।
ধনু খসাইয়া বাঁশী দিল আরবার ॥
যদি ভূতা হই মন থাকে ত্রিচরণে ।
লইব ইহার শোধ তোর বিদ্যামানে ॥
বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুশর করে ।
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ অবতারে ॥

কুস্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড ।

পুনশ্চ,—“যা করেন শিব শূল, এবার পাইলে কুল,
মদসায় ববিব পরাণে ।” কেতকাদাস ।

* “দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পূজিয়া ।

কেনা ঘরে যায় পরে বসন পরিয়া ॥ চৈ, ভা, আদি ।

শ্রীচৈতন্যদেব এক রামোপাসককে শ্রামোপাসনায় প্রবর্তিত করিয়াছিলেন ।

“ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল ।
কহ বিপ্র এই তোমার কোন দশা হৈল ॥
পূর্বের তুমি নিরন্তর লৈতে রাম নাম ।
এবে কেন নিরন্তর লও কৃষ্ণ নাম ॥
বিপ্র বলে এই তোমার দর্শন প্রভাবে ।
তোমা দেখি গেল মোর আত্মস্থ স্বভাবে ॥

বালাবধি রাম নাম গ্রহণ আমার ।
তোমা দেখি কৃষ্ণ নাম আইল একবার ॥
সেই হতে কৃষ্ণ নাম জিহ্বাগ্রে বসিল ।
কৃষ্ণ নাম শ্রুয়ে রাম নাম দূরে গেল ॥
চৈ, চ, মধ্যমখণ্ড ৯ ম পঃ ।

এইরূপ বিভিন্ন উপাসকগণ তাঁহাদের মতামতানুযায়ী শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া-
ছিলেন, ও অমুরূপ গ্রন্থ ভাষায় বিরচিত করিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে ধর্মতত্ত্ব
পোহাইতে যত্নপর হইয়াছিলেন । আমরা অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ কালিকা-
পুরাণ গারুড়পুরাণ এইরূপ প্রায় তাবত পুরাণেরই অতি প্রাচীন বঙ্গাভাবাদ দেখি-
য়াছি । ধর্মভিন্ন কোন জাতি বড় হয় নাই, ধর্মভিন্ন কোন সাহিত্যের
শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই ।

প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত ধর্ম লইয়া দেশময় ভাবের বন্ধ্যা ছুটিল । বৌদ্ধধর্মকে
উন্মূলিত করিতে যাইয়া বোধ হয় হিন্দুর বিপুলশক্তি ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল,
তাই মুসলমানগণ এত সহজে হিন্দুর শিথিলমুষ্টি হইতে স্বাধীনতার
কাড়িয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন । বৌদ্ধধর্ম* ও ভারতের স্বাধীনতা লুপ্ত

* বৌদ্ধধর্ম শেষসময়ে নাস্তিকতাপ্রসূত হইয়া পড়িয়াছিল । বিদ্যোদ্যাদত্তরসিদ্ধিগীতে
তাহাদের যুক্তি এই প্রকার বর্ণিত আছে ।

(১) ন স্বর্গো নৈব জন্মান্তরপি ন নরকো নাপাখর্শো ন ধর্মঃ, কর্তা নৈবাস্ত কশিৎ প্রভবতি
জগতো নৈব ভর্তা ন হর্তা । প্রত্যক্ষান্তর্যমানে ন সকল কলভুগ্গেহভিন্নোহস্মি কশ্চিদ্বিখ্যা
ভূতে সমন্তেহপানুভবতি জনঃ সর্বমেতদ্বিমোহাৎ ।

অর্থ,—স্বর্গ নাই জন্মান্তর নাই, নরক নাই, অখর্শ নাই, ধর্ম নাই, এই জগতের কোনও
কর্তা নাই, সংহার কর্তা নাই প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই । দেহ ভিন্ন পাপ পুণ্যানি সমস্ত
কর্মের কলতোপী কোনও আত্মাদি নাই । এই মিথ্যাজুত অখিল সংসারে জীবগণ মোহ বশতঃ
এই সকল অন্তত্ব করিয়া আসিতেছে ।

(২) অহিংসা পরমো ধর্মঃ পাপমাক্রম্যপীড়নম্ ।

অপরাধীনতা মুক্তিঃ স্বর্গোহভিলষিতাশনম্ ॥

সদাশরণনারেবু বধেচ্ছং বিহরেৎ সবা ।

শুকশিষ্যপ্রণালীক ত্যজৎ স্বহিতসাচরন ॥

হইয়াছে ; কিন্তু গৃহে গৃহে, প্রতি গৃহীর হৃদয়ে হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও সাবিত্রী মূর্তি অঙ্কিত হইল—আমাদের এই লাভ । কৃষ্ণ ভক্তিতে দেশ ডুবিয়া গেল । বৌদ্ধধর্মের অবসানে নরহৃদয়ে নবভাব অকুরিত হইল, তাই আমরা খ্রীষ্টচৈতন্যদেবকে পাইয়াছি । আমরা ধর্মজগতে কতিগ্রস্থ নহি । ভারতবর্ষ অন্যদিগে লাভালাভের গণনা করে না । প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে শাস্ত্রের দোহাই ভিন্ন অন্য কথা নাই । পুরুষদিগের ত কথাই নাই, স্ত্রীলোকগণ ও প্রতি কথায় শাস্ত্রের নজির দেখাইতেন । ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে গৃহে-প্রত্যাবর্তনের জন্য শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন (ক, ক, চ), লহনা ঘেষপরবশ হইয়া খুল্লনাকে স্বামীর গৃহে যাইতে নিবেদন করিলে খুল্লনা কতকগুলি শাস্ত্রের নজির দেখাইয়া সপত্নীর তর্ক-কুহক দূর করিতেছে (ক, ক, চ), বিপুলাকে যখন তাঁহার ভ্রাতা স্বামীর শবত্যাগ করিতে বলিতেছে তখন বিপুলা তৎবিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় নজিরসহ অকাট্য প্রমাণ দেখাইতেছে (হস্তলিখিত পদ্মপুমাণ) কর্ণসেন যখন রঞ্জাদেবীকে সম্মান না হওয়ার কষ্ট বিস্তৃত হইতে অনুনয় করিতেছেন, তখন স্ত্রী শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধারণে পরাভূত হয় নাই (খ্রীষ্টধর্মমঙ্গল ৪র্থ সর্গ) ।

এইরূপ অসংখ্য স্থলে দেখা যাইবে শাস্ত্র চর্চা সমাজের নিয়তম স্তর ও স্ত্রীজাতি পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল, নিরক্ষর কালকেতু ব্যাধ কংস নদীর জল পান করিয়া দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাগবতের কথা উল্লেখ করিতেছে, উহা কবির অস্বাভাবিক বর্ণনা হয় নাই । প্রাচীন সামাজিক জীবনের ভিত্তিভূমি শাস্ত্র এবং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ভিত্তিভূমি সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ।

কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণকে শীর্ষস্থানে স্থাপন করিয়া উত্থিত হয় নাই । যদিও ভাষাগ্রন্থগুলিতে অজস্র ব্রাহ্মণের

অর্থ,—অহিংসাই পরম ধর্ম, আত্ম পীড়নই পাপ, পরাধীন না হওয়াই মুক্তি, অভিলষিত ক্রিয়া ভোজনই স্বর্গ । নিজ পত্নীতে ও পরদারে সততই যথেষ্টা বিহার করিবে; আপনায় হিতজনক আচরণ করিয়া গুরু শিষ্য প্রণালী ত্যাগ করিবে ।

(৩) কা স্ত্রী পদ্বিদেবনা যদি পুনঃ পিত্রোরপত্যোত্তমঃ ।

কুন্ডালাঃ প্রভবন্তি সন্ততমসী তন্তংকুলাদিতঃ ॥

অর্থ,—যখন মাতা, পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইতেছে, আর সেই কুন্ডকারাদি কর্তৃক যখন দিরন্তর বটাদি উৎপাদিত হইতেছে, তখন স্ত্রীর জন্ত ভাবনা কি আছে ?

স্তব দৃষ্ট হয়।* যাঁহারা নব-হিন্দুধর্মের স্বেতা হইলেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কবীর জোলা তাঁতি, রাইদাস চর্মকার, দাদুপন্থী-প্রবর্তক প্রসিদ্ধ দাছ ধুনরী, পীপা রাজপুত, খনা জাট এবং সেনগন্থী-প্রবর্তক সেন + নাপিত ও তুকারাম শূত্র ছিলেন। চৈতন্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ব্রাহ্মণের এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ নিকৃষ্ট জাতীয় ছিলেন।† ব্রাহ্মণের ব্রহ্মনিষ্ঠা সমস্ত হিন্দুজাতি হরণ করিয়া লইয়াছিল তাই চর্মকার ও ধর্ম-নেতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মিস্ পারফিটন যেরূপ খ্রীষ্টীয় কুটারের দিগে আটলান্টিক মহাসাগরকে অগ্রসর দেখিয়া সম্মার্জনী হস্তে তাহার গতি রোধ করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন সেইরূপ সমাজের গৌড়াগণও এইধর্ম-প্রবাহে সর্বশ্রেণীর মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান বিস্তারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রানুবাদকারীদিগকে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন;—

* “যাঁর ক্রোধে বহুকুল হইল নির্বংশ।

যাঁর ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ।

যাঁর ক্রোধে কলঙ্কী হইল কলানিধি।

যাঁর ক্রোধে লবণ হইল সলিলধি।

যাঁর ক্রোধে অনল হইল সর্বভক্ষ।

যাঁর ক্রোধে ভগ্ন হইল সহস্রাক্ষ।” কাশীদাস।

ব্রাহ্মণের ক্রোধ এইরূপ! পরীক্ষিত রাজা বলিতেছেন;—

“এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ।

দংশক আমারে রহক ব্রাহ্মণ বচন।” ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি এতদূর।

+ সেন পূর্বে বঙ্গগড়ের (গন্দোয়ানার অন্তঃপাতি) রাজাদিগের কুল নাপিত ছিলেন। শেষে ধর্মজগতে তাঁহার প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনিও তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি সম্ভ্রামেরা উক্ত রাজবংশের কুলগুরু হইয়া অতিশয় খ্যাতি ও প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, দ্বিতীয় ভাগ, ৬৫ সংখ্যা, ১৭৭০ শক, ১৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।

† প্রসিদ্ধ ‘কড়চা’ লেখক (পদকর্ত্তীনহেন) গোবিন্দ দাস কামার ছিলেন;

“বর্দ্ধমান কাঞ্চন নগরে মোর ধাম।

ভ্রামদাস পিতৃ নাম, গোবিন্দ মোর নাম।

অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার।

মাধবী নামেতে হয় জননী আমার।” কড়চা।

“কৃষিবাসী, কানিনাসী, আর বায়ুগণ যেন, এই তিন সর্বনাশী” * কিন্তু তথাপি এই শাস্ত্রানুবাদে শিক্ষার স্রোত প্রতিকূল হয় নাই ।

পূৰ্বে এক অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত প্রাচীন কাব্যের প্রায় তাবতই গানের পালা ছিল। বঙ্গের বৈভবশালী ব্যক্তিগণ এই সব গানের আদর করিতেন; প্রত্যেক রাজসভায়ই সভা-কবি নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি স্বীয় পৃষ্ঠপোষক উৎসাহ-দাতার ধর্মবিশ্বাসানুকূল্যে কাব্য রচনা করিতেন। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা করিব, গোড়েশ্বরগণ বঙ্গসাহিত্যের ত্রিবিধ সাধনार्থ অনুবাদ গ্রন্থগুলি প্রণয়নে শাস্ত্রজ্ঞ কবিদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চণ্ডীকাব্য অন্নদামঙ্গল ও শিবসংকীৰ্ত্তন রচকগণও উৎসাহ লাভ করিয়াই কাব্য রচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু স্ববিক্রমে যাহা দাঁড়ায়, তাহার তুলনা নাই। বিবাহরি ও চণ্ডীপূজার জায় বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তন ও ভজন অর্থকরী কি সম্মানস্পদ ছিল না।† নিম্ন শ্রেণীর সমাজই নবভাবের প্রশস্ত কার্যক্ষেত্র। যে ভট্টাচার্য্যের দল রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই পূৰ্বপুরুষগণ চৈতন্যপ্রভুর প্রবর্তিত নবধর্মের প্রতিকূলে বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাস জীবনে সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। ঢকানাদে তাঁহার কলঙ্ক প্রচারিত হইয়াছিল এবং তিনি সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন।‡ মহাপ্রভুর অনুচরগণও নানারূপ উৎপীড়ন ও নিন্দা সহ্য করিয়াছিলেন,§ তথাপি

* Baboo Hara Prasad Shastri's pamphlet on old Bengali Literature P.13.

† চৈতন্য প্রভু ত্রিধরকে বলিতেছেন,—“লক্ষীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি। অন্ন বস্ত্র দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি ॥” এবং লাভজনক বিবাহরি ও চণ্ডীপূজা অবলম্বনের উপদেশ দিতেছেন। চৈ, ভা, আদি।

‡ “দুঃখের কথা কৈতে গেলে প্রাণ কাঁদি উঠে।

মুখ কুটে বলতে নারি মরি বুক কেটে ॥

ঢাক পিটিয়ে অপবাদ গ্রামে গ্রামে দেয় হে।

চক্ষে না দেখিয়ে মিছে কলঙ্ক রটায় হে ॥”

বিকুপ্রিয়া পত্রিকা, ১০৬ গৌরান্দোল ১০ই মার্চ।

§ “কেহ বলে এন্তসার হইল কি বাই।

কেহ বলে রায়ে নিত্রা বাইতে না পাই।

কেহ বলে সৌম্যজি রঘিবে এই ডাকে।

এন্তসার সর্বনাশ হৈবে এই পাকে ॥

তাঁহারাই বঙ্গসাহিত্য গঠন করিয়াছেন। সংস্কৃতের দাসত্ব হেতু বঙ্গসাহিত্য মুকুলে শুকাইত, ইহার পৃথক অস্তিত্ব থাকিত না; কিন্তু বৈষ্ণবগণ ইহার ভিত্তি দৃঢ় করিয়া সজীব করিয়াছেন। এপর্যন্ত বঙ্গভাষা শিক্ষাভিমানীর

কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।

পরম ঔদ্ধতাপান কোন ব্যবহার ॥

মনে মনে বলিলে কিপুণ্য নাহি হয়।

বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয় ॥” চৈ, ভা. মধ্যমখণ্ড।

ভট্টাচার্য্যগণ সর্বদাই চৈতন্তপ্রভুকে বিষেষ করিতেন; তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও প্রভুর দ্বাহায়া বুঝিতে পারেন নাই, বলাবন দাস তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন;—

“মুরারি শুণ্ডের দাস যে প্রসাদ পাইল।

দেই নদীয়ার ভট্টাচার্য্য না দেখিল ॥” চৈ, ভা. মধ্যমখণ্ড।

চৈতন্তপ্রভুকে শাস্ত্রের বচন দ্বারা পরাভূত করিবার আশায়, এই মহাত্ম্যগণ তত্ত্বরত্নাকরে কতকগুলি শ্লোক বোঝনা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে আছে, “বটুক ঝৈরব একদা ভগবান গণদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিপুরাসুর হত হইলে, তাহার অস্থর-তেজ নষ্ট হইয়াছিল কি কোন রূপে বিরামান ছিল?”

গণদেব উত্তর করিলেন,—

“ন এষ ত্রিপুরোদৈত্যো নিহতঃ শূল পাণিনা।

রুষয়া পরয়াবিষ্ট আত্মানমকরোদ্রিধা ॥

শিবধর্ম্মশিবনাশায় লোকানাং মোহহেতবে।

হিংসার্থ শিবভক্তানাংমুপাবান নৃজঘহন ॥

অংশেনাদ্যেন গৌরাধ্যঃ শচীগর্ভে বভূব সং।

নিত্যানন্দোষিতীয়েন প্রাচুরাসীন্নহাবলঃ ॥

অশ্বৈতাত্ত্বাংকৃতীয়েন ভাগেন নৃপুজাধিপঃ।

প্রাপ্তে কলিযুগে যোরে বিজহার মহীতলে ॥

ততো হুয়াত্মা ত্রিপুরঃ শরীরৈজ্জিত্তিরাহরৈঃ।

উপলবায় লোকানাং নারীভাবমুদাশিশং ॥”

ইহার সারার্থ এই, “ত্রিপুরাসুর মহাদেবের দ্বারা নিহত হইয়া শিবধর্ম্ম নাশের জন্য গৌরান্দ, নিত্যানন্দ ও অশ্বৈত এই তিনরূপে আবির্ভূত হইলে, পরে নারীভাবে ভজনের উপদেশ দিয়া লোকসমুহকে মোহভাবে বশীভূত করিলেন।” ইহার পর এইরূপ আরও অনেক ইতর-জনোচিত নিন্দাবাদ আছে। বাহা ভাল তাহা পৃথিবী ‘লুকে’ নেয় না। তাহা হইলে এতদিন পৃথিবী স্বর্গ হইত।

উপেক্ষার বস্তু ছিল। কিন্তু যে দিন (১৫০৩ শকে) সংস্কৃতভাষার অসাধারণ পণ্ডিত, অশিতিপরব্রহ্ম কৃষ্ণদাসকবিরাজ বহুবৎসরের চেষ্টায় চৈতন্য-চরিতামৃতের ন্যায় অপূৰ্ণ দর্শনাত্মক ইতিহাস রচনা করেন, সেই দিন বঙ্গভাষার এক যুগ। আবার যে দিন শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর বাঙ্গলা ‘পদ্যমৃতেশমুদ্রের’ সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করেন, বঙ্গভাষার সেই আর এক যুগ। দেবভাষা বঙ্গভাষার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল, ইহা হইতে সেই যুগে এভাষার আর অধিক গৌরবের কথা কি হইতে পারিত ?

২। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ ।

যাহারা টেইন, ডাউডান পড়িয়া বঙ্গভাষার সমালোচনার প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা একটি বিষয় মনে রাখিবেন ; বিলাতী লিপি আর দেশী পদ্যে, জেসিমাইন আর জুইএ একটা প্রভেদ আছে ; ইংরেজীও বাঙ্গালী চরিত্রে সেইরূপ একটা প্রভেদ আছে ; জাতীয়সাহিত্যেও সেই প্রভেদের প্রতি-বিষ পড়িয়াছে ।

ইংরেজী কবি চছার যে গীতি গাহিয়াছেন, পেন্সার তাহা স্পর্শ করেন নাই ; আবার ক্যান্টারবারিটেলস কি ফেয়ারিকুইনের সৌন্দর্য্যের ছায়াপাত প্যারাডাইসলস্টে লক্ষিত হয় না । এইরূপে জনওয়েবটার, ফোর্ড, বেনজনসন, চ্যাটারটন, স্কট, শেলি প্রভৃতি কবিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শে কাব্য রচনা করিয়াছেন ; একজনের চিহ্নিত পথ অপর কবি অনুসরণ করেন নাই, একজনের রাগিণীর সঙ্গে অস্ত্রের রাগিণী জড়িত হইয়া যায় নাই । উদীয়মান স্বাধীন জাতির ব্যক্তি-গত স্বাবলম্বন একটি বিশেষ লক্ষণ ।

কিন্তু বাঙ্গালী কবিগণ পূর্ববর্তী কোন কবির পথ না দেখিয়া প্রায়ই অগ্রসর হইরেন নাই । অনুবাদ-গ্রন্থের আদি লেখক কৃষ্ণিবাস, সঙ্গ্রহ কি মালাধর বস্তু হইতে পারেন, কিন্তু মৌলিক গ্রন্থগুলির তাবতই পূর্ববর্তী কবির চেষ্টার পরে পুনশ্চ সেই চেষ্টার বিকাশ। আদি-কবি বলিয়া কাহাকেও নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করা যায় না ; এক কবির পূর্বে আর এক কবি, তৎপূর্বে অল্প এক জন, এইভাবে একই কাব্যের রচনায় যুগ-ব্যাপী চেষ্টার বিকাশ দেখা যায়। আদি-কবি একজন মানিয়া লইলে ও তিনি কল্পনাবলে গল্পের উৎপত্তি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, সম্ভবতঃ তিনি লোক-পরম্পরা-শ্রুত আখ্যানটি গীতে পরিণত করিয়াছেন। চণ্ডী-

কাব্যের আদি-লেখক কে, আমরা জানি না। চৈতন্য ভাগবতকার মঙ্গলচণ্ডীর গীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন; আমরা বিজ্ঞ জনার্দন নামক কবির অতি প্রাচীন এবং সংক্ষিপ্ত চণ্ডীর উপাখ্যান পাইয়াছি। বোধ হয় এইরূপ কোন মাল মসলা লইয়া মাধবাচার্য্য কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, মাধবাচার্য্যের উদ্যম মুকুন্দরাম পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ববর্তী কবিগণের তপস্তার বলে নিজে অমরবর লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের যশ হরণ করিয়াছেন। কবি কল্পণের পর লালাজয়নারায়ণ আবার সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। আমরা কাণাহরিদত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত ইহাতে আরম্ভ করিয়া একুনে ৩১টি মনসার গীতি-লেখক পাইয়াছি।* কৃষ্ণরাম বিন্যাসুল্লর রচনা করেন, পরে রামপ্রসাদ ও তাঁহার পরে ভারতচন্দ্র সেই উপাখ্যানটি উৎকৃষ্ট কাব্যে পরিণত করেন। ভারতচন্দ্রের পর, পাগল প্রাণারাম তাঁহার দৃঢ় যশের কেল্লা ফতে করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি প্রভিনা গড়িতে পারেন নাই, তেঁক গড়িয়াছিলেন।

দক্ষিণারায়ের উপাখ্যানের প্রথম কবি মধবাচার্য্য, দ্বিতীয় কবি নিমতা-নিবাসী কৃষ্ণরাম। যুগলক্ক রতিদেব দ্বারা বিরচিত হওয়ার পর, পুনশ্চ রঘুরামরায় কবি সেই প্রসঙ্গে কাব্য রচনা করেন। ধর্ম্ম মঙ্গলের কবি ৩ জন। পাওয়া যাইতেছে, খেলারাম, রূপরাম, ঘনরাম। অমুবাদ গ্রন্থ গুলিতে ও এইরূপ কবিগণ শব্দের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়; সঙ্গয়ের পর কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী ও পরে কাশীদাস মহাভারতের অমুবাদ প্রণয়ন করেন। রামায়ণের কবি অসংখ্য, কিন্তু কৃষ্ণিবাসের আদি-গৌরব কেহই বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। গুণরাজ খাঁর পথ অমুসরণ করিয়া মাধবাচার্য্য ও লাউরাকৃষ্ণদাস প্রভৃতি অনেককবিই ভাগবতের অমুবাদ রচনা করেন। এইরূপ সমস্ত কবির নাম উল্লেখ করিতে গেলে বঙ্গীয় প্রায় তাবত প্রাচীন

* ১। কাণাহরিদত্ত, ২। নারায়ণ দেব, ৩। বিজয় গুপ্ত, ৪। রঘুনাথ, ৫। বহুনাথ, ৬। বল-
রাম দাস, ৭। বৈদ্য জগন্নাথ, ৮। বংশীধন, ৯। বংশীদাস, ১০। বল্লভ বোধ, ১১। লল্লর,
১২। গোবিন্দ দাস, ১৩। গোপীচন্দ্র, ১৪। জানকীনাথ, ১৫। দ্বিজবলরাম, ১৬। কেতক দাস,
১৭। কেমালদাস, ১৮। অনুপচন্দ্র, ১৯। রাধা কৃষ্ণ, ২০। হরিদাস, ২১। কমলনয়ন, ২২। সীতাপতি
২৩। দ্বাধিনিধি, ২৪। কবিচন্দ্র পতি, ২৫। গোলকচন্দ্র, ২৬। কবিকর্ণপুর, ২৭। জানকীনাথ,
২৮। বর্দ্ধমান দাস, ২৯। বটীন্দ্র, ৩০। বঙ্গদাস, ৩১। দ্বাধিনিধি।

কবির কথাই বলিতে হয় । পরবর্তী কবি প্রায় সব স্থলেই পূর্ববর্তী কবির রচনার খুঁৎ বাহির করিয়া কাব্য রচনা আরম্ভ করেন । আমরা ‘ভেলুয়া সুল্লরী’ কাব্য ও কৃষ্ণরায়ের ‘রায় মঙ্গলের’ ভূমিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া উদাহরণ দেখাইতেছি ;—

“পুস্তকের কথা এই কম অবগতি ।

বেলশে রচিল এই ভেলুয়ার পুঁথি ।

তয়ীহুত নাম এক ভজমূল আলি ।

আছিল আমার জেন সবাকারে বলি ।

অন্নবুধি শিশু-মতি ছিল শিশুজ্ঞান ।

না ছিল পণ্ডিত গুণী না ছিল বিদ্বান ।

লোকমুখে ভেলুয়ার গীত কথা শুনি ।

রচিল পুস্তক প্রায় সেই সে কাহিণী ।

আপনার শিশুবুধি শক্তি যত ছিল ।

অন্নমাত্র সেইরূপে পুস্তক রচিল ।

না ছিল পুস্তকে সেই পদের মিলন ।

ভাটের কাহিণীরূপে আছিল গাঁথন ।

... ..

একদিন আহি আমি বসি নিজ হান ।

হেনকালে বন্ধুগণ আসি বিদ্যমান ।

কহিল আমাকে সব করিয়া মাগুতা ।

ভেলুয়ার খণ্ডকাব্য রচিবার কথা ।

আদি অন্ত ভেলুয়ার বতক কাহিণী ।

বিরচিয়া কহ মিত্র আমি সব শুনি ।

গীতরূপে গায় সব শুনিতে মুগ্ধ ।

না হয় সংযুক্ত কথা না মিলে অক্ষর ।

আমি যে রচিল খণ্ড অন্ন বাক্য ডার ।

পাটরূপে নাই জাতে সমস্ত প্রচার ।

... ..

অলজ্ঞা তাসব বাক্য ধরি আমি শিরে ।

‘ভেলুয়া’ নামেতে এই রচিল পুস্তক ।”

হামিদুদ্দা প্রণীত “ভেলুয়া সুল্লরী ।”

“ভুনাহ সকল লোক অপূৰ্ণ কখন ।

যেমতে হইল এই কবিতা রচন ।

থানপুর পরগণা নাম মনোহর ।

বড়িতা তথায় একতপ বিদ্বান্বর ।

তথায় গেলাম ভাস্রমাস সৌমবারে ।

নিশিতে শুইলাম গোরালের গোলাঘরে ।

রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন ।

বাঘ পাঠে আরোহণ এক মহাজন ।

করে ধমুশর চাক সেই মহাকায় ।

পরিচয় দিল মোরে দক্ষিণের রায় ।

পাঁচালী প্রবন্ধ কর মঙ্গল আমার ।

আঠারভাগির মধ্যে হইবে প্রচার ।

পূৰ্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য্য ।

না লাগে আমার মনে, তাহে নাহি কার্য্য ।

চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা ।

মমান নাহিক তাহে, মাধু খেলে পাশা ।”

কৃষ্ণরায় প্রণীত ‘রায় মঙ্গল ।’

এই পুঙ্খপ্রাহিতা বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের সূত্র । নূতন পথ খোলার অধিকার আছে, প্রাচীনকবিগণ বোধ হয় একথা স্বীকার করিতেন না । তাই কবিগণ করনার পুঙ্খ রথারোহী হইয়া মেঘ হইতে নূতন নূতন হ্যাতি কি ডোনাগুলিয়া সংগ্রহ করিয়া বেড়ান নাই । ধর্ম্মের বন্ধনীর মধ্যে ঘোঁটাধাড়া করনা অন্ত কোন দিগের পুষ্পপল্লব লক্ষ্যে ধাবিত

হইতে পারে নাই। একথা প্রশংসনীয় হউক, কিন্তু যখন বিদ্যাসুন্দরের মত কাব্যকেও বিবপত্র এবং তুলসীদল দ্বারা শোধান করিয়া লওয়ার চেষ্টা দেখিতে পাই, তখন ধর্মের গণ্ডী অনেকদূর প্রসারিত হইয়াছিল, একথা অবশ্যই মানিতে হইবে।

বাল্মীকি প্রাচীন কাব্যের এখনও ভালরূপ খোঁজ হয় নাই। আমরা গ্রাহাদিগকে আদি কবির যশোমালা দিতেছি, তাঁহারই আদি কি না ঠিক বলা যায় না, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রকৃতস্ববিৎগণ দ্বারা এই প্রাচীন ক্ষেত্রের আবাদ হইলে তাঁহাদের চেষ্টা ও গবেষণার ফলাফলভাগে নূতন কবির কঙ্কাল প্রকাশ পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র হইবে না।

বড় নদীতে যে নিয়ম, ক্ষুদ্র জল-রেখায় ও তাহাই; সৌর-জগতে যে নিয়ম, গ্রহগীর্ষহ অলাবুলতার চক্রে ও সেই নিয়ম দৃষ্ট হয়। কেবল বড় বড় কাব্যগুলিতে নহে, কাব্যের অংশগুলিতে ও সেই অমুকরণ-বৃত্তির পরিচয় লক্ষিত হয়। একটি উৎকৃষ্ট ভাব পাইয়া কবিকে প্রশংসা করার পথ নাই; কোন্ কবি সেই ভাবের আদি প্রণেতা, সে প্রশ্ন সহজে মীমাংসা হইবার নহে। আমরা প্রতি চণ্ডীকাব্যেই ফুলরা ও খুলনার ‘বারমাস্তা’ পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বিজয়শঙ্করের ‘পদ্মপুরাণে’ পদ্মাবতীর ‘বারমাস্তা’ পদকল্পতরুতে বিষ্ণুপ্রিয়ার ‘বারমাস্তা’ (১৭৮৩ পদ), বিদ্যাসুন্দর গুলিতে বিদ্যার ‘বারমাস্তা’, সৈয়দ আলোয়াল কবির পদ্মাবতীতে নাগমতীর ‘বারমাস্তা’ এইরূপ রাশি রাশি ‘বারমাস্তার’ সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ঘাটে পথে-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। যেখানে একটি সুন্দর ভাব পাওয়া যাইতেছে, তাহা উপর্যুপরি কবিগণের চেষ্টায় তত্ত্বসার হইয়াছে। বিদ্যাপতির,—“না পুড়িও মোর অঙ্গ না ভাসাও জলে। মরিলে রাখিও বাঁধি তমালের ডালে। কবহঁ সো পিয়া যদি আসে বুলাবনে। গরাণ পায়ব হাম পিয়া পরশনে।” এই কবিতার ভাবটি রাধামোহন ঠাকুর,—“এ সখি, কর তহঁ পর উপকার। ইহ বুলাবনে দেহ উপেক্ষব, মৃত তনু রাখি হামার। কবহঁ স্তায় তনু গরিমল পাওব, তবহঁ মনোরথ পুর।” (পদ কল্পতরু ৪৩ পদ।) যতুনন্দন দাস,—“উত্তর কালে এক করিহ সহায়। এই বুলাবনে বেন মোর তনু রয়। তমালের কাঁধে মোর ভুল লতা দিয়া। নিশ্চয় করিয়া তুমি রাখিহ বাঁধিয়া। কৃক কড় দেখিলেই পুরিবেক আপ। (পদকল্পতরু ১৮৩ পদ), নরহরি (ঘনশ্রাম),—“করিহ উত্তরকালে জিয়া। রাখিহ তমালে তনু যতনে বাঁধিয়া। লেহ এ ললিতা মণিহার। অপুখন রলায় পরিহ আপনায়।

রূপিত মল্লিকা নিজ করে । গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইব তারে । তোমরা কুশলে সব য়েয়ো । এই যবে বান্ধেক আলিতে তারে কৈয়ো । নরহরি কৈয়ো এই কাম । যে সময়ে কাণে শুনাইও তার নাম ॥” (সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় ভাগ, ৪ষ্ঠ সংখ্যা, ১২২২ ।) ও কৃত্তকমল,—

“দেহ দান ক'র না দহন দাছে । ভাসাও না। তাহা যমুনা প্রবাহে ।” (স্বপ্নবিলাস ।)

ইত্যাদি পদে নকল করিয়াছেন । জয়দেবের,—“হৃদি বিসলতা হারো নাঃ তুজদয় নামকঃ ।” ইত্যাদি শ্লোক হইতে বিদ্যাপতি,—“হাম নহ শব্দর হঁ বরনারী ।”

ও রামবল্লভ “হর নই হে আমি যুবতী । কেনে আলাতে এলে রতিপতি ॥ করো না আমার হুর্গতি । বিচ্ছেদে লাগণা, হরেছে বিবর্ণ । ধরেছি শব্বরের আকৃতি ॥ ক্ষীণ দেখে অঙ্গ,

অঙ্গ অনঙ্গ, একি রঙ্গ হে তোষার । হর ভ্রমে শরাঘাত কেন করিতেছ বার বার । ছিন্ন ভিক্ষু বেশ, দেখে কণ্ঠ মহেশ, চেননা পুরুষ প্রকৃতি । কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখে পরেছি নীল রতন ।

অরণ্য লোচন করে পতি বিরহে রোদন । এ অঙ্গ আমার, ধূলার, ধূসর । মাখি নাই বিভূতি ।” (বিদ্যাপতি, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভট্টের সংস্করণ, ১৫৫—১৫৬ পৃঃ ।) গানের ভাব চুরি

করিয়াছেন । অপর একটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে কবি-শেখর, “নিজ কর পরব দেহ না পরশই শব্দই শব্দী ভানে । মুকুরতলে নিজ মুখ হেরি হুম্মরী শশি বলি হেরই রগনে ॥ (পদকল্পতরু ১৮৭১ পদ) চুরি করিয়াছেন ; চোরের উপর বাটপার

কৃত্তকমল উহা হইতে “পারী হেরি নিজ করে, নখর নিকরে, ভেবে শশী করে আবরণ করে” (দ্বিবেদ্যাদি) ইত্যাদি গানটি প্রস্তুত করিয়াছেন । ইহা ইংরেজীর Parallel

passage অর্থাৎ সমভাব-রচনা নহে, ইহা সাহিত্যের ঘরে দিনে ছপরে ডাকাতি ।

আমরা এই প্রবন্ধাংশে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি ; কতগুলি ধর্ম প্রসঙ্গের সীমা-বন্ধনীতে বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল । যে পর্য্যন্ত কোন

এক ধান্য কাব্যের সম্পূর্ণ বিকাশ না হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণ ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া তাহা প্রস্ফুট করিয়াছেন । সম্পূর্ণ কাব্য এবং

কাব্যাস্তগত বিচ্ছিন্ন ভাবরাশি উভয়ই এইরূপ ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইয়াছে । কিন্তু বিকাশই সর্বত্র প্রকৃতির নিয়ম নহে । উদ্যানের কতকগুলি ফুল কোটে,

আবার কোন কোনটি কোরকেই শুষ্ক হয় । সেইরূপ কবিকল্প চণ্ডী, কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান, ঘনরামের স্ত্রীধর্মমঙ্গল প্রভৃতি

সম্পূর্ণ কাব্যগুলির পার্শ্বে সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শগির পাঁচালী, ধান্যপূর্ণিমা ব্রত-গীতি প্রভৃতি অসংখ্য খণ্ডকাব্য দৃষ্ট হয়, সে গুলিতে উদগম আছে, বিকাশ নাই ।

আরো পাঁচ স্বর্ণের পার্শ্বে, ঐষৎ স্বর্ণে পরিণত লোষ্ট্রখণ্ড যেকূপ দেখায় চণ্ডী কাব্য, পদ্মপুরাণ প্রভৃতির পার্শ্বে এইগুলি সেইরূপ দেখায় ।

কাব্যগুলির সম্পর্কে এই অনুকরণবৃত্তি নিম্ননীয় কি প্রশংসনীয় ঠিক বলিতে পারি না। তবে বোধ হয় ক্রমে ক্রমে গঠিত প্রাচীন বঙ্গীয় প্রত্যেক কাব্যেই নিপুণতা ও অভিনিবেশযুক্ত সৌন্দর্য্য অধিক লক্ষিত হয়। দোষ এই, এই সব কাব্যে স্বাধীনতার বায়ু বহে নাই, কল্পনার উন্মাদকর স্বপ্ন ও তপ্তমদরির আবেশ নাই। কাব্যগুলির পুরুষ চরিত্র প্রায় তাবতই সমাজের কঠিন নিয়মের বশবর্তী, বিপদের সময় স্বীয় চেষ্টা ব্যবহারে অনিচ্ছুক—অলৌকিক দৈব শক্তির উপর অনুচিত বিশ্বাস পরায়ণ। যে জাতির শাসনে দাসত্ব, চিন্তায় দাসত্ব, সমাজে দাসত্ব, তাহাদের সাহিত্যে অন্তরূপ হইবে কেন? আমরা যাহা, তাহা ভুলিব কিরূপে? স্বপ্রকৃতি তাহা হইতে মুছিয়া ফেলিব কিরূপে?

কিন্তু সদ্য প্রক্ষুটিত পুষ্পবাসের শ্রায় বৈষ্ণবীয় গীতি-রাশি, একটি স্বাধীন মুগ্ধকর-ভাব-জাত। সেই ভাবের নাম প্রেম। ‘লছোদর’, ‘নাভী সুগভীর’, ও ‘আজামুলম্বিতবাহ’র শ্রায় রাশি রাশি সংস্কৃতির আবর্জনা বঙ্গসাহিত্যে কলুষিত করিয়াছিল। সদ্যজাতি এই ভাবটি অপ্রকৃত উপমা রাশির স্থলে “শীতের ওড়নীপিয়া, গিবিখীর বা। বরবার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না (বিদ্যাপতি)” প্রভৃতি প্রকৃত কথা জাগাইয়া দিল। জয়দেব শ্রীহরিকে দিয়া যে দিন “দেহিপদ পন্নব মুদার” গাওয়াইয়াছিলেন, সেদিন সন্ন্যাস-সংস্কারে প্রাণ-হারী যন্ত্র প্রায় মানুষ দাঁতে জিভ কাটিয়া একটি দৈবঘটনা দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিল; কিন্তু জ্ঞানদাস যে দিন “নিই যার চাঁদ বদন শ্রাম অঙ্গে দিয়া পা” (পদকল্পতরু ১১০০ পদ) ও কৃষ্ণকমল “অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি, আলতা পরাত বধু কতই বাখানি” (দিব্যোদ্ভাস) রচনা করিয়া-ছিলেন সেদিন আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। জাতীয়-জীবনে প্রেম ফিরিয়া আসিয়াছিল; তাই বলিতেছিলাম, এই অধীনত্ব-গন্ধী প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণবীয় পদে স্বাধীনতার বায়ু খেলা করিতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

গৌড়ীয় যুগ ।

অথবা

খ্রীষ্টাব্দ-পূর্ব সাহিত্য ।

- ১। ‘পঞ্চগৌড়’ ।
- ২। অনুবাদ-শাখা ।
- ৩। লৌকিক ধর্ম-শাখা ।
- ৪। পদাবলী-শাখা ।
- ৫। কাব্যোতিহাসের সূত্রপাত-শাখা ।

মুসলমান-বিজয়ের কয়েক শতাব্দী পূর্বে ও পরে বিদ্যাপর্যন্তের উত্তর-বর্তী ও প্রাক্‌জ্যোতিষপুরের পশ্চিম-স্থিত বৃহৎ ভূভাগ সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা, ও উৎকল এই পঞ্চভাগে বিভক্ত ছিল; এই পঞ্চ বিভাগের সাধারণ নাম ছিল, ‘পঞ্চগৌড়’ । এই নাম গৌড়দেশেরই প্রভাব-ব্যঞ্জক, বস্তুতঃ গৌড়দেশ অতি প্রাচীন রাজ্য।* পূর্বোক্ত পঞ্চরাজ্য ভিন্ন ভিন্ন রাজাদিগের শাসনাধীন ছিল, কিন্তু সমধিক পরাক্রান্ত রাজা, সেক্সনদিগের ‘বটওয়াল্ডার’ জায় গর্ক-পূর্ণ ‘পঞ্চগৌড়েশ্বর’ উপাধি গ্রহণ করিতেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউনসাঙ শিলাদিত্য মহারাজকে এই ‘পঞ্চ গৌড়েশ্বর’ উপাধি বিশিষ্ট দর্শন করিয়া যান।† গৌড়দেশীয় রাজাগণ অনেকবার এই গর্কিত উপাধিলাভ করিয়াছিলেন; খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে

* গৌড়ের রাজধানী ৭৩০ খৃঃ পূঃ অব্দে স্থাপিত হয়। ইহাকেই বোধ হয় টলমি ‘গঙ্গারিজিরা’ সংজ্ঞায় বাচ্য করিয়াছেন। উক্ত সময়ে এই দেশ করতোয়া ও গঙ্গা দ্বারা বিভক্ত হইয়া পশ্চিমাংশ গৌড় ও পূর্বাংশ বঙ্গদেশ বলিয়া খ্যাত ছিল। এক রাজার শাসনাধীন থাকা হেতু এই দুই অংশ কালে ‘গৌড়দেশ’ এই সাধারণ নামে অভিহিত হইত। বোণল রাজাদিগের সময় গৌড় ও বঙ্গদেশ ‘বাল্লাল’ নাম গ্রহণ করে। See—Major Ronnel’s Map of Hindoostan.

† বিল (Beal) সাহেব-কৃত হিউন সাঙএর ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদে ‘পঞ্চগৌড়েশ্বর’ নামের স্থলে “Lord of the Five Indies” লিখিত হয়।

কিরণস্বর্ণের রাজা শর্শাঙ্কগুপ্ত কান্যকুব্জাধিপতি রাজ্যবর্ধনকে যুদ্ধে জয় করিয়া নিহত করেন। বৌদ্ধরাজ্যদিগের মধ্যে গোপাল, দেবপাল ও জয়পাল সমস্ত আর্য্যাবর্ত জয় করেন। ইহারা এতদূর কক্ষাতাশালী ছিলেন যে পঞ্জীকায় কলি-যুগের রাজচক্রবর্তীদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের নাম ও উল্লিখিত দেখা যায়। বলা বাহুল্য ইহারাই “পঞ্চ গৌড়েশ্বর” উপাধির প্রকৃতরূপে বাচ্য ছিলেন। এই গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহই বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রথম কারণ। বঙ্গভাষার প্রাচীন গীতি-সমূহে “পঞ্চ গৌড়েশ্বর” সংজ্ঞা অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু বোধ হয় কালক্রমে কবি ও স্মৃতি-জীবনগণের দ্বারা এই উপাধির অর্থচ্যুতি ঘটিয়াছিল।

আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীনকালে বৌদ্ধরাজস্বর্ণের স্মৃতিই বঙ্গীর কাব্যের বিষয় ছিল। যোগীপাল, গোপীপাল ও মহীপালের গীতি শুনিতে লোক-বৃন্দ আনন্দিত হইত।* পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে দ্রাগিকচাঁদের গানের বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী রচনাগুলিতে ও গৌড়েশ্বরগণের মহিমার অঙ্গুলী স্পর্শিত আছে। কুন্তিবাস গৌড়েশ্বরের আজ্ঞাক্রমেই রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্মৃতরাং তিনি গর্বেই লিখিত বলিয়াছেন,—“পঞ্চগৌড় চাপিয়া যে গৌড়েশ্বর রাজা। গৌড়েশ্বর পূজা কৈল, গুণের হয় পূজা।” শ্রীকৃষ্ণবিজয়লেখক ও গৌড়েশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়া গুণরাজ্য খাঁ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, “মিথুণ অধম মুক্তি, নাহি কোম গ্রাম। গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥” গৌড়েশ্বর নসরতখান মহাভারতের অনুবাদ করাইয়া-ছিলেন,—“শ্রীযুত নাথক সে যে নসরত খান। রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান॥” (কবীন্দ্র, বে, গ, পৃ. ৮৮ পত্র।) এই দৃষ্টান্তে পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ, সেনাপতিদ্বয়, দ্বিতীয়বার মহাভারতের অনুবাদ সংকলন করিতে দুইজন প্রতিভাবান কবিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই দুই কবি ও পঞ্চগৌড়ের গৌরব বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন, আমরা বারংবার তাঁহাদের রচনায় পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ দেখিতে পাই,—“নৃপতি হসেন সাঁহ হয় মহামতি। পঞ্চগৌড়ে যার পরম সুখাতি॥” (কবীন্দ্র, বে, গ, পৃ. ১৫ পত্র।) “লস্কর পরাগল গুণের সাগর। অবতার, করতল, রূপে বিদ্যায় ॥ শিবপুত্র তাহার বিখ্যাত ছুটিখান। পঞ্চম গৌড়েতে যার

* যোগীপাল, গোপীপাল, মহীপাল গীত।

ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত। চৈ, তা, অঙ্ক ৩৩।

নামের বাধান ॥ (কবীন্দ্র, বে, প, ২৭৭ পত্র ১১)। এতদ্ব্যতীত বিদ্যাপতির “চিরঞ্জীব
 রহ” পঞ্চ গোড়েশ্বর, কবি বিরাপতি ভণে।” বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে পঞ্চগোড়েশ্বর
 হলেন সাহকে “সনাতন”, “নৃপতি-তিলক” প্রভৃতি গরীমত উপাধি দ্বারা
 স্তুতি ও মাধবাচার্যের চণ্ডীকাব্যে “পঞ্চগোড় নামে দেশ পৃথিবীর সার।
 একাক্ষর নামে রাজা অর্জুন অবতার ॥” (মাধবাচার্যের চণ্ডী, চট্টগ্রামের সংস্করণ ৮ পৃঃ।)
 প্রভৃতি পদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। পূর্বঅধ্যায়ে উল্লেখ
 করিয়াছি, প্রাচীনকালে বঙ্গের ধর্মী ব্যক্তিগণ বঙ্গভাষার আদর করি-
 তেন। তাহার মূল কারণ বোধ হয়, গোড়েশ্বরগণের সন্দৃষ্টান্ত। আমরা
 জগদানন্দের সঙ্গে কবি যষ্টিবরের*, রঘুনাথদেবের সঙ্গে মুকুন্দরামের
 বশোমন্ত সিংহের সঙ্গে শিব-সংকীর্তন-লেখক রামেশ্বরের†, বিশারদের
 সঙ্গে অনন্তরামের‡, কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের, মাগন-
 ঠাকুরের সঙ্গে কবি আলাওলেরগ ও রাজা জয়চন্দ্রের সঙ্গে ভবানী দাসের§
 নাম একত্র পাইয়াছি। রাজমালায় দৃষ্ট হয়, ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ
 (২২) ধর্মমাণিক্য মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন। গজদন্ত স্তূর্ণ
 জড়িত হইলে যে শোভা হয়, ধন ও জ্ঞান মর্যাদার এই যোগ তাহা
 অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইরাছে।

আমরা আশা করি, পাঠকগণ এখন বুঝিতে পারিলেন, আমরা কেন
 এই অধ্যায় ‘গোড়ীয়যুগ’ সংজ্ঞায় অভিহিত করিলাম। গোড়েশ্বরগণের
 উৎসাহে যে ভাষার সুখবন্ধ হইয়াছিল, তাহা ‘গোড়ীয় সাধু ভাষা’ আখ্যায়
 পরিচিত হইরাছিল।

* “অমৃত লহরী ছন্দ, পুণা ভারতের বন্ধ, কৃষ্ণর চরিত্র শেষ পর্কে। শ্রীযুত জগদানন্দে,
 অর্হর্নিশ হরিবন্দে, কবি যষ্টিবর কহে সর্কে ॥” সঙ্গর বে, প, পৃ ৭৮৯ পত্র ১।

† “বশোমন্ত, সবঙ্গবন্ত, তন্ত পোষা রামেশ্বর, ভদ্রাঙ্গের করি যর, বিয়টিল
 শিব-সংকীর্তন।” রামেশ্বরের শিবসংকীর্তন।

‡ “বিশারদ পদে সেই রেণু অতিপ্রায়। পবনকে রচিলেক প্রথম অধ্যায় ॥” অনন্ত-
 রামকৃত, ত্রিরাবোণ সার, হস্তলিখিত পুঁথি।

§ বিরহ মন্ত মাতঙ্গ, বহল বাহিনী সঙ্গ, হরি দরশনে, অঙ্গ পরশনে, সসৈন্ত হইল ভঙ্গ।
 অতি রসিক স্তম্ভন, রূপ জিনি পঞ্চবাণ, শ্রীযুত মাগন, আরতি কারণ, হীন আলাঙলে ভণে।
 পদ্মাবতী ২০৪ পৃঃ।

§ “কহেন ভবানীদাস, শ্রীরামের পদে আশ, জয়চন্দ্র রাজার বচনে।” লক্ষণ দ্বিবিজয়।
 রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্করণ (২৮৫ নং আগার চিংপুর রোড) ১২২ পৃঃ।

২। অনুবাদ-শাখা—(ক) কৃতিবাস ।

ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করিতে প্রথমতঃ অনুবাদ গ্রহণেরই আবশ্যক । গোড়েশ্বরগণের উৎসাহে বঙ্গভাষার আদিকালে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত গ্রন্থের অনুবাদ রচিত হইয়াছিল । কৃতিবাস অশিক্ষিত ছিলেন, তিনি স্বভাব-কবি বা হটাৎ-কবি, কথকদিগের মুখে গান শুনিয়া সহসা কবিত্বের ক্ষুরণে, কবি-বশ-স্পৃহার শির-কণ্ঠ্যনে রামায়ণ ভাষার বিরচিত করেন ; তিনি ৩০০ বৎসরের কবি ; এইরূপ অনেক কথাই তাঁহার সম্পর্কে সাহিত্য-সংসারে রাষ্ট্র হইয়াছে । সুবিজ্ঞ ৬ রামগতি জায়রাম মহাশয় ‘কৃতিবাস ওঝাকে’ ব্রাহ্মণ প্রমাণ করিতেই গলদ্বন্দ্ব্য হইয়া পড়িয়াছিলেন ।* বঙ্গবাসীর সম্পাদক মহাশয় দেখাইয়াছেন, কৃতিবাস ৫৫০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন । আমরা ও জন্মভূমিতে এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া জীযুক্ত বাবু অশোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রমাত্মক মত খণ্ডন করিয়াছিলাম ।† কৃতিবাস ৫০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ উচ্চকালে বর্তমান ছিলেন, একথা আমরা এখন একরূপ স্থিরভাবে বিশ্বাস করি । এখন এবিষয়ে অল্প কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া ১৪২৩ শকের হস্ত-লিখিত বহি হইতে আমরা কৃতিবাসের স্বকৃত-আত্ম-বিবরণ দিতেছি । ইহার রচনা ও ভাব এমনই সুন্দর, স্বভাবের প্রতিবিম্বের জ্বায় ; ইহা যিনি একবার পড়িবেন, তাঁহাকেই বিশ্বাস করিতে হইবে, এটি একখণ্ড খাটি ঐতিহাসিক স্বর্ণ ; ইহাতে ঐতিহাসিক ঐন্দ্রজালিকের জালিয়াতি নাই ।

পূর্বেতে আছিল বেদাম্বুজঃ মহারাজ ।

তাঁহার পাত্র আছিল নায়সিংহ ওঝা ॥৭

দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার ।

বঙ্গভাগে ॥ ভূঞা তিহ সুখের সংসার ॥

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ৭৬ পৃঃ ।

† জন্মভূমি, ১৩০১ সন ভাদ্র—‘কৃতিবাস’ প্রবন্ধ দেখ ।

‡ ইনি সম্ভবতঃ সুবর্ণ গ্রামের নম্বল রায় । ইনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিতেছিলেন ।

৭ নৃসিংহ ওঝা আমিত হইতে অধস্তন ৪র্থ পুরুষ । ইহার পরবর্তী যে সমস্ত রাস পাণ্ডুর বান, তাহা কুলজী গ্রন্থের সঙ্গে সকলই একা হইয়া বাইতেছে ।

॥ পূর্ববন্ধ ।

বঙ্গদেশে এমাদ* হৈল সকলে অধির ।
 বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর ॥
 হুখতোগ ইচ্ছার বিহরে গঙ্গাকূলে ।
 বসতি করিতে স্থান খুজিখুজে বুলে ॥
 পদ্মাতীরে পাড়াইরা চতুর্দিকে চায় ।
 রাত্রিকাল হইল ওঝা শুভিল তথায় ॥
 পুহাইতে আছে বধন দৈত্যক রজনী ।
 আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি ॥
 কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায় ।
 হেনকালে আকাশ-বাণী শুনিবারে পায় ॥
 মালীজাতি ছিল পূর্বে মালক এধানা ।
 কুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার যোবনা ॥
 গ্রাম রত্ন কুলিয়া জগতে বাখানি ।
 দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী ॥
 কুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি ।
 ধন ধান্দে পুত্র গোত্রো বাড়য় সমৃদ্ধি ॥
 গর্তেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয় ।
 মুরারি, সূর্য্য, গোবিন্দ, তাহার তনয় ॥
 জানেতে কুলোতে ছিল মুরারি কুচিত ।
 সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম বে ভৈরব ।
 রাজার সত্য তার অধিক গৌরব ॥
 মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি ।
 বর্ষচর্চায় রত মহাস্তম যে মানী ॥
 নদ-রহিত ওঝা স্থলর মুরতি ।
 মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রোপবগতি ॥
 স্থলীল ভগবান ভণি বনমালী ।
 প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলোতে গাঙ্গুলী ॥

কুলে শীলে ঠাকুরালে প্রোঙ্গাতি প্রসাদে ।
 মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে ॥
 মাতার পতিব্রতায় যশ জগতে বাখানি ।
 হয় সহোদর হৈল এক যে ভগিণী ॥
 সংসারে মানন্দ সতত কুস্তিবাশ ।
 ভাই ব্রহ্মজ্ঞয় করে বড় উপবাস ॥
 সহোদর শাস্তি মাধব সর্বলোকে ঘৃণি ।
 শ্রীকর ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥
 বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর ।
 আর এক বহিন হৈল সতাই উন্নয় ॥
 মালিনী নামেতে মাতা, বাপ বনমালী ।
 হয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥
 আপনার জন্ম কথা কহিব যে পাছে ।
 মুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে ॥
 সূর্য্য পতিভের পুত্র হৈলা নাম বিভাকর ।
 সর্বত্র জিনিয়া পতিত বাপের সোদর ॥
 সূর্য্য পুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল ।
 সহস্র সংখ্যক লোক ষারেতে বাহার ॥
 রাজা গোড়েশ্বর দিল প্রসাদী একখোড়া ।
 পাত্র মিহ্র সকলে দিলেন থাণা জোড়া ॥
 গোবিন্দ, জয়, আদিত্য, ঠাকুর বসুন্ধর ।
 বিদ্যাপতি রত্ন ওঝা তাঁহার কোন্ডর ॥
 ভৈরব হত গজপতি বড় ঠাকুরাল ।
 বারানসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি যোবারে বাহার ॥
 মুখটি বংশের পদ্য শাস্ত্রে অবতার ।
 ব্রাহ্মণ সঙ্কলনে শিখে বাহার আচার ॥
 কুলে, শীলে, ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে ।
 মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে ॥

* সম্ভবতঃ চৌগরল বীর বিদ্রোহ-জনিত বিষয় । কথিত রায় এই সময় বিদ্রোহীরা সঙ্গে
 যোগ না দিয়া সত্ৰাটের পক্ষে দৃঢ় ছিলেন, এজন্য বিদ্রোহীরা তাঁহার রাজ্যে নানাতরফে
 উপদ্রব করিয়াছিল ।

আমিত্যবার শ্রীপক্ষ্মী পূর্ণ মাঘমাস।
 তখিমধ্যে অন্য লইলেন কুজিবাস ॥
 শুভক্ষণে বর্ড হৈতে পড়িমু ভূতলে।
 উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈল কোলে।
 দক্ষিণ দ্বাইতে পিতামহের উল্লাস।
 কুজিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ ॥
 এগার নিবড়ে* যখন বারতে প্রবেশ।
 হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥
 বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
 পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার।†
 তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
 যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার ॥
 সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
 নান। ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে ক্ষুরে ॥
 বিদ্যা সাক্ষ করিতে প্রথমে হৈল মন।
 গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥
 ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বান্দ্রীক চাবন।
 হেন গুরুর ঠাক্রি আমার বিদ্যা সমাপন ॥
 ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উদ্ভাকার।‡
 হেন গুরুর ঠাক্রি আমার বিদ্যার উদ্ধার ॥
 গুরু স্থানে মেলানিগ লইলাম মঙ্গলবার
 দিবসে।
 গুরু প্রাশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥

রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
 পক স্নোক তেটিলাম গু রাজা গৌড়েঘরে **।
 দ্বারী হস্তে স্নোক দিরা রাজাকে জানালাম।
 রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম ॥
 সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
 শিয়র দ্বাই আইল দ্বারী হাতে হুর্ণ লাঠি ॥
 কাম নাম কুলিয়ার মুখটি কুজিবাস।
 রাজার আদেশ হৈল করহ সজ্জাব ॥
 নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
 সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনপরে ॥
 রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
 তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ হুন্দ ॥
 বামেতে কেদার ধী ডাহিনে দারায়ণ।
 পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন ॥
 গজবর্ষ রায় বসে আছে গজবর্ষ অবতার ॥
 রাজ সভা পুজিত ঠিহ গৌরব অপার ॥
 তিন পাত্র পাড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
 পাত্র মিত্র লয়ে রাজা কয়ে পরিহাসে ॥
 ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরঙ্গী।
 হুন্দের শ্রীবংশ আদি ধর্মাবিকারিণী ॥
 মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান হুন্দর।
 জগদানন্দ রায় মহা পাত্রের কোঙর ॥
 রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
 দেখিয়া আশ্চর্য চিত্তে লাগে চমৎকার ॥

* নিবড়ে.—অতীত হইলে।

† বড় গঙ্গা বনোহরে: “ পূর্ব সীমা ধূল্যাপুর বড় গঙ্গাপার ” অনন্না মঙ্গল।

‡ উদ্ভাকার—তেজস্বী।

গ মেলানি—বিদ্যায়।

ঙ ভেট (উপহার) দিলাম, পাঠাইলাম।

** এই গৌড়েঘর সম্ভবতঃ কংসনারায়ণ (রাজা গণেশ)। নৃসিংহ ওঝা হুজুর রায়ের সময় বর্তমান ছিলেন (১২৭৭ খৃঃ হইতে ১২৮২ খৃঃ কি এইরূপ কোন সময়)। কুজিবাস নৃসিংহ ওঝা হইতে অধস্তন ৫ম পুরুষ। উক্ত বর্ণনায় বৈষ্ণব হিন্দু ভাবাপন্ন রাজ সভার বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে গৌড়েঘর হিন্দু ছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ হয় না,—সমস্ত সভাসবই

পাত্রেতে বেঁটত রাজা আছে বড় হুখে ।
 অনেক লোক দাড়াইয়া রাজার সম্মুখে ॥
 চারিদিক দাড়াইয়া সর্বলোক হাসে ।
 চারিদিকে ধাওয়াই রাজার আত্মসে ॥*
 আদিনাম পড়িরাছে রাজা মাছুরি ।
 তার উপর পড়িরাছে সেতের পাছড়ি ॥
 পাটের চানোরা শোভে মাখায় উপর ।
 মাখমাসে খরা† পোছায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥
 লড়াইয়ু গিয়া আমি রাজ বিদ্যামানে ।
 মিকটে বাইতে রাজা দিল হাত সানো‡ ॥
 রাজ আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উঠেঃখরে ।
 রাজার সম্মুখে আমি পেলাম সত্বরে ॥
 রাজার ঠাঁই পাড়াইলাম হাত চারি অন্তরে ।
 সাত মোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে ॥
 পঞ্চদশ অধিষ্ঠান আমার শরীরে ।
 সরস্বতী প্রদানে মোক বুধ হৈতে বহুরে ॥

বানী হলে মোক আমি পড়িহু সভায় ।
 মোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ॥
 বানী মতে বানী মোক পড়িলাম রসাল ।
 খুঁষি হৈয়া মহারাজ দিল পুষ্প দাল ॥
 কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া ।
 রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ॥¶
 রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান ।
 পাত্র মিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান ॥
 পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা ।
 গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ॥
 পাত্র মিত্র সব বলে শুন বিজ্ঞরাজে ।
 বাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে ॥
 কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার ।
 যথা বাই তথায় গৌরব মাত্র সার ॥
 যত যত মহাপণ্ডিত আছেয়ে সংসারে ।
 আমার কবিতা কেহ নিম্নিতে না পারে ॥

হিন্দু, তৎপর,—“চন্দনেরছড়া”—ও “পাটের-পাছড়া” (পটবস্ত্র) প্রভৃতি কথাও হিন্দুভাষায় মরণ করাইয়া দেয় । গৌড়েশ্বর কংসনারায়ণ ভিন্ন এসময়ে অন্য কেহ হিন্দু ছিলেন না ; ১২৭৭ খৃঃ হইতে কংস নারায়ণের সময় (১৩৮৫-১৩৯২) একশত বৎসরের কিছু উপরে । ১২৭৭ খৃঃ অব্দ নৃসিংহের জন্মকাল নহে । সুতরাং নৃসিংহ ওয়ার জন্মকাল হইতে, কংস-নারায়ণ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫০ বৎসর পাওয়া যাইতেছে । সেজন্য বৎসরে পাঁচ পুরুষ গণতি করা নিম্নমাত্রাব্যাপী বটে । কুন্তিবাস কংসনারায়ণের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এইমত আমরা প্রচার করিতে পারি । সে আজ ৫০০ বৎসরের কিছু উপরে । তাহা হইলে কুন্তিবাস ১৩৬৫ কি ১৩৬৬ খ্রিষ্টাব্দে কোন খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসে ত্রীপঞ্চমীর দিন রবিবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

* আভাস—গৃহ, অনেক স্থলেই এই অর্থে ব্যবহৃত হইত, যথা,—“তার মধ্যে বেধ পদ্মাবতীর আভাস । সমীর সকার নাহি পক্ষীর প্রকাশ ॥” আলোয়াল-কৃত পদ্মাবতী ।

† খরা,—রোহা যথা,—খরা,—“জোটে খরা, আবাতে ধরা, শক্তির ভার না সহে ধরা ।”

‡ সানো,—সঙ্কত, ‘স্বখাসব দেখাইয়া অঙ্গুলীর সানো’, রাজেন্দ্রবাসের শকুন্তলা ।

¶ পাটের পাছড়া, পটবস্ত্র । ‘পাটের পাছড়া’ শব্দ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়,—“বিনে কাশি নাহি পিলে পাটের পাছড়া ।” মৃ, চ, গা, ১০ মোক ।

“পাটের পাছড়া পুটে বন উড়ে যায় ।

যড়ার আচল লুট গাঞি পড়ি যায় ॥” শ্রীকৃষ্ণবিজয় ।

সঙ্কট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোষ ।
 রামায়ণ রচিতে করিলা অমুরোধ ॥
 প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সহরে ।
 অপূৰ্ণ জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ॥
 চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত ।
 সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥
 মুনি মধ্যে বাখানি বাখ্যকি মহামুনি ।

পণ্ডিতের মনো কুন্তিবাস শুণী ॥
 বাশ মায়ের আশীর্বাদে, শত্রু অজ্ঞা দার ।
 রাজাজ্ঞায় রচণীত সপ্তকাণ্ড গাম ॥
 সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত ।
 লোক বুঝাবার তরে কুন্তিবাস পণ্ডিত ॥
 রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে ।
 কুন্তিবাস রচি গীত সরস্বতীর বরে ॥

সেই সময়ের কবির বিদ্যামর্যাদার চিত্র কেমন সরল ও জীবন্ত ! উহাতে সত্য-জাত যুথি জাতির সৌরভ আছে। গুণান্বাদী গোড়েরখরের উৎসাহে কবির গর্জিত মস্তক নক্ষত্র-লোক স্পর্শ করিয়াছিল। যে দিন রামায়ণ রচনার তার কবি হস্তে লইলেন, সেই দিন বঙ্গভাষার শুভ দিন, তাঁহার নিজের শুভদিন; সে দিন তাঁহার শরীরে দিবা লাবস্তের জ্যোতিঃ বাহির হইয়াছিল, তাই লোকবৃন্দ ‘চন্দন চর্চিত’ প্রতিভাপূর্ণ ‘ফুলিয়ার পণ্ডিতকে’ দেখিয়া ‘অপূৰ্ণ জ্ঞানে’ ধন্য ধন্য বলিয়াছিল। এই বর্ণনাটি সরল ভাষায় অঙ্কিত প্রফুল্লতার এক থানি ছবি বিশেষ !

কিন্তু যে রচনা আমরা কুন্তিবাসী রচনা বলিয়া পাঠ করি, তাহাতে কুন্তিবাস কতদূর বিদ্যমান, ইহা একটি যুগের সমস্যা ; পরিষদ ইহার কিরূপ মীমাংসা করিতে পারিবেন, বলিতে পারি না ; কিন্তু আমার নিকট কুন্তিবাস নামধের কবি বর্তমান ছিলেন, একথা যে রূপ সত্য বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার রচনার সম্পূর্ণ উদ্ধার করা অসম্ভব, এই কথা ও তেমনি আর একটি সত্য বলিয়া বোধ হয়। কুন্তিবাস শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি রামায়ণ অমুরোধ করিতে ঘাইয়া বাখ্যকির গুণি কেন অতিক্রম করিবেন, এ কথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী, প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত ‘কুন্তিবাসী রামায়ণ’ পাইতেছি তাহাতে বীরবাহ, তরণীসেন, প্রভৃতির যুদ্ধ, রাক্ষসগণ কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব, ও শ্রীরামের চণ্ডী-পূজা, এই সমস্ত মূলগ্রন্থবহির্ভূত বিষয় দৃষ্ট হয় না। সে গুলি কতকাংশে বাখ্যকির প্রতিভা-বজ্র-বিদ্ধ পথে বঙ্গীয় কবির সূত্র নিঃসরণ বলা বাইতে পারে। তবে কোন গুলি খাঁটি, ও দেশের না এ দেশের ? কুন্তিবাসী রামায়ণ যে, পূর্বে বঙ্গ পৌছিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বটভলার রামায়ণের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত পুথির ভাব ও ভাষা অনেক স্থলে ছেদে ছেদে এক

হইতেছে ; আমরা ‘ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে হটকট’ শীমকরি রঘুনাথ গেলেন নিকট’ (পরিষদের পৃষ্ঠা ২০) ও “বরিষা গোআই গেল শরত প্রবেশ । রাম বোলেন না হইল সীতার উদ্দেশ ” (পরিষদের পৃষ্ঠা ২৬ পত্র) প্রভৃতি অনেক স্থলেই বহু ছত্র পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া দেখিয়াছি, সেই সব পৃষ্ঠিতে ও বটতলার মুদ্রিত রামায়ণে একই কবির হস্ত-গন্ধ অনুভব করা যায় । “বৃদ্ধতাত পড়িল দুই, তিন সহোদর । কবিল অতিকা বীর যমের দোসর ॥” (পরিষদের পৃষ্ঠা ২২৭ পত্র) ও প্রায় একরূপ । কিন্তু বটতলার পুস্তকে এই দুই ছত্রের পরে “চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন । ঈশ্বরে ছাদে নেও কৌশল্য নন্দন ॥ রাবণ-সন্তান বলি পরা না করিবে । দয়াময় রাম নামে কলহ রহিবে ॥” আছে, এই রূপ রাক্ষসী বৈষ্ণবী ভক্তির খোঁজ পূর্ব বঙ্গের হস্ত লিখিত পুস্তকে পাওয়া যায় না । এরূপ হইল কেন ? সুমধুর তরনীসেনের বধোপাখ্যান, রাম ‘কমল-আর্থির’ কমলাক্ষ দ্বারা হারানো নীলোৎপলের স্থল পূর্ণ করিয়া চণ্ডী-পূজার উদ্যোগ এই সব সুন্দর স্থান পূর্ব বঙ্গের পুঁথিগুলিতে পরিত্যক্ত হইল কেন ? আমার মনে একটি গভীর সন্দেহ আছে ; শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি সাধনে নানারূপে কার্য্যকরী হইয়াছে । বৈষ্ণব-গণ রাক্ষসদিগের দ্বারা ঈরামের স্তব গান করাইয়াছেন, ক্ষেদ মিটাইতে শাক্তগণ ঈরামকে দিয়া চণ্ডী-পূজা করাইয়াছেন ; এই দুই দলের চেষ্টায় মূল অনুবাদ বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে । ইহাকে ঠিক বিকৃতি বলা যায় না ; যদি ও রাক্ষস বিরবাহর ঈরামচন্দ্রকে “রাক্ষসবিনাশকারী ভুবনমোহন” বলাতে রাক্ষসী বিধ্যবস্তার বিরুদ্ধ ভাব দৃষ্ট হয়, তথাপি বোধ হয় এই রচনা তাৎকালিক বঙ্গীয় জীবনের মূল নীতি উল্লেখ করে নাই । বৈষ্ণবীর নীতি বঙ্গের সমাজের অভ্যন্তরে কার্য্য-করী হইয়াছিল ; এই বৈষ্ণবীর নীতি দ্বারাই রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ

• পরিষদের জন্ত আমি যে পুস্তক ত্রিপুরা হইতে খরিদ করিয়া দিয়াছি, সে রামায়ণ খানা খুব প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ; উহা নিম্নশ্রেণীর লোকের হাতের লেখা ; ও অনেক স্থল পাঠবিকৃতিপূর্ণ, কিন্তু এতলে যে সব মত লিপিবদ্ধ করিলাম তাহা শুধু পরিষদের এই অবলম্বন করিয়া বহু, পূর্ব বঙ্গে যে ১২১৪ খানা রামায়ণের হস্তলিখিত প্রাচীন বই পাইয়াছি, তাহার সমস্তই আমার লক্ষ্য । আলোচনার সুবিধার জন্ত পরিষদের পুঁথির উল্লেখ করিলাম ।

সম্পূর্ণ রূপে শাসিত। এ সমস্ত পরবর্তী যোজনা কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু বঙ্গীয় প্রকৃতি উল্লিখিত হয় মাই বরং তদনুকূলে হইয়াছে, এই জন্ত যোজনা হইলে ও উহা বিকৃতি মনে। জিপুরা, মোরাখালী ইত্যাদি স্থানের লোকগণ যে মূলগ্রন্থ জ্ঞান করিয়াছে, বোধ হয় না। সে সব দেশে ভারত চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বিশেষ কোন রূপ বিকৃতি দৃষ্ট হয় না; শুধু ‘লাফ’ স্থলে ‘ফাল,’ ‘মা’ স্থলে ‘মাও’ প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের শব্দগুলির দিগে রুচি প্রবল দৃষ্ট হয়; পরিবর্তন এইরূপ শব্দের, কিন্তু বিষয়গত পরিবর্তন ত দেখা যায় না। তবে এক কৃষ্ণিবাস পূর্ব ও পশ্চিমে দুই রূপে উদয় হইলেন কেন? যদি প্রকৃত পক্ষেই পূর্বোক্ত উপাখ্যানগুলি যোজনা হইয়া থাকে, তবে কি সে অংশগুলি এখন রামায়ণ হইতে কর্তন করিতে পারি? তরগীর কাটামুও ‘রাম রাম’ বলিয়া শ্রীরামের পদস্পর্শ করিয়াছিল, এই ভক্তির কথাই আমাদের প্রিয়; আমরা রাক্ষসী বিভীষিকা হইতে রাক্ষসী বৈষ্ণব-ভাবেরই বেশী পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি, সে গুলি ছাড়িয়া দিলে বঙ্গীয় রামায়ণে কি পড়িব? আমরা একখানা অতি প্রাচীন হস্ত লিখিত কৃষ্ণিবাসী রামায়ণে এইরূপ সূচনা পাইয়াছি,—

“বান্দিকী বলিলা গোসাঞি তুমি অন্তর্ধামি ।
তোমা ঠাঞি কিছু কথা জিজ্ঞাসিব আমি ॥
কোন মহাপুরুষ হয় সংসারের সার ।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম অবতার ॥
সংসারের সাধু প্রিয় জগতের হিত ।
যার কোষে দেবদগ্ন শতেক বেতিত ॥

সর্ব ফলক্ষণ যার হয় অধিষ্ঠান ।
হিংসার ঈষৎ নাই, চন্দ্র সূর্যের সমান ॥
ইন্দ্র ধন বায়ু বরুণ সেই বলধান ।
ত্রিভুবনে নাই কেহ তাহার সমান ॥ ”
ইত্যাদি,—বে, গ, পুংখি ৪ পত্র ।

বিক্রমপুর হইতে প্রাপ্ত একখানা প্রাচীন পুঁথির প্রারম্ভ ও এইরূপ দৃষ্ট হয়—ইহা অনেকটা মূলের মত। যাহাহউক, জিপুরা, শ্রীহট্ট, মোরাখালী প্রভৃতি স্থলের কতিপয় হস্ত-লিখিত পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া আমরা রামায়ণসম্বন্ধে জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে সাহসী নহি। ঐ সব উপাখ্যান বাদ দিলে অবশিষ্ট যে অংশ থাকে তাহা ও রামায়ণের ঠিক অনুবাদ বলিবার যায় না। ফটোগ্রাফে যেমন প্রকৃতির চিত্রালেখ্য সম্মুখতনে অথচ যথার্থ রূপে প্রতিবিম্বিত হয়, কৃষ্ণিবাসী-মুকুণ্ডে বান্দীকির

রামায়ণ সেইরূপ প্রতিবিম্বিত হয় নাই; মূল পাঠ করিলে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র দেবতা নহেন-দেবোপম; মামুষী শক্তি ও বীর্যবাহার আতিশয্যে তাঁহাকে ক্ষণে ক্ষণে দেব বলিয়া ভ্রম হয়, এই মাত্র। কুন্তীবাসী রামায়ণের রাম নৈবিদ্যাহারী গড়া-পুতুল, তুলসী চন্দনে লিপ্ত বিগ্রহ। তিনি কোমল কর-পল্লবের ইন্ধিতে স্ফুট স্থিতি সংহার করিতে পারেন, তিনি বংশীধারীর ভ্রাতা, প্রেমানন্দ পূর্ণ-চক্ষু; ভক্তের চক্ষে জল দেখিলে যোজিত শরটি তুণীরে রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। মূলে আছে, কৌশল্যা বনগত পুত্রকে স্মরণ করিয়া স্তম্ভের নিকট বলিতেছেন,—‘রাম পুষ্পবৎ কোমল উপাধানে শির রক্ষা করিয়া নিশা স্তম্ভ উপভোগ করিত, এখন স্বীয় বজ্রবৎ কঠিন ভুজে শির রক্ষা করিয়া কিরূপে শয়ন করিবে?’ রামের চিত্র পাছে কঠোর হয়, এই ভয়ে কুন্তিবাস বজ্রবৎ কঠিন ভুজের কথা উল্লেখ করেন নাই। কি ভীক, প্রকৃতই যদি রামের ভুজ কোমল কিশলয়োপম হইত, ও “চাঁপা নাগেশ্বর দিয়া রামের চূড়া বাঁধা”* থাকিত, তবে কি রাবণ বধ হইত, না এখনকার ঐতিহাসিকদিগের মতানুসারে, আর্য্য-ভুজ বলে দাক্ষিণাত্য বিজয় হইত। শৌর্য্যই পুরুষের সৌন্দর্য্য, কমনীয়তা নহে। মূল রামায়ণে রামের ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিয়া মারিচ রাক্ষস বলিয়াছিল,—“বৃক্ষে বৃক্ষে আমি করাল রামমূর্ত্তি দর্শন করি, ধম্পাণী রামমূর্ত্তি ছায়ায় ছায় কাননের সর্বত্র দর্শন করিয়া নির্জনে চমকিত হই।” যখন গলাদনাদী গোদাবরীতীরে কদম্ব, অশোক, কর্ণিকার বৃক্ষকে শোকে রক্তক্ষণ বিরহী শ্রীরামচন্দ্র বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পান নাই, পথে রক্তখিন্দু ও রাক্ষসের পদাক দর্শন করিয়া রাক্ষস কর্তৃক সীতা বধ আশঙ্কা করিলেন, তখন বিরাত ধনুতে জ্যা আরোপন করিয়া জরা, ব্যাধি কি মৃত্যুর ছায় করাল বেশে প্রকৃতিকে সংহার করিতে সমুদাত হইলেন, ত্রিপুরাস্তক হরের ছায় কি যুগান্তকারী কালের ছায় শ্রীরামচন্দ্রের সেই চিত্র অতি ভীষণ। সে সব কথা প্রলাপ হউক, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর ও সুন্দর! সেই ক্রোধে ভাবী রাক্ষস সংহারের ছায়া পড়িয়াছে। কুন্তিবাসী রামায়ণে এই সব ছবির যথাযথ প্রতিকৃতি উঠে নাই। যে আনন্দে প্রকৃতির মাধুরী মূলে প্রতিবিম্বিত, পল্ল-সম্পীড়িত পম্পাবারি, কান্তোপভূক্তা অলস-গামিনী রমণীর ছায় বর্ষাকরে নদীর ধীর মহরগতি, শৃঙ্গধারী ককুম্বানের

জায় বালেন্দ্রশীর্ষ মেঘেরপট, হস্তি কর্তৃক পদ্মবনে উপগীত শ্লোক, এই নানাবিধ প্রফুল্লতার উন্মাদকর ছবি, কুন্তিবাসী অম্ববাদে প্রতিবিম্বিত হয় নাই। কিন্তু রাম ও লক্ষ্মণের সৌহার্দ্য, কৌশল্যার শোক, সীতার (কাজ্রেয় তেজ ও ব্রহ্মচর্য্য নহে) গৃহস্থবধূর ন্যায় ব্রীড়ানত মাধুরী,—বোধ হয় মূল্যাপেক্ষা অম্ববাদে আরও সুন্দর হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত যদি পশ্চিম-বঙ্গ-প্রচলিত রামায়ণের পাঠই ঠিক হইয়া থাকে, তবে একটি অভিনব বস্তু কুন্তিবাসী রামায়ণে পাই,—তাহা রামচন্দ্রের বৈষ্ণবীয় কোমলতা—ভক্তের জন্য করুণা। ইহা খৃষ্টীয় কোমলতা হইতে ও সুন্দর; ইহার ছায়া রামায়ণে, কিন্তু পূর্ণতা বৈষ্ণবীয় পদাবলীতে।

বাঙ্গালীর নিজভাব দ্বারা ঈষৎ পরিবর্তিত ও নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ‘রামায়ণ’ বঙ্গীয় গৃহস্থের এত আদরের বস্তু হইয়াছে। মিত-ব্যয়ী বণিক ক্ষুদ্র দীপাধার অকাতরে তৈল-পূর্ণ করিয়া যে গীতি অঙ্কুরাত্ম জাগিয়া পাঠ করে, তাহা এখন ও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া কোমল করে; সেই গীতি আমাদের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। উহার অপরিচ্ছদ মাধুর্য্য শুধু শৈশবের কথা নহে, কত যুগ যুগান্তরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ইদানীং কুন্তিবাসী রামায়ণের পাঠবিকৃতির দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া করিয়া জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের শ্রমের ছাই কুড়াইয়া ফাঁসির ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু তাহার উক্ত তর্কালঙ্কারের বিরোধী, তাঁহাদের নিকট এই বক্তব্য, যদি তাঁহারা প্রাচীন বঙ্গীয় পুঁথির আলোচনা করিয়া থাকেন, তবে দেখিবেন পুস্তকের হস্তলিপি যত প্রাচীন, ভাষা ও সেই অনুসারে জটিল ও প্রাচীন; পরবর্তী পুঁথিগুলির ভাষা ক্রমশঃ সহজ দৃষ্ট হয়।* এক জয়গোপালের উপর ক্রুদ্ধ হইলে কি হইবে? কত জয়গোপাল বঙ্গীয় রামায়ণের বিকৃতিসাধনে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। প্রাচীন অপ্ৰচলিতশব্দবহুল একখানি পুঁথি উদ্ধার করিয়া চালাইতে চেষ্টা

* “Every one who has gone into the work of editing ancient songs in Bengali has felt this difficulty, later M.S.S always giving a smoothed down version of the ancient dialects.” Pundit Hara Prashad Shastri's Pamphlet on old Bengali Literature P.3.

করিলে, তাহা দেশী আগামর সাধারণ পড়িবে কি ? প্রকৃত্ত্ববিৎগণের সম্বোধন অর্থকরী নহে ।

আমার বিবেচনায় বঙ্গীয় পুঁথিগুলির এইরূপ পরিবর্তন সর্বাংশেই পরিচাপের বিষয় নাই । এইরূপ যুগে যুগে সময় উপযোগীভাবে ভাষার একটুকু একটুকু সংস্কার হওয়াতেই ৫০০ বৎসরের অধিক কালের রচিত রামায়ণ এখন পর্য্যন্ত ও এদেশে এতদূর প্রচলিত আছে । ইংরেজী চছারের সীতি কত জনে পড়ে ?

কিন্তু মূল রামায়ণ নানা কারণেই উদ্ধার করা আবশ্যক । আধুনিক শব্দের মনোহারীত্বে অভ্যস্ত বহুসংখ্যক লোকের প্রতি মূল রামায়ণ শ্রবণে সূখী হইবে কি না বলা যায় না । তথাপি আমাদের সাহিত্যের আদি-গৌরব কৃতিবাসকে সমুচিতরূপে অধিষ্ঠিত দেখিবার বাসনা কাহার না হয় ?

আমরা যে সব রচনা কৃতিবাসের লিখিত বলিয়া প্রাচীন কবির কবিত্ব গৌরবের বড়াই করিয়া থাকি, সেই প্রশংসার পুষ্প ও বিষপত্র হয়তঃ এই ভয়গোপাল কি পূর্ববর্তী কোন ভয়গোপালের মস্তকে পড়িতেছে, কৃতিবাস হয়তঃ তাহা পাইলেন না । দৃষ্টান্ত স্বলে বলা যাইতে পারে,—সুবিখ্যাত নিম্নলিখিত পদগুলি আমরা কোন ও হস্তলিখিত পুঁথিতে পাই নাই,—

“গোলাবরী নীচে আছে কমল কানন ।

তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ॥

পদ্মালয়া পদ্মমুখী নীতারে পাইয়া ।

রাখিলেন বুঝি পদ্ম বনে লুকাইয়া ॥

চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস ।

চলেকা ভ্রমে রাহ করিলা কি প্রাস ॥

রাজ্যচ্যুত-বদ্যপি হয়ছি আমি বটে ।

রাজলক্ষ্মী আমার ছিলেন সন্নিহিতে ॥

আমার সে রাজলক্ষ্মী হারালাম বনে ।

কৈকরীর মনোভিষ্ট দিচ্ছ এত দিনে ॥

রামায়ণ ভিন্ন কৃতিবাস ‘যোগাধ্যার বন্দনা’ ও ‘শিবরামের যুদ্ধ’ নামক অপর দুইখানা খণ্ডকাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা এখন একরূপ হুম্মাপ্য ।

অকুবাস-শাখা—(খ) সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর,

ও শ্রীকর নন্দী ।

খাটি কৃতিবাসী ‘রামায়ণ’ উদ্ধার করা সহজ নহে ; নানা কবির হাতে তাহা নানারূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে । মূলের সঙ্গে এইসব উপকাব্য জড়াইয়া এক হইয়া গিয়াছে ।

৫০০ বৎসরের অধিক হইল রামায়ণের অনুবাদ রচিত হইয়াছিল, তার ২০০ বৎসরের কিছু অধিক হইল কাশীদাস মহাভারত অনুবাদ করেন; মধ্যবর্তী ৩০০ বৎসরের মধ্যে অল্প কেহ মহাভারত প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাই, এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক। এইজন্য লুপ্ত মহাভারত-অনুবাদ-কারক মহাজনগণের খোঁজ করিতে প্রবৃত্ত হই। সুখের বিষয় বহুকষ্টে পূর্ববক্ত হইতে অনেকগুলি প্রাচীন মহাভারতের পুঁথি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব পাঠকগণ নির্ণয় করিবেন, কিন্তু আমি কলহাসের মতই তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। বহুসংখ্যক অনুবাদকারীদিগের মধ্যে সঞ্জয়, কবীন্দ্রপরমেশ্বর ও রামেশ্বর নন্দীর রচিত মহাভারতগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। আকাশের তারার জ্ঞান অগণ্য মহাভারতের অংশরচকদিগের নাম এখানে উল্লেখ করা নিশ্চায়জন। অনুমান ও কল্পনার ছরবিধ যোগে সেইসব কবি-নক্ষত্রগণ এসময় হইতে কত দূরবর্তী, সে প্রশ্নের ও উত্তর দিতে এস্থলে চেষ্টা করিব না।

কবীন্দ্র রচিত মহাভারত হসেন সাহার সময় লিখিত হয়। সুতরাং ৪০০ বৎসর পূর্বের অনুবাদ পাওয়া গেল। এই মহাভারতের বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার মহাভারতে উল্লেখ করিয়াছেন;—

“শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান।

চচাইল পাকালী যে গুণের নিদান।” কবীন্দ্র, বে, গ, পুঁথি ৮৮ পত্র।

এই দুই ছত্র একবার ৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সুতরাং কবীন্দ্র রচিত মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন লুপ্ত মহাভারতের ও খোঁজ পাওয়া গেল। কবীন্দ্র রচিত ভারতের ভাষার সঙ্গে কাশীদাসী মহাভারতের ভাষার স্থলে স্থলে খুব বেশী সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; কাশীদাস চট্টগ্রামের কবির ভাষা চুরি করিয়াছেন সম্ভব নহে; আর কবীন্দ্রের রচিত মহাভারতের যে সব প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার একখানি প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন, সুতরাং তাহাও অবিস্মৃত নহে; তবে এইরূপ সাদৃশ্যের কারণ কি? বোধ হয় কোনা ও লুপ্ত মহাজনের গৌরব উভয়েই অপহরণ করিয়া থাকিবেন।

কবীন্দ্র-রচিত মহাভারত হইতে আর একখানা অতি প্রাচীন মহাভারত পাওয়া গিয়াছে, তাহা সঞ্জয়-বিরচিত । ইহার ঐতিহাসিক কোন গোড়া পাওয়া গেল না ; কিন্তু এই পুস্তক নানা কারণে সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতেছে । কবীন্দ্র-রচিত প্রাচীন পুঁথি যেখানেই পাওয়া যাইতেছে, তৎসঙ্গে মূল-পুঁথির হস্ত লিপি অপেক্ষা প্রাচীন হস্তাক্ষর যুক্ত ছ্চারি খানা সঞ্জয় মহাভারতের পৃষ্ঠা ও সংলগ্ন দেখা গিয়াছে, সুতরাং সঞ্জয়ের মহাভারতের পরে কবীন্দ্রের অনুবাদ প্রচলিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে । কবীন্দ্র রচিত ভারতের প্রচার শুধু কবির-নিবাস ভূমি ‘ফণী নদীর’ নিকটবর্তী স্থলে ; কিন্তু সঞ্জয়-রচিত মহাভারত বিক্রমপুর, ঈহট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সর্ব-স্থলেই পাওয়া যাইতেছে সুতরাং এই গ্রন্থের প্রচার একরূপ সমস্ত পূর্ব-বঙ্গময় বলা যাইতে পারে । সঞ্জয় রচিত ভারতের ভাব ও ভাষার বিকাশ কবীন্দ্রের ভারতে ‘দৃষ্ট হয় ; যযাতি ও দেবযানির মিলন স্থলে সঞ্জয় এইমাত্র লিখিয়াছেন ;—

“কলিত পুণ্ডিত বন বসন্ত সময় ।
সদাএ হৃগন্ধী বায়ু মন্দ মন্দ বয় ॥
বিচিত্র যে অলঙ্কার বিচিত্র ভূষণে ।
কথা সব নানা রঙ্গ করে সেই বনে ॥

কেহ মিষ্ট কল খাএ, কেহ মধু পিএ ।
শদ্বিষ্ঠা যে দেবযানি চরণ সেবএ ॥”
সঞ্জয়, বে, গ, ১১ পত্র ।*

কবীন্দ্র এই উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—

* বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের জন্ত যে হস্ত লিপিত সঞ্জয় পুঁথি খরিদ করিয়াছি, তাহার শেষ পত্র এইরূপ ;—

“এই অষ্টাদশ ভারত পুস্তক শ্রীগোবিন্দরাম রায়ের একোন পত্র অঙ্ক সাতশত উননব্বই সমাপ্ত হইছে । অক্ষয়করমিঃ শ্রীঅনন্তরাম শর্মাঃ র ইহার দক্ষিণা জন্মাবধি সামান্ততাক্রমে অন্নপত্রে প্রতিপাল্য হইয়া সত্রয়্যাহ হইয়া পুস্তক লিখিয়া দিলাম । নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তার পর রোজকারহ বৎসর ঝাপিয়া পাইবারহ আজ্ঞা হইল । শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৩৬ সন ১১২৪ তারিখ ২৫শে কার্তিক হোল বৃহস্পতিবার দিবা ত্রিভীতীয় গ্রহর গতে সমাপ্ত । মোকাম শ্রীমুলগ্রাম লেখকের নিজ গ্রাম ।”

“একদিন দেবদানি, হৃদয়ে হরিকণ্ঠনি,
শর্শিষ্ঠা লইয়া রাজ হুতা।
ঋতুরাজ মধুসাস, ক্রীড়াথণ্ডে অভিলাষ,
চলি আইল পুষ্পবন যথা।
নানা পুষ্প বিকাশিত, গন্ধে বন আমোদিত,
কুসুমে নমিত হৈছে ডাল।
কোকিলের মধুর ধ্বনি, শুনিতে বিদরে প্রাণী,
ভ্রমর করয়ে কোলাহল”।
সানন্দিত বন দেখি, মিলিয়া সকল সখি,
ক্রীড়া তাতে করয় হরিশে।
মলয় স্থায়ী বাও, ধীরে ধীরে বহে গাও,
প্রাণ মোহিত পুষ্পবাসে।
হেন সময় যযাতি, বিধাতা নির্বন্ধ গতি,
মৃগয়া কারণে সেই বনে।

ভ্রমিল কাননে চাএ, মৃগ কোথা নাহি পাএ,
কন্তা সব দেখি বিদ্যমানে।
তার মধ্যে এই কন্তা, রূপে গুণে অতি ধন্তা,
জিনি রূপে রত্না উর্বশী।
অধরে বাধুলি জ্যোতি, দশন মুকুতা পাতি,
বদন অলয়ে যেন শশী।
নয়ন কটাক্ষ শরে, মুনি জন মন হরে,
জয়গে কাম ধনু ধারা।
চারিভিতে সহচরী, বসি আছে সারি সারি,
রোহিণী বেষ্টিত যেন তারা।
শয়ন করিয়া আছে, রতি কাম অভিলাষে,
বিচিত্র পাতিয়া নানা ফুল।
শর্শিষ্ঠা চাপে পাও, কোন সখি করে বাও,
কোন সখী যোগায় তাবুল।”
কবীন্দ্র, হস্তলিখিত পুঁথি।

এইরূপ অনেক স্থলেই কবীন্দ্র সঞ্জয়ের উপর তুলি ধরিয়া চিত্রগুলি বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীহরি যে স্থলে স্বপ্রতিজ্ঞা বিন্মত হইয়া রোষক্ষিপ্ত গজেন্দ্রবৎ ভীষ্মকে বধ করিতে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন,—কবীন্দ্রের বর্ণনা সে স্থলে বড় সুন্দর, কিন্তু সঞ্জয়-ভারতে এই প্রসঙ্গ এবং অতুল্য সুন্দর আখ্যানের একবারে উদয় হয় নাই। সঞ্জয় রচিত ভারতের বনপর্বে ১৪ পাতা, অনুশাসন পর্বে ৩ পাতা মহাপ্রস্থানিকা পর্বে ৩ পাতা ও সৌপ্তিক পর্বে ৫ পাতা পাইলাম। সুতরাং প্রায় স্থলেই বৃত্তান্ত অতি সংক্ষিপ্ত। মহাভারত-প্রসঙ্গ যখন দেশে নূতন বস্তু ছিল, এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সেই সময়েরই উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। খাঁটি কুন্তিবাসী রামায়ণের স্থায় খাঁটি আগা গোড়া সঞ্জয়ের মহাভারত অতি হৃৎকট। আমি একখানা মাত্র শ্রীযুক্ত বাবু অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট দেখিয়াছি।

সঞ্জয়-রচিত মহাভারত কাব্যের স্বল্পে কত কবি শাখা-কাব্যের উৎপত্তি করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শকুন্তলা-উপাখ্যানটি রাজেন্দ্র দাস কবি উৎকৃষ্ট খণ্ড-কাব্যে পরিণত করিয়া সঞ্জয় ভারতের অন্তর্বর্তী করিয়া দিয়াছেন; গঙ্গাদাস সেন অশ্বমেধ পর্বট সংযুক্ত করিয়াছেন; গোপীনাথ কবি দ্রোণ

পক্ষ সংলগ্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের বাক্য-বিজ্ঞান উৎকৃষ্ট, রচনার নিপুণতা উৎকৃষ্ট, ভাব মন-গুণের প্রভা-ধারী; কিন্তু সঞ্জয়ের রচনা অমোঘ, সংক্ষিপ্ত ও সরল। অথচ এই সমস্ত উপকরণ রাশি গ্রাস করিয়া সঞ্জয়-কৃত মহাভারত ‘তালের বড়ার’ ছায় নামমাত্র তালের কীর্তিই ঘোষনা করিতেছে। কোন কোন পুথির অধিকভাগই অপরূপ কবির লিখিত, অথচ প্রহের নাম ‘সঞ্জয়কৃত’ মহাভারত। নারায়ণদেব ও বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণের অবস্থাও তাই।

এই সংক্ষিপ্ত সরল বর্ণনাবৃত্ত মহাভারতটির প্রতিপত্তি এতবেশী হইল কেন? কবি ষষ্টিবরের, তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেনের, রাজচন্দ্র দাসের উজ্জল পংক্তি নিচয়ের বশঃ সঞ্জয়-নামের আড়ালে পড়িল কেন? বোধ হয় সঞ্জয় প্রাচীনতম কীর্তি এই জন্ত।

আমরা সঞ্জয়-রচিত ভারতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রমাণ দেখিতেছি,—যে স্থলেই সঞ্জয়ের ভণিতা, সেই স্থলেই লোক বুঝাইতে সঞ্জয় ভারত অনুবাদ করিয়াছেন একথা লিখিত দেখিতেছি। মহাভারত অতি কঠিন, সঞ্জয় লোক হিতসংকল্পে তাহা বাঙ্গলা ভাষার প্রচার করিতেছেন প্রতি পত্রে এই কথা দৃষ্ট হয়;—কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি;—

“সঞ্জয় বোলন্ত মহাভারতের সার।

পরায় প্রবন্ধে কহে লোক বুঝিবার ॥”

সঞ্জয় বে গ, পুঁথি, ২০ পত্র।

“সঞ্জয় কহিল কথা হুখে বুঝ লোকে ।”

১৫০ পত্র।

“বিরাট পর্কের কথা পরায় প্রবন্ধে।

সঞ্জয় কহিল কথা বুঝহ সানন্দে ॥”

১৭০ পত্র।

“বিরাট পর্কের কথা নানা রসায়।

সর্বলোকে বুঝিবারে কহিল সঞ্জয় ॥”

১৮২ পত্র।

“মহাভারতের কথা অতি অনুপম।

সঞ্জয় বলএ ইহা করিয়া হৃদয় ॥” ২০২ পত্র।

“এমতে ভারত কথা কহিল সঞ্জয়।

গীত হেন গাহে লোকে মোহিত হৃদয় ॥”

২০৫ পত্র।

“কর্ণ অর্জুনের যুদ্ধ স্থলন্ত লোকএ।

নাচিতে গাইতে মোক্ষ কহিল সঞ্জয় ॥”

২২৫ পত্র।

“একলক্ষ লোক মহাভারত সংহিতা।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ ক্যাসের কবিতা ॥

সাবধানে ধর্ম কথা বুঝাইবার তরে।

সঞ্জয় কহিল কথা মধুর পরারে ॥” ৪৪৬ পত্র।

“অতি অক্ষকার যে মহাভারত সাগর।

পাকালী সঞ্জয় তাকে করিল উজ্জল ॥

৪৮২ পত্র।

কৃষ্ণিবাস ভিন্ন অজ্ঞ কোন কবির ভণিতায় বারংবার এইরূপ কথা নৃষ্ট হয় না। মহাভারতের পূর্ববর্তী অনুবাদ থাকিলে এরূপ লেখা স্বাভাবিক হইত না।

এই সঞ্জয় কে? তাঁহার কোন বিশেষ পরিচয় নাই, একবার ভাবিয়া-ছিলাম বিহুর-পুত্র সঞ্জয়কেই কি আমরা কাব্য-প্রণেতা বলিয়া ভুল করিতেছি? ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয় যুদ্ধ বর্ণনা করিতেছেন, সুতরাং যুদ্ধ পৰ্ব-গুলিতে সঞ্জয় কহিতেছেন, একথা মহাভারতমাত্রেই থাকিবেক। এই সঞ্জয় কি সেই সঞ্জয়? এই ভ্রম পাছে পাঠকের হয়, এই অজ্ঞ সঞ্জয় কবি নিজেই সতর্ক হইয়াছেন,—তিনি লিখিয়াছেন,—

“ভারতের পূর্ণা কথা নানা রসময়।

সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়।”

বে, গ, পুঁথি ৫৭৭ পত্র।

“সঞ্জয় কহিল কথা, রচিল সঞ্জয়।” ৫৮৭ পত্র।

“সঞ্জয়ের কথা শুনি, সঞ্জয়ের কথা পুনি,
শুনিলে আপদ হৈতে তরি।” ৫৩৬ পৃঃ

“প্রথম দিমের রণ ভীষ্ম পর্ব পৌঁধা।

সঞ্জয় রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা।” ২৩৩ পৃঃ।

সুতরাং সঞ্জয় পৌরাণিক ভূত নহেন, একালেরই মানুষ; তাঁহার পরিচয়স্থলে বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট লাইব্রেরীর জন্ত আমি যে পুঁথি খরিদ করিয়াছি, তন্মধ্যে এই ছুটি ছত্র পাওয়া যায়,—“ভরষাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম। সঞ্জয়ে ভারত কথা কহিলেক মন্দ।” ৫৩৩ পত্র। যে বংশে হি হর্ষ, কৃষ্ণিবাস ও ভারতচন্দ্র, সঞ্জয় কি স্বভাবিক কবিগুণ-সম্পন্ন সেই প্রসিদ্ধ বংশের একজন?

সঞ্জয়ের কবিত্ব স্বাভাবিক, তাহাতে লিপিচাতুর্য্য নাই, বর্ণমা চাতুর্য্য নাই, অথচ তাহা এক্ষেয়ে নহে। পাঠক উচ্চ শিক্ষার অভিমান বিশ্বৃত হইয়া একবার ভাই বলিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে ও যদি চিনিতে পারেন, তবে এই সব গ্রাম্য কবিতার সরল জীবন্ত চিত্র-পট আপনাকে ও প্রীতি দান করিবে,—উহাতে একটুকু গ্রাম্য-সৌন্দর্য্য আছে, গ্রাম্য গতা পুষ্পের ভ্রাণ আছে, তাহা বড়ই মনো-মুগ্ধকর। এই কবিতা যদিচ হৃদয়কে মেঘ-লোক পর্য্যন্ত পৌঁছায় না সত্য, কিন্তু উহা পাঠে প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়ের হারামো বাধ কিরিয়া পাওয়া যায়, সঞ্জয় মহাভারত শীঘ্রই সাহিত্যভূষণী ত্রিযুক্ত জয়দেবপুরাধিপতি বাহাদুরের বাহ্যে ও পূর্ববঙ্গের পৌরব ত্রিযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের যত্নে মুদ্রিত।

হইবে। পাঠক গ্রাম্য, মনোরম চিত্রপট ও সৌন্দর্যের ছবি মুগ্ধিত পুস্তকে দেখিবেন, আমরা নিয়ে ক্রোধের অভিনয়ের কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি,—

দ্রৌপদীর অপমান ।

রাজার আদেশ পাই, হুঃশাসন গেল থাই,
সভাতে আসিল একেধরী ।

একবত্র রত্নখলা, রূপল-নন্দিনী বালা,
রাহএ কেন চল মিল হরি ।

মল বোলে সভাজন, ধর্মশাস্ত্র অকারণ,
উচিত না বোলে কোন জনা ॥

কঁদয়ে হুন্দরী রামা, রূপ গুণে অতুপমা
নয়মে বহয়ে জলধারা ।

আগবে হারিল পতি, মোহোর যে ফোম গতি,
উত্তর না দেও সভাজন ।

দ্রৌপদীর বাকা শুনি, সভাসদে কাণাকাপি,
অস্তে অস্তে মুখ নিরীকণ ॥

তাহা দেখি কম্পয়ে যে বীর বৃকোদর ।

বজ্রসম গলা হস্তে, কম্পে ধর ধর ॥

খাউক সেবিয়া ধর্ম যুধিষ্ঠির রাজা ।

কুরু বল দাসি আজি যমে করো পূজা ॥

কোথায় আছরে বর্ষ কেবা তাহা জানে ।

কোন বর্ষ সেবি রাজ্য পাইল চুর্যোধনে ॥

কিবা যে অধর্মে আমি হারি পাশা খেলি ।

কিবা অধর্মে আনে দ্রৌপদীর কেশ ধরি ॥

কোন অধর্মে বিবত্না করয়ে রত্নখলা ।

কোন অধর্মে সভাতে কঁদয়ে হুন্দরী বালা ॥

এই ছুবে ভীমসেন কম্পয়ে বিগুণ ।

অন্তরেতে মহাকোপ কম্পয়ে অর্জুন ॥

নকুল সহদেব কম্পয়ে শরীর ।

হাতে ধরি নিসারণ করে যুধিষ্ঠির ॥

হেত অপরাধ যোর কন তাত্ সব ।

আগন অধর্ম হইতে রজিবে কোবর ॥

চক্ষু পাকায় ভীম যেন কাল বর ।

বন্ধনে থাকিয়া যেন সর্পের বিক্রম ॥

সঞ্জয় বে, ধ, পুঁথি ১১৫ পত্র ।

কর্ণের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন ।

তবে কর্ণ কটকের রঙ্গ বাড়াইতে ।

একে একে সমাইরে লাগিল পুছিতে ।

কে আজি অর্জুনে দেখাইতে পারে ।

রত্নের শকট ভরি দিমু আজি তারে ॥

বৎসের সহিত দিমু খেতু একশত ।

যে আজি অর্জুনে দেখাইয়া দিব মোত ॥

লেজ কালা খোপ ঘোড়া বহে যেই রথ ।

তাক দেই অর্জুনেরে যে দেখায় মোত ॥

ছএ হস্তি দিমু শকট ভরিয়া সোণ ।

তাক দিমু অর্জুনক দেখায় যেই জনা ॥

শ্রাম তরুণী গীত বাদ্যে যে পণ্ডিতা ।

একশত হুন্দরী হুবর্ণ অলঙ্কৃত ॥

তাক দেই যেই মোকে দেখায় অর্জুন ।

শতে শতে ঘোড়া রথ হস্তি যে হুবর্ণ ॥

সবংসা তরুণী ধেমু হুবর্ণ ভূষণ ।

তাক দেই যে আমারে দেখায় অর্জুন ॥

শুভ্র ঘোড়া পঞ্চশত, গ্রাম একশত ।

তাহা দেই যেই অর্জুন দেখাএ মোত ॥

কাছোজিয়া ঘোড়া বহে সোণার রথখান ।

তাক দেই অর্জুন দেখাএ আশ্রয়ান ॥

ছএ শত হস্তি যে হুবর্ণ বিভূষিত ।

সাগর তীরেতে জন্ম বীর্ষে সুসারিত ॥

কৌশল্য দেই তাক অতি হুচরিত ।

নিরুটে জীমব খেট নির্ভর সতত ॥

এক রাজা এক গ্রাম জুয়াএ ভূজিতে ।
মগধের এক শত নাসী দেই ভাতে ॥” ০

শৈল্যের উত্তর ।

কোপ বাড়িবার শৈল্য বলে আরবার ।
ফুটিলে অর্জুন বাণ না গর্জিবে আর ॥
হৃদয় নাহিক কর্ণ তোমা কেহ দেখে ।
অগ্নিতে পতঙ্গ মরে তারে কেবা রাখে ।
অস্ত্রান মায়ের কোলে থাকিতে ছাওয়ালে ।
চন্দ্র ধরিবারে হাত বাড়িএ কুতূহলে ॥
সেইমত কর্ণ তুমি বোলরে দারুণ ।
রথ হৈতে পাড়িবারে চাহসি অর্জুন ॥
চৌকা ধার ত্রিশূলেতে যব কেন গাও ।
হরিণের ছায়ে যেন সিংহের বোলাও ॥
মৃত মাংস খাইয়া শূন্যল বড় হুল ।

সিংহেরে ডাকএ সেই হইতে নির্মূল ॥

হতপুত্রহৈয়া রাজপুত্রে ডাক কেনে ।

মশা হৈয়া মস্ত হস্তি ডাক যুড়ে যেনে ॥

গর্ভের কাল সাপ ঝোকাও কাটি দিয়া ।

সিংহকে ডাকহ তুমি শূন্যল হইয়া ॥

মর্গ যেন খাইয়া যায় মারিতে গরুড়ক ।

সেইমত চাহ তুমি মারিতে অর্জুনক ॥

চন্দ্র উদয় যেন সাগর অন্তর ।

বিনি নৌকাএ পার হৈতে চাহসি বর্কর ॥

সেইমত কর্ণ তোমার বুঝিল যে মন ।

মেঘ মধ্যে শুনি যেন ভেকের গর্জন ॥

সঙ্কম, বে, গ, পুঁথি, ৪৭৭ পত্র ।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী ।

১৪২৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫২৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সম্রাট হুসেন সাহ গোড়-
দেশ শাসন করেন ; চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে হুসেন সাহ প্রথমে
সুবুদ্ধি রায় নামক জনৈক হিন্দু জমিদারের ভৃত্য ছিলেন, একদা পুরুরিণী
খনন কার্যে নিযুক্ত হইয়া কর্তব্যে অমনোযোগী হওয়াতে সুবুদ্ধি রায়
তাহাকে বেত্রাঘাত করেন। হুসেন সাহ উচ্চ বংশজাত ছিলেন, তিনি

০ এই অংশ পড়িয়া এ্যাকিলিসের ক্রোধ নিবৃত্তির জন্য এগাম্মারনসের চেষ্টা মনে পড়ে,—

“Ten weighty talents of the purest gold,

And twice ten vases of refulgent mould ;

Seven sacred tripods whose unsullied frame,

Yet knows no office nor has felt the flame ;

Twelve steeds unmatched in fleetness and in force,

And still victorious in the dusty course ;

Seven lovely captives of the Sessian line,

Skilled in each art, unmatched in form divine,

All these, to buy his friendship, shall be paid &c.”

Iliad Book IX. (Pope's Translation.)

রাজ সরকারে এবিষ্ট হইয়া ক্রমে উজিরি পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং শেষে ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে সম্রাট সুজাফর সাহ নিহত হইলে গোড়ের সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। মুসলমানী ইতিহাসে একথা বিস্তারিত ভাবে লেখা নাই বলিয়া কেহ কেহ এ বৃত্তান্ত অমূলক মনে করেন; বৈষ্ণব গ্রন্থকার সেই সময়ের লোক, তিনি হাওয়া হইতে এই গল্পের উদ্ভব করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না; বরং ইতিহাস আলোচনার একথা প্রামাণিক বলিয়াই বোধ হয়।*

যদিও প্রথমতঃ হুসেন সাহ উড়িষ্যার দেবদেবী ভগ্ন করিয়াছিলেন,† তিনি পরে হিন্দুগণের প্রতি বিশেষ সদয় ও উদার ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয় তিনি চৈতন্য-প্রভুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। একথায় কিছু বাদ দিয়া বিশ্বাস করিতে গেলেও মানিতে হইবে, তিনি চৈতন্য-প্রভুকে শ্রদ্ধা করিতেন। হুসেন সাহা'র সময় কামরূপ বিজিত হয়, চট্টগ্রামে মগগণ পরাস্ত হয়, ত্রিপুরেশ্বর ও মুসলমান-ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পৃথিবীর যে কোন সম্রাট বহু রাজ্য জয় করিয়া দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারই অসি বল হইতে শ্রীসি বল বেশী প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। যে গুণে আকবর ভারত-ইতিহাসের কণ্ঠে কণ্ঠহার হইয়া রহিয়াছেন, সেই গুণে হুসেন সাহা বঙ্গের ইতিহাসের উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া গণ্য হইবেন। একাবরী মোহরের জায় হুসেনী মোহর ও লোক-প্রীতির কল্পিত মূল্যে মূল্যবান। রাজকৃষ্ণ বাবু বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—

“হুসেন সাহা'র রাজত্বকালে একদেখীয় ধনীগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন, এবং যিনি নিরস্ত্রিত সভায় বসে স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মর্যাদা পাইতেন। গোড় বা পাণ্ডুরা প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অটালিকা পরিলক্ষিত হয় তদ্বারা ও রাজসার ঐশ্বর্যের ও তাৎকালিক শিল্প নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয়

* “It is however certain, that on his first arrival in Bengal, he ~~was~~ for some time in a very humble position.”

Stewart's History of Bengal. P. 71.

† “যে হুসেন সাহা সর্ব উড়িষ্যার দেশে ।

দেব মুক্তি তাদিলেক দেউল বিশেষে †” কে, ভা, অধ্যায় ৩।

পাওয়া যায়; বাস্তবিক তখন এসেছে হাপতা নিদার আচ্ছন্নরূপ উন্নতি হইয়াছিল, এবং পৌড়ে কোথানে সেখানে যুক্তিকা খনন করিলে যেকোন রাশি রাশি ইষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টক-নির্মিত গৃহে বাস করিত, দেশে অনেক হিন্দু ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাহাদের ক্ষমতা ও বিস্তার ছিল।”

হসেন সাহা বঙ্গ সাহিত্যের উৎসাহ-বর্দ্ধক ছিলেন; যে সভার রূপ, সনাতন ও পুরন্দর ণী সভাসদ ছিলেন, সে সভায় হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া হিন্দু শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন; মালাধর বসুকে হসেন সাহা “গুণরাজ ণী” উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে হসেন সাহার প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে, হসেন সাহার পুত্র নসরত সাহা “ভারত পাঞ্চালী” রচনা করাইয়াছিলেন, এসকল কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি। পরাগলী মহাভারত ও ছুটি খাঁর অশ্বমেধ-পর্বে পত্রে পত্রে হসেন সাহার প্রশংসা ও গুণবর্ণনা দৃষ্ট হয়।

এই রাজসভা হইতে দুইজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মগীরাজার সৈন্যদিগকে চট্টগ্রাম হইতে দূর করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন; একজন স্বয়ং রাজকুমার,—ভাবী সম্রাট নসরত সাহা, অপর—সেনাপতি পরাগল ণী।

ফণী নদীর (আধুনিক ফণী) তীরে চট্টগ্রাম জোরওয়ারগঞ্জ থানার অধীন ‘পরাগলপুর’ এখন ও বর্তমান, ‘পরাগলী দীঘি’ অতি বৃহৎ এখন ও তাহার জল ব্যবহৃত হয়; পরাগল খাঁর প্রাসাদাবলী এখন রাসীকৃত ভদ্র ইষ্টক-স্তম্বে পরিণত। ইহারা কেহই সেই মগী-সৈন্য-জয়ী সেনাপতির কাহিনী লোক স্মৃতিতে আনিতে পারে নাই, কিন্তু একখানি তুলট কাগজে লিখিত, কীট দংশিত, লুপ্তভুজ্জড়িত প্রাচীন পুঁথি লুপ্ত স্মৃতির উদ্ধার করিয়াছে; সে পুঁথি খানি—

‘পরাগলী ভারত ।’

অথবা

কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত

মহাভারত ।

তাহার ভূমিকা এইরূপ;—

০ কবীন্দ্র-রচিত ভারতের ১৬৪৬ শকের হাতের লেখা পুঁথি বরিশত করিয়া বেট
গুণবর্ধনের লাইব্রেরীতে নিরাছি, তাহা ছাড়া আরো দুইখানা পুঁথি পাইয়াছি তাহার এক
২০০ পত, আর একখানা প্রায় ২৫০ পতের প্রাচীন ।

নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি ।
 পঞ্চম পৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি ॥
 অস্ত্র শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অগার ।
 কলিকালে হরি খেল কুক অবতার ॥
 নৃপতি হুসেন সাহ পৌড়ের ইন্দর ।
 তান হক্ সেনাপতি হওন্ত লঙ্কর ॥

লঙ্কর পরাগল খান মহামতি ।
 স্বর্ণ বলর পাইল অধ বায়ু গতি ॥
 লঙ্করী বিবর পাই আইবস্ত চলিয়া ।
 চাটিগ্রামে চলি খেল হরষিত হৈয়া ॥
 পুত্র পৌড়ে রাজা করে খান মহামতি ।
 পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি ॥

কবীন্দ্র বে, গ, পুঁথি ১ পত্র ।

পরাগল খাঁর পিতার নাম রাস্তি খাঁ ও পুত্রের নাম ছুটি খাঁ, এই পুঁথিতেই উল্লেখ আছে। কবীন্দ্র স্বীয় অনুগ্রাহক খাঁ মহাশয়ের গুণ প্রতি পত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, সময়ে সময়ে উচ্ছলিত কৃতজ্ঞতা রসে পয়ারের বাঁধ ছুটিয়া গিয়াছে, পদ কোথায় দাঁড়াইয়াছে দেখুন;—

“ক্ষৌণী করতক শ্রীমান দীন দুর্গতি বারণ ।

পুণ্যকীর্তি গুণান্বাদী পরাগল খান ।” বে, গ, পুঁথি ৮৮ পত্র ।

পরাগলী মহাভারত প্রায় ১৭০০০ শ্লোকে পূর্ণ। এ পুস্তক খানা উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক; শুনিয়াছি পরাগল খাঁর বংশ এখনও বর্তমান ও তাঁহার অবস্থাপন্ন লোক। ইহা প্রথমতঃ তাঁহাদেরই কার্য্য।

চট্টগ্রামের প্রাচীন ভাষা স্থলে স্থলে এত জটিল যে, গবেষণার দস্ত ভাঙ্গিয়া যায়, অর্থ পরিগ্রহ করা যায় না; সহজ স্থল বাছিয়া কবীন্দ্রের কবিত্বের নমুনা দেখাইতেছি।

দ্রৌপদীর বিরাট নগরে আগমন ।

ভার পাছে দ্রৌপদী সৈরঙ্গীরূপ ধরি ।
 অধিক মলিন বস্ত্রে গেলা একেশ্বরী ॥
 দূর হৈতে যার খেল ত্রিসিত হরিণী ।
 নগরের নারী সব পুছন্ত কাহিনী ॥
 দ্রৌপদী বোলেস্ত সৈরঙ্গী মোর নাম ।
 দ্রৌপদীর পরিচর্যা কৈলু অমুগাম ॥
 অন্তঃপুর নারী বত উত্তর না পাইল ।

হৃদেবা দেবীএ তাকে সাদরে পুঁছিল ॥
 সত্য কহ আক্সাতে(১) কপট পরিহারি ।
 কি নাম তোমার কহ কাহার বরনারী ॥
 দুই উর গুরু তোর অতি হুলিলিত ।
 নাতী গভীর তোর শাক্য হুলিলিত ॥
 দশন ডালিষ বিজুলি নরন ।
 রাজার মহিষী যেন সব হুলক্ষণ ॥

‘আদি’ স্থানে ‘আদি’ ও ‘ভূমি’ স্থানে ‘ভূমি’ পূর্ণ বস্তুর প্রাচীন ভাবত পুঁথিতেই । সঙ্গর রচিত ভারতের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে ও তাহাই দৃষ্ট হয়। শুধু বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের কাপিতে ‘আদি’ ‘ভূমি’ রূপ পাইয়াছি।

কিবা গন্ধর্কের তুষ্টি হয়সি বনিতা ।
 নাগ কস্তা তুষ্টি কিবা নগর দেবতা ॥
 বিদ্যাধরী কিবা তুষ্টি কিম্বরী রোহিণী ।
 অমুসুয়া কিবা তুষ্টি উর্ধ্বাণী মানিনী ॥
 ইন্দ্রের ইন্দ্রানী কিবা বরুণের নারী ।
 তোক্ষাক্ষপ দেখি আক্সি লইতে না পারি ॥
 হৃদেকার বচন যে শুনিয়া তৎপর ।
 সেইধামে হ্রোপদীএ দিলেন্ত উত্তর ॥
 আক্সি দেব কস্তা নহি গন্ধর্কের নারী ।
 সহজে সৈরজ্ঞী আক্সি কেশ কর্ত্ত করি ॥
 মালিনী মোহোর নাম হ্রোপদী ধরিল ।
 তোক্ষাকে সেবিত মোর হৃদয় বাঞ্ছিল ॥
 তে কারণে আইনুঁ হেথা বিরাট নগর ।
 সত্য কথা কৈন এহি তোক্ষার পোচর ॥
 হৃদেকাএ বোলেন্ত শুনহ বর নারী ।
 মাথে করি তোক্ষারে রাখিতে আক্সি পারি ॥
 নারী সব তোক্ষা দেখি পাসরিতে নারে ।
 কেমত পুরুষ আছে ধৈর্য্য রাখিবারে ॥
 রাজাএ দেখিলে তোক্ষা মজিবেক মন ।
 বল করি ধরিতে রাখিবে কোন জন ॥
 আপন কণ্টক আক্সি আপনে রোপিব ।
 মুত্ৰাএ ধরিলে যেন বৃক্ষ আরোহিব ॥
 কর্কটীর গর্ত্ত যেন মুত্ৰার কারণ ।
 তেনমত দেখি আক্সি তোক্ষারে ধারণ ॥”*

কবীন্দ্র বে. গ. পুঁথি ৫৭ পত্র ।

শ্রীহরির রূপ বর্ণন ।

পরিধান পীতবর্ণ কুহুম বসন ।

নবমেঘ শ্রাম অঙ্গ কমল লোচন ॥

মেঘের বিদ্যাত ভুলা হসিত মুখত ।
 শংখা চক্র গদা পদ্ম এচারি করত ॥
 শিরেতে বান্ধিছে চূড়া মালতী মালাএ ।
 দেখিয়া মোহন বেশ পাপ দূরে ধাএ ॥ ৫৫ পত্র ।

ভীষ্ম পর্বের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ ।

“দেখহ সাতাকি মুঁঞি চক্র লইনু হাতে ।
 ভীষ্ম হ্রোণ কাটরা পাড়িমু রথ হৈতে ॥
 বৃতরাষ্ট্র পুত্র সব করিমু সংহার ।
 যুধিষ্ঠির নৃপতিক দিমু রাজাভার ॥
 এ বলিয়া সাতাকীরে করি সম্বোধন ।
 হস্তেত লইল চক্র দেব জনার্দন ॥
 সূর্য্যের সমান জ্যোতি সহস্র বজ্রসম ।
 চারি পাশে ক্ষুর তেজ যেন কাল্‌ বম ॥
 রথ গৈতে কাল দিয়া চক্র লৈয়া হাতে ।
 ভীষ্মক মারিতে জাএ দেব জগন্নাথে ॥
 কৃষ্ণ অঙ্গে পীতবাস শোভিছে তখন ।
 বিদ্যাত সহিত যেন আকাশে শোভে ঘন ॥
 দেখিয়া সকল লোক বলিল তখন ।
 কৌরবের ক্ষয় আজি দেখিএ লক্ষণ ॥
 পদ ভরে কৃষ্ণের কম্পিত বহুমতী ।
 গজেন্দ্র ধরিতে যেন জাএ হৃগপতি ॥
 সজ্জস না করে ভীষ্ম হাতে যত্নঃপর ।
 নির্ভএ বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥
 শ্রীযুত পরাগল খান গম্বিনী ভাস্কর ।
 কবীন্দ্র কহন্ত কথা শুনন্ত লক্ষর ॥ ১০৫ পত্র ।

* কবীন্দ্র সংস্কৃত হৃপতিত ছিলেন, তিনি স্থানে স্থানে মূল্যের প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন। সেকালের অনুবাদ-প্রণেয় পক্ষে ইহা কম ঘোরতর কথা নহে। স্থানাক্রমে সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়া বিশেষরূপে তুলনা করিতে পারিব না। হ্রোপদীর বিরাট নগরে আপন

পরাগল খাঁর মৃত্যুর পরে • তৎপুত্র ছুটি খাঁকে সম্রাট হুসেন সাহ সেনাপতির পদে বরণ করেন। ছুটি খাঁর গৌরব কবীন্দ্র বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

“তনয় যে ছুটি খান পরম উজ্জ্বল ।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল ॥” বে, গ, পুঁথি ৮৮ পত্র ।

ছুটি খাঁ ও পিতার দৃষ্টান্তানুসারে শ্রীকর মন্ডীকে অশ্বমেদ পর্বের অনুবাদ করিতে আদেশ করেন; এই কবির কল্পনা বৃক্ষবাহী লতার দ্বারা আকাশ ছুঁইতে উচ্চক । ইনি স্বীয় প্রভুর মনস্তাটী কিরূপে করিতে হয় বিশেষরূপে জানিতেন । কল্পনার তৈলাধার মুক্ত করিয়া ইনি ছুটি খাঁর পদ সেবা করিয়াছেন । আমরা সাহিত্য পত্রিকায় * যাহা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, সেই অংশ পুনঃ এস্থলে ও উদ্ধৃত করিতেছি,—

নসরত সাহ ভাত † অতি মহারাজা ।

সামবৎ নিতা পালে সব প্রজা ॥ •

নৃপতি হুসেন সাহ হএ ক্রিতিপতি ।

সামদান নওভেদে পালে বহুমতী ॥

তান এক সেনাপতি লক্ষর ছুটিখান ।

ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান ॥

চাটগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে ।

চন্দ্রশেখর পর্বত কলারে ॥

অল্প কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা জৈমিনি ভারত হইতে নহে, মূল বাসের মহাভারত হইতে উদ্ধৃত হইল, পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন ।—

সুদেষ্ণোবাচ । •

বৃদ্ধি দ্বাং বাসরোং বৈ সংশরো মে ন বিদ্যতে ।

ন চেমিচ্ছতি রাজা দ্বাং গচ্ছৎ সর্কেণ চেতসা ॥

দ্বিরো রাজকুলে বাশ্চ বাশ্চেমামম বৈশ্বনি ।

এসক্তাদ্বাং নিরীকন্তে পুংসং সৎ কং ন মোহরেঃ ॥

বৃক্ষান্দাবহিতান পশ্ত বইমে মম বৈশ্বনি ।

জে হপি দ্বাং সন্নমন্তীং পুংসং সৎ কং ন মোহরেঃ ॥

রাজা বিরাটঃ হুজ্রোণি দৃষ্ট্বা বপুঃসামুখম্ ।

বিহার মাং বরারোহে দ্বাং গচ্ছৎ সর্কেণ চেতসা ॥

অথারোহেৎ বৃথা বৃক্ষানবধায়ৈবাস্তানো নয়ঃ ।

রাজবৈশ্বনি তে শুভে অহিতঃ স্তান্তথা মম ॥

বখাচকর্কটকী গর্ভমাধস্তে মৃত্যুমান্বনঃ ॥

তথাবিধমহং মন্তে বাসন্তব শুচিস্মিতে ॥”

* সাহিত্য, অগ্রহারণ ১৩১১ ।

† নসরত সাহ চটগ্রামে আনিয়াছিলেন তাই তাঁহার পিতা আপেক্ষা তিনি সেদেশে বেশী পরিচিত ছিলেন এবং সেই জন্য কবি পুত্রের নামে পিতার পরিচয় দিতেছেন । নসরত সাহ বঙ্গ সাহিত্যের উৎসাহ বর্ধক ছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে; আমরা কব পদাবলীতে ও নসরত সাহের উল্লেখ দেখিতে পাই “সে যে নদিয়া সাহ জানে, বাসে মনন বাসে ।” (সাধনা আবেণ ১৩০০, ২৭২ পৃঃ ।)

চন্দ্রলোক পিরি তার পৈত্রিক বসতি ।
 বিধিএ নিখিল তাক কি কহিব অতি ॥
 চারি বর্গ বসে লোক সেনা সন্নিহিত ।
 নানান্তরে প্রজা সব বসয়ে তথাত ॥
 কণী নামে নদীএ বেষ্টিত চারিধার ।
 পূর্বদিশে মহাগিরি পার নাহি তার ॥
 লঙ্কর পরাগল খানের তনয় ।
 সমরে নির্ভেদ ছুটিখান মহাশয় ॥
 আক্কাহুলখিত রাহ কমল লোচন ।
 বিলাস হনয়ে মত্ত গজেন্দ্র গমন ॥
 চতুষ্ঠি কলা বসতি গুণের নিধি ।
 পৃথিবী বিখ্যাত সে যে নির্ঝাইল বিধি ॥
 দাতা বলি কর্ণ সম অপর মহিমা ।
 শৌর্যে বীর্যে গাভীর্যে নাহিক উপমা ॥
 তাহান লত গুণ শুনিয়া নৃপতি ।
 সমাদিয়া আনিলেক কুতূহল মতি ॥
 নৃপতি অগ্রত তার বহল সম্মান ।
 ঘোটক আসাদ পাইল ছুটি খান ॥
 লঙ্করী বিষয় পাইয়া মহামতি ।
 সামদান দণ্ড ভেদে পাশে বহুকহী ॥

ত্রিপুর নৃপতি তার ডরে এড়ে দেশ ।
 পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥
 গজবাহি কর নিয়া করিল সম্মান ।
 মহাশয় মধ্যে তাঁর পুরীর নির্মাণ ॥
 অদ্যপি ভয় না দিল মহামতি ।
 তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি ॥
 আপনে নৃপতি সন্তপিয়া বিশেষে ।
 সুখে বসে লঙ্কর আপনার বেশে ॥
 দিনে দিনে বাড়ি তার রাজ সম্মান ।
 যাবত পৃথিবী থাকে সন্ততি তাহান ॥
 পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভাখণ্ড মহামতি ।
 একদিন বসিলেক বাক্য সংহতি ॥
 গুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা ।
 মহাবুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা ॥
 অবশেষ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয় ।
 সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় ॥
 দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পরায় ।
 নকারোক কীর্তি ঘোর জগত সংসার ॥
 তাহান আদেশ মালা মস্তকে ধরিয়া ।
 শ্রীকরনন্দী কহিলেক পরায় রচিয়া ॥

ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, সে শুণি ছুটি খাঁর পদে পুষ্প বিবদলে অর্চনা । ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন এগুলি স্মৃতি ফুলের অঞ্জলি; সে সময়ে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ গুপ্তমাণিক্য ও তাঁহার সেনাপতি মহাবীর চন্দ্রচাঁদ রণক্ষেত্রে মুসলমানগণকে দেখাইয়াছিলেন—ত্রিপুর পাহাড়ের তীব্র বায়ু তাঁহারা সহ করিতে অশক্ত । তথাপি আমরা কবির কল্পনাকে ধন্যবাদ দিব; সত্য হইতে মিথ্যার ছবিই কবির তুলিতে সক্ষম হয়, চার্লস সেকেন্ডের কবি স্বীয় প্রভুর নিকট অজ্ঞান বদনে একথা স্বীকার করিয়াছিলেন ।

নন্দী কবির কবিত্ব একটুকু ব্যঙ্গ মিশ্রিত হইয়া মধ্যে মধ্যে বসন্ত মনোরম হইয়াছে, আমরা ভীম ও কৃষ্ণের উত্তর প্রত্যুত্তর উল্লেখ করিতেছি।—ভীম সুবানারের পুরী হইতে অশ্ব আনার জন্য মনে

হইলে শ্রীকৃষ্ণ এ প্রস্তাব অমুমোদন করেন নাই। অনেকগুলি যুক্তির মধ্যে এই একটি,—

“বহু ভক্ষ হএ ভীম দুঃখ কলেশ্বর ।

হিঙ্কিষা রাক্ষসী ভাৰ্যা বাহার সহচর ।

ভীমের উত্তর ।

কৃষ্ণের বচনে ভীম কবির বলিল ।
মোকৈ মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল ।
তোম্কার উদরে যত বসে ত্রিভুবন ।
আজ্ঞার উদরে কত অন্ন ব্যঞ্জন ।
সংসার উপালন্ত সব খাইলা তুমি ।

তাহা হৈতে বহু ভক্ষকর বোলে আশি ।
ভক্ষক কুমারী তোমার ঘরে জাম্বুবতী ।
তাহা হৈতে অধিক বোল হিঙ্কিষা যুবতী ।
তুমি নারীজিৎ না হও আশি নারীজিৎ ।
আপন না দেখিয়া মোক বল বিপরীত ।”

ভাষার জটিলতা হেতু উদ্ধৃত ছন্দগুলিতে তোতলার রাগ মনে পড়ে। কাশীদাস এস্থল সম্বন্ধ করিয়াছেন, কিন্তু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণত্ব হ্রাস হইয়াছে।

‘একখানা প্রাচীন পরাগলী ভারতে আমরা একস্থলে এইরূপ ভণিতা পাইয়াছি,—

“কহে কবি গঙ্গানন্দী, লেখক শ্রীকর নন্দী” এই গঙ্গানন্দী আবার কে? শ্রীকর নন্দীই বা এস্থলে কবির আসন হইতে লেখকের আসনে নামিলেন কেন? হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির আলোচনায় নানা রূপ জটিল প্রশ্নের উদয় হয়, অতীতের অন্ধকারে কল্পনার তীর নিক্ষেপ ভিন্ন অনেক সময়ই পথ পরিষ্কার করিবার অস্ত্র উপায় দেখা যায় না।

সম্ভব, কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দী ও পরবর্তী অনুবাদকারিগণের প্রায় তাবতেই জৈমিনি সংহিতা দৃষ্টে অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছেন; ব্যাসের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক অতি অল্প, মধ্যে মধ্যে দোহাই আছে এই পর্য্যন্ত। বঙ্গের বৃহৎ-সমীর-স্পর্শ-স্থখে কি ব্যাস ঋষি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন? জৈমিনির প্রতি সকলের লক্ষ্য হইল কেন?

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, বাহার হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকারী, জৈমিনি তাঁহারের অগ্রণী; তাঁহারই শিষ্য ভট্টপাদ রাজা স্মৃতিধার সভায় বৌদ্ধত্বল বিজয় করেন। শঙ্কর ইহাদের পরবর্তী। জৈমিনি ভারত-গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করেন; মহাভারত শাস্ত্রকারদিগের মতে দুস্তর ভবসাগর পার হইবার একমাত্র সেতু, কিন্তু ব্যাসের বিরাটোর্ণব সম্ভরণ করা সহজ নহে; তাই জৈমিনি সহজ পথের আবিষ্কার করিয়া ভবান্বিতের বিপন্ন পথিকদিগকে

জ্ঞাপ করিলেন। জৈমিনি-ভারত দেশময় প্রচলিত হইয়াছিল; অনেক বাঙ্গলা প্রাচীন পুঁথিতে জৈমিনি-ভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা চণ্ডী-কাব্যে শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভে,—

“জৈমিনি-ভারত, হৃত, তবে পড়ে মেঘদূত,
নৈষথে কুমার সম্ভবে।”

অম্বুবাদ-শাখা—(গ) মালাধর বসু।

ফুলিন গ্রামের বসুবংশ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, গ্রামখানি চূর্ণ-স্বয়ংক্রিয় ছিল; এই পঞ্চের স্বাক্ষিগণ বসু মহাশয়দিগের নিকট হইতে ভূরি প্রাপ্ত না হইলে জগন্নাথ তীর্থে বাইতে পারিতেন না। মালাধর বসু ও হুসেন সাহাৰ মন্ত্রী গোপীনাথ বসু (উপাধি পুরন্দর ঠাঁ) এক সময়েই লোক। বসু পরিবার বৈষ্ণব-ধর্মে বিশেষ অবস্থাবান ছিলেন; মালাধর বসুর পৌত্র বসুরামানন্দের নাম বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত।

মালাধর বসু আদি বসু হইতে অধস্তন ২৪শ পুরুষ; ইহার পিতার নাম ভগ্নীরথ বসু ও মাতার নাম ইন্দুবতী দাসী।

মালাধর বসু হুসেন সাহ হইতে ‘গুণরাজ ঠাঁ’ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি—সেকালের উপাধিগুলি কিছু অল্পত রকমের ছিল; ‘পুরন্দর ঠাঁ’, ‘গুণরাজ ঠাঁ’ এইসব রাজ-দত্ত খেলাৎ। আমরা একথানা প্রাচীন কৃষ্ণিবাসী রামায়ণে কৃষ্ণিবাসকে ‘কবিশ-ভূষণ’ উপাধি-বিশিষ্ট দেখিয়াছি, এই ‘কবিশ-ভূষণ’ কি রাজ-দত্ত উপাধি অথবা পুঁথি-লেখকের জ্ঞান প্রশংসাপত্র, স্থির করিতে পারিলাম না; বাহা হউক ‘গুণরাজ’ উপাধি দেশে প্রচলিত ছিল; আমরা বঙ্গীকর কবিকে ও ‘গুণরাজ, উপাধিযুক্ত পাইয়াছি। টুলে পণ্ডিতগণ দক্ষিণাপ্রাপ্ত হইয়া কাণাকে ও কলকাতা নাম দিতে পারেন কিন্তু গৌড়ের সম্রাট নিগুণকে গুণরাজ উপাধি দেন নাই; বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে মালাধর নিজকে ‘নিগুণ’ অথবা প্রকৃতি সংজ্ঞায় জ্ঞাপন করিয়াছেন।

১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খৃঃ) মালাধর বসু ভাগবতের বঙ্গানুবাদ প্রকৃত হন ও ৭ বৎসরে দশম ও একাদশ স্কন্ধের অম্বুবাদ

করেন।* এই অনুবাদ-গ্রন্থের নাম ‘ত্রীকৃষ্ণ-বিজয়’, কোন কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে ‘গোবিন্দ-বিজয়’ নাম দৃষ্ট হয়; শেষ স্তম্ভে ত্রীকৃষ্ণের দেহ ত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্যই বোধ হয় ‘ত্রীকৃষ্ণ-বিজয়’ নাম দেওয়া হইয়াছে, প্রাচীনকালে ‘মৃত্যু’, বা ‘যাত্রা’ এই দুই অর্থে ‘বিজয়’ শব্দ ব্যবহৃত হইত। ভগবতী যেদিন পৃথিবী হইতে কৈলাস গমন করেন সেইদিন ‘বিজয়ার দিন’ নামে পরিচিত।

ত্রীকৃষ্ণবিজয়ের কবি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। মূল গ্রন্থের সঙ্গে ত্রীকৃষ্ণ-বিজয় মিলাইয়া দেখিলে অমূল্য হইবে, মালাধর বসু শুধু কথকদিগের মুখে শুনিয়া ভাগবত শ্রবণ করেন নাই, তিনি স্বয়ং ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। সেকালে ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া অনুবাদ করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না; ‘ত্রীকৃষ্ণ-বিজয়’ ও সেরূপ অনুবাদ নহে, তবে মূলের সঙ্গে কতকটা ভাষাগত সংশ্রব না আছে এমন নহে; নিম্নে উদাহরণরূপে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

মূল হইতে অনুবাদিত;—

(১) “কোন সময় কোনেই প্রথম ভোজ্য করিবার মানসে প্রভাতে হরি গাজোখান করিলেন, এবং বৎসপালক বয়সদিগকে প্রবোধিত করিয়া মনোহর শৃঙ্গ ক্রমি করিতে করিতে বৎস সকলকে অগ্রে করিয়া নির্গত হইলেন।

কতিপয় বালক কদম্বী বাদ্য করিতে করিতে, কতকগুলি শৃঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে, কতিপয় অর্ডক ভৃঙ্গলহ গান করিতে করিতে, অস্ত্র বালকেরা কোকিল-সঙ্গে কলরব করিতে করিতে খেলা করিতে লাগিল। অপর শিশুরা পক্ষীদিগের ছায়ায় ধাবন, হংসদিগের সহিত গমন, বক সঙ্গে উপবেশন, ও ময়ুর সহ নৃত্য প্রবৃত্ত হইল। আর কোন কোন বালক বানরশিশুদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।” শ্রীমদ্ভাগবত । ১০ম স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়।

ত্রীকৃষ্ণ বিজয় + ;—

“প্রভাতে ভোজন করি শিক্ষা বাজাইয়া।

শিখে লিখে চলে বত বাজুর ঢালাইয়া।

একত্র হইল সব বসুনার তীরে।

নানামতে ক্রীড়া করি বায় দামোদরে।

“তেরশ পঁচানই শকে এই আরম্ভন।

চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।” ত্রীকৃষ্ণ বিজয়।

মুদ্রিত ত্রীকৃষ্ণবিজয় আমার নিকট আপাততঃ নাই। পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত প্রায় বইখানার প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথি হইতে এই অংশ এবং পরবর্তী অংশ উদ্ধৃত হইল।

কথাতে কোকিল পক্ষীগণে নাদ করে ।
তার সঙ্গে নাদ করে দেব গদাধরে ॥
কথাতে মর্কট শিশু লাক দেহি রত্নে ।
সেই মতে যায় কুক বালকের সঙ্গে ॥
কথাতে ময়ূর পক্ষী মধু নাদ করে ।

সেইমত নৃত্য করে দেব কামোদরে ॥
কথা কথা পক্ষীএ আকাশে উড়ি বাই ।
তার ছায়া সঙ্গে নাচে রামকাটুট ॥
কথা বা সুগন্ধি পুষ্প তুলিয়া মুরারি ।
কত হৃদে মস্তকে অবগে কেশ পড়ি ॥”

মূল হইতে অনুবাদিত ;—

(২) কোন কোন গোপস্বনা গো দোহন করিতেছিল, তাহারা দোহন বিসর্জন পূর্বক সমুৎসুক হইয়া গমন করিল । অল্পমাত্র গোপী অন্ন পাকানন্তর মহানসে রাখিয়া স্থালীস্থ জল নিঃসারণ করিতেছিল, সমুদায় কাথ নির্গম প্রতীক্ষা করিতে পারিল না । অপরাগোপী গোমুখ কাথস্থ ব্রহ্মন করিতেছিল, পক্ষ অন্ন না নাবাইয়াই চলিল । কোন কোন গোপী গৃহে অন্নাদি পরিবেশন করিতেছিল, কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইতেছিল, অল্প কয়েক জন পতি স্তম্ভবায় রত ছিল, তাহারা তত্তৎ কর্তব্য তাগ করিয়া গেল । অল্প গোপান্ননাশণ ভোজন করিতেছিল, গীত শুনিবা মাত্র আহার তাগ করিয়া চলিল ।” ১০ম স্কন্ধ, ২৯ অঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে,—

সবার সহয়ে কাহু প্রবেশ করিয়া ।
বেণুধারে গোপীচিহ্ন আনিল হরিয়া ॥
ছাওয়ালের স্তন পান করে কোন জন ।
নিজপতি সঙ্গে কেহ করেছে শরন ॥
গাভী দোহায়েন্ত কেহ দুগ্ধ আর্জনে ।
গুরুজন সমাধার করে কোহু ঐশে ॥
ভোজন করএ কেহ করে আচমন ।
রন্ধনের উদ্যোগ করয়ে কোহু জন ॥

কাঁধা হেতু কেহ কারে ডাকিবার যায় ।
তৈল দেহি কোহুজন গুরুজন পাঞ ॥
কেহ কেহ পরিবার জনেয়ে প্রবোধে ।
কেহ ছিল কার কাঁধা অনুরোধে ॥
হেনহি সময়ে বেণু শুনিল অবগে ।
চলিল গোপীকা সব যে ছিল বেমনে ॥

আমরা বাছিয়া উঠাই নাই; মূলের সঙ্গে মোটামুটি বেশ ঐক্য আছে, কেবল রাধিকার প্রসঙ্গ ভাগবত-বহির্ভূত ।

এই কুমারী প্রথমতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও আর কয়েক থানা সংস্কৃতগ্রন্থ আশ্রয় করিয়া শুভ দিনে আখ্যাবর্তের দেব-মণ্ডপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন; চির-শ্রদ্ধেয় দেব দেবীগণ প্রকৃতির এই আভরণ-হীনা নয় সৌন্দর্য্যময়ীর আঁড়ালে গড়িয়া গেলেন; সদ্য-চ্যুত অনাঘাত মালতী পুষ্পের স্তার এই কুমারীকে পাইয়া কবি ও ভক্ত আকর্ষিত হইল; চিররাধ্যা রূপা ও কাঞ্চী উদ্দেশে আকৃত পুশ্পালা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে দোলাইয়া দিল । বসন্তের কুসুম-সিংহাসনে; কুম পঙ্কজ ও চন্দনাত্র তুলসী-দলে সজ্জিত হইয়া

কুমারী অধিষ্ঠিত হইলেন; প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যের সার সৌন্দর্য্য—ঐরাধিকার চরণ কমলের স্পর্শ। রাই কামু নাম বঙ্গ-সাহিত্য হইতে বাদ দিলে এই দেশের অতীত ও ভাবী শত সহস্র উৎকৃষ্ট গীতের শিরে বজ্রাঘাত করা হয়; এই দেশে সেই সব গীতের তুল্য মনোহারী কিছু হয় নাই।

দানলীলা অধ্যায়ে কবি মালাধর বসু এই নূতন সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করিয়াছেন। ভাগবতের গোপীগণ ঐক্যকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিতেছে, তাঁহাদের প্রেম ঐক্যের দেব শক্তিতে বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, সুতরাং তাঁহাদের কতকাংশে বিশ্বয়ের উচ্ছ্বাস ভিন্ন কি? কিন্তু তুল্য জ্ঞান না হইলে বাছ জড়াইয়া আলিঙ্গন করা যায় না, হাত বাড়াইয়া ফুল ফুলটি গদে রাখিয়া আসা যায় মাত্র। ভক্তের মত ভক্ত হইলে, দেবতা ও ভক্তের আসন একখানে, কারণ ভক্ত ভিন্ন দেবতা কাষ্ঠ-পুতলি মাত্র, চকোর এবং চক্রে প্রকৃত প্রেম হয় না; চণ্ডীদাস বলিয়াছিলেন—

“কি ছার চকোর চাঁদ,—ছহঁ সম নহে।”

ভাগবতের অসম্পূর্ণ অংশ মালাধর বসু এই স্থলে পূরণ করিয়াছেন। দানলীলা ও পার খণ্ডে; রাধিকা ও গোপীগণ ঐক্যের সঙ্গে কোতুক করিতে ও তাঁহাকে মান ভরে গালিদিতে শিখিয়াছে; এখানে ঐক্য পীত ধরা পরিহিত বংশীধারী একটি প্রস্তর মূর্তি নহেন;—তিনি প্রেমিক শিরোমণি, চতুর শিরোমণি; ভাগবতের ঐক্য গোপীগণকে প্রেম দান করিয়া অমৃগ্হীত করেন, ঐক্য-বিজয়ের নায়ক প্রেম দিয়া যেরূপ অমৃগ্হীত করেন, প্রেম পাইয়া ও সেইরূপ অমৃগ্হীত হন।

দক্ষিণা পবনে নৌকা টলমল করিতেছে তখন,—

“কি হৈল কি হৈল বলি কাঁধে পোপ নারী।”

এবং “কাঁধকে রুমাল করি হাসয়ে মুরারি।” ঐক্য বিজয়।

এর পরে গোপীগণ ঐক্যকে এ শব্দট হইতে উদ্ধার করিতে বলিতেছেন, যে যে উৎকোচ দিবেন এই লউন তার ফল;—

“কেহ বলে পরাইবু পীত বসন।

কেহ বলে পরাইবু অলঙ্কার রতন।

কেহ বলে বনমালা রাখি বিনু গলে।

কেহ বলে হার দিবু কোহু নখী জল।

কটিতে কল্লণ দিবু বলে কোহু জন।

কেহ বলে পরাইবু অলঙ্কার রতন।

শীতল বাতাস করিবু অঙ্গ সুদার।

কেহ বলে হৃদয় চন্দন দিবু গাধ।

কেহ বলে চুড়া বানায়িমু নানা ফুলে ।

মকর কুণ্ডল পরাইমু ঐতি ফুলে ।

কেহ বলে রসিক হৃদয় বড় কাণ ।

কপূর তাম্বুল সমে জোগাইব পান ।”

শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এসব কিছুই চান না । গোপীগণের ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার ও আশা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে—তিনি বলিলেন,—“প্রথমে মাগিএ আমি যৌবনের দান ।” রাধিকা জুজ্বা, তিনি এই অবনতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া—

“কাণ বলে সত্য কহি বিনোদিণী রাই ।

নবীন কাণ্ডারী আমি নোকা নাহি বাই ।” শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ।

এই ধানে প্রাণের খেলা, রসের এই অপ্রক্ষুট মাধুর্য্য যাহা পদকর্তাগণ প্রক্ষুট করিয়াছেন, ভালবাসার মাহাত্ম্যে আরাধ্য ও আরাধকের এই গূঢ় চিত্ত-সংযোগ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে অভিনব বস্তু । তাই কাব্যের এই স্থানের মৌলিক রসধারায় অম্বাদের কৃত্রিমতা নাই ; ভালবাসার শাস্ত্র ভাগবতের পর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে আর একটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে । শ্রীচৈতন্য দেব যে সমস্ত ভাষা গ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া সুখী হইতেন শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় তাহার অন্ততম ।

৩—লৌকিক ধর্ম্ম-শাখা ।

(ক)—লৌকিক ধর্ম্মের উৎপত্তি ।

(খ)—চাঁদ সদাগর, বেহুলা ও মনসা ।

(গ)—কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও কবি

জনार्দন প্রভৃতি ।

মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, বজ্রী, সত্যনারায়ণ, দক্ষিণের রায় ই হারা বাঙ্গালীর ঘরের দেবতা । বঙ্গভাষাই ই হাদের শাস্ত্র লিখিত ; বজ্রীর গৃহস্থ বধূসংগই ই হাদের পূজার উৎকৃষ্ট পুরোহিত, ই হাদের ছড়া পাঁচালী মুখস্থ করা গৃহস্থ বধূগণের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণিত ছিল ; ই হারা কেহ সপ্তাহে কেহ মাসান্তে ষাট বাঙ্গালীর ঘরে এখনও পূজা পাইয়া থাকেন । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এইসব দেবতার ছড়া পাঁচালী প্রথমে নগণ্য

প্রতিষ্ঠিত হইয়া কালসহকারে যুগে যুগে কবিগণের হস্তস্পর্শে বিশাল কাব্যরূপে বিকাশ পাইয়াছে; ক্ষমতাপন্ন শেষ কবি বংশের ভাগটা নিজেই সমস্ত একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। এইসব ছড়া পাঁচালী শিশুর ক্রীড়নকের জায় নগণ্য, কিন্তু এই উপকরণ রাশির আয়তন বৃদ্ধি করিয়া কবিগণ কিরূপে উৎকৃষ্ট কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ-মন কিরূপে যুগ-ব্যাপী চেষ্টায় অতি ক্ষুদ্র হইতে ক্রমে অতিবিশাল সৌন্দর্যের পট আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা পাঠ করাতে কেবল কাব্যামোদীর পরিতৃপ্তি হইবে না, সাইকলজির পাঠক ও মনের গতি-বিধির একটি আশ্চর্য্য ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করিয়া নব শিক্ষা লাভ করিবেন।

লৌকিক-দেবগণের পূজা প্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। যেখানে আমরা দুর্জল হইয়া পড়ি, সেইখানেই একটি দুর্জলের সহায় দেবতার আবশ্যক হয়। শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত চিন্তিত মাতা কি মাতামহীর দুর্জলতাস্বত্রে বশী কল্পিত হইলেন। চণ্ডিকা ও হরি চির-প্রসিদ্ধ দেবতা; কিন্তু বিপদনিবারনার্থ ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি-কল্পে এই দুই দেবতা ঈশ্বর নাম ও ভাব পরিবর্তন করিয়া দুর্জলের সহায়রূপে উপনীত হইলেন; একজনের নাম হইল মঙ্গলচণ্ডী, আর একজনের নাম হইল সত্যনারায়ণ। এ চণ্ডী শুধু বিপদ-ত্রাণ-কারিণী; ইনি বসন্তকালে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যে মধু-মুষ্টি ধারণ করিয়াছিলেন, কিম্বা যে বেশে বৎসরান্তে পিত্রালয়ে আগমন করেন, এখানে সে বেশে আসেন নাই—এখানে ইনি শুধু বিপদ-বারিণী। সত্য নারায়ণ ননীচোরা গোপাল হইতে পৃথক্ বস্তু; ইনি অর্থ সম্পদ দাতা, কুবের কি ম্যামন স্থানীয়।

বঙ্গদেশ যখন নীল সমুদ্র-গর্ভে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ-পুঞ্জের সমষ্টি ছিল এবং আর্য্যগণ যখন এই রাজ্যে প্রথম বসতি স্থাপন করেন, তখন সর্প ও ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের এই বনপ্রদেশ অধিকার করিতে হইয়াছিল; সিংহবাহুর জন্ম বৃত্তান্ত মধ্যযুগে কৌতুকবহু গল্প ইতিহাসের পাঠক অবগত আছেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ব্যাঘ্রাদির সঙ্গে যুদ্ধ অনেক স্থানেই লুপ্ত হয়। কালকেতু ও লাউসেনের সঙ্গে ব্যাঘ্র যুদ্ধ চণ্ডীকাব্যে বিশদ মঙ্গলে পাইয়াছি, কুবেরায়নের রায়মঙ্গলে যোদ্ধাদিগের সঙ্গে কুবের ব্যাঘ্র যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এইসব উপাখ্যান বর্ণিত

ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুর সঙ্গে মনুষ্যের আলাপ ব্যবহার বর্ণনায় কবি-কল্পনা অনেক দূর গড়াইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অসির সঙ্গে শূঙ্গ ও নখরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঠিক কল্পনার কথা নহে; এই প্রতিযোগিতায় অসি-অগ্রভাগে শূঙ্গ ও নখর ভগ্ন হইয়াছিল, ও অসিধারীকে শূঙ্গী ও নখিগণ স্বরাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছিল। সভ্যতার দ্বিতীয় পর্যায়ে গুলির মিকট অসি হটয়াছে, হার কবে প্রীতির মিকট অসি, গুলি, মখ, শূঙ্গ সকল অন্তর্হই পরাজয় স্বীকার করিবে।

বঙ্গদেশের রয়েল টাইগারের সঙ্গে বিরোধ করা ও বরং সহজ; অন্ততঃ উভয় পক্ষেরই তুল্য সুবিধাজনক ক্ষেত্রে যুদ্ধ চলিতে পারে; কিন্তু কেউটার দস্ত্র অলক্ষ্যে কাটে। বিশেষতঃ ব্যাঘ্র শুধু ঘনবাসী শূঙ্গ, সর্প গৃহস্থের গৃহ-শূঙ্গ; কোন্ ছিন্ন হইতে বিষ উল্লীর্ণ করিবে নিশ্চয় নাই; এইজন্য ব্যাঘ্রের দেবতা 'দক্ষিণের রাগ' হইতে সর্পের দেবতা 'মনসা'র প্রতিপত্তি বেশী হইয়াছিল।

লৌকিক ধর্ম-শাখা,—

(খ) চাঁদসদাগর, বেহুলা ও মনসা।

মনসা পূজা উপলক্ষ্যে চাঁদসদাগরের চরিত্র বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে পুরুষকারের জীবন্ত আদর্শ। মনসার ক্রোধে ছয় পুত্র বিনষ্ট হইল; 'মহাজান' লুপ্ত হইল, 'সপ্তডিন্দা মধুকর' অমূল্য সম্পত্তি লইয়া জলমগ্ন হইল; এই অসহ্য বিপদে ক্রক্ষেপ নাই, সমকার মর্ষভেদী ক্রন্দনে ও সে চরিত্র হেলে নাই। এই ছত্তর ভব-সাগরে ঝঞ্জে কে পড়ে নাই? কিন্তু চাঁদের উপর যে ঝড় বহিয়াছে সেরূপ অতি বিরল; চাঁদ এই সর্বগ্রাসী তুফানকে উপেক্ষা করিয়া যেরূপ অনড় ও অটলভাবে ঝাঁড়াইয়াছে সেরূপ দৃঢ় অতি বিরল; তাহার দৃঢ় মজ্জাগত সাহসের নিকট কনিওলেমাসের বীরত্বকেও শিশুর উৎসাহ বলিয়া বোধ হয়। চাঁদের নোকা সমুদ্র বক্ষে ঝটিকা-ভাঙিত, জলমগ্ন হইতে উদ্ধৃত; বিপদের মূল মনসা। এই শত্রু তর্কনী বাহু শেষ হইতে তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছেন; চাঁদ এ বিপদে ও হেঁতাল হুঞ্জে নাই,—

‘কিছু যদি বলে পদ্মা রথে করি ভর । •

হেঁতালের বাড়ি স্নেহে কাঁপে ধর ধর ॥

মনেতে ভাবিছ কাণি অন্তরীক্ষে রৈয়া ।

সাহস যদ্যপি থাকে কহ আশু হৈয়া ॥

সোর মন্দ করি যদি সান্নিধ্য পায় ।

তবে কেন কাণা আঁখির ঔষধ না কর ॥

বিজয় গুপ্ত ।

চাঁদ বন্ধুদে পড়িল, লোনা জলে প্রায় সংজ্ঞাহীন, এই অবস্থায় পদ্মা কয়েকটি পদ্ম-ফুল ফেলাইয়া দিলেন ; পদ্মার তাঁহাকে স্মারিতে ইচ্ছা নাই, চাঁদ মরিলে পূজা প্রচলিত হয় না ; চাঁদ সেই অন্ধকার রাত্রেই দীপ্যং বিদ্যুতালোকে মুমূর্ষু অবস্থায় পদ্মফুলের জুপ দেখিয়া আশ্রয় বোধে হাত বাড়াইল ; কিন্তু পদ্ম স্পর্শে পদ্মাবতীর নাম-সংশ্রব স্মরণ করিয়া স্ফুণায় হাত ফিরাইল, লোনা জলে মরিতে ডুব দিল ।

তিন দিন উপবাসের পর চাঁদ বন্ধুগৃহে থাইতে বসিয়াছে ; নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রীর সঙ্গে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত ; ক্ষুধার্ত চাঁদ গণ্ডূষ করিয়া খাওয়া আরম্ভ করিবে, এমন সময় বন্ধু চাঁদকে মনসার সহিত বাদ ক্ষান্ত দিতে উপদেশ দিলেন । “বর্ষের ভাঁড়ায় খাও কাণি” বলিয়া ক্রোধোদ্রত চাঁদ অন্ন ব্যঞ্জনে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল ও নদীর পারে বসিয়া কদলীর পরিত্যক্ত ছোবড়া খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল ।

ছয় পুত্রের শোকে জর্জরিত-চিন্তিত চাঁদ লখিন্দরকে পাইয়া মণি মাণিক্য তুল্য অমূল্য জ্ঞান করিয়াছিল । কিন্তু মনসার সাপু লখিন্দরকে খাইয়াছে ; সনকা শোকে ক্ষিপ্ত, গভীর ক্রোধে ও বিষাদে চাঁদের ললাটে মেঘবৎ ছায়া পড়িয়াছে ; তবুও চাঁদ কাঁদিল না, মনসাকে বধ করিতে হেঁতাল কাঁধে তুলিয়া লইল ।

কিন্তু পদ্ম-পুরাণের শেষ অঙ্কে পরাভব । সে পরাভব ও চাঁদের ভ্রায় বীরের উপযুক্ত । মনসা ইতি পূর্বে কতবার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, একবার এক মুষ্টি ফুল তাঁহার পদে ফেলিয়া দিলেই তিনি পুত্রগুলি বাঁচাইয়া দিবেন, ‘সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর জল’ হইতে তুলিয়া দিবেন কিন্তু চাঁদ বীর হেলে নাই । এই শাজলী তরু কিসে নত হইল ? বেহলার স্নেহ চাঁদবেশে রোধ করিতে পারিল না ; সনকার মর্ষভেদী ক্রন্দন সে উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বেহলা স্নেহী হইয়া ও ভাহারই মত এক জন । সে ছয় মাস স্বামী র গণিত শব্দ করিয়া ভোগ্য ভাসিয়াছে ; সে কত প্রলোভন দলন করিয়া, স্থলকুস্তীর

ও জলকুস্তীরের লেলিহান জীভ ও মুক্ত দশম হইতে একাগ্রতার বলে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কঠোর তপস্যায় স্বগণবর্গকে বাঁচাইয়া আনিয়াছে; সে কোন প্রাণে এমন পুত্র বধুকে বহু-ক্লেশ-অর্জিত স্বগণসহ মৃত্যুর দ্বারে ফিরিয়া যাইতে বলিবে ?

এখানে বিধাতা নীলোৎপল পত্রে শমীতরুচ্ছেদন করিলেন, স্নেহে বশীভূত ততোধিক গুণে চমৎকৃত চাঁদ পদ্মপুরাণের শেষ অঙ্কে অন্তর্নিহিত মুখ ফিরাইয়া বাম হস্তে বিষহরির পদে অঞ্জলি দিলেন। যে হস্তে শিবের পদে অঞ্জলি দানে নিযুক্ত, 'চেন্দ্রমুড়ি কাণী' সে হস্তের অঞ্জলি প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই; এ অঞ্জলি বিষহরির পদে সেবা নহে, ইহা তাঁহার হৃদয়ের দুর্বলতা-জ্ঞাপক নহে; ইহা পতিব্রতা সতী সাধ্বী পুত্র বধুর শিরে আশীর্বাদ; ইহা গুণীর নিকট গুণীর অবনতি; গুণশীলা পুত্রবধুকে চাঁদবেগে কষ্ট দিতে পারেন নাই।

বেহুলা ।

এই স্থানে পাঠকের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আমরা বেহুলার চরিত্র সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিব; বিলাতী এণ্ড্রমেকি, ডিডো, ডেসডেমোনা, জুলিয়েট দেখিয়াছি তথাপি বেহুলার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই; বিলাতী উদ্যানে এমন সুগন্ধি কুসুম দেখি নাই, সতীত্বের এমন উজ্জল পট এমন চক্চিকিলেখা বুঝি আর কোথা ও নাই।

বেহুলা রূপে গুণে অতুল্যা; তথাপি ভাগ্য দোষে বেহুলা বিরূপের রাত্রেই স্বামী-হীনা হইল; স্বামী রাত্রে ক্ষুধায় অন্ন চাহিয়াছিলেন, সতী নেতের আঁচল চিরিয়া অগ্নি জালিয়া, নারিকেল দ্বারা উন্নত প্রস্তুত করিয়া ভাত রান্ধিয়াছিল; একটি একটি করিয়া কৌশলক্রমে তিনটি আপকে বন্দী করিয়াছিল; কিন্তু বিধি লিপি নির্মম, অখণ্ড; ঈষৎ নিজাববোধে বেহুলার চক্ষুপট মুদিত হইয়া আসিয়াছে, কাল সর্প এমন সময় লখন্দরকে দংশন করিল; লখন্দর ডাকিয়া বলিল,—

“ভাগহ ওহে বেহুলা সায়বেগের ধি।

তোরে পাইল কাল নিদ্রা ঘোরে খাইল কি ?”

কেতকা দাস

বেহুলার কাল নিদ্রা ভাঙিয়া গেলা, চমকিত হইয়া যখন

হৃদিতে হাত বাড়াইল তখন আর স্বামী জীবিত নাই, শব শব্দে সিহরিত
হইয়া বেহলা কাদিয়া উঠিল; সেই ক্রমেনে স্বামীর সমকা ছুটিয়া আসিল
ও বেহলার ক্রোড়ে মৃত পুত্রকে দেখিয়া কাদিতে কাদিতে বেহলাকে গালি
দিয়া বলিল,—

“সমকা কাদিয়া দেয় বেহলাকে গালি ।
সিঁতার সিন্দুরে তোর না পড়িল কালি ॥
পরিধার বস্ত্রে তোর না পড়িল ধলি ।
পায়ের আলতা তোর না পড়িল ধূলি ॥

বস্তু কপালিনী বেহলা চিরনী দাতী ।
বিতা মিনে খাইলি পতি না পোষাতে রাতী ॥”
কেতকা দাস ।

কিন্তু বেহলা সে গালি শুনে নাই, স্বামী রাত্রে আলিঙ্গন চাহিয়া-
ছিলেন, লজ্জিতা নববধু লজ্জায় তাহাতে স্বীকৃতা হয় নাই; সেই কথা
স্মরণ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থিতা ও চক্ষু ফাটিয়া জল পতিত হইতেছিল । তারপর
আর এক দৃশ্য । বেহলা কলার মানসে স্বামীর শব ক্রোড়ে করিয়া
ভাসিতেছে; বেহলা এই স্থলে নিরুপমা সুন্দরী । যে স্বামুড়ী গালি দিয়াছিলেন
তিনি সাধিতেছেন,—

সমকা কাদিয়া বলে আলো অভাগিনী ।
এ তিন তুবন মাঝে কোথাও না শুনি ॥
বালিকা যুবতী বুকা যায় পতি মরে ।
বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে ॥

কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাসিবে ।
প্রভাত কাহার বোলে কান্দে ধীরাইবে ॥
কেতকা দাস ।

তাহার ভ্রাতাগণ কাদিতে কাদিতে তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছেন,—

“হরি সাধু বলে ভগ্নি মোর বাক্য ধর ।
সকলের কুলে তুমি লখিলেরে পোড় ॥
এইক্ষণে চল বেহলা মুক্ত সাহের বাড়ী ।
খনি বন্ধন দিব কাঁচা পাটের খারি ॥

শব্দ বদলে দিব সুবর্ণের চুরি ।
সিন্দুর বদলে দিব কাঁড়গের গুরি ॥”
বিজয় ভট্ট ।

কিন্তু বেহলা স্বামীর প্রার্থিত আলিঙ্গন দিয়া কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়াছে,
সে আর এ আলিঙ্গন ছাড়িবে না; শব ক্রমে গলিত হইল,—

“দেখিয়া বেহলা কাদে পায় বড় শোক ।
এ মরায় গায় হানে এক জোক ॥
হইতে নাহি ছাড়ে খাটসেতে লুকার ।
নাহি দি বেহলার কি হবে কলার ॥

* * * *
অবিরত নেত্র জল নিবারিতে নারি ।
নোয়াদার ঘাটে ভাসে বেহলা সুন্দরী ॥
কেতকা দাস ।

এই দুঃখের অবসায় একদিনে জলজন্তুগণ শব কাড়িয়া যাইতে আসিয়াছে,
অপরদিনে;—

“পথের পথিক রক্ত লব বৈরা যায়।
বেহলার রূপ দেখি ঘন ঘন চায় ॥

ত্রিভুগং মোহিনী কেন মরা লৈয়ে কোলে।
কলার মানসে ভাসে ডেউর হিজোলে ॥
কেতকা দাস।

কত লোকে তাঁহাকে লাভ করিতে হাত বাড়াইতেছে, সতীত্বের জোরে
কপালের সিন্দূরের জোরে বেহলা চলিতেছেন, তাঁহাকে কে স্পর্শ করিবে ?
একজন বৈদ্য অশিষ্টপ্রস্তাব করিয়া শব বাঁচাইয়া দিবে বলিয়া আশা
দিয়াছিল, বেহলা তাহার মুখে ছাই দিয়া ভেলা ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন।
গোদা, ধনা, মনা তাঁহার লোভে সাঁতার দিয়াছিল, বেহলা দৈববরে
তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন; কিন্তু জলমগ্ন লম্পটত্রয়ের জন্ত
করণার অশ্রু বিন্দু রাখিয়া গেলেন। স্তূথে দুঃখে বেহলার চরিত্রে কখনও
স্নেহ মমতা দয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্টভাব লুপ্ত হয় নাই, সর্বদা আরও প্রফুল্ট
হইয়াছে। মরার হাড় অঞ্চলে বাঁধিয়া বক্ষে লুকাইয়া কাদিতে কাদিতে
নৈশ আঁধারে সতী লক্ষ্মী ভাসিয়া যাইতেছেন; মেঘপুঞ্জ ঘিরিয়া আসিয়াছে,
আশার ক্ষীণ আলো নিবু নিবু, এসময়ে শৃগালের বিকট ধ্বনি,—

“যতক শৃগাল, হয়ে একপাল,
একত্রে বেহলারে ডাকে।
মরা ফেলাইয়া, যাহ না ফিরিয়া,
প্রাণ পাই তোর পাকে ॥” কেতকা দাস।

কিন্তু শৃগালগুলিকে সতী প্রবোধ দিয়া যাইতেছেন, এ তাঁহার জীবন
অপেক্ষা প্রিয় স্বামীর হাড়, ইহা তিনি দিতে পারেন না, ইহাতে তিনি
জীবন প্রতিষ্ঠা করিবেন, নতুবা প্রাণ দিবেন, তখন,—

“এত কথা শুনি, হস্ত শৃগালিনী,
এ পড়ে উহার গায়।
অপূর্ব কাহিনী, কতু নাহি শুনি,
মরা নাকি প্রাণ পায় ॥” কেতকা দাস।

কিন্তু,—

“শৃগাল কখনে, বেহলার মনে,
কিছু নাই অভিমান।”

মৃত্যু গীতে অহুরক্তি—পদ্মিনী নারীর লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত আছে।

ছোট বেলা বেহলা নাচিতে পাইতে শিখিয়াছিল, তাহার স্ত্রী দেখিয়া তাহার মাতা অমলা মোহ যাইত। পুনরায় এই দুঃখের সময় হস্তমুখে বেহলা দেব সভায় নাচিয়া গাইয়া স্বামীর ও তাহার ভ্রাতৃগণের জীবন পুরস্কার লইয়া ফিরিয়া আসিল।

এই গল্পের আদ্যস্ত একটি কল্পনার খেলার আয় বোধ হইবে, কিন্তু ইহা ডানহাস্ কি উড্ডীয়মান তুরঙ্গের গল্প নহে; পাঠক পদ্মপূরণখানা পড়িবেন, ইহা কল্পনার কথা নহে; প্রতিপক্ষে মর্শ্বের উক্তি— আমরা বেহলার সঙ্গে ছত্রে ছত্রে অশ্রু আকুলিত চক্ষে তাহার স্বামীর জীবন প্রার্থনা করিয়া অগ্রসর হইয়াছি। তাহার সৌম্যমূর্তি, সদা হস্তমুখ মুখ থানা, স্ত্রী সৌম্য দুঃখে সৌম্য মনোমুগ্ধকর স্বভাব, দৃঢ়ব্রত চরিত্রের লাবণ্য ভুলিবার জিনিষ নহে। কবি স্বচক্ষে সতী দেখিয়া সতী আঁকিয়াছেন। হিন্দুর গৃহলক্ষ্মী চক্ষু-লবঙ্গজল গড়াইয়া গণ্ডে পড়িতে দেন নাই, ললাটের দিম্বুর বিন্দু স্বামী বিয়োগের পর আরও উজ্জল করিয়া স্বামীর শব সঙ্গে পুড়িয়া ছাই হইয়াছেন, সেই আঁগুনে কবিত সতীকে যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি বেহলার চিত্র আঁকিতে পারিবেন না। এ স্থলে শুধু দেবদত্ত ক্ষমতায় কুলাইবে না, মাইকেল এঞ্জেলো ও রায়কিয়েল এখানে অপারগ হইবেন।*

মনসা ।

এই সর্পভীতিপূর্ণ ত্রিপুরার জঙ্গলে বসিয়া কল্পিত হৃদয়ে একটি সত্য কথা বলিতে হইতেছে, মনসার মত দুষ্টা মেয়ে দেবকুলে দ্বিতীয়টি নাই। চাঁদ সদাগরের পূজা খাইতে ইহার কি ভয়ানক লোভ! কখনও চাঁদের বহুকষ্ট অর্জিত তুণুলকণা নষ্ট করিতে ইনি গণদেবের নিকট একটি সামান্য মুবিক ভিক্ষা করিতেছেন, কখনও সমুদ্রে একটু তুফান উঠাইতে

* বেহলার চরিত্র সম্বন্ধে ৮ রাসপতি ভায়রব মহাশয় লিখিয়াছেন;—

“স্বীত পলিত কীটাকুলিত পুতিগন্ধি মৃতপতিকে জোড়ে লইয়া নির্বিকার চিত্তে ও নির্ভয় মনে বেহলার মায়াসে যাত্রা ভাবিতে গেলে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মনোরমের পতিনিমিত্তক সেই সেই ক্রেশ-ভোগ ও সামান্য বলিয়া বোধ হয়, এবং বেহলাকে মনোরমের পতিকা বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়।”

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ১১৮ পৃঃ ।

হনুমানের স্মরণ লইতেছেন, কখন ও লৌহের বাসর নির্মাণ কারীকে একটি মূর্তিকা প্রমাণ ছিদ্র রাধিতে অনুময় করিতেছেন, দেব সভায় অনার্যাসে মিথ্যা কথা গুলি বলিয়া ফেলিলেন। ইহার ক্রোধে অপর দূরে থাকুক পিতা শিব ও স্বামী জরৎকার চলিয়া পড়িয়াছিলেন; বিষনেজে যে দিগে চাহিয়াছেন, শ্রামল ভূমির স্থলে শাশান হইয়াছে, কুসুম পল্লবের স্থলে তীক্ষ্ণ মূর্তি দেখা দিয়াছে; একথা স্থির, এহেন দেবতার পদে যে এত পূজা পড়িয়াছে-তাহা প্রেমে ও নহে, ভক্তিতেও নহে,—ভয়ে।

চাঁদের ন্যায় বীরপুরুষের পূজা পাওয়ার যোগ্যতা ইহার কিছুমাত্র নাই; চাঁদ যখন পূজা দিতে স্বীকৃত, তখন ও ইনি মণ্ডপে নাবিতে সাহসী নহেন,—

“যদি মোর পূজা করিবে চাঁদ বেণে।

হেঁতালের বাড়ি গাছি আগে ফেল টেনে ॥

এ কথা শুনিয়া হৈল চাঁদ বেণের হাস।

হেঁতালের বাড়িতে আর নাহি কর আস ॥

বেহলা বিনয় করে আসিয়া শব্দে।

হেঁতালের বাড়ি তুমি টেনে ফেল দূরে ॥”

ক্ষমানন্দ।

(গ)—কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও
কবি জনার্দন প্রভৃতি।

কাণীর গীত প্রথমতঃ এক কাণা রচনা করে; কাণী তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই, তাই তিনি ফুলশ্রী গ্রাম-নিবাসী বিজয় গুপ্তকে স্বপ্নে কাব্য রচনা করিতে নিযুক্ত করেন—

“মূর্খেতে রচিল গীত না জানে মাহাস্বয়।

প্রথমে রচিল গীত কাণা হরি-দত্ত ॥” বিজয় গুপ্তের পদ্যপূরণ।

সুতরাং বিজয়গুপ্তকে দেবীর অনুরোধে পড়িয়া এ কার্যে ব্রতী হইতে হয়; আমরা বিজয় গুপ্তের পদ্যপূরণে পুস্তক রচনার সময় উল্লিখিত পাইয়াছি। বিজয় গুপ্ত সঘর্ষে যে কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব স্মরণ, তাহা নিরে উদ্ধৃত পংক্তি নিচয়ের অন্তর্গত আছে,—

“হেনমতে স্বপ্ন কথা কহি উপদেশ।

নামহর্ষে চড়ি দেবী গেল নিজ দেশ ॥

স্বপ্ন দেখি বিজয় গুপ্তের দূরে গেল নিরে।

হরি হরি নারায়ণে স্মরিয়া পোবিলে ॥

প্রভাত সময়ে কাক প্রকাশে দশ দিশা।

দান করি বিজয় গুপ্ত পুঙ্খিল মনসা ॥

হরি নারায়ণ স্মরি নির্মল কৈল চিত।

রচিত্তে আরম্ভ কৈল মনসার গীত ॥

যেইমতে পদ্মাবতী করিল সন্নিধান ।
 সেইমতে করে সব গীতের নির্মাণ ॥
 ছায়া শূন্য বেদ শব্দী পুরিমিত শব্দ ।
 সনাতন হসেন সাহ নৃপতি তিলক ॥
 উত্তরে অর্জুন রাজা প্রতাপেতে বস ।
 সুদূর ক্ষতেজাবাদ বাঙ্গালার সীম ॥
 পশ্চিমে ঘাঘরা নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর ।
 মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নথর ॥

চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল ।
 বৈদ্যজ্ঞানি বৈদ্যে তথা শাস্ত্রেতে কুশল ॥
 কায়স্থ জ্ঞানি বৈদ্যে তথা লিখিতে প্রচুর ।
 আর যত জ্ঞানি নিম্ন শাস্ত্রেতে চতুর ॥
 স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময় ।
 হেন ফুলশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয় ॥”
 বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ ।

অন্ত এক স্থলে,—

“সনাতন তনয় কল্পিণী গর্ভজাত ।

সেই বিজয় গুপ্তে রাণ তব পদ সাত ॥”

প্রথমাংশ বিজয় গুপ্তের নিজের রচনা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে, কারণ ঐ অংশের অব্যবহিত পরেই এই ছই পংক্তি পাওয়া যায়,—

“গায়ক হৈয়া তাল ধরে জন্মে নানা জাতি ।

বিজয় গুপ্তে বন্দিয়া ভাই গীতে দেও মতি ॥”

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি প্রাচীন কবিগণের স্বরূপ আবিষ্কার করা সহজ কর্ম নহে। বিজয় গুপ্তের ছদ্মবেশে জয়গোপালগণ ঐতিহাসিক মরীচিকা উৎপাদন করিতেছেন, এই গাঢ় ভ্রম সমুদ্র হইতে রত্ন উঠাইতে যাইয়া অনেক সময় শব্দ লইয়া ফিরিতে হয়। পূর্ববর্তী-কাব্যগুলির ছায়া বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ ও নানা হস্ত স্পর্শে, নানা তুলির বর্ণক্ষেপে পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। ভুবন্ত দিবালোক ও উদিত নক্ষত্রালোক যেরূপ সাক্ষ্যগগনে মিশিয়া যায়, প্রাচীনকালের ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণের লেখাও সেইরূপ মিশিয়া গিয়াছে; বিজয় গুপ্তের পদ্ম-পুরাণে প্রকাশ্যভাবে অস্তিত্ব কবির ভণিতারও অভাব নাই। আমরা ৫৯ পৃষ্ঠায় যোজনাকারিদিগের নামের একটা তালিকা দিয়াছি।

যদি উক্ত অংশের উল্লিখিত তারিখ (১৪০০ শক*) আমরা বিজয় গুপ্তের নিম্নলিখিত বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারি, তবে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কতদূর আশ্রয় হওয়া উচিত, সে বিষয়ও বিবেচ্য। বাহার বঙ্গদেশের ইতিহাস

* হসেন সাহর রাজব-জ্ঞানের সঙ্গে এই তারিখের ঐক্য হয় না, ইহা রাজব আদর্শের কয়েক
 পূর্বে হইয়া পড়ে ।

ভালরূপ পড়িয়াছেন, তাঁহারা জামেন হুসেনসাহ ও তৎপুত্র নসিরাসাহ বঙ্গদেশে হিন্দুদিগের মিকট এতদূর প্রতিপত্তিশালী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন যে, এদেশীয়গণ কোম উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকার সময় নির্দেশ করিতে হইলে, তাঁহাদের রাজত্বকালেই তাহা আরোপ করিতেন; আমরা বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে পাইয়াছি,—

“সে যে নসিরাসাহ জানে ।

যারে হানিল মন বাণে ॥

চিরঞ্জীব রহ' পঞ্চ পৌণ্ড্রের ।

কবি বিদ্যাপতি ভাণে ॥”

কোথায় নসিরাসাহ, আর কোথায় বিদ্যাপতি, মধ্যে এক যুগের প্রলয় ঘাবধান ।

এইরূপ যোজমা দ্বারা বিজয় গুপ্তের কাল নির্দেশ হওয়া বিচিত্র নহে; নানা কারণে আমরা বিজয় গুপ্তকে ৪০০ বৎসর হইতে অনেক পূর্ববর্তী কবি বলিয়া মনে করি; যাহাইউক আপাততঃ এখানে তাহার আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম ।

বিজয় গুপ্তের কবিতা কথায় কথায় ব্যঙ্গের দিগে ধাবিত হয়, সেই ব্যঙ্গেই তাহার কবিতা বেশ ছুটিয়া উঠে । এই নথ্যপদ, উত্তরীয়-সার, ঔষধের পটলি-কঙ্ক ‘বেজ মহাশয়’ সেকালের একজন বিশিষ্ট রসিক লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই । সেকালের রসিকতা এখন ভাঁড়ামি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু বিজয় গুপ্ত ভাঁড় ছিলেন না; নিজে তাঁহার রচনার কিছু নমুনা দিতেছি,—

পদ্মার বিবাহ সম্বন্ধে শিব দুর্গার আলাপ ।

“জামাই এনেছি পুণ্যবান, কস্তা করিব দান,

বিবাহের সজ্জা কর ঘরে ।

এনেছি মূনির হুত, রূপে শুণে অদ্ভুত,

কস্তা সমর্পিব তার তরে ॥

হাসি বলে চণ্ডী আই, তোমার মুখে সজ্জা নাই,

কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে ।

এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে, তারা চাবে পান খাইতে,

আর চাবে তৈল সিন্দুরে ॥

হাসি বলে শূলপার্বণ, এয়ো ভাঙাইতে জানি,

মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হয়ে ।

দেখিয়া আমার ঠান, এয়ো উড়িবে আশ,

লাজে সবে বাবে পলাইয়ে ॥

আছুক পানের কাল, এয়োগণ পাবে লাজ,

পান শুয়া দিবে কোন জনে ।

বিজয় গুপ্তেতে কয়, “এরূপ উচিত নয়,

ঘরে গিয়ে কর সম্বিধানে ॥”

বিজয় গুপ্তের পদ্মপূরণ ।

(২) ইহার কতকংশ ৮৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শিবের অনর্শনে চণ্ডিকার রাগ ।

ভাল ভাঁড়াইয়া শিব পলাইয়া গেল দূর ।
এবার তোমার লাগ পাইলে দর্প করিতাম চূর ॥
জাঁচলে জাঁচলে পিট ঝাঁঝি এক ঠাঁই ।
রাখিতে নারিছ তবু পাগল শিবাই ।
কপট চরিত্রে তোমার খলের সঙ্গে চন্ড ।
যাবার কালে লাগ পাইলে দেখাইতাম রক্ত ॥
পাপ কপাল কলে বামী পাইলাম ভাল ।
ভাল খুড়িয়া ধার পরিধান ব্যাঘ্র ছাল ॥

প্রভের সনে স্বশানে থাকে সাধার ধরে নারী ।
সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি ॥
নিশ্চৈ ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে ।
চড়ে বেড়ায় ছুট বললে তারে খাটক বাগে ॥
আগুন লাগুক কাছের ফুলি ফ্রিশূল লউক চোরে ।
গলার সাপ গরুড়ে খাটুক যেমন জাণ্ডাল ঘোরে ॥
ছিড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা, প'ড় ভাঙ্গুক লাউ ।
কপালের তিলক চলে তারে গিলুক রাহে ॥

বিজয় গুপ্ত ।

বঙ্গীয় প্রাচীন কাব্যগুলির কয়েকটির নির্দিষ্ট ভাব বিরূপে এক কাব্য
হইতে অন্য কাব্যে অপহৃত হইয়া বিকাশ পাইয়াছে, তাহা বিজয় গুপ্তের পদ্ম-
পুরাণে লক্ষিত হইবে; আমরা ভারতচন্দ্রের—

“জয় জয় অনর্পণ বলিয়া ।
নাচেন শব্দর ভাবে চলিয়া ॥

হরিবে অরশ অরশ অরে ।
নাচেন শব্দর রঙ্গ তরঙ্গে ॥

ইত্যাদি পড়িয়া ভারতচন্দ্রের কতই স্মৃতিয়াছি, এইরূপ ছন্দে
ভারতচন্দ্রের বহু পূর্বের কবি বিজয় গুপ্ত শিব-নৃত্য বর্ণনা করিয়াছিলেন,—

“জগত মোহন শিবের দাস ।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ ॥
রঙ্গে নেহারিয়া গৌরীর মুখ ।
নাচেরে মহারোষ মনেতে কোতুক ॥
হাসিতে খেলিতে রঙ্গে ।
বন্দী মহাকাল কাহার বুলে ॥

বিশাই নাচেরে হাতেতে বালা বাজে ।
হাতেতে তালি দিয়ারে মুখেতে দীত গাহে ॥
বিকট দশনে জুহুট ভাল সাজে ।
চুম চুম বলিয়া শিবের গুহুর বাজে ॥
বিজয় গুপ্ত যত্বেরে সঙ্গন গায় ।
পদ্মার চরিত্রে লবে বন্দ হর ॥”

হ্যামিলটনের বাড়ীর মুক্তার মালা ছড়া হাতে লইয়া উক্ত কোম্পানীকে কতই
প্রশংসা করিয়া থাকি, কিন্তু যে ভুবান্ধি প্রাণ আশা ছাড়িয়া মুক্তার লোভে
অতলে ডুব দিয়াছিল, তাহার কথাটা কাহার মনে উদয় হয়? বহু চিন্তা
করিয়া দেখিয়াছি, যে উদ্ভাবন করে তাহার অপেক্ষা যে পালিশ করে, এই
দৃষ্টান্তে তাহারই সম্মান অধিক ।

বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে অনর্পণও অনেক স্থলে লক্ষিত হইয়াছে; সে সব
পড়িতে পরবর্তী প্রাচীন বড় বড় কবিসংকে মনে হইয়াছে; সে সব

কবিশ্রী বাহাদুরের কথা লইয়া বড় হইয়াছেন, তাঁহার অতীতের বিয়াট ছাড়ার পাছে পড়িয়া রহিয়াছেন, কে তাঁহাদিগের ধোঁয়া করে? প্রশংসা সম্পদ, বশঃ সমস্তই ভাগ্যাধীন; সংসারক্ষেত্রের জায় সাহিত্যক্ষেত্র ও প্রতিভা অপেক্ষা ভাগ্যেরই বাহাদুরী জ্ঞাপক, পরে এই কথা আরও পরিস্ফুট হইবে।

নারায়ণ দেব।

সম্ভবতঃ বিজয়গুপ্তের সমকালেই নারায়ণ দেব তাঁহার পদ্ম-পুরাণ রচনা করেন। ইনি ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের সংযোগ স্থলে-জোয়ানসাহী পরগণায় কায়স্থ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। দয়াল চন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক শিক্ষিত লেখক ইহার জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতেছিলেন ও ভারতী পত্রিকায় (১২২০ সন, কার্তিক) তাহা প্রকাশ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু সহসা তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তিনি এ কার্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি নারায়ণ দেবকে পদ্ম পুরাণের আদি লেখক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন,—ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ মন-গড়া স্বধা।

এই কবির ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে—কিছু মাত্র সংশোধন না করিয়া বেঙ্গল পাইল্যাম সেইরূপই একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি—

বেহুলা ও তাহার ভ্রাতা নারায়ণীর কথোপকথন।

নারায়ণী শুনি বোলে বিপ্লব।

কি কারণে কৈলা ভইন(১) অশকা কখন।

বিবস সায়স(২) ভইন কৈলা কি কারণ।

দেবতা মনিবা কোথা হইছে দরশন।

আজ্ঞা দেহ ভইন ময়া পুড়িবারে।

একেশ্বর কেমনে বাইবা কেবলরে।

কেমনে ছাড়িয়া দিমু সাগর ভিতর।

কথাতে পাইবা তুমি দেবের নগর।

অগোরি(৩) চন্দন কাটে(৪) লখাই পুড়িমু।

লক্ষ্মীর কর্ণ(৫) ভইন এইখানে করিমু।

নেউটিয়া চল ভইন আগমার ঘরে।

একেশ্বর কেমনে বাইবা দেখ করে।

(১) ভইন—ভরী। (২) সায়স—সাহস। (৩) অগোরি—অস্তর। (৪) কাটে—কাটে।

(৫) কর্ণ—শব্দসাহায্য।

মৎস যাংস এড়ি ভইন বস্ত উপহার ।
 সর্ব্ব বর্ষ্ব দিমু আমি তুমি খাইবার ।
 সংখ্য় সিন্দুর মাত্র না পড়িবা তুমি ।
 নানা অলংকার তোমা দিমু আমি ।
 মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর ।
 বিপুলা রাখিআ আইলা জলের উপর ।
 বিপুলা রাখিতে সাধু করএ জন্মন ।
 বিপুলাএ বোলে কিছু প্রবোধ বচন ।
 জীআইতে আইল প্রভু খাইমু পলাইআ ।
 কেমনে মুগ্ধেত্ত জন্ত দিবাম তুলিয়া ।
 অমর্তী হইব মনিষ্য লোকেত প্রচার ।
 কি কারণে এতেক জে রাখিমু খাখার ।
 গোত্র জ্ঞাতি আছে চম্পক নগর ।
 তারা কি বলিব আমি কি দিব উত্তর ।
 বিপুলা হনিআ বাক্য নিষ্ঠুর বচন ।
 সকলগ ভাসে সাধু করএ জন্মন ।
 হুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী ।
 নারায়ণ করুণা হন একট লাচাড়ি ।

কাঁদে নারায়ণ সাধু করএ বিপুলা চাইআ ।
 প্রাণে না সংহুঃখ না দিমু এত্টিয়া ।
 অরুদ্বিয়া সদায়র বুদ্ধি অতি ছার ।
 জীয়াতা ভাসাইআ দিছে সহিতে মরার ।
 বিবম সাগরে চেউ তোলপার করে ।
 জলেত পড়িলে খাইব মৎস মকরে ।
 মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর ।
 কি কথা কহিব আমি উজানী নগর ।
 বিপুলা রাখিতে সাধু করএ জন্মন ।
 নারায়ণ দেবে কহে মনসা চরণ ।
 বিস্তর যতন করি রাখিতে না পারিয়া ।
 চিন্তে ক্ষেমা দিয়া যায় ভেলুআ ভাসাইআ ।
 ভাইত বিদায় করি বিপুলা মুল্লরী ।
 ছাড়িয়া আএ তবে ভূরাখান মেলি ।
 নৈকত্র সকারে যেন ভূরার চলন ।
 সম্মুখে বাঘের মাকৈ দিলা দরশন ।।”

এই পুস্তকের হস্তলিপিতে সংস্কৃত পড়ার গন্ধ নাই, লেখক যে ভাবে কথা কহিতেন সেই ভাবেই শব্দ গুলি লিখিয়া গিয়াছেন—ইহাতে বিদ্যা না থাকিলে ও স্বাভাবিকত্ব আছে। বিজয় গুপ্তের লেখার পালিস দেখিয়া নারায়ণ দেবকে অগ্রবর্তী কবি মনে করা সম্ভব হইবেনা। বিজয় গুপ্তের পদ্ম-পুরাণের বটতলার ছাপা দেখিয়া অংশগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, আর নারায়ণ দেবের পুঁথি থানা গত ২০০ বৎসর যাবৎ কোন ও রূপ হাওয়ায় বাহির হয় নাই;—এই সময়ের মধ্যে কীটগণ অবশ্যই কিছু নষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু জয়গোপালগণ সেরূপ স্রবিশা পান নাই।*

* ২৮৫ নং আশার চিংপুর রোড খেঁচীমাথব দে এণ্ড কোম্পানির ছাপা নারায়ণদেবের পদ্ম-পুরাণ বিজয়গোপাল ও কবি বল্লভের দ্বারা সম্পূর্ণ রূপ নূতন ভাবে রচিত বলিয়া ঘোষ হয়। উহার মধ্যে মূল গ্রন্থের ঐক্য নাই বলিলে ও অত্যুক্তি হইবে না। উহার পক্ষে পক্ষে ভণিতা এইরূপ,—

(১) “বিজয়গোপালে গায় পদ্মার চরণ ।

ভবসিন্ধু তরিরারে বোলে নারায়ণ ।।”

(২) নারায়ণ দেবে কয়, হুকবি বল্লভে হয়, ইত্যাদি ।

মনসার গীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব। ত্রিপুরাজেলায় একটি চম্পকনগর আছে, পূর্বাঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থলেই লক্ষ্মণের কাণ্ড কারখানাটা হইয়াছিল। লক্ষ্মণের লোহার বাসরের ভিটা ও তথায় ছম্পাপ্য নহে। এদিকে বর্ধমানের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে চম্পক নগর, ও তন্নিকটে বেছলা নদী প্রভৃতি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ভূগোলবিৎ পণ্ডিতমহাশয়ের একটু গোলে পড়িবারই কথা। চাঁদবেণে এখন বঙ্গসাহিত্যের একটি সজীব ছবি; ইনি চণ্ডীকাব্যে ধনপতি সদাগরের বাড়ীতে পুষ্পমালা পাইতেছেন, জয়মারাগের চণ্ডীতে ইঁহার সহিত জনৈক কাব্যোক্ত নায়কের দীর্ঘকাল ব্যাপী আলাপ বর্ণিত আছে ও ত্রিবেণীর পারে তাঁহার বাটার একটা জমকালো বর্ণনা আছে; বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি মনসার গীতি ছাড়িয়া ও এদিক সেদিক হইতে উঁকি দিতেছেন; সুতরাং চাঁদ সদাগরের জায় প্রয়োজনীয় ব্যক্তির নিবাস-ভূমি জানা পাঠকের নিতান্ত আবশ্যক।

কিন্তু হুংখের বিষয়, আমাদের বিশ্বাস চাঁদবেণের গল্পটি আগাগোড়া কল্পনা মূলক। পাঠক শনির পাচালী কি সত্যনারায়ণের পাচালী দেখিয়াছেন, চাঁদবেণের কথার সুর ও ঠিক সেইরূপ ছিল। এক একজন করিয়া কবিগণ ঘটনা ও কাব্য-বর্ণিত চরিত্র বাড়াইয়াছেন, এবং মিথ্যাকে এমনই সত্যের পোষাক পরাইয়াছেন,—চাঁদ সদাগর কল্পনার লালপাশরি মাথায় বাঁধিয়া সত্যসত্যই আমাদের ভয় জন্মাইতেছে। কাব্য বর্ণিত ঘটনাগুলি অনুধাবন করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। মনসার সঙ্গে বাদে চাঁদ সদাগরের ভ্রগতিগুলিতে কিছুমাত্র সত্য থাকিতে পারে না। স্বর্গে যাইয়া নাচিয়া গাহিয়া স্বামীর জীবন লাভ করার কথা ও পৃথিবী-বাসীগণ না দেখিয়া বিশ্বাস করিবে কিরূপে? এই দুইটি মূল ঘটনাই দুই থানা কল্পনার ইষ্টকে গ্রথিত দেখিতে পারিলেন। সত্যের উপর মধ্যে মধ্যে কল্পনার একটুকু প্রলেপ দিয়া কাব্য প্রস্তুত হয় যথা,—পলাশীর যুদ্ধ কাব্য। কিন্তু এ কাব্য তাহা নহে।

মনসার সেবক যতই বাড়িতে লাগিল ততই চাঁদ সদাগর ও বেছলার প্রতিবিম্ব ক্ষয়িতর হইয়া সজীব বস্তুর জায় স্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইল। এই বস্তুদ্বয়ে প্রাচীন ভয় কীর্তির অভাব নাই, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

ইষ্টকল্পপরিশেষে বৃহৎ চাঁদবেগের ভূতের বাসাবাড়ী নির্ভারিত হইল ; বর্জমান ও ত্রিপুরার চম্পকনগরস্থর, নেতখোপানীর ষাট প্রভৃতি নাম এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দিখ্যা সাক্ষ্য দিতে বসিয়াছে। চাঁদের এই সৌভাগ্য সত্যনারায়ণের পাঁচালীর নায়কের হইতে পারে নাই।

কবি জনার্দন প্রভৃতি ।

মঙ্গল চণ্ডীর কুজ ছড়া ও ক্রমে বড় কাব্য হইয়া পড়িয়াছে ; মাধবাচার্য্যের চণ্ডীর (১৫৭২ খৃঃ) পূর্বে ও মঙ্গল চণ্ডীর গীত ছিল ; চৈতন্য-প্রভুর পূর্বে ও মঙ্গল চণ্ডীর ছড়া গাইয়া গায়কগণ রাত্রি আগরণ করিত ।

“মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে ।

দন্ত করিবিষ হরি গুজে কোন জনে ॥” চৈ, ভা, আদি ।

সেই গীতি কিরূপ ছিল, ঠিক জানি না। আমরা বিজ্ঞ জনার্দনের একটা চণ্ডী পাইয়াছি—উহা কাব্য নহে, ব্রত কথা। হস্তলিপি প্রায় ২৫০ শত বৎসরের প্রাচীন। এইরূপ কোন চণ্ডীর গীতিকে অবলম্বন করিয়া মাধবাচার্য্য তাঁহার কাব্য গঠন ও চরিত্রগুলির রেখাপাত করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। ছোট ছোট চেউ কিরূপে বড় বড় ভরজ হইয়া দাঁড়ায়—অম্পট রেখার কীৰ্ত্তি ছবি কিরূপে ক্রমে সম্যক বিকশিত, বড় ও অম্পট হইয়া উঠে—জনার্দন মাধবাচার্য্য ও কবিকঙ্কণের চণ্ডী ক্রমাগত তুলনা করিলে তাহা অনুমিত হইবে। কাব্য-জগতের এই ক্রমিক বিকাশের দৃষ্ট, ছায়াবাজির ছায়াগুলির ক্রমশঃ বিশাল, অম্পট, ও বিচিত্র-বর্ণ-বিশিষ্ট অবয়বে পরিণতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জনার্দন কবির কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপখ্যান হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

১ম অংশ ।

“নিভা নিভা সেই বাধ আনিলিত হইয়া ।

পরিবার পাশে সে যে কুশলি মারিয়া ॥

ধনুক ফুড়িয়া বাণ লজ্জড় কাঁথিতে ।

সর্ব হুধ খাইয়া দেল কিম্বাদিরিতে ॥

মদমদেধি দুগ কদাছিল আসে ।

পাছে বাঞ্ছিত হুগ মারিবার পাশে ॥

বুদ্ধ বরাহক আদি বত মৃগগণ ।

মঙ্গল চণ্ডীর লগ্নে লইল শরণ ॥

কাষে লেখিয়া দেবী উপায় চিহ্নিল ।

হুর্বাতি-মাপিনী দেবী সর্ব হইল ॥

হুর্বা মোদিকারূপ ধরিল পদকর্তী ।

বাধ পথ দুড়িয়া রহিল ভগবতী ॥

যুগল না পাইয়া স্তাথ হইল চিহ্নিত ।
 হুবর্ণ পোষিকা পথে দেখে আচম্বিত ॥
 হুবর্ণ পোষিকা পাইয়া হরষিত মনে ।
 ধনুর অগ্রে তুলি লইল তখনে ॥
 মনে মনে ভাবি বাধ ধীরে ধীরে হাটে ।
 সম্বর গমনে পেল বাড়ীর নিকটে ॥
 হরষিত মনে বাধ গলগল বাণী ।
 উচ্চস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিল পোষিকী ॥
 যেন মতে গৃহে নিরা হুইল পোষিকা ।
 পরম স্তম্ভরী রূপ বরিজ চণ্ডিকা ॥
 দিব্যরূপ দেখি ভান স্তাথ কালকেতু ।
 গৃহিণীর মুখ চাহি বোলে কোন হেতু ॥
 মঙ্গল চণ্ডিকা বোলে স্তন বাধবর ।
 ভুট হয়ে দেখা দিল ভোমার গোচর ॥

এস্থলে গুজরাট বাইয়া রাজ্যাদি স্থাপনের কথা ও কলিকাদি পতির
 সহিত যুদ্ধ-বর্ণনা নাই; ক্ষুদ্র গীতিটি কাব্যে পরিণত করিবার সময় কবিগণ
 নিজ হস্তে একটি মানচিত্র আঁকিয়া লইয়াছেন; পদ্ম-পুরাণের ঘটনার
 কেন্দ্রভূমি ও এইরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে;
 ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানের উপর বিদ্যাসুন্দরের কেলেকারী চাপাইয়া তাঁহার
 প্রতি অভ্যাচারের প্রতিলোভ লইয়াছিলেন; পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়
 লিখিয়াছেন ।

“বর্দ্ধমান-রাজ যে ভারতচন্দ্রের উপর অভ্যাচার করিয়াছিলেন, সে কথা লোকে তুলিয়া
 গিয়াছে । কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা যে নিশ্চয়ই বর্দ্ধমানে ঘটয়াছিল, এ ধারণা অনেকেরই আছে ।
 এবং এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া পুণ্ড্রাশয় রামগতি জারর মহাশয় মালিবারী বাসী অধিবাসী
 বর্দ্ধমান সহরে অনেক দিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সুড়ঙ্গ দিয়া এখন ও রাজবাটী যাওয়া যায়
 কি না, দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ।”

২য় অঙ্ক ।

অসুগত জনে দয়া করে পিরিস্থতা ।
 চলহ ব্রজনা গৃহে সাধু হুহিতা ॥
 ব্রজের বিধান সর্ব্ব ত্রুটি এ কহিল ।
 প্রশংস করিয়া শুধে ব্রজনা চলিল ॥
 ছারছিয়া হিল ছাঙ্গল পথে পাইল ভায়ে ।
 গৃহে আসি ব্রজনায়ে বিবিধ প্রকারে ।
 চণ্ডিকার পূজা করে ভক্তি অহুসারে ॥

সম্ভ্রান্তি হইল বাধ ভোমার শুভকৌশল ।
 পঞ্চমত বর্ণাকুরী কর উল্লেখ্য ॥
 আজ হোতে বাধ তুমি না বাইবা বল ।
 যুগল না মারিবা এহি স্তনহ বচন ॥
 অন্ন ত্রবা অকুরী দিল। যে আমারে ।
 ইহা বাইয়া কি করিব বল তার পরে ॥
 মঙ্গল চণ্ডিকা দেখী হইলা সদয় ।
 বর্ণ ভাওঘর তাকে দিলেক নিশ্চয় ॥
 চণ্ডিকা প্রসাদে বাধ কৃতার্থ হইল ।
 তারপর ভগবতী অন্তর্দান হৈল ॥
 ধন পাইছে হেন রাজ্যে শুনিয়া ।
 শীঘ্র করি কালকেতু বন্দী কৈল নিয়া ॥
 বন্ধনে পীড়িত হৈয়া বাধ মহাজন ।
 কানিয়া মঙ্গল চণ্ডী করিলা স্মরণ ॥ ইত্যাদি ।

স্থাপনের কথা ও কলিকাদি পতির
 সহিত যুদ্ধ-বর্ণনা নাই; ক্ষুদ্র গীতিটি কাব্যে পরিণত করিবার সময় কবিগণ
 নিজ হস্তে একটি মানচিত্র আঁকিয়া লইয়াছেন; পদ্ম-পুরাণের ঘটনার
 কেন্দ্রভূমি ও এইরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে;
 ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানের উপর বিদ্যাসুন্দরের কেলেকারী চাপাইয়া তাঁহার
 প্রতি অভ্যাচারের প্রতিলোভ লইয়াছিলেন; পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়
 লিখিয়াছেন ।

মঙ্গল চণ্ডীর বরে বাড়িল উন্নতি ।
 ব্রজ হনে স্থখী হৈল ব্রজনা যুযুতি ॥
 বিবা বস্ত্র অলংকারে সাধু হুহিত ।
 কতকাল পরে কস্তা সর্ব্ববতী হৈল ॥
 ব্রজনার গর্ভ ছয়মাস হৈল বাবে ।
 বাণিজ্যে চলে ধনপতি সাধু ভাবে ॥
 বামীর অগ্রেত পিয়া করিল ভকতি ।

বাগিচা করিতে সাধু হইলেক মতি ॥*

ছয়মাস গৰ্ভ যোর জানাইল তোমারে ।

জানিবার পত্রে হর্ষে দিলেক কুমারে ॥

হীরা মণি বাণিকা আদ্য নানা দ্রব্য ঘতে ।

হরষিত তরে ডিক্রা যত লয় চিতে ॥

ডিক্রাতে অৰ্থ ভরি সাধুর নন্দনে ।

খুন্না আসিতে আজ্ঞা করিল তখনে ॥

মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত করিতে কারণ ।

অৰ্থ আনিতে বিলম্ব হইল তখন ॥

বিলম্ব দেখিয়া তবে সাধু মহাজন ।

চণ্ডিকার ঘটে পদ ফেপিল তখন ॥

০ . ০ . ০ . ০ . *

মঙ্গল চণ্ডীর ঘরে খুন্না যুবতী ।

পুত্র প্রসবিল তথা নাম প্রীতি ॥

দিনে দিমে বাড়ি কুমার চক্ষের লহান ।

শুভক্ষণ ক'রয়া কাঠি কৈল দান ॥

লিগিতে কহিল কুমার ছাত্র সব স্থান ।

আমারে লিখায়ে দেহ এই খড়্গ ধাম ॥

হাসিয়া সকল ছাত্র বুলিলেক বাণী ।

জারজ কুমার তুমি কে দিবে কাঠিগণি ॥

অসন্তোষ ভাবি তবে সাধুর কুমার ।

হেট মাথা করি গৃহে গেল আপনার ॥

বিবাদ ভাবিয়া তবে সাধুর নন্দন ।

মাথাএ বসন দিয়া করিল শয়ন ॥

অন্ন জল না খাইল সাধুর নন্দন ।

দ্বান হৈয়া নিবাস ছাড়য়ে ঘন ঘন ॥

মাতা বিমাতার বুঝি পুত্রের লক্ষণ ।

সাধু দিছে যেই পত্র দিলেক তখন ॥

শেষ পংক্তির উপরের পংক্তির ক্ষুদ্র ‘বিমাতা’ শব্দটি হইতে ইয়ত লহনী নারীর স্পষ্ট ছবি জাগিয়া উঠিয়াছে। শ্রীমন্তের বিদ্যালয়ে মন্মাহত হইবার কথাটি এখানে বেরূপ আছে মাধবাচার্য্য ও প্রায় সেইরূপই রাখিয়াছেন, কবিকল্প সে স্থানটি ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন।

রতিদেবকৃত মৃগলক্ষ পুঁথির কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি—উহা শৈব ধর্মের ভগ্ন ধ্বজা। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বঙ্গসাহিত্যে শিব কোন স্থলেই বড় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই, যেখানেই তিনি দেখা দিয়াছেন, সেই খামেই ভবানীর জুকাট-ভঙ্গীতে তিনি ধতমত খাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছেন।

‘মৃগলক্ষ’ গীতি শৈব ধর্মের প্রাবল্য সময়ে লিখিত; উক্ত ধর্ম শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের জাঁড়ালে পড়িয়া যাওয়াতে শিব-গীতির আর বিকাশ হইতে পারে নাই।

শনির পাঁচালী, ষষ্ঠির পাঁচালী,—অতি আদিসময়েও বিদ্যমান ছিল; মেয়েলী ছড়ার খোঁজ করিতে করিতে সেইসব প্রাচীন গীতের ভগ্নাংশ কোন বুদ্ধার পাকস্থলী হইতে জীর্ণ-প্রায় অবস্থায় বহির্গত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

(৪) পদাবলী-শাখা।

ক। পদাবলী সাহিত্য।

খ। বিদ্যাপতি।

গ। চণ্ডীদাস।

বঙ্গদেশে প্রেমের অবতার হইয়াছিল; বাঙ্গালী কবি প্রেমবর্ণনার পৃথিবীর সব কবি হইতে বড়। আমরা নিজকে এত দীন হীন মনে করি যে, আমাদের দেশে কোন উৎকৃষ্ট জিনিষ ছিল, একথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হই। আত্ম-গরিমা জ্ঞানশূন্য হইলেই এক জাতির প্রকৃত অধঃপতন হয়।

পদাবলীসাহিত্য,—প্রেমের রাজ্য, ময়ন-জলের রাজ্য। পূর্বরাগ, উক্তি, প্রতুক্তি, প্রথমমিলন, বাসরসজ্জা, সম্ভোগ, অভিসার, কারণমান নি-
হেতুমান, প্রেমবৈচিত্র্য, দানলীলা, নৌকা-বিলাস বাসন্তী-লীলা, বিরহ, পুনর্মিলন—প্রেমের এই বহু বিভাগের পর্যায়ে পর্যায়ে কেবল কোমল অশ্রুর উৎস। ইহাতে স্বার্থের আহতি, অধিকারের বিলোপ; বাস্তবের দেহ স্পর্শ করিতে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে, তজ্জাত অপূর্ণ পরিমল জ্বলিতে, তাঁহার সুখ মাখা বাণী আশ্বাদ করিতে, মধুগন্ধে অন্ধ অলির ভ্রায় কতকগুলি অপ্রাকৃতভাবাপন্ন পাগল কাদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, পদাবলী-সাহিত্য তাঁহাদের অশ্রুর ইতিহাস। ভালবাসাকে কে কালে কোন জাতি বাঙ্গালীর ভ্রায় একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে পরিণত করিয়া তাহার পর্দায় পর্দায় বেহাগ, ঝিঁঝিঁট, রাগিণীর স্তর বাধিয়া একরূপ সুখ লহরীর উৎপত্তি করিতে পারেন নাই। এই স্বর্গীয় অশ্রু ও নির্মল স্বার্থত্যাগের রাজ্যে, বিলাস-রসের ওস্তাদ ভারতচন্দ্রগণের প্রবেশ নিষেধ; কামানের গুলি চালাইয়া এই দুর্গের দ্বার মুক্ত করা যায় না—মীনকেতনের এই অপূর্ণ ফোর্টউইলিয়মে গোরাপন্টনের প্রবেশ নিষেধ। আমরা এস্থলে শুধু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বিষয় আলোচনা করিব।

খ। বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতির বাড়ী মিথিলা—সীতামরি মহকুমার অন্তর্গত জাঁয়েল পরগণায় অবস্থিত বিসপীগ্রাম। তাঁহার পিতার নাম গণপতি, সীতামহের

নাম জয়দত্ত, প্রপিতামহের নাম ধীরেশ্বর ও স্বকপ্রপিতামহের নাম দেবাদিত্য। এই বংশ বিশেষ খ্যাতি বিশিষ্ট ছিল—পিতা গণপতি ‘গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী’ নামক সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। জয়দত্ত সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও পরম ধার্মিক ছিলেন, এজন্য তিনি ‘যোগীশ্বর’ আখ্যায় পরিচিত হন। জয়দত্তের পিতা ধীরেশ্বর স্থায়ী পাণ্ডিত্যগুণে মিথিলা-রাজ কামেশ্বর হইতে মাসিক বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি মহারাজ শিবসিংহের (১৪৪৬-১৪৫০ খৃঃ) সভাসদ ছিলেন। পুরুষপরীক্ষায় তিনি শিবসিংহকে পরমশৈব ও কৃষ্ণবর্ণ-দেহবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শিবসিংহের পূর্ণনাম “রূপ-নারায়ণ-পদাঙ্কিত-মহারাজ-শিবসিংহ।” ইঁহার আদেশে তিনি সংস্কৃতে ‘পুরুষ-পরীক্ষা’ রচনা করেন, রাজ্ঞী বিশ্বাসদেবীর (১৪৫৮-১৪৭০ খৃঃ) আজ্ঞাক্রমে তিনি ‘শৈব-সৰ্বস্বসার’ ও ‘গঙ্গাবাক্যাবলী’ নামক অপর দুইখানা সংস্কৃতপুস্তক রচনা করেন। তাঁহার সৰ্ব্বশেষ সংস্কৃতগ্রন্থ দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী ভৈরবসিংহমহারাজের (হরি নারায়ণ) রাজত্ব সময়ে (১৫০৬-১৫২০ খৃঃ) যুবরাজ রামভদ্রের (রূপ নারায়ণ) উৎসাহে রচিত হয়। পূৰ্বোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া তিনি ‘দানবাক্যাবলী’ ও ‘বিভাগসার’ নামক দুইখানা স্মৃতিগ্রন্থ ও রচনা করিয়াছিলেন। ১৪৫৭ খৃঃ অব্দে তিনি স্বহস্তে যে ভাগবত লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বংশধর বনমালী ও বদরীনাথের নিকট এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। সম্ভবতঃ মহারাজ শিবসিংহ হইতে বিদ্যাপতি ‘কবি-কণ্ঠ-হার’ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।* বিদ্যাপতির পদাবলীতে শিবসিংহ ও তাঁহার পত্নী লছিমাদেবীর নাম অনেক স্থলেই উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতি, মহারাজ শিবসিংহ হইতে বিসপী গ্রাম পাইয়াছিলেন। সেই ভূমিদানপত্রে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ এখনও দেখাইয়া থাকেন, ভূমিদানপত্রে ১৪০০ খৃঃ দানকাল বলিয়া উল্লিখিত

* “তথাহি বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠ হার।

কোটি হ'ন যত্ন বিদ্যাপতিসার।” Grierson's Maithil Songs.

A. S. J, Extra No. 163.

কেহ কেহ বলেন তাঁহার উপাধি ‘কবিরঞ্জন’ ছিল,—“চতুর্দশ কবিরঞ্জে মিলল” ও “পুত চতুর্দশ কবিরঞ্জে” প্রভৃতি পদ দৃষ্টে সন্দেহ ও বোধ হয়।

আছে; মিথিলার রাজপঞ্জী অনুসারে রাজা শিবসিংহ ১৪৪৬ খৃঃ অব্দে সিংহাসন আরোহন করেন। ভূমিদানপত্রের তারিখ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে তিনটি গোলে পড়িতে হয়;—

(১) বিসপী গ্রাম প্রাপ্তির সময় কবির বয়স মাত্র ২০ বৎসর কল্পনা করিয়া লইতে হয়, তাহা না হইলে জীবন বড় অতিরিক্ত লম্বা হইয়া পড়ে। একরূপ নবীন যুবকের পাণ্ডিত্য দর্শনে মহারাজা তাঁহাকে একখানি বড় গ্রাম দিয়া ফেলিলেন, ইহা কেমন কেমন বোধ হয়; তার পরে ভূমিদান পত্রে বিদ্যাপতিককে “মহা পণ্ডিত” ও “নব জয়দেব” আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। টোলের পড়া সঙ্গ করিয়া “ইষদ গোপের রেখা”—যুক্ত যুবকের রাজসভায় “মহাপণ্ডিত” বলিয়া সম্মান লাভ করা কতদূর সম্ভব তাহা বিবেচ্য বিষয়। জগতে চ্যাটার্টন, কার্কহোহাইট এবং অষ্টবক্স না আছেন, এমন নহে; কিন্তু তাহাদের দৃষ্টান্ত বড় বিরল।

(২) মহারাজ শিবসিংহকে রাজা হইবার ৪৭ বৎসর পূর্বেই ভূমি দান করিতে হয়—অথচ ভূমিদানপত্রে তিনি দিগ্বিজয়ী ‘মহারাজাধিরাজ’ বলিয়া কীর্তিত। ইহা বড়ই অদ্ভুত অনুমান।

(৩) ২০ বৎসর বয়সে (১৪০০ খৃঃ) কবি বিদ্যাপতি ‘মহাপণ্ডিত’ আখ্যা ও বিসপী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন, মানিয়া লইলেও ১২৭ বৎসর বয়সক্রম কালে (ভৈরবসিংহের রাজত্বে ১৫০৬-২০ খৃঃ) তাঁহাকে ‘দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী’ লিখিতে হয়;* এই বয়সে যে পুস্তক লিখিতে শক্তি থাকে, তাহা প্রমাণ করিতে প্লাডেটোনের উদাহরণেও কুলায় না; প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের এই অনুমানের প্রসারটা দেখিয়া কবি কল্পনার কথা মনে হয়।

ভূমিদানপত্রের সঙ্গে রাজ সভার পঞ্জীর এক্য স্থাপন করিতে ইচ্ছুক লেখকগণ ইতিহাসের ছিন্ন পৃষ্ঠার এইরূপ তিনটি বড় রকমের তালি দিয়াছেন।

সেটলমেন্ট অফিসারগণ প্রায়ই ভূমিদানপত্র অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। রাজ সভার পঞ্জী অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ নাই—সেখানে স্বার্থের

* কেহ কেহ বলেন তিনি ২৬ বৎসর বয়সে নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে ‘দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী’ রচনা করেন। ২৬ বৎসর বয়স ও সামান্য নহে। কিন্তু স্মৃতিঃ বন্ধন ভৈরব সিংহের কথা কবি উদ্দেশ্য করিয়াছেন, তখন বর সিংহ দেবের রাজত্বকালে উক্ত পুস্তক লিখিত হইয়াছিল, একরূপ সিদ্ধান্ত করার কোন কারণ নাই।

সংশয় নাই; এই ভূমিদানপত্র সম্বন্ধে আমরা সেরূপ কথা বলিতে পারি না।* কিংবা এমনও হইতে পারে, ভূমিদানপত্র প্রায় নষ্ট হওয়াতে তাহা উদ্ধার করা হইয়াছে, তারিখের অংশ পত্রের শেষভাগে থাকে, তাহাই প্রারম্ভ: পূর্বে নষ্ট হয়, সেই অবস্থার পরে একটা আন্দাজে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। বিমল সাহেব বলেন ‘ভূগর্ভভক্তি-তরঙ্গিণী’ অপর কোন বিদ্যাপতির লেখা হইলে ও হইতে পারে। বিদ্যাপতির এই আত্মরিক দীর্ঘায়ু সম্বন্ধে যদি অনুমান দ্বারা অনুমানের উত্তর দিতে হয়, তবে বলা যাইতে পারে যাহারা প্রেমকে অতিরিক্ত লাল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, সেই সব কবিগণকে প্রায়ই দীর্ঘায়ু হইতে দেখা যায় না।

খাস মিথিলায় ও বিদ্যাপতির খাটি রচনা উদ্ধার করা অসম্ভব। মিথিলার পাঠ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও বিকৃত, বঙ্গদেশের প্রচলিত পাঠ ও বিকৃত স্তুরাং কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির উপর বাঙ্গালী ও মৈথিলদিগের দাওয়া তুল্যরূপ। মিথিলা বাঙ্গালার পঞ্চ বিভাগের এক বিভাগ ছিল ও মিথিলার রাজসভায় লক্ষ্যণাক্ষ প্রচলিত ছিল ইত্যাদি বলিয়া কোন কোন লেখক আবার বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী কবি বলিয়াই স্থির করিতে চাহেন। পাঠবিকৃতি সমস্ত প্রাচীন কবির রচনাতেই দৃষ্ট হয় এবং এক দেশ অত্র দেশের অধীন থাকিতে পারে, এজন্য কবির স্বদেশবাসীদিগকে বঞ্চনা করিতে যাওয়া অস্বাভাবিক। বিদ্যাপতির সমাধিস্তম্ভ উঠিতে বিসমীতেই উঠিবে, মৈথিলগণই তাহাকে লইয়া গর্ব

* ভূমিদানপত্র সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত লেখা শেষ হইলে দেখিতে পাইলাম, ১২৮৯ সনের আশ্বিনের ভারতীতে শ্রদ্ধেয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় ও আমাদের অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার একটি যুক্তি এই;—

“এই সময়ে যে কেবল লক্ষ্যণাক্ষের উল্লেখ আছে এমন নহে, সনন্দের অন্ত তাহা আরও এত অল্প লিখিত হইয়াছে, যথা সন (হিজিরি) ৮০০ ॥ সম্বত ১৪৪৪ ॥ শাকে ১৩২১ ॥ আমরা প্রাচীন হিন্দু রাজ্যগণের অনেকগুলি সনন্দ ধর্শন করিয়াছি। কিন্তু এরূপ ৪ টি অক্ষর কোমণ্ড সময়ে ব্যবহৃত দেখি নাই। প্রাচীন নির্ঝল হিন্দুস্থান এতদূর সতর্ক ছিল না। সনন্দের সম্রাটবধায়ণ কালে কতদূর কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা পুরাতত্ত্ববিৎ পাঠকগণ বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। কারণ কোনও সনন্দে একাধিক অক্ষর লিখিত হয় নাই এবং সেই অক্ষর যে কোন রাজার প্রচলিত তাহা প্রায় স্থিররূপে লেখা হয় নাই। কিন্তু এ সময়ে সনন্দাক্ষরে লক্ষ্যণাক্ষ, হিজিরি সন, বিজয়সম্বত, শালিবাহন শকাব্দ অজ্ঞাত সতর্ক, এবং অক্ষর জানা কারণে এই সনদের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে।”

করিবেন। তবে আমাদের একটা ভালবাসার আধিপত্য আছে, বঙ্গদেশের বহুদিনের অশ্রু, সুখ ও প্রেমের কথা সঙ্গ তঁহার পদাবলী জড়িত হইয়া পড়িয়াছে; ধীরে ধীরে আমরা বাঙ্গালীর ধৃতি চান্দর পরাইয়া মিথিলার বড় পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়া তঁাহাকে আমাদের করিয়া দেখিয়াছি, সেইরূপে তিনি আমাদেরই থাকিবেন; আমরা আসনের পার্শ্বে একটি নকল বিদ্যাপতি খাড়া করিয়াছি; জগতে এই প্রথম বার নকলটি আসনের মতই সুন্দর হইয়াছে। আমরা পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক হইতে তঁাহাকে আর বাদ দিতে পারি না। এ শুধু ভালবাসার বল প্রয়োগ; ঐতিহাসিক এ আবদার নাও মান্ত করিতে পারেন।

আমাদের অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর কবি বিদ্যাপতির শিষ্য। মিথিলার শিষ্যই আমাদের নূতন কথা নহে। মিথিলার রাজর্ষি জনক, জাঙ্ঘবহ্মা গার্গী, মৈত্রেয়ী, গোতম, কপিল,—সমস্ত ভারতবর্ষের গুরুস্থানীয়। মিথিলারাজ ইক্ষ্বাকুর চারি পুত্র বিমাতার চক্রান্তে ভেদিত হইয়া কপিলাবস্ত্রতে নবরাজ্য স্থাপন করেন, বুদ্ধদেব সেই বংশোদ্ভব। নবদ্বিপের অজ্জয়টোল মিথিলার শিষ্য কাণাশিরোমণি দ্বারা অধিষ্ঠিত। ব্রিজ নামক মিথিলার ক্ষত্রিয়বংশের ভাষা—ব্রিজবুলি বঙ্গ সাহিত্যের বহু পৃষ্ঠা জুড়িয়া আছে। মিথিলার পণ্ডিতগণ “এক বাংগালী, দোসর তোতরাহ”* বলিয়া যদি আমাদের একটু গালি দেন, তাহা সহ করা আমাদের অমুচিত হইবে না।

বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস সমকালিক কবি, বসন্তকালে গঙ্গাতীরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক কবি পদ লিখিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাপতির ধর্ম-বিশ্বাস কি ছিল জানা যায় নাই। তিনি ‘দুর্গা-ভক্তি তরঙ্গিনী’ লিখিয়াছিলেন ও শৈবধর্মাবলম্বী শিবসিংহ রাজার প্রিয় সভাসদ ছিলেন। কিন্তু তঁহার স্বহস্ত-লিখিত ভাগবত খানা আছে—তঁহার রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় পদাবলী ভক্তির সরস উৎস; একটি শিব বন্দনায় তিনি লিখিয়াছেন, হরি উৎকৃষ্ট চাপা ফুলের অঞ্জলি গ্রহন করেন, শিব তুমি সামান্য ধূতুরা ফুলেই প্রীত হও। তিনি বাহিরে যাহাই থাকুন তঁহার হৃদয়টি বৈষ্ণবধর্মের অন্তরালে ছিল, একথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে।

বিদ্যাপতির কবিত্ব ভাবের প্রকৃত সামগ্রী। তিনি ভগবত্-কৃপার সঙ্গে স্বীয়

* বিদ্যাপতি, কাব্যবিশাখ মহাশয়ের সংস্করণ, উপক্রমণিকা ৮/।

শিক্ষার যোগ করিয়াছিলেন; সৌন্দর্য উপভোগের জন্ত স্বভাব-দত্ত চক্ষু ও শিক্ষা-দত্ত চসমা উভয়ই ব্যবহার করিতেন, একটি রূপের আকৃতি দেখিলে পৃথিবীর নানা রূপের ছবি স্পষ্ট ভাবে মনে উদয় হইত,—তাই তাহার উপমাগুলি এত সুন্দর । নায়িকার ডাগর চোখ ছাট তিনি কত উপমায় ব্যক্ত করিয়াছেন—দেখুন (১) সলিলাজ্জ চক্ষু ইবদ রক্তান্ত হইয়াছে,—পদ্মদলে যেন ইবদ সিন্দূরের লেপ পড়িয়াছে (২) চক্ষুর তারা যেন স্থির ভ্রূঙ্গের স্তায়—মধুতে বিভোর হইয়া উড়িতে পারিতেছেন । (৩) চোখের বক্সিম চাহনিতে কৃষ্ণ তারকা এক কোণে সরিয়া পড়িয়াছে, যেন মধু-সত্ত্ব ভ্রমরকে পবন ইন্দ্রিবর হইতে ঠেলিয়া কেলিতেছে ।

এইরূপে উপমার সংখ্যা নাই; উপমা ভিন্ন কথা নাই । পৃথিবীর সুন্দর পদার্থগুলি পৃথক হইলে ও তাহাদের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে; চাঁপা ফুলের ভ্রাণে ও বেহাগ রাগিণীর কথা মনে পড়ে; এই সম্বন্ধ নির্ণয় করা বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত, কিন্তু কবি তাহা ধরিয়া ফেলেন, জগতের এই লতাফুলপল্লব ও নরনারীচিত্র এক তুলির আলেখ্য; সেই একত্বের গন্ধ অনুভব করিতে মনের একটা শক্তি আছে, চক্ষু কর্ণের স্তায় তাহার নাম নাই, সেই শক্তি উপমা বোজনায় ব্যক্ত হয় । বিদ্যাপতির এই ইন্দ্রিয় অতি তীক্ষ্ণ ছিল; বৈদ্য যেরূপ সতত উপেক্ষিত ভূগপল্লব হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কার করেন, বিদ্যাপতি ও সেইরূপ এই পৃথিবীর অতি সচরাচর দৃশ্য হইতে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করিয়াছেন । উপমার যশঃ ভারতবর্ষে একমাত্র কালিদাসেরই একচেটিয়া, যদি দ্বিতীয় একজনকে কিছুভাগ দিতে আপত্তি না থাকে, তবে বোধ হয় বিদ্যাপতির নাম করা অসম্ভব হইবে না । বিদ্যাপতির দ্বিতীয় শক্তি,—সৌন্দর্য্যের একটি পরিস্কার চিত্র আঁকিয়া দেওয়া । বিদ্যাপতির বর্ণিত রাধিকা,—কতকগুলি চিত্রপটের সমষ্টি । বয়ঃ সন্ধির ছবিখানা এইরূপ,—

রাধা কখনও বলিকা-হুলত উচ্চহাস্য হাসিয়া কেলেন, কখন ও নবাগত যৌবনের ভাবে গুটপ্রান্তে ইবৎ হাসি চাপিয়া রাখেন । কখন ও চমকিত হইয়া পান-বিক্ষেপ করেন, কখন ও তাহার গতি বুঝতীর স্তায় মুহুমুদ; নিজের শরীরে আনত দৃষ্টি করিয়া কখন ও বিভোর হইয়া তাহাই দেখেন, কখন ও বা তাহা বস্ত্রে ঢাকিয়া রাখেন । প্রেম-ক্লিষ্টার কথা শুনিলে চক্ষু মুক্তিকর দিগে মত করিয়া একান্ত কর্ণে তাহাই শুনিতে লাগত; কেহ তাহা লক্ষ্য করিয়া এতর করিলে স্বাভাৱ্য হইয়া বিবাহিয়া গাণি দেন । আদর্শা সম্মুখে রাধিকা চুলকনাদি করার সময় সখীগণকে চুপে চুপে প্রেম সম্বন্ধে প্রেম

করেন ও হৃদয়ে প্রেমের ভাব উপস্থিত হইলে চক্ষু মুদ্রিত করেন। রসের কথা শুধিলে সংগীত-মুগ্ধ হরিণীর স্তায় সেই দিগে আকৃষ্ট হন।*

আর একখানি ছবি লজ্জার।

“একদিন একখানা ছোট কাপড় পরিয়া আলুবালাু ভাবে বসিয়া আছি। অলক্ষ্যে কৃষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। শরীর একদিগ ঢাকিতে অন্তরিক মুক্ত হইয়া পড়ে। লজ্জায় ইচ্ছা হইল ধরণী কাটিয়া বাউক তাহাতে প্রবিষ্ট হই * * * * *
কি বলিব সখি, আমার জীবন যৌবনে থিক, আজ আমার মুক্ত অঙ্গ গ্রীহরি দেখিলেন।

এই লেখাগুলি তুলিতে আঁকা ছবির মত। সুন্দরীর নানা ভঙ্গীর ছবি দেখিয়া কবি ফটো তুলিয়াছেন; তুলি দ্বারা ফলিত বর্ণ মুছিয়া যায় কিন্তু লেখনীর আঁকা ছবি মোছে না; তাই ৫০০ শত বৎসর পরে ও এই নারী-চিত্র গুলি সদা প্রস্ফুট মালতীর স্তায় স্পষ্ট রহিয়াছে। এই রাধা জয়দেবের রাধার ভ্রাতৃ—শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের ভাগ অল্প। কিন্তু বিরহে পৌছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাইয়াছেন, তথা হইতে কবি কপালে তিলক কাটিয়া বৈষ্ণবভক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার স্ত্রেমে-বাধা বিলাসকলাময়ী নায়িকার চিত্রপটখান্না সহসা সজীব রাধিকা হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার উপমা ও কবিতার সৌন্দর্য চক্ষের জলে ভিজিয়া নবলাবণ্য ধারণ করিল। বিরহ ও বিরহান্তর মিলন বর্ণনায় বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-কবিদিগের অগ্রগণ্য। কেহ কেহ বলেন চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাঁহার কবিতার এই অপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল।

গ্রীহরি মথুরার বাইবেন গুনিয়া রাধা জ্ঞান-হীনা, কৃষ্ণ আসিলে তাঁহার হাত ছুখানি সবত্রে মস্তকে ধারণ করিয়া যেন রাধা নীবরে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল “আমার মস্তকে হাত দিয়া বল, বাইবে না।” কৃষ্ণ সেইরূপ অপখই করিলেন, রাধা তাহাই বেদবাক্যের মত বিশ্বাস করিল। বিদ্যাপতি-বর্ণিত রাধিকা বড় সরলা, বড় অনভিজ্ঞ। কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, শুধু ও শীর্ণ কুসুমকান্তি ভূতলে সূটাইতেছে, সখীগণ

পাঠক কৃষ্ণের উদ্ধৃত কথার কতি কমা করিবেন। কটির অহরোহে আমার অহবানের আরেক স্থল একটু একটু কোমল করিয়াছি। নিখুঁত হৃদয়সম্পন্ন রচনা বিদ্যাপতির পুরস্কার, কৃষ্ণাপ-মিলন, মনঃ প্রেয়-বৈচিত্র্য প্রভৃতি অখ্যানে একরূপ হুস্মান্য।

কুম্ভ আসিবেন বলিয়া অকস্মাৎ দিতেছে, মুক্যশয়্যারশয়ানা কাতরে বলিতেছেন,—

চক্ষু করে নলিনী লতা শুকাইয়া গেলে বসন্ত ঋতু আসিলেই বা কি হইবে ?

বাস্তবিক তখন ও তাঁহার সেই ‘বিদগিত-মাল’ নলিনী-লতার একই অবস্থা ।

এই দুঃখের পরিসমাপ্তি সুখে । বিরহের দুঃখের পর মিলনের সুখ বর্ণনায় বিদ্যাপতির শ্রায় গাঢ় প্রেমের কথা পদ্য-সাহিত্যে অল্পই আছে । রাধিকা চক্ষুরিরণে কোকিলের কুহুম্বরে পাগলিনী হইয়া ছিলেন,—এখন বলিতেছেন,—সেই কোকিল এখন লক্ষ ডাক ডাকুক, লক্ষ চাঁদ উদিত হউক, পাঁচটি ফুলবাগের ফলে লক্ষ ফুলবাগ নিকৃষ্ট হউক ।

কুম্ভ আসিবেন—প্রাণবধূকে প্রণাম করিবেন, রাধা এই সুখের আশায় মুগ্ধা ।

“কি কহ বরে সবি আনন্দ ওর ।

চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥”

প্রভৃতি পদের হর্ষে মহাপ্রভু পাগল হইয়া এক প্রহর কাল নৃত্য করিয়াছিলেন । “জনম অবধি” পদ বহুব্যবহার উদ্ধৃত হইয়াছে ; এখানে আর উঠাইব না । ছবি-অঙ্কন-নিপুণ, প্রেমালাদ বর্ণনায় কৃতার্থ, উপমা ও পরিহাস রসিকতার অত্যুৎকৃষ্ট বিদ্যাপতি অনেকগুলি স্বাভাবিক গুণ লইয়া জগৎগ্রহণ করিয়াছিলেন । সাধারণ পাঠক তাহার মনোমুগ্ধকর উপমা পড়িয়া প্রীত হইবেন, তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর পাঠক তাঁহার প্রেমের বিকলতা ও গাঢ়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রেমিক ও ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিবেন । কিন্তু আমরা বিদ্যাপতি হইতে বড়, খাঁটি প্রেমিক আড়ম্বর-হীন আর একটি কবির সম্বন্ধিত হইতেছি,—সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্য ঘাটিলে ও বাহার একটি অঙ্গুর মূল্য হইবে না, বাহার কুতিপর অজ্ঞানজনিতপদ কুম্বের সুরভির তার প্রকৃতি আপনা আপনি দ্বার উদঘাটন করিয়া প্রচার করিতেছে—শিকার কর্ণন আব-
শ্যক হয় নাই,—যিনি গীতি কবিতার সরস অক্ষরে কটকাবীর্ণ কুম্ব-
মের তার সুধা ও বিব মিশ্রিত প্রেমের কথা গাধিয়া গিয়াছেন—
কাব্যক্ষেত্রে সেই চণ্ডীদাসপ্রভৃ কৰ্ম্মক্ষেত্রে চৈতন্যপ্রভুর ন্যায় অন্য এক

প্রেমাবতার। বিদ্যাপতির কবিতা টাকা টিপ্তনী দিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদ যিহা নিজে আনন্দ করিতে না পারিবেন, তাঁহার কাছে পতিত হইলে বিদ্যাপতির কথায় বলা যাইতে পারে,—

“কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল।

ভগ্না রতন করই সমতুল ॥

বো কহু কতু নাহি কলা রস জান।

মীর ক্ষীর গুহ করই সমান ॥”

গ। চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ ১৩৮০ খৃঃ অব্দে নানুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন্দুবিষ ও বিসপী হইতে নানুর বড় তীর্থ; চণ্ডীদাসের নিবাস-ভূমি পবিত্র নানুর-পন্নী এখনও আছে,—পাগল চণ্ডীর স্বর্গীয় অঙ্গসিক্ত পবিত্র বাঙালী দেবীর মন্দির এখনও আছে। সেই পন্নী ও মন্দিরের নিভৃত নিকেতনে প্রেমের যে মধুর মধুর লীলা হইয়াছিল,—এ জগতে তাহার তুলনা নাই; প্রেমিকের নিকট ক্ষুদ্র নানুর-পন্নী দ্বিতীয় বৃন্দাবন তুল্য হৃদয়; কিন্তু পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতি-লেখকের স্মৃতি বহন করিতে সেই স্থানে কোন সমাধি স্তম্ভ নাই—এ আক্ষেপ আমাদের ইংরেজী শিক্ষার দরুণ হয়; নতুবা আমাদের দেশের লোক অতীতকালে স্মৃতি রক্ষা করিতে অভ্যস্ত ছিল,—সমাধিস্তম্ভ এদেশের সামগ্রী নহে; তাহার। ঘরে ঘরে মূর্তি গড়িয়া পূজা করিত, প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া পুষ্পাঙ্কুর মহাঅনুগ্ৰহের নাম ভক্তিতরে উচ্চারণ করিত ও শিশুগণকে বলিতে শিখাইত।

পাঠক ক্ষমা করিবেন, ইতিহাসলেখকের স্বমতটি আড়ালে রাখিয়া বিষয়টি বর্ণনা করা উচিত, আমি সেই নিয়ম রক্ষা করিতে পারিতেছি না। একটা বিষয় বক্তব্য এই,—চণ্ডীদাসের কবিতার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট না হইলে আমি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য আলোচনা করিতাম না। সুতরাং তাঁহার কথা লিখিতে মান্য অসম্বন্ধ কথা আসিয়া পড়িতেছে।

নানুর বীরভূম জেলার অন্তর্গত,—বাঁকুগির থানার অধীন, সিউরি হইতে পূর্বাংশে ১২ কোশ। বীরভূম জেলার অনেকগুলি মূন্সির তপোবন আছে; বকেরা আরি উক প্রভাবন, মৌরক্ষী, অজয়, সাল, হিংলা, ধারিকা প্রভৃতি নদ নদী পাহাড়ের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া ছুটিয়াছে। বীরভূমের

বেলফুর্স বড় বড়, শ্রীমতীগোলাপহনরীরা ও তাহাদের সৌন্দর্য্য, অবরব ও সুবস্ত্রের সিকট লজ্জা পাইবেন। স্বভাবের সুবন্দ্য্য স্নিকোভন বীরকুম—জয়দেব ও চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। তাহাদের ফলস্র ও সেই বড় বড় বেল ফুলের জার সুন্দর ও বড় ছিল, ইতিহাস এ কথা স্বীকার করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের পিতা ‘বিশালানন্দদেবীর’ পূজক ছিলেন, তজ্জন্তই বোধ হয় পুত্রের নাম ‘চণ্ডীদাস’ রাখা হইয়াছিল; এখনও নান্দুর গ্রামে বাণুলী-দেবী অধিষ্ঠিত আছেন ও তাহার পূজা নিয়মিতরূপে নির্বাহিত হইয়া থাকে। চণ্ডীদাসের পিতার মৃত্যুর পর তিনিও উক্ত দেবীর পূজক নিযুক্ত হন। উক্ত দেব-মন্দিরের সেবিকা রামমণি (মরহরিরমতে ডাকী) * খুবনী কবির ছন্দে অপরূপ প্রেম জাগাইয়া দিয়াছিল; এই সম্বন্ধে নামাবিধগল্প আছে; বাহা ঐতিহাসিক ভিত্তিতে দাঁড়াইতে না পারিবে, এরূপ অসার গল্প লিখিয়া পাঠকগণের মধ্যে এল্যানাস্কারের ন্যায় ভাবুক শ্রেনীর মনোরঞ্জন করিতে ইচ্ছা নাই; বিদ্যাপতির সম্বন্ধে ও এইরূপ অনেক গল্প পাঠ করা গিয়াছে।

রাখীকে ভালবাসিয়া তিনি লোক লজ্জা ও লাঞ্ছনার একশেষ পাইয়াছিলেন, এরূপ অনেকগুলি পদে পাওয়া যায়। বাহা ইউক এধিবর লইয়া বিলম্ব করা প্রয়োজনীয় বোধ করি না। কালে চণ্ডীদাসের ভূপ্রোথিত ইতিহাস কেহ উত্তোলন করিতে পারিলে হীরা, চুনি, মুক্তা দিয়া তাহা স্বরিতের বোণা হইবে।

চণ্ডীদাসের কর্ণিত রাখিকাকে প্রথম যখন তিনি দেখাইতেছেন তখনই উন্মাদিনীর বেশ; প্রেমের হাতধার তিনি হুটয়া রাখিয়াছেন। স্বীয় নিবিড় রক্ত হুতল আত্মাতে একবার বুলিতেছেন, একবার দেখিতেছেন,—তাহার মধ্যে ‘ককরনের’ মাধুরীটি আছে; ককরনোড় ভেবপানে তাকাইতেছেন, ককরনের ভাষা চমকিতেছে না,—যেদের সৌন্দর্য্যে ডুবিল পড়িতেছে,—ককরন ককরন বর্ণ বেবের জায়; একদৃষ্টে তিনি সমুদ্র সমুদ্রীর কণ্ঠ দেখিতেছেন, সেখানেও চক্ষু ককরনের অহনক্ষান করিতেছে,—সব শরিতর এইরূপ।

* এইরূপ বাহু ভঙ্গ্য তর বহালয়ের সুন্দর্য্যে চণ্ডীদাসের বে জীবনী একত্ব হইয়াছে তাহাতে ইহার নাম ‘সামন্তার’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৩০ পৃ:)। এই নামই বোধ হয় ঠিক, অজ্ঞা হইলে বর হরিন ‘তারা খুবনী’ বৃত্তিতে কোমল ও মৌল হয় না।

ভাষায় গর গ্রেমের বিবলতা, কত বিমল, কত অহমহ, মধুরাধা ক্রোধ, সেই ক্রোধে কারিয়ামাত্র নাই, ফুললে সেই ক্রোধের কষ্ট, —মাকের পুরই মানভঙ্গ, গালি দিয়া, —আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়া নিজে আহত হইয়া আসা, —কত কাতর অশ্রুর সম্পাত, কত দুঃখের নিবেদন, কত কাতরোক্তি; গ্রেম করিয়া লোক কত দুঃখী হয়, —বন্দরে ঘাইয়া যেন ভিক্ষা দিলে না, সুরধুনী-তীর হইতে যেন শুককণ্ঠে ফিরিয়া আসিতে হয়, —সেই দুঃখ চণ্ডীর কবিতায় ছত্রে ছত্রে। তথাপি সেই কষ্টের মধ্যেই কষ্ট বহন করিবার যোগ্য উপকরণ আছে, —কষ্টের মধ্যেই কষ্টের ঔষধ সুখ আছে।

“যথা তথা যাই আমি বতব্বর পাই।

চাঁদ মুখের মধুর হাসে ভিলক জুড়াই।”

সেই চাঁদ মুখের কথা বলা যায় না। বলিতে গেলে সুখে দুঃখে সুখা বিয়ে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সেই অশ্রুতে সুখ দুঃখ জড়িত, —প্রভাত পরের নয়ান ছাট চক্ষু আলো পাইয়া জাগে, কিন্তু নৈশ-শিশির ভারাক্রান্ত হইয়া মলিন হয়, —কোনটি পূলকাক্ষ কোনটি শোকাক্ষ, কোনটি প্রাতঃশিশির কোনটি নৈশ-হিম-কণা তাহা নিশ্চয় বলা যায় না।

“সুসজ্জন আগে, দাঁড়াইতে নারি,
সদা হল হল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক দেহারিভে,
সব স্থানময় সেখি ॥

দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পুরয় তবু স্থান পরসঙ্গে ॥
পুলক চাকিতে নানা করি পরকার।
ময়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥

তাঁহার প্রসঙ্গেই কাদিয়া ফেলেন, বড় সুখ হয়, —সে নারি শুনিতে বড় সুখ হয়, চক্ষে আপনিই জল পড়ে; আবার এই সুখ পাঁছে পরে দেখে, —পৃথিবী ত সুখের বাদী, গভীর সুখ পৃথিবী বোঝে না, —জই নানাপ্রকারে সেই পুলক চাকিতে চেষ্টা করিয়াও তাহা রোধ করা যায় না। এই সুখের মধ্যে ও বিবাদের ছায়া আছে, না হইলে সুখ অপূর্ণসুখ হইত না; না ভাবাইতেই ভাবিবার ভয়; —

“এ হেন বঁচুরে মোর বে জন ভাসার।

হাম নারী অবলার যথ লাগে তার ॥”

ভালবাসার দুঃখের প্রতিবেদন, —আভিমান; কিন্তু তাহা আত্মবিকারমাত্র।

“এক কর্তব্য হইল আমি করি নানি করব।

আমি এক কর্তব্যে আমি মথি হইয়া রম—ও যদি করব না।”

ইহাই চূড়ান্ত শীঘ্র। চণ্ডী দাসের মান করিবার ও সাধ্য নাই; দশ ইঞ্জির
বুধ, যন মান করিবে কিরূপে? স্বীয় শরাসন অক্ষুণ্ণ, শর নিক্ষেপ
করা অসাধ্য,—

“মত নিবারিয়ে তার বিহার না যায় ।

আন পথে খাই তবু কাণু পথে যায় ॥

এ ছার রসনা ঘোর হইল কি বাম ।

ধীর নাম নাহি লব লয় তার নাম ॥

এ ছার নাসিকা মুক্তি কত কর বন্ধ ।

তবুত দারুণ নাশা পায় গ্রাম গন্ধ ॥

সে কথা না শুনিব করি অনুমান ।

পর সঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ ॥

ধিক রহে এ ছার ইঞ্জির আদি সব ।

সদা যে কালিয়া কাণু হয় অনুভব ॥”

ইহা অপূৰ্ণ তত্ত্ববৎ ।

আমরা চণ্ডীদাসের কবিতা বেশী উঠাইব না। যে পাঠক প্রেমিক
তিনি হৃদয় নিভুতে সেই পদ-কুসুমগুলি তুলিয়া অশ্রুসিক্ত করিয়া স্থখী
হউন। মিষ্ট দ্রব্যের যেরূপ স্বাদ ভিন্ন অল্প প্রমাণ নাই, এই গীতিগুলির
উৎকর্ষের ও পাঠ ভিন্ন অন্য প্রমাণ হইতে পারে না।

একটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব, কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির
যশে চণ্ডীদাসের যশ কিছু ঢাকা পড়িয়াছে। তাহা হওয়া বিচিত্র নহে,
কালিদাসের যশে ভবভূতি ঢাকা পড়িয়াছেন, ভারতচন্দ্রের যশে কবিকঙ্কণ
ঢাকা পড়িয়াছেন, কতক দিনের জন্য পোপের যশে সেক্ষপীয়র ঢাকা
পড়িয়াছিলেন, চাক-চিহ্নপটখানা দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হয়,—কিন্তু মানস
সৌন্দর্য ও গরিমার পট সেরূপ সহজে আয়ত্ব ইহবার বিষয় নহে।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ভ্রাতৃ শিক্ষিত ছিলেন না,—ইহাই সাধারণ মত।
লেখা পড়া পুষ্পের ভ্রাতৃ, ফল জন্মিলে পুষ্পের বিলয় হয়; শাস্ত্র
জ্ঞাব কি, অস্ত্রের নিকট পৌছাইতে চেষ্টা করে; যিনি নিজের ভাবুক বা
ভক্ত তিনি শাস্ত্রের আয়নায় প্রতিবিম্বিত প্রকৃতির যুষ্টির প্রতি কেনই
বা লক্ষ্য করিবেন;—প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। চণ্ডীদাস
বিদ্যাপতির ভ্রাতৃ উন্নয়ন প্রয়োগ করেন নাই,—হৃদয়ের স্বভাব ভঙ্গীই
গহনা হইতে বেশী আকর্ষক; উপমা কবির একটি শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া
বর্ণিত আছে সত্য,—কিন্তু যিনি ভাবটি নিজের জ্বলিতে আঁকিতে পারেন
না, তিনি উপমার আত্মনী সঙ্কেতে দৌণবন্ত স্বারা সুখা বস্তুর আভাস
নিতে চেষ্টা করেন। তাই উপমার রূপ বর্ণনা হইতে জীবন আঁকিয়া

রূপ বর্ণনা উৎকৃষ্ট। এই অংশে কালিদাস হইতে সেকপীয়র শ্রেষ্ঠ,—কিন্তু—
পতি হইতে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ।

চণ্ডীদাসের দুএকটি গানে ভাগবত পড়ার আভাস আছে,—“কেশল
আছিল দুই অর্ধেক চুলাতে রাখিয়া বেনালি” প্রভৃতি পদ দেখুন।

৫। কাব্যোতিহাসের সূত্রপাত-শাখা।

ক। ঐধর্ম-মঙ্গল অথবা গোড়-কাব্য।

খ। রাজ-মালা।

এই অধ্যায়াংশে বেশী কিছু লিখিবার নাই। মেদিনীপুর ময়নাগড়ে
লাউসেন রাজার ভগ্ন-প্রাসাদের অবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। অজয়নদের
তীরে ইছাই ঘোষের বাড়ীর রাশীকৃত ইষ্টকাবলী এখনও পড়িয়া আছে।
এসব চাঁদসদাগরের নিবাস স্থানের জ্ঞান করিত রাজ্য নহে; গোড়-ইতিহাসের
প্রবল প্রভাপাণিত মহারাজগণের সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত ঐতিহাসিক
তথ্য আবিষ্কৃত হয় নাই। পল্লিকায় কলিযুগের রাজচক্রবর্তিগণের গিটিতে
লাউসেনের নাম দৃষ্ট হয়, হাণ্ডার সাহেব তাঁহার ‘এনালস্ অব ব্রহ্মাল বেঙ্গল’
নামক পুস্তকে ইছাই ঘোষের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইটি ঐতিহাসিক
বীরকে ধর্মমঙ্গলকাব্য, কন্ননার গাঢ় ভূহিনে আবৃত করিয়া উপস্থিত
করিয়াছে;—কন্ননার নানাবিধ উজ্জলবর্ণ-বিশিষ্ট কুসাসার চাপে স্বত্যের
জীবনটুকু একবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু তথাপি ইহার গোড়ায় একটুকু সত্য আছে, এই জন্য আমরা
ইহা এই স্থানে সন্নিবিষ্ট করিলাম। প্রকৃতপক্ষে গোড়-ইতিহাস এখন
আমরা যে অবস্থায় পাইতেছি, তাহা পদ্মপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যের মত।
উহা আশ্রয় করিয়া কবিগণ চণ্ডীদেবীর বিজয়কেতু উদ্ভিত করিয়াছেন।
প্রাচীনকালের হুইজন বীরকে প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রবাদের খানা হইতে
উন্তোলিত করিয়া শিব দুর্গার প্রিয়সেবকরূপে পরিণত করা হইয়াছে,
সুতরাং এখনকার ঐধর্ম-মঙ্গলের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক অল্প।

হাকিমপুরাণ নামক পুস্তক প্রাচ্য এই ইতিহাসের প্রথম প্রচার হয় বলিয়া
উল্লিখিত আছে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন বাঁকুড়ায় যখন
ভট্ট প্রণীত গোড়কাব্য এখনও প্রচলিত আছে,—ইছাই দ্বিতীয় প্রহ,

আমরা—তাহা পাই নাই। খেলারাম শ্রেষ্ঠ একই বোর্ডের কবিরের তৃতীয় পুস্তক; শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিবিধি রচয়িতা এই পুস্তকের উদ্ধার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কে গুজরাতান পাইয়াছেন তাহার গোবের অনেকাংশ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মিত্রের একখান পুস্তক না পাওয়া পর্যন্ত খেলারামের কাব্য ছিন্নভিন্ন কি ভগ্নবিগ্রহের ভাষা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখিবার যোগ্য হইবে।

খেলারামের পুস্তক ১৫২৭ খৃঃ অব্দে রচিত হয়; কবি তাহা নিম্নলিখিত পংক্তি করেকটাতে উল্লেখ করিয়াছেন;—

“ভুবন শকে বায়ু দাস শরের বাহন।*

খেলারাম করিলেন এই আরম্ভন।

হে ধর্ম এ দাসের পূরাও মঙ্গলান।

গৌড়কাব্য একাশিতে থাকে খেলারাম।

তোমার কুপার যদি এই পুঁহির।

অষ্ট মঙ্গলায় দিব আশ্ব পরিচয়।”

তাঁহার শেষ অধ্যায় (অষ্টমঙ্গলা) পাওয়া যায় নাই; সুতরাং আশ্ব-বিবরণটি নষ্ট হইয়াছে। খেলারামের কবিতা সরল ও সরস; কিছু নমুনা এই;—

“হিত পৈলেশ্বর শিব বঙ্গের অঞ্চলে।

সুরবা সম্রাট এক ভীরু নাহি বলে।

কমল কুবলী স্মারি সনাতন মল।

কিন্দারি সুর্য্য তার শীল উজ্জ্বল।

শুন বাছা লাউসেন বলিলে তোমার।

একলাই দিত, কেহা কেউই তকার।”

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মহোদয়, জনরামের পূর্বে রূপরাম দায়ক জায় একজন কবি স্বর্গবন্দল ফারা লিখিয়াছিলেন; কলিকাতার পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ উক্ত পুস্তক এখনও প্রচলিত আছে। তাহা হইলে শ্রীকর্মবন্দল-প্রণেতা কবিগণ সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য প্রত্যয়। এই ৪জন কবির মধ্যে একজনের নামেই ‘রাম’ আছে, যথা,—খেলারাম, রূপরাম, জনরাম।

খ। রাজ-মালা।

ত্রিপুরার মহারাজা স্বর্গমণিকোর সময় (১৪৭৭-১৪৯২ খৃঃ) রাজ-মালা কবিগণ কর্তৃক লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। ত্রিপুরার মহারাজাধ্বজ বঙ্গভাষার

* ভুবন=১৪; বায়ু=৪১। শরের বাহন=ধনু=গৌরবাস। ১৪৪১ শক গৌরবাস।

এইসব কবিতা শ্রীযুক্ত ভক্তিবিধি মহাশয় আমাকে পাঠাইয়া নিয়াছেন।

কিছুপা উৎসাহ বর্ধক হিসেবে ইহা আমাদের আত্মবিশ্বাস হইবে, প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্বে হইল রাজসভার বক্তৃতা গৃহীত হইয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটির জারিভালে একবার এই রাজমালার সারাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের অজ্ঞাত রাজসংগত যদি এই পথ অনুসরণ করিয়া স্বীয় বংশের ইতিহাস সংকলনে যত্নপর হইতেন, তবে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস প্রস্তুতকৃতবিশেষের কল্পনার একটি বৃহৎ ক্রীড়াকাননে পরিণত হইত না। যে সময় রাজ-মালা রচিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় বংশাবলী স্বনামতনে দেখান জন্ত একটি সংক্ষিপ্ত রাজমালা ও প্রস্তুত হইয়াছিল—আমরা তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি,—

“যবাতি রাজার পুত্র দুর্ধা নামবার।

তান বংশে লৈতা রাজা চন্দ্র বংশ মার।

তাহান তনয় রাজা ত্রিপুর নাম ধরে।

তন্ত পুত্রী পর্কে জিলোচন রাজ্য মধ্যে।

তাহান তনয় হৈল হর্ষিণ নৃপতি।

তন্ত পুত্র তৈলকিণ রাজা চারুদতি।

তন্ত পুত্র হর্ষকিণ ছিল বহীশার।

তান পুত্র হয় দক্ষিণ নৃপতি বিশাল।

তন্ত পুত্র ধর্মতর রাজ-নীতি অতি।

তান পুত্র ধর্মপাল হৈল নরপতি।

তন্ত পুত্র সুর্য ছিলেন মহারাজা।

তান হৃত তরঙ্গ হৃথপালে প্রজা।

তন্ত পুত্র বেবাজন হইল মতিমান।

তান পুত্র নরাস্তিত নৃপতি আধান।”

ইহা বঙ্গে ইতিহাস লেখার সূত্রপাত। ইহার বিকাশ বৈষ্ণব-সাহিত্যের চৈতন্য-ভাগবতের স্থায় ঘটনার উৎকৃষ্ট সমাবেশযুক্ত ইতিহাসে ও চরিতামৃতের দ্বারা অপূর্ণ তত্ত্ব-সম্পূর্ণ দর্শনাত্মক ইতিহাসে দৃষ্ট হইবে। কিন্তু বাংলা ভাষার চরিত-শাখা মাত্র বিকাশ পাইয়াছে। রাজবংশের ইতিহাস কি রাজনীতির আলোচনা বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে হুম্মাপ্য; বাহা কিছু পাওয়া যায়,—রাজমালারই তাহার সূত্র, রাজমালারই তাহার শেষ।

আমরা যে-সব কবিগণকে পৌরীকরণ অথবা শ্রীচৈতন্য-পূর্ব সাহিত্যের অন্তর্গত করিয়া তাঁহাদের কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যের সমকালিক হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য প্রভুর পূর্বে সাহিত্যের যে নানাবিধ উদ্যম হইতেছিল, আমরা এই অধ্যায়ে তাহার সূত্র ও ক্রম-বিকাশ নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যদিও উল্লিখিত কবিগণের মধ্যে কেহ কেহ চৈতন্য প্রভুর সময়ে আনিয়া পড়িলেন, ইহাদের কেহই তাঁহার প্রভাবান্বিত নহেন ও ইহাদের মধ্যে ও চৈতন্য প্রভু অমৃত্যুর বলিয়া সাধারণের নিকট গৃহীত হয় নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ।

আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত কবিগণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, এস্থলে তাঁহাদের সময় ও গ্রন্থাবলীর সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি,—

নাম—	কাব্য রচনার কাল—	রচিত গ্রন্থের নাম ।
১। কুস্তিবাস	১৩৮৫—১৩৯২ খৃঃ (কংস নারায়ণের কাল)	১। রামায়ণ, ২। শিব রায়ের যুদ্ধ, ৩। যোগদ্যায় বন্দনা ।
২। সঙ্গর	সম্ভবতঃ কুস্তিবাসের সমকালে ।	মহাতারত ।
৩। বিদ্যাপতি	১৪৪৬—১৫০৬ খৃঃ—	১। পদাবলী, ২। পুস্তক পরীক্ষা, ৩। শৈব সর্বসঙ্গার ৪। দানবাকাবলী, ৫। বিবাদসার ৬। পরা- পস্তন, ৭। পদাবাকাবলী, ৮। দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী । পদাবলী ছাড়া সবগুলি পুস্তকই সংকূতে রচিত ।
৪। চণ্ডীদাস	১৪০৩ খৃঃ—	পদাবলী ।
৫। দ্বাদশর বহু	১৪৫৩—১৪৮০ খৃঃ† (শুণ্ডরাজ্য বঁ।)	১। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় । ২। লক্ষ্মী চরিত্র । পদ্মপুরাণ ।
৬। কাণাহরিদত্ত	১৪৫০ খৃঃ অব্দ অথবা তদ্রিকটবর্তী কাল	২
৭। বিজয়দত্ত	১৪৭৮ খৃঃ‡ (ইনি হুসেন সাহের উল্লেখ করিয়াছেন ।)	৩
৮। নারায়ণদেব সম্ভবতঃ	বিজয়দত্তের সমকাল ।	৩

* “বিধুর রিকট বেড় পঙ্কজাণ

নবহঁ নবহঁ রস, ইহ পরিমাণ ।” চণ্ডীদাস ।

† “ভেরশ পিচানই শকে গ্রহ আরভন ।

চতুর্দশ ছই শকে হল সমাপন ।।” শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ।

‡ “ছায়া শূন্য বেদশয়ী পরিমিত শক ।

বসন্তের হুসেন সাহেব শ্রুতি-ভিত্তিক ।” বিজয়দত্ত ।

আমরা যে কারণে বিজয়দত্তকে আরও পূর্ব সময়ের কবি মনে করি, তাহা নিশ্চিতরূপে
হির না হওয়া পর্যন্ত উক্ত তারিখই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম ।

- ১০। বিজয়নাদী—ইরুপ কোন নদীর—মঙ্গলচৌরী উপাখ্যান ।
 ১০। রতিদেব—ঐ—হুগলন্দ ।
 ১১। শুক্রেবর ও বাণেশ্বর পণ্ডিত—১৪০৭—১৪৩৯ খৃঃ—রাজমালা ।
 ১২। খেলারাম—১৫২৭ খৃঃ—ধর্মমঙ্গল অথবা গোড়কাব্য ।
 ১৩। কবীন্দ্র পরমেশ্বর—১৪৯৫—১৫২৬ খৃঃ—মহাভারত
 (হসেন সাহার সময়)

- ১৪। শ্রীকরনন্দী—ঐ—অধঃসংস্কৃত ।

এই কবিগণের মধ্যে কবীন্দ্রপরমেশ্বর ও শ্রীকর-নন্দীর অনুবাদিত মহাভারত পরোক্ষভাবে সম্রাট হসেন সাহারই উৎসাহের ফল ; বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ ও বহুসংখ্যক বৈষ্ণব গ্রন্থে হসেন সাহার যশ ও কীর্তি বর্ণিত আছে । তিনি অম্যধর্মাবলম্বী হইয়াও হিন্দুদিগের প্রতি অত্যন্ত উদার ও বন্ধুভাবার উৎসাহবর্ধক বলিয়া গণ্য ছিলেন । এই সম্রাটের মামাহুসারে গোড়ীয় যুগের মধ্যে এক ষণ্ডযুগ চিহ্নিত করিয়া তাহাকে “হসেনী সাহিত্যের কাল” আখ্যাদান করা অনুচিত হইবে না । উপরি উক্ত ১৪ জন কবির মধ্যে বিদ্যাপতি মিথিলা—বিসপীর, চণ্ডীদাস বীরভূম—নারায়ের, খেলারাম সম্ভবতঃ হুগলী জেলার ও মালাধরবহু কুলীমগ্রামের অধিবাসী ছিলেন । অবশিষ্ট ৯ জন পূর্ববঙ্গের কবি । ইহাদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত বরিশাল ফুলশ্রীগ্রামের, নারায়ণদেব ময়মনসিংহের, রাজমালালেখকগণ ত্রিপুরার এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর শ্রীকর-নন্দী, ও রতিদেব চট্টগ্রামের অধিবাসী । অপর দুইজনকে পূর্ববঙ্গবাসী বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া গেল না । বঙ্গদেশের প্রত্যেক স্থলেই ভাষাকাক্য রচিত হইয়াছিল, কোন প্রদেশেই একবারে প্রতিষ্ঠানু্য যত ছিল না । আরণ্যকুসুম ও গ্রাম্যকবিতা সর্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই সম্বন্ধে যথার্থ অনুসন্ধান হয় নাই, হইলে বহুকালের আশঙ্ক বৃক্ষবর্ণ ভুলট কাগজের গোর হইতে আমরা প্রাচীন কবিগণের আরও কতগুলি ককাল উন্মোচন করিতে পারিব, কে বলিতে পারে ?

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, হিন্দুধর্মের উত্থানের মানাবিধ চেষ্টাই বন্ধুভাবা বিকাশের প্রথম এবং প্রধান কারণ । যে সে পুস্তক নিম্নলিখিত তাহা সাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইত না । কেবল পুস্তকের বিষয় বর্ণনামাত্র

হওয়া আবশ্যক ছিল এমন নহে, প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত লেখক না হইলে কেহ প্রতিভাবলে কি শরীরের বলে দাঁড়াইতে পারিতেন না। এইজন্য প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই শঠতার সাধারণ মার্গ অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিতে হইত। দেবাদেশে কাব্য রচনার হাত দিয়াছেন, একথা ঘোষণা করা সাহিত্যের ব্যবসাদারী ছিল। সমাজের শাসনে প্রতিভা স্বীয় শক্তিতে দাঁড়াইতে সাহসী হইত না। কৃষ্ণিবাস লিখিয়াছিলেন,—“কৃষ্ণিবাস রচে গীত সরসতীর বরে” তাঁহার সঙ্গে দল বাঁধিয়া অসংখ্য লেখক স্বপ্ন কি ‘বরের’ দোহাই দিয়া কাব্যের মুখপাত আরম্ভ করিয়াছেন। ‘কাহ্ন কুলেতে জন্ম কুলিন গ্রামে বাস। স্বপ্নে আদেশ দিলেন শ্রু বাস।’—মালাধরবন্ধু লিখিয়াছেন। ‘বিজয় গুপ্ত রচে গীত মনসার বরে।’—ইহাঁর স্বপ্নের কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। ‘পাঁচালী সম্ময় রচিল দেববলে।’—(বে, গ, পুঁথি ৪৫১ পত্র) সম্ময় লিখিয়াছেন। পরবর্তীসময়ে কবি-কঙ্কণের “চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপ্নে” পদ সকলেই জানেন। কবি কৃষ্ণরাম স্বপ্নে ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণের রায়ের মারফৎ যে আদেশ পাইয়াছিলেন তাহা পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাঁর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত গুনিলে পাঠকের সর্কাস্ত্র শিহরিত ও বাধ্য হইয়া কাব্যখানাকে ভাল বলিতে হয়। স্বপ্নে কবির নিকট আদেশ এই,—“ভোমার কবিতা যায় মনে নাহি লাগে। সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে ॥” কিন্তু এই স্বপ্নময় কবিতাকাননে ভারতচন্দ্রের স্থান সকলের উপরে ; ভগবতী মকুমদারের নিকট ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন,—

জানবান হবে সেই আমার কুপার।
এই গীত রচিবার স্বপ্ন কব তার ॥
কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
স্বয়ং গুণাকর নাম দিবেক তাহারে ॥

সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে।
অষ্টাহ মঙ্গল একাশিবেক সংসারে ॥
ডিউসাঁই নীলমণি কণ্ঠজাতরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম পায়ন ॥”

দেবীর অপার লীলাগুণে কাব্যের উৎপত্তি, বিকাশ ও গায়ের কর্তৃক তৎপাঠ, সমস্তই স্বপ্ননিরস্ত্রিত।

পূর্বোক্ত কবিগণের মধ্যে ইয়ত চিন্তাধিক্যবশতঃ কেহ প্রকৃতই স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু এই তৎকালের দলে পতিত সভ্যভাবী সারসপক্ষীও ও কুসঙ্গ হেতু বন্ধী হইবেন ও মিথ্যাকের সাজা পাইবেন।

কল্পের বড় বড় কবিগণ ও স্বপ্ন কি দেবাদেশের কথা না বলিয়া কাব্য লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু বৈষ্ণবগণ প্রাচীন সংস্কারগুলি দলন

করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিভা সত্যের সুরল পথ আবিষ্কার করিয়া স্বাধীনতার যুক্ত রাজ্যে বিহার করিয়াছিল। তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিনয়-মাখা ; প্রত্যাদেশের খুঁট গিটি তাঁহারা দেখান নাই। এই সব আদেশগর্ষিত বেথকগণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নরোত্তম দাসের,—“ঈক্ল বৈকব পদ হ্রস্বয়েতে ধরি। চৈতন্তের হাটে নিত্য ঝাড়ু গিরি করি।” বৃন্দাবন দাসের,—“ঈক্ল চৈতন্ত নিত্যানন্দ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে পান।” কিম্বা কৃষ্ণ দাস কবিরাজের,—“যুধ নীচ হুয় মুকি বিষয়লালস। বৈকবাজা বলি করি এতেক সাহস।” প্রভৃতি পড়িয়া দেখুন ; সরল কথা আর ফুলমালা আপনিই সুরভিময়।

পঞ্চগৌড়ের বিষ্ণু ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে, এই পঞ্চগৌড়ের মধ্যে মিথিলাই বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। মিথিলার ভাষা ‘ত্রিজবুলি’ বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অধ্যায় গঠন করিয়াছে, মিথিলার সংস্কৃত টোল নবদ্বীপের শিক্ষা-গুরু, এসব বর্ষ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। মৈথিল অক্ষর (তিরুটেঅক্ষর) বঙ্গদেশে গৃহীত হইয়াছিল।* মিথিলার পরে কান্তকুজ বঙ্গদেশের সভ্যতা-গঠনে সহায় করিয়াছে ; কনৌজ বঙ্গদেশকে পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকারস্থরূপ সুবর্ণমুষ্টি দান করেন ; কিন্তু এই ধানেই এ ঋণের শেষ নহে। ‘পঞ্চালী’ নামক গীত পঞ্চালেই (কনৌজে) উদ্ভূত হওয়া সম্ভব ; এই ‘পঞ্চালী’ গীতের আদর্শ লইয়া বঙ্গভাষার প্রথম গীতগুলি রচিত হইয়াছিল। সারস্বত প্রদেশের শকালা বঙ্গদেশে গৃহীত হয়। এইরূপে দেখা যায় আৰ্য্যজাতির এই পঞ্চাশা পূর্বে সন্নিকটবর্তী ছিল ; ইহাদের সমস্তের ইতিহাস না জানিলে একশাখার উৎস ইতিহাস লেখা সম্ভব হয় না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে হিন্দু-স্থানী, মৈথিলী, ও উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দের সঙ্গে বাঙ্গালা শব্দের ঐক্য দৃষ্ট হয় ; ইহার কোন ভাষা অপর কোনটি হইতে উদ্ভূত হয় নাই,—কিন্তু একজাতির এই ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চাশা, সে সময়ে পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্তী ছিল, এইজন্য এই সাদৃশ্য। আমি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের ‘ত্রিজ-বুলি’ চিহ্নিত অধ্যায়ের কথা বলিতেছি না ; ‘ত্রিজবুলি’

* ত্রিজবুলি অক্ষরের একই বিশেষ ভাব এই যে ‘ব’এর নিচে সর্বত্রই শূন্য আছে (See Grierson's Maithil Grammar J. A. S. Extra No. 1880) আরও প্রাচীন অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথিতে ‘ব’এর নিচে শূন্য এবং পেট কাটা ‘র’ পাইয়াছি।

মৈথিলভাষার অল্পকরণে বাঙ্গলার বিশেষে এক নূতন দৃষ্ট ভাবা,—উহা সমুদায় উক্তি নহে, লেখনীর উক্তি। বঙ্গসাহিত্যের প্রিয়বৃন্দিচিহ্নিত অংশ কান দিলেও খাটি বাঙ্গলা যে সব পুস্তক আছে, তাহাতে হিন্দী, মৈথিল প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সেকেলে বাঙ্গলার অধিকতর নৈকট্য দৃষ্ট হয়। নিম্নে কতকগুলি শব্দের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে;—

বেতস্ক, ভেতস্ক, তুখা, বতুয়া (কড়) পইতার (প্রভায় করে) সুবোবিসা, সুল্লা, শোখতি, বাসল (ব্রাহ্মণ) গ্লাস, জাকিরা, (মা, চ গা,); সামিনাল, বাউরী মজাই, শিবাই, বড়ি (বড়), টুট, পাকনা, লাক, সোরগিল (বিজয় গুপ্ত); বহিন, তুতিক, এড়া (কুস্তিবাশ) কের, কৈল, গৈরা, হাঁইল, শহুনিয়া, করিলেজ, বারুজ, পড়িলেজ, জাইবেজ ইজারি, মোহর (আমার) চাহসি, কহসি, করসি ইজারি, নিয়ড়ে, কালা (কোথার), তুনি লন, বাও (বাতাস) সোলাও, এহি বিহা, চিহি (চেনা) নিই, কেহে, পাকায় (সময়, কবীন্দ্র, জীকর-বন্দী প্রভৃতি) ইহা ছাড়া 'পরদেশক লাগিয়া' 'জলক লাগিয়া' (মা, চ, গা,); 'দরেক গমন' (কুস্তিবাশ) 'বায়ক রমাল' (জীকর বিজয়) প্রভৃতি পুথিও হিন্দীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।*

অল্প ভাষার ঐক্য নহে, পরিচ্ছদাদিতেও উত্তর পশ্চিমের ভ্রাতাদের সঙ্গে তখন অধিকতর নৈকট্য ছিল; 'বিজয় গুপ্তের কর্ণিত সিংহলরাজ চন্দ্রনাগরের নিকট পট্টবস্ত্র পাইয়া তাহা বাঙ্গালীভাবে পরিচ্ছদে শিথিতেছেন,—“একখান কাচিয়া পিছে, আর একখান মাথায় বাজে, আর একখান দিল সর্বকায়া।” মা. মরিন্দাছেন খেতুরি রাজাকে বলিতেছে, 'কার জন্মে পাগড়ি রাখিহ মন্তকের উপর' মাণিক চাঁদের গানে (৩৫২ সোক) এইসব বর্ণনায় মাল কোঁচা মারা পাগড়ি মাথায় ঠিক খোঁটার ছবিটি জাগিয়া উঠিতেছে? 'লম্বোদর' 'নাতি সুগজীর' প্রভৃতি বর্ণনায় বোধ হয় খোঁটার মত বাঙ্গালীরা ও উন্নত উদর ও নাতি দেখাইয়া প্রশংসিত হইতেন। এইরূপ বঙ্গপরিহিত

* উক্ত শব্দগুলির মধ্যে 'তুতিক' শব্দ এখনও মৈথিলভাষায় প্রচলিত আছে (See Grierson's *Maithili Grammar* J. A. S. *Extra* No. 1889) কবর, বোলজ প্রভৃতি উড়িয়া ভাষায় ব্যবহৃত হয়; 'শহুনিয়া', প্রভৃতি শব্দ হিন্দীর অঙ্গরণ; এহলে বলা যাইতে পারে সম্ভবতঃ খোঁটার মুখে বন্ধাবিশের নাম 'লক্ষনিয়া' তুনিয়া আবুল ফজল যে নাম লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে 'লক্ষনিয়া', নাম বাকরণের সাহায্যে সৃষ্টি হইয়া বঙ্গইতিহাসে প্রচলিত হইয়াছে। আমরা উক্ত শব্দ সংগ্রহে চণ্ডীদাস কি অল্প কোন প্রিয়বৃন্দি-অধিকৃত লেখকের সাহায্য গ্রহণ করি নাই।

বাঙ্গালীর পক্ষে কাঁচুলিআঁটা রঙ্গণীই শোভা পায়, প্রত্যুত বাঙ্গালী
স্বাধীন পরিচ্ছদও খোঁটারদোকানে ক্রীত।—দ্রীলোকের কাঁচুলি
পর্যায় রীতি কুস্তি বাস, শুণরাজ খাঁ, বিজয় গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস ইহাতে আরম্ভ
করিয়া কবিকল্প প্রভৃতি অনেক কবিই বর্ণন করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের
সময়ও এ রীতি একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল না;—“রাজা ও রাজবধু ও
রাজকন্যারা কাপাস বা কোবের শাট পরিতেম, কিন্তু ধার সমস্ত শুভ কর্মোপলক্ষে
পশ্চিমোত্তর দেশীয় সম্রাট মহলাগণের স্তায় কাঁচুলি, ঘাগরা ও ওড়না পরিধান করিতেন।
(কিটীশ বংশাবলী চরিত ৩ঃ পৃঃ) আমরা বৈষ্ণব কবির পদে ও পাইয়াছি—“নৌ ওড়ণার
নাথে মুখ শোভা করে। সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে।” (প ক, ত, ১৩৭৭) এতদ্ব্যতীত
শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে,—“কট তটে ক্ষুদ্র ঘটিকা ভাল নাজে। রতন মঞ্জরী রাজা চরনেতে নাজে।”
এইসব নরনারীগণ যে দু'একটি হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিবেন কিম্বা ত্রিজবুলীর
স্বায় অল্পতর্পনার্থের সৃষ্টি করিয়া পদ্য লিখিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে?

উড়িয়া, মাদ্রাজী, এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন দেশের
অধিবাসীর স্তায় বাঙ্গালী পুরুষগণ ও পূর্বে দীর্ঘকেশ রক্ষা করিতেন;
তাহারা দীর্ঘকেশ বাঁধিয়া রাখিতেন এবং কখনও তদ্বারা বেণী গ্রথিত
করিতেন; রাধাকান্ত সর্দারগণ শ্রীশ্রাম চাঁদকে বলিতেছেন,—“আজি কেন পিঠে
মোটা বেণী?” (চৌদাস) শ্রীচৈতন্য দেবের কেশ মুণ্ডনের সময় শিষ্যগণ
বিলাপ করিতেছে,—“কেহ বলে না দেবিয়া সে কেশ বন্ধন। যেমতে রহির এই
পাপিষ্ঠী জীষন। কেহ বলে সে হৃদয় কেশে আরবার। আমলকী গিরা কিবা করিব
সংসার?” (চৈ, ভা. ন্যায় শব্দ) “শল্য রাসের সৈন্ত নাহি বাঁধে কেশ।” (কুস্তি বাস)
“পদ্মর হৃদয় লক্ষাইর দীর্ঘ নখার চুক। জাতিগণ ধরি নিল গাঙ্গুড়ির কুল।” (বিজয় গুপ্ত।)

সবু ভাষা ও পরিচ্ছদাদিতে নহে, আহারে ব্যবহারে ও সেই নিকটবর্ত্তিতা
প্রতীক্ষমান হইবে। ভারত চন্দ্র মহাদেবের যুগে প্রচার করিয়াছেন,—
“কুং কুংকার আজি হরজে বাঙ্গল।” বঙ্গভাষায় সংস্করণের বিকৃত চীকার এই
‘কুংকুং’ অর্থ ভোষা হইয়াছে, ‘একরূপ স্যবগ্রী’। এখন বাঙ্গালীর ‘কুংকুং’
অর্থ জাত হওয়ার সুবিধা নাই, কিন্তু রাজপুতনা এবং অন্যান্য নিকটবর্ত্তী
প্রদেশে এই ‘কুংকুং’ ভাষণ এখনও একটি বিশেষ আয়োজনক কনসার;
উহা আফ্রিকের হায়া প্রভৃতি হস্ত এবং কুংকুং ভাষণের অন্তা নিয়ন্ত্রণ একটি
উৎসবরূপে গণ্য হয়। এইরূপ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নানা দৃষ্ট হইতে
উত্তরপশ্চিমবাসীদিগের সঙ্গে আমাদের নিকট সম্বন্ধের সাক্ষ্য পাওয়া

বার। খোষ্টা, মৈথিল, উড়িয়া, বাঙ্গালী—এক বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন শাখা, ক্রমে শাখাগুলি ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছে; ভাষাও সাহিত্যের মানচিত্রে এই ক্রম দূরবর্তিতার চিত্র চিত্রিত আছে, তদৃষ্টে লুপ্তপ্রায় শব্দের স্থিতি আগ্রহিত হয় এবং মনে অপূৰ্ণ আনন্দ বোধ হয়।

বঙ্গদেশে সমাগত আৰ্য্যজাতির শাখা আবার দুই উপশাখায় বিভক্ত হইল। পূৰ্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ভাষা এখন যত দূরবর্তী, পূৰ্বে তত দূর ছিল না। পূৰ্ব এক অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, ‘করিমু’ ও ‘করিবু’ এই দুইরূপ ক্রিয়ার ব্যবহারই প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্ট হয়; ডাকের বচনে ‘করিবু’ ক্রিয়া পাওয়া গিয়াছে; মাণিক চাঁদের গানে ও সেরূপ ক্রিয়া অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়,—“কুল গোঠেকে দেখিয়া কুল না পাড়িব। পাখী গোঠেক দেখিয়া ডিমা না মারিব। পরার স্ত্রী দেখিয়া হাত না করিব।” (৫৬৩ শ্লোক) “ভূমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা। রাক্ষা চরণ বেড়িয়া লবু পলায়ে যাবু কোথা। (১৭৩ শ্লোক) পশ্চিম-বঙ্গের সাহিত্যে ‘করিমু’ প্রভৃতি ক্রিয়ার বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়,—

“বৃগধর্ম্ম প্রবর্তয়িমু নাম সংকীৰ্ত্তন। ভক্তি দিয়া নাচারিমু ভুবন। আপনি করিমু ভক্তি অঙ্গীকার। আপনি আচারি ভক্তি নিখামু সবার।।” চৈ, চ, আদি ৩য় পরিচ্ছেদ।

চতুর্দশ ও গুণরাজ খাঁ ও এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই দুইরূপ ক্রিয়াই পূৰ্বকালে প্রচলিত ছিল কিন্তু বোধ হয় কালে ‘করিমু’ হইতে ‘করিবু’ ক্রিয়ার সাপক্ষে পশ্চিম বঙ্গের রুচি প্রবল হইয়া গেল, করিব (কর্ক) ‘খাব’ ‘যাব’, ইত্যাদির প্রচলন হইল। পূৰ্ববঙ্গে ‘করিমু’ ‘করম’ ইত্যাদি রূপ গৃহীত হইয়া প্রচলিত হইল; কিন্তু উক্ত প্রদেশের নিত্যান্ত মফস্বলে ‘করিবাম’, ‘খাইবাম’ ইত্যাদিরূপ ও লক্ষিত হয়। নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণের উক্ত তাংশে সেইরূপ ক্রিয়ার প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে। পশ্চিমবঙ্গেও যে কোনকালে সেইরূপ ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল তাহার আভাস আছে। ‘করিবাঙ’ ‘যাইবাঙ’ ‘বলিবাঙ’ প্রভৃতি শব্দ চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি পুস্তকে প্রায়ই দৃষ্ট হয়। কেতকানাস ও কেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের লেখক বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছেন, উক্ত দুই গ্রন্থকারকৃত মনসার ভাষা হইতে একটি ছত্র উঠাইতেছি,—

“কলস কলন আমি দিবাম এই বর। সাত ডিম্বাধন হয়ে চৌখ ডিম্বা ভর।।” কেতকানাস ও কেমানন্দের ভাষায় আশার চিৎপুর শ্লোক, ২৮৫ সংখ্যক বিদ্যাসুত্রে বহু মুদ্রিত। পৃ: ৪৫।

পূৰ্ববঙ্গ-প্রচলিত ‘আছিল’ শব্দ পশ্চিমের অনেক পুথিতেই পাওয়া যায়; সুতরাং এইসব ক্রিয়াপদগুলি পূৰ্বকালে বঙ্গের দুই অংশেই কতক

পরিমাণে প্রচলিত ছিল; কালক্রমে কিছু কিছু রূপান্তরিত হইয়া শব্দগুলি এক এক আকারে এক এক স্থানে বদ্ধমূল হইয়াছে।

করসি, করেস্ত, বোলেন্ত ইত্যাদি ক্রিয়া পূর্ববঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়; পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন পুথিতে ও সেরূপ ক্রিয়া একবারে হুপ্পা পা নহে; আমরা ত্রীকৃষ্ণবিজয় হইতে পিবন্তি, চৈতন্ত চরিতামৃত হইতে যান্তি ও ডাকের বচন হইতে থায়সি, পুত্ৰসি প্রভৃতি ক্রিয়ার উদাহরণ দিয়াছি। (১৩,৪০ পৃষ্ঠা) অত্যান্ত শব্দের আলোচনা করিলে দেখা যায়, পূর্ববঙ্গের অনেক গুলি শব্দই কতক পরিমাণে প্রাচীন রূপ রক্ষা করিয়াছে; প্রাকৃতের ‘ও’—(আ)—প্রিয়তা পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুথি গুলিতে দৃষ্ট হয়, যথা :—

শব্দ ... পূর্ববঙ্গের পুথিতে প্রাপ্ত রূপ।

মা ... (মাতা) ... মাও।

পা ... (পদ) ... পাও।

যা ... (যাত) ... যাও।

না ... (নোকা) ... নাও।

রা ... (রব) ... রাও।

গা ... (গাজ) ... গাও।

শব্দ ... পূর্ববঙ্গের পুথিতে প্রাপ্ত রূপ।

গা ... (গ্রাম) ... গাও।

ছা ... (ছানা) ... ছাও।

দা দাও।

ভাব ভাও।

বা ... (বাত) ... বাও।

তা ... (তাপ) ... তাও।

এই সব শব্দের কোন কোনটি পশ্চিমের প্রাচীন পুথিতে ও পাওয়া যায়, যথা—‘নাট নাত হুখে যায়, রূপার দোলায় কেলাষ পাও। (খনা।)

প্রাচীন সাহিত্য পাঠে বঙ্গবাসীদিগের সঙ্গে উত্তরপশ্চিমের শাখাগুলির ও পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের উপশাখাষয়ের বর্তমান সময়োপেক্ষা অধিকতর নিকট সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই দূরবর্তিতা যদি ক্রমে প্রসারিত হইতে থাকে, তবে কালে আমরা সম্পূর্ণ পৃথক জাতির জ্ঞান হইয়া দাঁড়াইতে পারি। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিবাহাদি বন্ধন দ্বারা এক জাতীয়তা ও একভাষা রক্ষিত থাকা সম্ভব, কিন্তু অন্যান্য দেশের সঙ্গে সেরূপ সামাজিক বন্ধন রোধ হইয়া যাওয়াতে আশঙ্কার কারণ না আছে, এমনত নহে। এই বিচ্ছিন্নতাগ্রস্ত জাতীয় জীবনের একমাত্র আশা—সংস্কৃত শাস্ত্রের অমূল্যলন; সেই শাস্ত্র হস্তে লইয়া উড়িয়া, খোষ্টা, মৈথিল,—পঞ্চগৌড় ছাড়িয়া—পঞ্চদ্রাবিড়ের সঙ্গে ও আমরা একতা সূত্রে বদ্ধ হইতে পারি। পূর্ব-পূর্বদিগের প্রসঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন জাগরিত হয়,—বহু এক হইয়া যায়।

‘বৌদ্ধ ধর্ম’ অধ্যায়ের রচনার সংস্কৃতের প্রভাব ছিল না। এই অধ্যায়ের সাহিত্য অনেকটা মার্জিত, সংস্কৃতের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে চেষ্টিত। মানিকচাঁদের গানে বর্ণিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের যে কয়েকটি নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতের সংশ্রব-রহিত, যথা—অম্বনা, পম্বনা, বেহুনি, মেলা, সমামতি। চণ্ডীদাস জামলা, বিমলা, মঙ্গলা ও জবলা, স্ত্রীরাধার প্রতিবেশিনী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এসব নাম সংস্কৃতের মত। কিন্তু বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত নাম উভয়ই পাওয়া যায়,— লক্ষ্মিনরের বিবাহ বাসরে এরোগণের কতকগুলি নাম সংস্কৃত ভাবাপন্ন, যথা— কমলা, বিমলা, ভানুমতি, রোহিণী, রমণী, তারাবতী, হুমলা, হুমরা, রঙ্গি, তিলোত্তমা, সরস্বতী, চন্দ্রেখা, কৌশল্যা, কুমারী, বামা, চলপ্রভা, চন্দ্রেখা, দুর্গভা, অমৃপমা, রত্নমালা, জাহ্নবী, চন্দ্রকলা, রঙ্গিণী, মলয়মালা, জয়মালা, বিজয়া, ভবানী, শিবানী, মাধবী, মালতী, বগলা, সরলা। কিন্তু তখন ও অসংস্কৃত প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই, অন্যান্য এরোগণের নাম ও গুণরাশি উভয়ই হাত্যাদীপক—উদ্ধৃতাংশের মধ্যে মধ্যে দু একটা সংস্কৃত নাম আছে,—একজন এয়ো আইল তার নাম রাধা। ঘরে আছে স্বামী তার ঘেন পোষা গাধা ॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম রুই। মস্তকে আছে তার চুল গাছ দুই ॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম সরল। পোয়াল ঘরে ধোঁয়া লিজে বোঁপা খাইল গর ॥ আর এয়ো আইল তার নাম কুই। দুই গালে ধরে তার কুল মণ দুই ॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম শবী। মুখে নাই দন্ত গোটা ওঠে ঘিছে মিশি ॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম আই। দুই গাল চণ্ডা চণ্ডা নাকের উদ্দেশ নাই ॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম চুয়া। ঘর হৈতে বাহিরিতে শিরে ধরে চুয়া ॥ (বিজয় গুপ্ত)। বেহলা, লখাই, মেড়া, সমাইওকা, সয়েবেণে, ফুলরা, ধুলনা এসব নাম ও সংস্কৃতের মত নহে। ‘বেহলা’ বিপুলার অপভ্রংশ হইতে পারে, কারণ প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে বেহলার স্থলে বিপুলা পাওয়া যায়; কিন্তু অন্য নামগুলি সংস্কৃতভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয় না। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ফুলরা, ধুলনা প্রভৃতি শব্দ ও সংস্কৃতের স্তূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন;* পাণ্ডিত্য বলে অপরাধিতাকেও পারিভ্রাত প্রমাণ করা বাইতে পারে—সেই ব্যাখ্যা অসঙ্গত না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দ্বন্দ্ববোধ হয় না। কুলজি গ্রন্থগুলি অনুসন্ধান করিলে লুই হইবে ১৯। ২০ পুরুষ পূর্বে অধিকাংশ নামই অসংস্কৃত ছিল; এখনও

বহুসংখ্যক প্রাচীন গ্রামের নামের সঙ্গে সংস্কৃতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। সেগুলি বৌদ্ধাধিকার ও প্রাকৃতিক যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; এই অখ্যার-বর্ণিত-সাহিত্যে সংস্কৃতের দিকে রুচি প্রবল লক্ষিত হয়; অমুবাদগ্রন্থ ও সংস্কৃতের অনুশীলন দ্বারা প্রাকৃতের আবর্জনা মার্জিত হওয়ার চেষ্টা আরম্ভ হইল; কিন্তু তখনও বঙ্গবৃহৎ মনোহিনীগণের নাম ‘হুই’ ‘রুই’ ‘কুই’ ‘আই’ প্রদত্ত হইত। এখন সংস্কৃতের পূর্ণ আধিপত্যের কালে কোনও গলনার অবস্থি নামাকরণ করিলে তাহার বিবাহ ঘটা—ও বিবাহান্তে সুরচিসম্পন্ন স্বামীর পত্র লেখা উভয়ই কৃচ্ছসাধ্য হইবে। কবিকঙ্কণের সময় ভাষার কলুষ সম্পূর্ণরূপে নাশ হইয়াছে, এয়োগণের নাম সমতাই সংস্কৃত—এবং বৈষ্ণবাধিকারের প্রভাব ব্যঞ্জক। যথা,—বিমলা, চাঁপা, কমলা, ভারতী, পার্শ্বতী, সূর্যবোধা, লক্ষ্মী, পদ্মাবতী, বসন্তা, দুর্লভা, রত্না, স্তম্ভা, বনুনা, চরিত্রা, কুলসী, শচী, রাণী, স্থলোচনা, হীরা, তারা, সরস্বতী, মদন-মুগ্ধরী, চিত্রলেখা, হুশা, রাধা, দয়া, মঙ্গোলরী, কোশল্যা, বিজয়া, গৌরী, হুমিত্রা, যশোদা, রোহিণী, রাধা, কান্দরী।

এই অধ্যায়ের আলোচিত পুস্তকগুলিতে আমরা নানারূপ শব্দ পাইরাছি, তাহাদের কতকগুলি প্রচলিত নাই; কতকগুলি ভিন্নার্থ পরিগ্রহ করিয়াছে; ৪র্থ অধ্যায়োক্ত শব্দগুলির ও কতক এই সর্গের সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নোক্তজন, অন্যান্য শব্দ কয়েকটি দেওয়া যাইতেছে।*

বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে—তোল—বিতোর (অতিক্রম হৈয়া তোলা। শ্রীকল পাছে দিল কোল।) আসোয়াহু—অহুহ; আগল—দক্ষ, অগ্রসর; শাসিরাগ—ভেজবী (শাসিরাগ ঘর ভুমি বিবাসে আগল) চোপা—মুখ; উদাসিনী—অনাথা (শিবের কুমারী আমি উদাসিনী নহি;) নবগুণ—নগুণ, উপবীত; (দস্ত-আকুটী করে, নবগুণ তুলি ধরে) সখিবান,—অবধান, মনোযোগ; খিটে—খুঁটিয়া তোলা; ছানিতে—সম্মুখে; বড়ি—বড়; ধাই—মাতা; মাই—মাতা; অখান্তর—চেষ্টা, প্রয়, বিপদ (বহু অখান্তর সেই পুন্দের কারণ); মেলানি—বিদায়; গোহারি—কাতর প্রার্থনা; বাহুড়িয়া—ফিরিয়া; পাকনা—পক্ষ; পাঁচে—চিন্তা করে; আচাভুয়া—মিথোষ; ঠান—ভাব; সহিলা ও সইলা—সখী; † ভাঙালে—ভাঙালে; পরিপাটী—কারিগরী (কার সাধ্য বৃদ্ধিতে পারে দেবের পরিপাটী) টনক—শক্ত (টনক করি ধরি মুখে দিল এক মুঠ)

* আমরা উক্ত শব্দের অবিকাশই যত অখ্যার-বর্ণিত গ্রাম তাবত কাকেই পাইরাছি, একাধিকবার তাহার উল্লেখ নিম্নোক্তজন বিহার কেবল এক কবির নাম নির্দেশ করিয়ায়।

† বোধ হয় এই সহিলা ও সইলা হইতে ‘সদা’ (পরামর্শ) শব্দ আসিয়াছে।

সোমর—তুলা; ফেলেক—হটেপুই; অবহা—কই, সত্যাবনা—সম্পত্তি; (সত্যাবনা কেবল বলাদ।) স্মৃতি—স্মৃতি, সানে—ইরিতে, (হাত সানে বলে সবে সিন্ধিটেক রও) তিজা—আর্য কুন্তিবাসী রামায়ণে,—সন্তোক—বোতুক, নিবড়ে—অভীতে, ভোকে—স্বায় মোর—অঙ্গ, ওর—সীমা, রড়—দৌড় কোর—পূর। সম্ভবকৃত মহাভারতে,—আজি—আমি, তুজি—তুমি, মোহর—আমার, সমাইরে—সকলকে, আভরণ—অগ্রসর, হুসারিত—শ্রেষ্ঠ, হুমায়—যোগ্য হয়, কেনি—কেন, পুনি পুন, বিনি—বিনে, খেরি—খেলা, হনে—হইতে, আগু—আগন। কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দীর অমুবাদে,—সম্রম—ভয়, সন্ধিধান—মনোযোগ, সনে—সহিত, (“জ্ঞান সমে কাটি পড়ে হাতের কোদণ্ড”—শ্রীকর নন্দী), পাড়িমু—কেলাইব (“ভীম দ্রোণ কাটিয়া পাড়িমু রথ হৈতে,” কবীন্দ্র), উপালন্ত—উপর। নারায়ণদেবের পদ্মপুরাণে,—খাধার—অশ্বখ, একেশ্বর—একাকী, কথা—কোথায়, এড়িয়া—তাগ করিয়া। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে,—চেটোনটো—অন্ন বয়স্ক বউগণ, টিট—ধূঁস, অথলা—সরলা, উতরোল—উৎকৃষ্ট, ভাল—ভাগ্যে, (“ভালে সে নাগরী, হয়েছে পাগলী”) আরম্ভ—হরিদ্রা, বড়ু—ব্রাহ্মণ পুত্র, (কিন্তু বট শব্দের অপভ্রংশ হইলে ছাত্র), দে—দেহ, টাপ—জখা, আকুতে—আগ্রহে, লেহ—স্নেহ, ওদন—অন্ন, গত্যতি—যাতারত। পরিবাদ—নিষ্কা। রাঢ়দেশপ্রচলিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় রেড়ো শব্দ বহুল; ক্ষীরোদ বাবু সাহিত্য পত্রিকায় যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,—(সাহিত্য ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা), ভাহাতে সহ (বোধ হয় আরোগ্য), রাকাড়ে—শব্দ, আউদর—এলোখোলা, পোকান—পুত্র,—

* চৈতন্য ভাগবতে ও তিতা শব্দ আর্য অর্থে ব্যবহৃত পাইয়াছি, যথা ব্রাহ্মণ্ডে “তিতা বহু এড়িলেন শ্রীশচী মন্দন।” (মধ্যম খণ্ড) আরও কয়েক স্থলে এরূপ পাওয়া গিয়াছে। এই “তিতা” র ত্রিমা—‘তিতিল’ (সিন্ত হইল) সচরাচরই দৃষ্ট হয়। হুতরাং ‘তিতা’ শব্দের সঙ্গে ‘তিত্ত’ শব্দের সংশ্লিষ্ট লক্ষিত হয় না, উহা সিন্ত শব্দের অপভ্রংশের জায় বোধ হয়। কিন্তু চণ্ডীদাসের “তিতা কৈল দেহ মোর নন্দী বচনে” পদে তিতা শব্দ তিন্তের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

+ এখানে হিন্দী ভাবাপন্ন শব্দ উদ্ধৃত হইল না।

‡ এই ‘টিট’ শব্দ গোবিন্দ দাসের পদে (প, ক, ত,—৩২৫ নং) বিজয় শ্বশুর পদ্মপুরাণ, বিদ্যাপতির পদাবলীতে (অগস্ত্য বাবুর সংস্করণ ৭৭পৃঃ) কবি আলোয়ালকৃত পদ্মাবতীতে (“কোথাতে নারিক বেশি হেন যোগী টিট” ২৬ পৃঃ) অজ্ঞাত পুস্তকে পাইয়াছি; বোধ হয় এই শব্দ হইতে ‘টিটকারি’ ‘টিটপরা’ ও ‘টেটন’ প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে, কিন্তু হিন্দীভাষার পদকল্পিতকর্ত্তে কোরা কোর স্থলে ‘ট’ এর টান তুল্যকরে পড়িয়া যাওয়াতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কোন কোন নূতন সংস্করণে ‘টিট’ শব্দ স্থলে ‘টীট’ প্রভৃতি হইয়াছে।

প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ এগুলি কবি নিজে ব্যবহার করিয়া ছিলেন, কিন্তু পূর্ববঙ্গের হস্তলিখিত ২৫০ বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ-বিজ্ঞানে এসব শব্দ নাই, পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন লেখকগণকে পূর্ববঙ্গের লোকগণ নিজদের সুবিধার জন্য কতকটা বাক্যল করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু মিথিলার বিদ্যাপতি বঙ্গদেশে যতদূর পরিবর্তিত হইয়াছেন, উঁহারা ততদূর হন নাই।

পূর্বোক্ত শব্দগুলি ছাড়া,—কাটিগী—খড়ি, সমাধান—সেবা, বলে—অনুসন্ধান করে সাবহিতে—সাবধানে, সারি—নিশ্চাবাদ প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্তের পদ্ম-পুরাণে ‘বাপু’ শব্দ সর্বত্রই সম্মান কর্তৃক পিতার প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা (শিবের প্রতি পদ্মা)—“পদ্মা বলে বাপু তুমি সংসারের সার। কির অপমান বাপু না দেখ একবার ॥ ধনস্তুরীর প্রতি শিষ্যগণ,—“শিষ্যসব বলে বাপু এ কোর বিধান। কার হাতে পাইলা বাপু হেন অপমান ॥” বেহলা পিতার প্রতি,—“বেহলা বলেন বাপু শুন নিবেদন। স্বপ্ন দেখিয়া আমি করেছি রোদন ॥” এখনকার ঐতিহাসিক উপ-হাসের লক্ষ্য ‘বাবু’ বোধ হয় এই ‘বাপু’ শব্দেরই অপভ্রংশ হইবেন। ত্রিপুরা জেলার উজানচর নামক স্থানে ‘মা’ কে ‘মাইঞা’ বলিয়া থাকে, আমরা এই অধ্যায়ে ‘মাই’ শব্দ পাইয়াছি; এই ‘মাই’ ও ‘মাইঞা’ হইতে বোধ হয় কত্কা বোধক ‘মেয়ে’ শব্দ আগত হইয়াছে। ‘বাপু’ ও ‘মেয়ে’ শব্দ একই কারণে অপত্যার্থে পরিণত হইয়াছে; পূর্বে উহারা পিতৃ মাতৃ বোধক ছিল। ‘লোকগুটি’ ‘বানগোটা’ প্রভৃতি ভাবে ‘গুটি’ ও ‘গোটা’ অনেক স্থলে ঘুট হয়,—‘লোকটি’, ‘বানটা’ বোধ হয় এই ভাবে উৎপন্ন।

বিভক্তি সম্বন্ধে এই প্রাচীন সাহিত্যের জঙ্গল হইতে সাধারণ নিয়মের মত কোন পরিষ্কার বস্তু উদ্ধার করা বড়ই দুঃসহ। এখনও বঙ্গদেশের নানা প্রদেশে নানারূপ বিভক্তি কথায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু রচনার জন্য একমাত্র নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সময় প্রাদেশিক বিভিন্নতা দূর করা ও ভাবার একীকরণ জন্য কোন সাধারণ সূত্র নির্দিষ্ট হয় নাই; নানারূপ অসহ উপাধান হইতে সমতার সূত্র সকলন করা ব্যাকরণের কাজ,—বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ইংরেজাধিকারে সংলিখিত হইয়াছে; সূত্ররূপে এই সমস্তের বহু পরে ও বিভিন্নরূপ বিভক্তি ও ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। আমরা এই অধ্যায়ে,—

পুঙ্খবিশী হসে (ও হসে)—পুঙ্খবিশী হইতে, কিছুক উদ্দেশে—বিহুর উদ্দেশে, তকিএ—তকিহাই,

দ্রোণক চাহিয়া—দ্রোণলিখে চাহিয়া, বিমিএ নিখিল—বিমি নির্ভান করিল, প্রহাস
করিক যেনকারে—যেনকারে প্রণাম করিল, ভূমিএ—ভূমিতে, তাহার—প্রহার, বোহর—জাহার,
নোহ—জামাহক, তাক—তাহা, কাত—তাহাক, বাণিঝোহে চাহ—বাণিঝোহে, এই সময়ত
পূর্ববক্তের প্রাচীন পুঁথি গুলিতে পাইয়াছি; ‘কে’ হলে ‘ক’ একরূপ সর্বত্রই
দৃষ্ট হয়, যথা,—সর্প যেন খাইয়া যায় মান্নিতে গরড়ক। সেইসত চাহ ভূমি মান্নিতে
অর্জুনক ॥” (৮৩ পৃঃ)

বহুবচন 'সব' 'গণ' ও 'আদি' শব্দ দ্বারা গঠিত হইত,—তুমি সব, আমি সব নাকসেনগণ, যুগাদি প্রভৃতি বহুবচন বোধক শব্দ ও তাহাদের পরবর্ত্তী রূপান্তরের বিষয় পূৰ্ব্ব এক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিম বঙ্গের পুস্তক ও লিখিত,—
 বরকে গমন, পাণিকে ধার, জলকে গেহু, কাঁধকে ক্রমাল, আমা—আমাকে, শুনে গোড়েশ্বরে—শুনে গোড়েশ্বর, তিহ—তিনি, আমিহ—আমি, মুঞি—আমি প্রভৃতিরূপ পাওয়া যায়।

ক্রিয়া সম্বন্ধে ‘আমি’ শব্দের পর ‘দেহা’ ‘কৈরো’ ‘করিল’ প্রভৃতি শব্দ অনেক প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায় ; ক্রিয়ার কর্তা নির্ধারণ করিতে শুধু অর্থই পথ প্রদর্শক ; এই অধ্যায়ের উদ্ধৃত রচনা হইতে পাঠক নমুনা খুঁজিয়া লইবেন ; কোন কোন পুস্তকে নিত্যান্ত প্রাকৃত ক্রিয়া ও দৃষ্ট হয় যথা,—
সনে হয় চাঁদের হয় পুত্র ধাম । (বিজয় গুপ্ত) তৎপর করসি, খায়স্তি, পিবস্তি ও উভয় প্রদেশের রচনায় অনেক পাওয়া গিয়াছে ও তৎসম্বন্ধে পূর্বে একবার লিখিত হইয়াছে । বঙ্গভাষায় ‘হের’ ক্রিয়া এখন দেখা অর্থেই ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু পূর্বকালে বোধ হয় হের অর্থ ছিল—‘এখানে’ ‘হের দেখ’ এই দুই শব্দ অনেক স্থলেই একত্র ব্যবহৃত হইতে দৃষ্ট হয় । ত্রিপুরার নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখে “এয়ার” অর্থ “এইখানে” শুনিয়াছি ; এই দুই শব্দ ‘অজ’ শব্দের সঙ্গে কোন ও রূপে সংশ্লিষ্ট হইতে পারে । বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করা সেতু বন্ধের ন্যায় গুরুতর ব্যাপার, কাষ্ঠবিড়ালের মত ক্ষুদ্রশক্তি অনুদারে আমি ইতস্ততঃ কিকিং ইঙ্গিত দ্বারা সাহায্য করিতে সমর্থ হইলেই নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব ।

এই অধ্যায় বর্ণিত পুস্তকগুলি গীত হইত; মনসার ভাসান, ময়লাচণ্ডী প্রভৃতি পুস্তক অষ্টাহ নাম হইত। অষ্টমরুণা অর্থাৎ শেখালার প্রকার আত্ম বিবরণ প্রদান করিতেন; এই পুস্তকগুলির সমস্তটিতেই বিবিধ রূপ রাগিণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যবেত্তা, সর্দার শাস্ত্রক ও উদ্যোক্তারদাস মহাশয়ের সাহায্যে এই পুস্তক লগনচন্দ্র মহাশয় বিদ্যাগতি ও

চণ্ডীদাসের সর্বপ্রথম যে সংস্করণ প্রণয়ন করেন, তাহাতে উক্ত দুই কবির রাসগানির রাস রাগিনী, উৎকৃষ্ট ভাবে আলোচিত হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে “উত্তরের (বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের) রাস রাগিনীর সংখ্যা (সাধারণতঃ একবার বাজা করিয়া) মোট ৪০ টি হইত। উদ্যোগে ৩০ টি বিভক্ত ১০ টি বিভক্ত।” (৩৩ পৃঃ) অধিকৃত কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ মহাশয় লিখিয়াছেন,—“গদ্যবলীর হরতাল সম্বন্ধে নামা সুনির সমাধৃত। একজন বেপস ‘ধানজী’ তে পের লিখিয়াছেন আর একজন সেই পদই বসন্ত রূপে সেরা লিখ করিয়াছেন। আবার অল্প পুঁথিতে সেই পদেই কল্যাণী রূপ নির্দেশ করা হইয়াছে।”^{*} এইসব গান সম্বন্ধে বলা বাইতে পারে, পূর্বকালে ‘ধানজী’ ‘জীরাগ’ ‘নটনারায়ণ’ ‘ভক্তরী’ প্রভৃতি ওস্তাদি ধরাণের রাগরাগিনীতে সংগীতের অনুশীলন হইত, এখন জাতীয় ভাবের মূহুতায় রুচি—ভৈরবী, কিংকিট প্রভৃতি মধুর রাগিনীরদিগে হেলিয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে ও পূর্বে উক্ত পশ্চিমের লোকের সঙ্গে আমাদের বেশী নৈকট্য ছিল।

চণ্ডীদাসের ভণিতা যুক্ত রাধা ও কৃষ্ণের লীলা বর্ণনার কয়েক পত্র আমরা প্রাচীন হস্তলিখিত বহীর স্তপ, হইতে পাইয়াছিলাম; হুর্ভাগ্য বশতঃ দুই দিন পরেই তাহা হারাইয়া যায়। চণ্ডীদাসের ‘কৃষ্ণ কীর্তন’ নামক পুস্তকের কথা শুনিয়াছি, তাহা পাই নাই। এই অধ্যায়ের রচনা পদ্মারের নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমরা ‘কৌণী কল্পতরু জীমান দীন দুর্গতি বারণ। (কবীন্দ্র) ও “তথাপিহ যেমনা না জানিয়া। নহরে গিয়া পার্শ্বেরে ধরিল দুই করে সাপটিয়া (জীকর নন্দীর অশমেধ)।” এইরূপ পদ অনেক স্থলেই পাইয়াছি।

চণ্ডীদাসের রচনার অনেক স্থলেই ত্রিজবুলির মিশাল দৃষ্ট হয়; এই ‘ত্রিজবুলি’ পবিত্র ব্রজভূমির ভাষা নহে। এ সম্বন্ধে এখনও অনেকের ভুল আছে। “ত্রিজবুলি” মৈথিল ভাষার অনুরূপ। চণ্ডীদাসের রচনায় ‘ত্রিজবুলির’ অনুরূপে শব্দসম্প্রসারণক্রিয়া অনেক স্থলে লক্ষিত হয়, যথা—ধরম, করম, পরকার, পরসল, বতন্তর, পরভাপ, ভরবে, সিমান, বলর, সরবস।

পূর্ববন্ধ ও পশ্চিমবন্ধের রমণীগণের পরিচ্ছদ একরূপ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। অীকৃষ্ণ বিজয়ে কণ্ঠে সুবর্ণের হার, কর্ণে কুণ্ডল, নানার

নকশতি, হস্তে খালা, কঙ্কণ, কটিকটে কুঁড়বটী, গলে মল্লরী প্রভৃতি কতক পরিমাণে পরিচিত অলংকারের উল্লেখ পাই। চণ্ডীদাস মল্লতাপ্তল (কোটী রমণীরা এখনও পদে পরিয়া থাকেন) নামক একরূপ ভূষণের নাম করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের লেখক বিজয় গুপ্ত, হস্তে সুবর্ণ বাউটি, সুবর্ণ ঘাগরা ও শিলমণি কাচ, কণ্ঠে হাসলী, কণ্ঠে সোণার মদন কড়ি, গলে পিতলের খাড়ু ও লোটন খোঁপা নামক একরূপ খোঁপার উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাষা ও সামাজিক জীবনের আদিত্তর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হয় না; ইতিহাস কতকদূর লইয়া যাইয়া অঙ্গুলী সংকেত করিয়া বিদায় হয়। কিন্তু প্রকৃতি হইতে এই গুপ্ত তত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করা যায়। প্রকৃতিতে বটবৃক্ষ ও বটবীজ উভয়ই মিলে; পাহাড়ের পাৰ্শ্ব বক্ষস্থ ক্ষীণ বক্ষস্থলের ছায় স্বচ্ছ জল রেখা ও শ্রামল তটান্তবাহী ক্ষীত গঙ্গাধারা উভয় দৃশ্যই প্রকৃতির মানচিত্রে মূলত। আদি, উদ্যম, বিকাশ প্রকৃতি দেখাইয়া থাকেন। বাঙ্গলা ভাষা ও সমাজের আদি খুঁজিতে বঙ্গের নিত্যন্ত মকঃস্থলে পল্লীগ্রামের ছবিখানা দেখিয়া আসুন। বাউটা, মল্লতাপ্তল প্রভৃতি যে সব গহনা আমরা নামে মাত্র অবগত আছি, যে সব হুকুহ অপ্রচলিত শব্দ লইয়া আমরা নানামত প্রকাশ করিতেছি, কোন অজ্ঞাত পল্লীর কুৎসবধু হয়ত এখনও সেইসব গহনা পরিয়া, হুকুহ শব্দ পরস্পর মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছে; আমরা আঁধারে তীরক্ষেপ করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইতেছি মাত্র।

পূর্বকালে বাঙ্গালীরা ডিঙ্গা সাজাইয়া সমুদ্রে বাতায়ত করিত; কোন দীর্ঘ যাত্রার প্রাকালে দ্বীপ সন্ধান হওয়ার সূচনা লক্ষ্য করিলে তাহাকে একখানা মঞ্জরীগড় দিয়া যাইত। সমুদ্রে গমনাগমনের জন্য বোধ হয়, পূর্ববঙ্গের নাবিকগণ উৎকৃষ্ট ছিল; কবিকঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস ইহারা তাবতই সমুদ্রের পথে ‘বাঙ্গাল মাঝি’ দিম্বকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস করিয়াছেন। এখনও এদেশের জাহাজের শারং ও খালসীগণের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের লোক, মাঝিরিগণের তদ্বাবধায়ক গাবুর নিবৃত্ত থাকিত; ইহারা ‘মাঝি’ গাইয়া মাঝিদিগকে কার্যে আকৃষ্ট রাখিত ও মাঝিরা কার্যে প্রথ হইলে তাহাদিগকে “ডাঙ্গা” দিয়া প্রহার করিত। ডিঙ্গা গুলির মধ্যে বাণিজ্যের উপযুক্ত নানাবিধ দ্রব্য থাকিত ও কোন কোন

বানার হাট ছিলিত। (“তার শিরে চলে ডিঙ্গা-নাথ চক্রেপাট। বাহার উপরে ঠাণ্ডা মিলায়ে হাট।” বিজয় গুপ্ত)। এই বাণিজ্য-যাণপারে বিলকণ লাভ ছিল,—“মুলার বদলে দিল মজনন্ত।” (বিজয় গুপ্ত) কি “সুভার বদলে মুক্তা দিল, তেড়ার বদলে বোড়া।” (ক, ক, চ)। প্রভৃতির মধ্যে কবি-কল্পনার অতিরঞ্জন থাকিলে ও সমুদ্র বাহিয়া ভিন্ন দেশে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইতে পারিলে বিলকণ উপার্জন হইত। আশঙ্কা নৌকা জল মগ্ন হওয়ার। নাবিকগণ সমুদ্রে চেউ উঠিলে তৈল নিষ্ক্ষেপ করিয়া চেউ নিবারণ করিত; ঝাঁকে ঝাঁকে ঝৌক উঠিয়া ডিঙ্গা আক্রমণ করিলে তাহারা “কারচুন” ছড়াইয়া ফেলিত; শব্দ উঠিয়া ডিঙ্গার গতি প্রতিরোধ করিলে মৎস্য মাংস কাটিয়া দিত, গন্ধে শব্দ গুলি পলাইয়া যাইত। এই সব বর্ণনার কত দূর সত্য আছে, তাহার বিচারক আমরা নহি। তবে বোধ হয় গর শুনিয়া কবি অনেক কথা লিখিয়াছিলেন,—যে ইংলণ্ড বাণিজ্যের জন্ত এত প্রসিদ্ধ, ৩০০ শত বৎসর পূর্বে সেই ইংলণ্ডের অনেক শিক্ষিত লোকেরা ও সমুদ্রের অপর পারে কবছাকার মনুষ্য ও এছোপাগী নামক জীবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিত, সেই সময়ে ইংরেজের শ্রেষ্ঠ কবি এ কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

বাণিজ্যজাত দ্রব্য লইয়া কবিগণ অনেক আমোদ-জনক ঘটনার প্রসঙ্গ করিয়াছেন; সিংহলের রাজা নারিকেল দেখিয়া ভয় পাইতেছেন ও সেবককে তাহা প্রথম খাওয়ার আদেশ করাতে সে চক্কের জলে বন্ধ ভাসাইয়া জী পুত্রের নিকট বিদায় লইতেছে। তাবুল-রজিত-অধর দৃষ্টে সিংহলীগণ অসুমান করিতেছে,—“কোতয়ালের মুখ দেখি বলে সর্বলোকে। অন্ধ-ঠাই এড়ি-তোবার মুখ ধরে জৌকে। (বিজয় গুপ্ত)।

সরিষাতে যাহারা তালকলের অবয়ব দেখাইতে পারেন, সেই সব কবিগণের কল্পনার অস্বীকরণে প্রতিবন্ধিত পট হইতে আমরা সমুদ্রবাহী ডিঙ্গা গুলির অবয়ব ও অস্তিত্ব তথ্য উদ্ধার করিতে পারিলাম না।

এই সময়ে বঙ্গে শির-জাত দ্রব্যের উন্নতি খুব বেশী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না; উৎকৃষ্ট ‘চাকাই’—এই সময়ের আরও ২০০-বৎসর পূর্বের সামগ্রী। ‘পাটের পাছড়া’ সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে পাটের পাছড়াকে পাটের খনি বলিত, গাএন একখানা পাটের খনি পাইলেই কৃতার্থ হইতেন,—“বিজয় গুপ্ত বলে গায়েণ গুণখনি। মনসা জমিলের গায়েণে দেও খনি।” এই খনির মধ্যে বিশেষ নিপুণতা কিছুই ছিল না, ইহার একমাত্র

গৌরব, ধুব শক্ত হইত । সিংহল-রাজ বঙ্গদেশের খনি হাতে আইয়া প্রশংসা করিতেছেন,—“যের দেশে এককালি জর কট আছে ঐতি ;—বুলিতে অনেক দিন লাগে । কেবল ধীরের কান, বঙ্গ বড় অনুপায়, এমন শক্তি টানিলে না ভাঙ্গে” (বিজয় ভণ্ডা) ।

স্রীলোকগণের কাঁচুলী নির্মাণে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শির নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইত ; কাঁচুলীতে সমস্ত দেবদেবীর মূর্তি স্তূত্য আকিয়া উঠান হইত ; এই অধ্যায়-বর্ণিত পুস্তকগুলিতে এবং পরবর্তী সময়ে কবিকল্প চণ্ডীতে আমরা কাঁচুলীর লখা লখা ব্যাখ্যা পড়িয়াছি । ভাঙ্কর ও স্থপতি বিদ্যার অবনতি হইতেছিল, তাহার প্রমাণ এই, বাহা কিছু স্তম্ভরূপে গঠিত ও স্ফুটাকরূপে অঙ্কিত, তাহাতেই বিশ্বকর্মার কর্তৃত্ব করিত হইত, স্তম্ভরূপে মনুষ্য সমাজে তাহার অনুলীলন হইতেছিল বলিয়া বোধ হয় না ।

এই সময়ের কাব্যাদিতে বদল দ্বারা বাণিজ্য নির্বাহ হওয়ার প্রথা দৃষ্ট হয় ; কিন্তু সাধারণতঃ বাজারে বট, বুড়ি, কাহণ প্রভৃতি ভাবে নির্দিষ্ট কড়ি দ্বারা দ্রব্যাদি জ্বর বিক্রয় হইত । মাটি কাটা ও কোন দ্রব্য ওজন জন্ত ‘পুরুষ’ * একরূপ মাপ ছিল,—উহা এখনকার গজ কাটির স্তায় হইবে । বাহা সেকালে কড়ি দ্বারা হইয়াছে, এখন তাহা তাম্র ও রক্তত ভিন্ন পাওয়া যায় না । রৌপ্যের স্থলে স্বর্ণ প্রবর্তিত হইলে কড়ির জিনিষ আমরা সোণা দিয়া কিনিব ; আমরা যে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে ধাবিত, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

আমরা এখন বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের সন্নিকটবর্তী হইতেছি । ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা চাঁদের চরিত্রে ক্ষাত্রেয় দৃঢ়তা দেখাইয়াছি, কিন্তু বঙ্গদেশের মুহু আবহাওয়ার শালতরুর বীজ বপন করিলে তাহাতে কুসুম স্তম্ভর উৎপত্তি না হইলেই সৌভাগ্য । এই চাঁদের চরিত্র বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণের তুলিতে যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছিল, পরবর্তী কবিগণ তাহার রক্ষা করিতে পারেন নাই ; উহাদের হস্তে চাঁদবেশে একটি হস্তরসের বহু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন । তাহার স্মৃতির বহু কবিগণ অজ্ঞতন করেন নাই, কষ্টে কেনাইয়া বাসকের স্তায় হাতে তালি দিয়া ভাবনা দেখিয়াছেন । কালকৈতুক বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম ভীষের

* “মাটি খানি কাটি বেলে এক বে পুরুষ”—বিজয় ভণ্ডা ।

“পুরুষ সাতক যোর হারালো কামল ।” ক, ক, চ ।

ন্যায় পারীক্ষিক শক্তিসম্পন্ন কর্মমা করিয়া ও বীরত্বের জগতে একটি মোমের পুতুলের ন্যায় নম্র করিয়া ফেলিয়াছেন। বীরত্বের উপকরণ এই কেন্দ্রে না ফেলিয়া মলীর জলে ফেলাও শ্রেয়ঃ। বাঙ্গালী উত্তরলক্ষিম হইতে আর্ম্যভেজ অবশ্যই আনিয়াছিল, পঞ্চগৌড়েশ্বরগণের মহিমাযুক্ত রাজত্ব ও সিংহলবিজয় প্রভৃতি অস্বীকার করিবার বিষয় নহে; কিন্তু সেই বিক্রম ক্রমে সুকুমার ভাবে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল,—মালকৌচা কুলকৌচা হইয়া গিয়াছিল; এটি এদেশের গুণ, কোট উইলিয়মের এদেশে থাকা নিরপেক্ষ নহে, কালে কুল-কুটীরস্থ প্রাপ্ত হইতে পারে। বাঙ্গালী রামায়ণ ও মহাভারতে নীতা-বিলাপ, তরণী ও সুধবার কৃষ্ণ-ভক্তি অভাবনীয় সুধা ঢালিয়া দিয়াছে; কিন্তু ত্রীকূলের পাকজনা ও অর্জুনের পাণ্ডব কুলমালায় আবৃত হইয়া পড়িয়াছে।

মানিকচাঁদের গান হইতে দৃষ্ট হয়, প্রেমের কথা বঙ্গদেশে ব্যর্থ হয় নাই; চণ্ডীদাসের গীতি প্রেমের সরস এবং নির্ভীক উক্তি; যে সমাজে ব্রাহ্মণ ও ইতরবর্ণের অধিকার স্বর্ণ ও লোহের ভিন্ন ভিন্ন রেখায় নির্দেশিত, সেই সমাজের ক্ষুদ্র একজন পূজক ব্রাহ্মণ “তন রজকিনী রামি। ও দুটি চরণ, শীতল দেখিয়া শরণ লইলাম আমি। তুমি রজকিনী, আমার রমণী, তুমি হও পিতৃ মাতৃ। ত্রিসন্ধ্যা বাজন, তোমার ভজন, তুমি বৈষ্ণব মাতা গায়ত্রী।” এইরূপ বন্দনা দ্বারা আশ্চর্য্য নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন, একথা লিখিতে তিনি সমাজের ভয় পান নাই; কারণ প্রেমের বলে পিপীলিকা মত্ত হস্তীকে দলন করিতে পারে। একথা লিখিতে তিনি লজ্জিত হন নাই,—কারণ এ প্রেমে ‘কামগন্ধ নাই’—ইহা উপাসনা, ধর্ম, নির্মল-তম বৃত্তির খেলা,—ইন্দ্রিয় বিভাগের উচ্ছেদ; ইহা স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণ গৌরবাঘাত হইয়াছেন। তিনি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন নাই।

এই প্রেম তুলনা ও উপমা রাজ্যের উপরে, চণ্ডীদাস পূর্বশ্রেষ্ঠ করিগণের উপমাগুলির গিণ্টি দেখিয়া ভুলেন নাই,—“ভার কমলে বলি সেহ হেন নহে। হিমে কমল যবে ভার হুখে রহে। চাতক জলধি কহি, সে নহে তুলনা। সমর নহিলে সে না ঘের এক কথা। কুহুমে মধুপে কহি সেহ নহে তুল। না আইলে ক্রমর, আপনি না যায় কুল। কি হার চকোর চাঁদ হুই সদ নহে। জিত্বনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে।” উপমার ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ইহার তুল্য আছে স্বীকার করিতে হয়।

এই প্রেমের পট ধানা উজ্জ্বল করা জাতীয় জীবনের ব্রত হইয়া উঠিল ; যাহা চণ্ডীর ভাষায় অত্যন্ত গভীরভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা সাধনার ধন করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত করিতে শত শত বৈষ্ণব অগ্রসর হইলেন । প্রাণঃশিশির-সিক্ত প্রকৃতির সমস্ত পট ভাঙুকরে বৈষ্ণব গুরু হইয়া স্থায়ী প্রভা প্রাপ্ত হয়, এই অশ্রুসিক্ত পদাবলী অমুঠানোর সঙ্গে যুক্ত হইয়া আরও গাঢ় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে ; ষাঁহার জীবন্ত লীলায় এইসব শ্রীতি সার্থক হইয়াছে, তিনি নরহরি, বাসুদেব প্রভৃতি কবিগণের বন্দনার মূল পরব্যুক্ত স্বর্ণ ক্ষেমে বাঁধা একখানা দেব মূর্তির ন্যায় আমাদের নিকট উদয় হইয়াছেন ; উৎকৃষ্ট তুলিকার অঙ্কিত ধ্রুব, প্রহ্লাদ হইতে আমরা সেই ভক্তির ছবিখানা উদ্ধে স্থাপন করিয়াছি । বঙ্গভাষায় রামায়ণ মহাভারত, ভাগবত অমুবাদিত হইয়াছিল, তথাপি ভাষাগ্রন্থলেখকগণ নিজেরা ও ইহাকে অগ্রাহ্য করিতেন,—‘সহজে পাঁচালী গীত নানা দোষময়’ বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন । কবীন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ তাঁহার অমুবাদ-পুস্তকে দেন নাই, কারণ “পাঁচালীতে উপদ্রুত নহে যোগ্য বাদ ।”

কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ের সাহিত্য শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাষ মহিমান্বিত ; পাঁচালী গীত তখন শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে ।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য বা নবদ্বীপের ১ম যুগ।

- ১। শ্রীচৈতন্যদেব ও এই যুগের সাহিত্য।
- ২। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন।
- ৩। পদাবলী-শাখা।
- ৪। চরিত-শাখা।

(১)

চণ্ডীদাসের দুইটি গীতি এইরূপ;—

(ক) আত্ম কেশো মূলী বাজায়।

এত কতু নহে স্তায় রায়।

ইহার গৌর বরণে করে আলো।

চুড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল।

* * * *

চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।

এরূপ হইবে কোন্ দেশে।

(খ) কাল কুহ্ম করে, পরশ না করি ডরে,

এবড় মনের মনোবাধা।

যেখানে সেখানে বাই, সকল লোকের ঠাই,

কাণাকাণি শুনি এই কথা।

* * * *

সই লোকে বলে কালা পরিবাদ,

কালার ভরমে হাম, জগদে না হেরি পো,

তাজিয়াছি কাজলের সাধ।

চণ্ডীদাস ইথে কহে, সলাই অনন্ত দহে,

পাশরিলে না যায় পাশরা।

দেখিতে দেখিতে হরে, তম্বু মন চুরি করে,

না চিনিরে কালা কিবা পোরা।

প্রথম পদটি পদকল্পলতিকায় বড় সুন্দরভাবে ঘোষিত হইয়াছে; রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পীতবস্ত্র পরিয়া বাঁশী হস্তে দাঁড়াইয়াছেন, চণ্ডীদাস রাধিকার গৌর বরণের কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু প্রথম গীতির “এরূপ হইবে কোন্ দেশে?” ও দ্বিতীয় গীতের “না চিনি বে কাল কিবা পোরা” দুইটি ছন্দ পড়িয়া শ্রবণের কথার স্তার একটা অলীকভাবে মনে হইয়াছিল,—যেন ভাবী ঘটনা যেরূপ সমুদ্রে ছায়া পাত করে, পরম সুন্দর চৈতন্যদেব ও তেমনি তাঁহার রূপের ছায়া প্রায় শতাব্দী পূর্বে প্রেমিককবির মনে প্রক্ষেপ করিয়া ছিলেন; সেই রূপের পূর্বাভাস পাইয়া আল্লাদে চণ্ডীদাস পক্ষীর স্তার আশ্রয় কালি দ্বারা তাঁহার আগমনী গান করিয়াছিলেন।

“এরূপ হইবে কোন্ দেশে ?” প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশে; তখন চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন না। চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতির মিলন হইয়াছিল, চৈতন্য-প্রভু আর রামানন্দরায়ের মিলন হইয়াছিল, কিন্তু চণ্ডীদাস আর চৈতন্যপ্রভুর মিলন হইলে তদপেক্ষা অপূর্ণ হইত। গীতির প্রেমোন্মাদ ও জীবনের প্রেমোন্মাদ—গোলাপের সুস্রাব ও পদ্মের সুস্রাব মিশিয়া যাইত। চণ্ডীদাসের বর্ণিত পূর্বরাগ, রাধিকার ব্যাকুল বিরহ, মধুর প্রেম ও দিব্যোন্মাদ গৌরহরি স্বজীবনে দেখাইয়াছেন; যদি গৌরহরি না জন্মিতেন তবে শ্রীরাধার “জলদ নেহারি নয়নে ঝর দোর।” কৃষ্ণ অঙ্গ ভ্রমে কুসুম লতা আলিঙ্গন, এক দৃষ্টে মধুর মধুরী কণ্ঠ নিরীক্ষণ ও নব পরিচয়ের স্নমধুর ভাবাবেশ কবির কল্পনা হইয়া যাইত। ভাবের উচ্ছ্বাসজাত এই ভ্রমময় আশ্র-বিশ্রুতি আজ শুক্লযুগে কবি কল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইত। কিন্তু গৌরহরি শ্রীমদ্ভাগবত ও বৈষ্ণব-গীতি সমূহের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন,— দেখাইয়াছেন এই বিরাট শাস্ত্র ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, চিত্তের প্রীতিতে দণ্ডায়মান। এই শাস্ত্রের শোভা স্বরূপ পূর্বরাগ, বিরহ, সন্তোগ মিলন ইত্যাদি যে সব লীলা রসের ধারা ছুটিয়াছে, তাহা কল্পনা নহে, আশ্রয়-যোগ্য ও আশ্রয়িত হইয়াছে; প্রেমের আশ্রয় ক্ষুণ্ণিতে শ্রীগৌরের দেহ কদম্ব প্রায় হইয়াছে, সমুদ্র চেউ যমুনা লহরী হইয়াছে, চটক পর্কত গোবর্দ্ধন হইয়াছে ও পৃথিবী কৃষ্ণময় হইয়াছে; ‘এই অপূর্ণ ভক্তি ও প্রেমের উপকরণ দিয়া শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী সৃষ্ট; তিনি আয়েসা কি কুননন্দিনী নহেন, তাঁহার বিরহের এক কণিকা কষ্ট বহন করিতে পারে, তাঁহার স্নেহের এক লহরী ধারণ করিতে পারে, এরূপ নারীচরিত্র পৃথিবীর কাষেয়ক্যানে নাই।

এই অধ্যায়ের চরিত্রশাখা পদাবলী দ্বারা বৃদ্ধিতে হইবে, পদাবলী চরিত্রশাখা দ্বারা বৃদ্ধিতে হইবে এবং উভয়ই গৌরহরির লীলারস দ্বারা বৃদ্ধিতে হইবে; তাহা কিরূপ দেখাইতে চেষ্টা করিব;—চণ্ডীদাস প্রেমের অজ্ঞান অবস্থা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন;—“ভূলাখানি মিল নাসিকা মাঝে। ভয়ে সে ভুলিল পোলাস আছে।” সার্বভৌমের গৃহে বধন চৈতন্যপ্রভু অজ্ঞান তখন “সমুভূলা আনি নাসা অক্সেতে ধরিল। ইবং রম্যে ভূলা দেখি যৈথে হল।” (চৈ, চ, নবম সর্গ পরিচ্ছেদ);—শ্রীরাধিক! তমাল দেখিয়া “বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল,” (নবম সর্গ ৩০ শ্লোক) ও বেধ দেখিয়া “চাহে বেধ পানে, না চলে নয়নের তারা,”

(চণ্ডীদাস) কৃষ্ণ ভ্রমে উন্মাদিনী হইয়াছেন; শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনও সেইরূপ ভ্রমময়;—“চটক পরন্ত দেখি গোবর্ধন ভ্রমে, থাকি চলে আর্জনা করিয়া ক্রন্দনে॥” “বাহ্য নহী প্রেম তাহা মানয়ে কালিন্দী। মহাপ্রেম বশে বাচে প্রভু পঙ্ক কাঁচি॥” (চৈ, চ, মধ্যম ৭৩ ১৭ পরিলেখন)।—“ভাসনের বৃক্ষ এক সমুখে দেখিরা। কৃষ্ণ বলি ধরে গিরে ধরে জড়হিয়া॥” (গোবিন্দ দাসের করচা)। “বল দেখি ভ্রম করে এই কল্যাণ চৈ, চ, ১৭ পঃ)। এরূপ অসংখ্য স্থল আছে। শ্রীরাধিকাকে চৈতন্য করিতে বলা হইত;—“উঠ উঠ রাখে বিনোদিনী, দেখ দেখ কৃষ্ণ গুণমণি॥” (বিনোয়াখ্য)। চৈতন্য দেবের প্রতিও সেই ব্যবস্থা, “যখন বা হয় প্রভু আননে হুঁহিত। কর্ণমূলে সব হরি বলে অতি ভীত॥” (চৈ, ভা, মধ্য ৭৩)। রাধিকা কৃষ্ণ নাম শুনিলে বক্তার পদে ক্রীত হইতেন, “অকথন বেরাধি এ কথা নাহি যায়। যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥ পায় ধরি কাদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোপার পতনী বেন ভূতলে লোটায়॥ (চণ্ডীদাস) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এইরূপ কতবার কৃষ্ণ নাম শুনিয়া বক্তাকে পদে ধরিয়াছেন, আলিঙ্গন করিয়াছেন, “কৃষ্ণ অতুলাঙ্গ সলা আবুল হৃদয়। শুনিলে কৃষ্ণের নাম অগ্রস্বারা বয়॥ যদি কেহ রাখে বলি উচ্চ শব্দ করে। অহনি অশ্রয় রায়া কর বর করে॥ শ্রীকৃষ্ণ বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে। ধরে গিরে আলিঙ্গন করেন তাহাকে॥” (গোবিন্দ দাসের করচা)। শ্রীরাধিকা “পুহরে কানুর কথা হল হল আঁখি। কোথায় দেখিলা ভায় কহ দেখি সখি॥” (চণ্ডীদাস)। চৈতন্য দেবও “গদাধরে দেখি প্রভু করয় লিঙ্গাস। কোথা হরি আছেন ভাবল পীতবাস॥ সে আঁর্জি দেখিতে সর্ব হৃদয় বিদরে। কি বলিব প্রভুর বচন নাহি শূরে॥ সম্রমে বলিল গদাধর মহাশয়। নিরবধি আছেন হরি তোমার হৃদয়॥ হৃদয়ে আছেন হরি বচন শুনিয়া। আপন হৃদয় প্রভু চিরে নথ দিয়া॥ (চৈ, ভা, মধ্যম ৭৩); কৃষ্ণ-প্রেম-মগ্না রাধিকা ভূপৃষ্ঠে নখাঙ্কন করিয়া কৃষ্ণ নাম লিখিয়া সুখী হইতেন, “ভরমে তোমার নাম ক্রিতি-তলে লিখি॥” (চণ্ডীদাস)। চৈতন্য দেবও “কণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিতল আকৃতি। চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্রিতি॥” (চৈ, ভা, মধ্য)। রাধিকার হাসি দেখিরা শ্রীকৃষ্ণ বিভোর, “হাস, হাস, নয়ন বুড়াক চক্ষুখি। এ বোল বলিতে পিয়ার হল হল আঁখি॥” চৈতন্যদেব রত্নগর্ভের মুখে ভাগবত পাঠ শুনিয়া,—“বোল বোল বলে বিমম্বর। গড়াগড়ি যায় প্রভু বরষি উপর। বোল বোল বলে প্রভু, পড়ে বিজবর। উঠিল সমুদ্র কৃষ্ণ-হৃদ বনোহর। লোচনের জলে হল পৃথিবী সিক্ত। অঙ্গ কল পুলকানি ভাবের উদিত॥ (চৈ, ভা, মধ্যম ৭৩)

এইরূপ কনক গুণের ন্যায় প্রেম-রোমাঞ্চিত দেহ, শিশির-সুদ পদ্যবলয় ন্যায় প্রেমোৎপূর্ণ চক্ষু এই ছবিখানা শ্রীচৈতন্য দেবের। ইহাও প্রেমের

অনন্ত আনন্দের যৎকিঞ্চিৎ চণ্ডীদাসের পদে পাওয়া যায়, অপরাপর করিগণ ভট্টর দর্শকের ন্যায় উঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া গীতি রচনা করিয়াছেন ; পদ কল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক চৈতন্য দেবের আনন্দিক প্রেমের আভাস দিতে চেষ্টিত ; তাঁহার লীলা কাহিনী বাহারা জ্ঞাত নহেন তাঁহার। এণ্ড্রোমেকি, জুলিয়েট, ডাইডোর সঙ্গে বৈষ্ণব কবি-অঙ্কিত রঙ্গধিকাকে একস্থলে দাঁড় করিষেন ; এই ভয়ে এতগুলি দৃষ্টান্ত খুঁজিয়াছি। বৈষ্ণব পদাবলী, উপন্যাস বা ইন্দ্রজালের ন্যায় অলীক বোধ হইতে পারে কিন্তু উহা খাঁটি সত্য ; ভক্তের চক্ষে মেঘে কৃষ্ণ ভ্রম হইয়াছে, তারপর “কেব মেঘ মেঘে রাই এমন হলি।” প্রভৃতি কথার উদ্ভব হইয়াছে। কেবল চৈতন্যদেব নহেন, এই দলে আরও ভক্ত ছিলেন, বাহাদের কথা স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হয় ; “মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অবধা কখন। মেঘ দরশন মাত্র হয় অচেতন। (চে,ভা,১)

এই অধ্যায়ের গ্রন্থরাশি বাহা নয়নাশ্রম নির্মলবিন্দুনিঃসৃতধর্ম দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া অবর্ণনীয় সুন্দর ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, ক্ষুদ্র বঙ্গভাষা বাহা পবিত্র স্পর্শে গঙ্গা ধারার নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে পদাবলী সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলাম ; এস্থলে সংক্ষেপে তাঁহার জীবন বর্ণনা করিব।

শ্রীচৈতন্যদেব ।

বে নবদ্বীপ একদা পলায়নপর হিন্দু রাজার একখানা মলিন আলেখ্য দ্বারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছিল, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বেই নবদ্বীপ ভিনটি শ্রেষ্ঠ পুরুষের চিত্রপট উপহার দিয়া স্বীয় ঐতিহাসিক কটী উৎকৃষ্ট ভাবে সংশোধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল ; ইঁহারা রঘুনাথ পিরোয়ণি, স্বর্গত রঘুনাথ ও শ্রীচৈতন্যদেব। প্রথম দুইজন শাস্ত্র চর্চাকারী জিগের মধ্যে রাজা উপাধি পাইবার যোগ্য ; শেষোক্ত জন ও অল্পবয়সে সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গুরুপত্রের দ্বায় সেই শিক্ষা দ্রুতরে নিক্ষেপ করিয়া সদা-বিকশিত উৎকৃষ্ট যদুবদ্ধ বা দেবদত্ত দেবদ্বীপছিলেন। প্রথম দুইজনের সমকক্ষ আছে ; কিন্তু তৃতীয় জন ইতিহাসে একমুখ ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজধানী নবদ্বীপ একটি বিরাট পাঠশালার পরিণত হইয়াছিল; মল্ল যুদ্ধের দিনগতে তথায় তর্ক যুদ্ধই প্রথমে অর্জনের পন্থা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে নবদ্বীপের পরিসর অতিশয় বৃহৎ ছিল। আতোপুর, শিমলিয়া, মাজিতাগ্রাম, বামণপৌখেরা, হাটিডাঙ্গা, চাঁপাহাট, রাতুপুর, বিদ্যানগর, মাউগাছি, রাহুপুর, বেলপৈখেরা, মায়াপুর, প্রভৃতি বহুসংখ্যক পল্লী ইহার অন্তর্গত ছিল, নরহরির অতিরঞ্জিত বর্ণনায় ইহার বসতি অষ্ট কোশ ব্যাপক বলিয়া উল্লিখিত আছে।* উক্ত পল্লী সমূহ ব্যতীত গন্ধবনিক্যাপাড়া, তাঁতিপাড়া, শাঁধারিপাড়া, মালাকারপাড়া প্রভৃতি চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত দেখিতে পাই।

নবদ্বীপে জ্ঞানের টোল তখন হিন্দুস্থানে অদ্বিতীয়; দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রের ও সে স্থানে বিশেষরূপ চর্চা হইতেছিল। এসব সত্যও নবদ্বীপবাসী স্বল্প সংখ্যক লোকের কিছু বাসনা অপূর্ণ থাকিয়া বাইত; মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী ও বটীর পূজা, বোগীপাল, গোপীপাল, মহীপালের গীত, এবং পণ্ডরক্ত ও মদ্য দ্বারা আত্ম বজ্রস্থলী দেখিয়া তাঁহারা আক্ষেপ করিতেন; হরিভক্তিহীন নবদ্বীপের অর্থ ও বিদ্যা সমৃদ্ধি তাঁহাদের নিকট সিন্দূর হীন রমণী-ললাটের জায় বৃথা মনে হইত। তাঁহারা পৃথিবীতে ভক্তির অভাব দেখিয়া ব্যথিত চিন্তে অশ্রুপাত করিতেন; এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে অমৈত্যাচার্য্য অগ্রগণ্য; প্রবাদ আছে—ইহাদের অভাব পূরণ করিতে শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হন।

বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তখন এই কয়েকটি বৈষ্ণব আবির্ভূত হন,— ইঁহারা চারিদিকে ভক্তির অপূর্ণ কথা প্রচার করিবেন, কিন্তু এক সময়ে নবদ্বীপে ইহাদের সকলের মিলন হয়। শ্রীহট্টে—শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীবাস, শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ও মুরারি গুপ্ত। চট্টগ্রামে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও চৈতন্য বরভ দত্ত। বাড়নে হরিদাস ও রাঢ়দেশে একচক্রাগ্রামে ঐনিত্যানন্দ। ইহারা দীপশলা; কিন্তু চৈতন্য দেব দীপ; চৈতন্যদেব আবির্ভূত না হইলে ইঁহারা জনিতে পারিতেন কিনা কে বলিবে?

শ্রীচৈতন্যের জীবনে অনেক অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত আছে; এক দিনে আশ্রয় বীজ বপন ও তাহা হইতে বৃক্ষ ও ফলোদগম, স্পর্শমাত্র কুরুরোগীর আরোগ্য,

* ভক্তি রত্নাকর দ্বাদশ ভবন।

জগদানন্দ চক্রকে আত্মানন্দমাত্র হইতে উৎকৃষ্ট চক্রের উৎস, বহুব্রহ্ম প্রকাশ ইত্যাদি। এ সব দ্রব্য কি বিখ্যাত সে সবকে কোন ও মত প্রকাশ করিতে আমি সাহসী নহি। এই সব প্রকৃত হইলেই বা ইহাদের কি মূল্য, তাহা বুঝিতে পারি না; তাঁহার জীবনে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা আরোপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহার নবনাশ্রম জ্ঞান কোনটিই অলৌকিক নহে; যে প্রেমে তাঁহার শরীর কনককোরকের জ্ঞান কণ্টকিত হইয়াছে ও অর্ধ নিমিলিত চকুপুট হইতে অজস্র অশ্রুবিন্দুপাত হইয়াছে, সেই প্রেমের জ্ঞান তাঁহার জীবনে কিছুই অপূর্ণ কি মনোহর হয় নাই। চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তকে তাঁহার আলেখ্য এই ভাবে লিখিত আছে,—

জন্ম ও শৈশব ।

চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ) নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বাড়ী খ্রীহট্ট; নবদ্বীপে পড়িতে আসিয়াছিলেন, অত্যন্ত সুবোধ সুশ্রী ও গুণী বলিয়াই বোধ হয় নবদ্বীপের নীলাধর চক্রবর্তী খ্রীহট্ট বাসী যুবক জগন্নাথের নিকট স্বীয় গুণবতী কস্তা শচীদেবীকে বিবাহ দিয়াছিলেন; শচীর গর্ভে ৮ কস্তা ও ২ পুত্র জন্মে; কস্তা সবটাই অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। ষোড়শবর্ষ বয়স্ক্রে শাস্ত্র চর্চায় বিবৃত বিশ্বরূপযুবক বিবাহরূপ জটিল প্রসঙ্গ দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া সম্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং জগন্নাথ মিশ্র নিজে সুপণ্ডিত হইয়াও দ্বিতীয় পুত্র নিমাইর পড়াশুনা বন্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তি এইরূপ,—‘এই যদি সর্লশাস্ত্রে হবে গুণবান। ছাড়িয়া সংসার হুখ করিবে পরানর। অতএব ইহার পড়িলা কার্য নাই। মুখ হৈয়া ঘরে ঘোর থাকুক নিমাজি ॥’ (চৈ, ভা, আদি ।)

শৈশব-কালে জগন্নাথ মিশ্রের এই দ্বিতীয় বালকটি নবদ্বীপে বড় খ্যাতিশীল বলিয়া পরিচিত হন নাই। ইনি গঙ্গা-ব্রাহ্মণ্যরী ভক্তিম্যান ব্রাহ্মণসম্প্রদায় উপর বিশেষ উৎসাহিত করিতেন, অভিযোগ শুনি এইরূপ,—‘একজন বলিতেছে,—“কহা করি জনেতে নামিয়া। ছুব দিয়া নৈরা বার চরণ ধরিয়া ॥” (চৈ, ভা, আদি) । “কেহ কহে ঘোর শিব-লিঙ্গ করে চুরি। কেহ বলে ঘোর করে পলায় উড়লি ॥” (চৈ, ভা, আদি) ।

পহারঘাটে বালিকাগণের মাথার ওকড়ার বীচি ফেলিয়া দিতেন, দীর্ঘ ছত্র-কেশ আলোর ছর্ভেদ্য ব্যুহ ভেদ করিয়া উক্ত বীচির নির্গমনে

অনেক গাছি মট না হইয়া বাইত না। শিশু চৈতন্যপ্রভু ভাষায়া বলিতেন; এইসব অভিযোগকারী শালিকাদের মধ্যে কাহারও বিষয় শুকনো ছিল। “কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে।” (চৈ, ভা, আদি)।* প্রভুর বয়স তখন পঞ্চদশবর্ষমাত্র, ইহা স্মরণ করিলে অভিযোগের গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস হইবে সন্দেহ নাই। একদিন নিমাই রন্ধনের বর্জিত হাড়ির উপর বসিয়া পাগলামির এক নব অবয়ব প্রকট করিলেন; মাতা কর্তৃক ভৎসিত হইলে শিশু উত্তর করিলেন,—“প্রভু বলে মোরে তোরা না দিস পড়িতে। ভজ্যভক্ত্য মূৰ্খ বিপ্র জানিব কি মতে। মূৰ্খ আমি না জানি যে ভাল মন্দ হান। সৰ্ব্বত্র আমার এক অবিতীয় হান।” (চৈ, ভা, আদি) এই উত্তরের সবটুকু খাটি সত্য কিম্বা ইহার মধ্যে লেখকগণের কিছু মুস্বীয়ানা আছে ঠিক বলিতে পারি না, যেরূপ ভাবেই হউক শিশুটির স্মৃথকর উপদ্রব হইতে গ্রামবাসীদিগকে মুক্তি দেওয়া একসময়ে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। তখন মাতাপিতা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে গঙ্গাবাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতে পাঠাইয়া দিলেন।

নিমাই ছাত্র ও নিমাই অধ্যাপক।

‘কি মাধুরী করি প্রভু ক, খ, গ, ঘ বলে।’ বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন; নিমাইর পড়া শুনার ইতিহাস প্রকৃতই বড় মধুর। যে একাগ্রতার শচীর পাগল ছেলে পাগলামী করিয়াছে, সেই একাগ্রতার শচীর হরন্ত ছেলে পড়া শুনা লইয়া পাগল হইল।

“কিবা জানে কি ভোজনে কিবা পর্যটনে। নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে।।”
আশনি করেন প্রভু নৃত্যের টিঙ্গনী। ডুলিয়া পুস্তক রসে সৰ্ব্ব দেবদণ্ডি।।” “না ছাড়েন ত্রিহস্তে পুস্তক একক্ষণে।” “পুঁথি ছাড়িয়া নিমাকি না জানে কোন কর্ণ। বিদ্যারস ইহার হয়েছে সৰ্ব্ব ধর্ম।।” “একবার যে নৃত্য পড়িয়া প্রভু যায়। আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায়।।” চৈ, ভা, আদি।

এইরূপ একাগ্রতার বলে নিমাই শীঘ্রই ব্যাকরণশাস্ত্রে অবিতীয়

* এইসব কাহিনীতে ভাগবতের সঙ্গে মিল রাখিবার কিছু কিছু চেষ্টা আছে, এবং এইসব কথার ঐতিহাসিকত্ব আমরা যুব বিশ্বাসপরাগ হইতে পারি নাই; বাস্তবিকের সারসংক্ষেপ অভিযোগ করিয়া সেবে চলিতেছে,—

“খুর্শে শুক্লিলাস বেন নন্দের কুমার। সেইমত ভোমার পুত্রের ব্যবহার।।” চৈ, ভা, আদি।

হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নিমাই এমনও সেই পারল ছেলে, সে সাম-
লারীর লীলারস বড় মধুর—উহা তাহার উদ্দাম ও ক্ষুধি পূর্ণ প্রকৃতির
সহজ খেলা—উহা মিশ্রল জনশ্রোতের জায় আনন্দদায়ী, তাহাতে সরলতা
বিধিত। নব যুবক তাহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও শিক্ষার মধু লইয়া বড় বড়
অধ্যাপকদিগের পাঠশালা লক্ষ্যে তীর ছুরিতে লাগিলেন; মুরারিগুপ্ত
বরসে বড়, তাঁহাকে তর্কে হারাইয়া নিমাই বলিতেছেন;—

“প্রভু কহে বৈরা তুমি ইহা কেন পড়। লভা পাতা নিরা গিয়া রোগী লুট কর।।
জ্ঞানকরণ শাস্ত্র এই বিবম অবধি। কক-গিস্ত অজীর্ণ রামহা নাহি ইধি।।” চৈ, ভা, আদি।

গদাধর পণ্ডিতকে পাথে পাইয়া,—

“হাসি দুই হাত প্রভু রাখিলা ধরিয়া। জ্ঞান পড় তুমি আমা যাও প্রবেধিয়া।।
জিজ্ঞাসহ গদাধর বলিল বচন। প্রভু কহে বল দেখি মূর্তির লক্ষণ।।” চৈ, ভা, আদি।

এইরূপে পথিকদিগকে পর্য্যস্ত আক্রমণ করিয়া পরাতবব্যঞ্জক
হাস্ত ও শ্লেষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নদীয়ার বড় বড় পণ্ডিত
এই তরুণ যুবকের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দেখিয়া প্রীত ও বিস্মৃত হইলেন।
নিমাই বে টোল স্থাপন করিলেন, তাহাতে অসংখ্য ছাত্র পড়িতে আসিল।
তাঁহার অপূর্ব স্মরণমূর্তি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সেই টোলের গৌরব
অশেষরূপে বাড়াইয়া দিল। কিন্তু তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অনতিক্রান্ত বিংশ
বর্ষ মাত্র।

কেশবকাশীর নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে
ভক্ত-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন; তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির গৌরবে নবদ্বীপ বাসীগণ
ভীত হইলেন; কিন্তু তরুণ নিমাই হাস্তমুখে গঙ্গাতীরে তাঁহার সহিত
বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বলা মাত্র তিনি গঙ্গার
সেই সন্মেরে শোভা ধরন করিয়া একটি দ্বোত্র রচনা করিলেন; দ্বোত্রগুলির
স্মরণ উপদ্রা, সহজ ভাব শ্রোতবর্গের মন মুগ্ধ করিল; কিন্তু নিমাই সেই
দ্বোত্রগুলির প্রত্যেকটি হইতে অলঙ্কারের দোষ বাহির করিয়া দিগ্বিজয়ীর
অকণ্ঠঅভিমান-সীত স্মরণস্তল ধরক ও মলিন করিয়া দিলেন; তাঁহার
এবম হুজুরে ভাসানী-তর্ক শব্দে ‘বিক্রমতি কোষ’, ‘বিক্রমতি’ শব্দের পরে
‘ক্রমতসকোষ’ ত্রীলম্বী শব্দে ‘পুনরুক্তবদান্তাল’, ইত্যাদি। যিনি ব্যাকরণের
ব্যুৎপত্তিতে অসাধারণরূপ কৃতি তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের স্মরণস্তল অবগত

ছিলেন একথা দিখিজয়ী কখন ও মনে জন্মেন নাই। তাই বন্ধ-বন্ধ বলিয়াছিলেন ;—

“ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলংকার। তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ॥ চৈ, চ, আদি।

কিন্তু এবার তাঁহার আটোপ বৃথা হইল; প্রভু তাঁহার রহস্যপ্রিয় ভাষ্য কবিতাটিকে যখন ছাইমুষ্টির ভাষ্য শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে প্রতিপন্ন করিলেন, তখন দিখিজয়ী তাঁহার অহঙ্কারের পুচ্ছ গুণ্ঠিত করিয়া কোন পথে পলায়নপর হইলেন, কেহ তাঁহাকে আর দেখিল না।

এই তরুণ বয়সে প্রবীণ শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিতটির দুরন্তপনার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। শ্রীহট্টীয়াগণ দেখিলে নিমাই ব্যঙ্গ করিতেন; তিনি খাটি নদেবাসীর সন্তান হইলে শ্রীহট্টবাসীদের ততদূর দুঃখ হইত না। ময়ূরের পুচ্ছ শরীরে সংলগ্ন করিলেই ময়ূর উপাধি পাওয়া যায় না, শ্রীহট্টবাসীগণের এইজন্ত একটু খায়া কষ্ট হইত ;—

“শ্রীহট্টীয়াগণ বলে হয় হয় হয়। তুমি কোন দেশী। তাহা কহ মহাশয় ॥ পিত্তা মাড়া আদিকরি তাবত তোমার। বল দেখি শ্রীহটে জন্ম না হয় কাহার। চৈ, ভা, আদি।

কিন্তু রহস্যপ্রিয় পণ্ডিতমহাশয় এসব যুক্তি শুনিতে প্রস্তুত নহেন। “তাবৎ শ্রীহট্টীয়াগণে চালেন ঠাকুর। যাবৎ তাহার জ্ঞেয় না হয় প্রচুর ॥ মহাজ্ঞেয়ে কেহ লই যায় খেদারিয়া। লাগালি না পায় যায় তর্জিয়া গর্জিয়া ॥” চৈ, ভা, আদি।

কিন্তু যে স্থলে এই যুবাবয়সে তাঁহার চাক্ষুশ্য না থাকে শ্রেয়ঃ ছিল, সে স্থলে তিনি সংযত ছিলেন ;—

“এই মত চাক্ষুশ্য করেন সব সনে। তবে স্ত্রী ছাত্র না দেখেন দুই কোনে ॥ তবে পরস্পর ছাত্র নাহি উপহাস। স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হইল এক পাশ ॥” চৈ, ভা, আদি।

কিন্তু ধর্ম না থাকিলে হিন্দুস্থানে রূপ বৃথা—বিদ্যা বৃথা। সকলেই নিমাইকে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে বাইত; রহস্যের শ্রোতে ধর্ম কথা জ্বলাইয়া দিয়া নিমাই হাসিতেন; ঈশ্বরপূরী পরমবৈষ্ণব, তাঁহাকে ধর্মে অজ্ঞি লওয়াইতে নিত্য নিত্য কত শ্লোক পাঠ করিতেন, কিন্তু নিমাই তাঁহার শ্লোক হইতে ব্যাকরণের দোষ বাহির করিতে নিপুণ ছিলেন। “প্রভু কহে এ খাতু আত্মনেপদী নয় ॥” ব্যাকরণের অতলগর্ভে ধর্মের কথা গুলির গলা প্রাপ্তি হইত। কিন্তু তাঁহার বাহিরের এই রহস্য-প্রিয়তা প্রকৃত ধর্ম হীনতার পরিচায়ক ছিল না। তিনি ব্যঙ্গ করিয়া ও ঈশ্বর

সদাধরকে দেখিলে যমে মনে আফ্লাদিত হইতেন ও ঈশ্বরপুরীকে দেখিলে পাগল হইতেন ।

এই যুবকের হৃদয় শরদ্রের জ্বাশ নির্মল ও শরৎ সৌন্দর্য্যিকার জ্বাশ পবিত্র ছিল ; ইহার চাপল্য—স্বচ্ছ উদ্দাম প্রকৃতির হর্ষময়—রসপূর্ণ থেলা—তাহা সকলের প্রীতি উৎপাদন করিত ; এই নির্মল ও পবিত্র প্রাকৃতিক উপাদানে সরস ভক্তি বিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইতেছি ।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ।

নিমাই পণ্ডিত পূর্ববঙ্গ পর্য্যটন করিতে গেলেন । ইতি পূর্বেই তিনি বঙ্গের সর্বত্র একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া নামে পরিচিত ছিলেন ; পূর্ববঙ্গের পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে যথেষ্ট আদরের সহিত অর্চনা করিয়া বলিলেন,—“উদ্দেশ্যে আমরা সবে তোমার টিঙ্গনী । লই, পড়ি, পড়াই শুনহ বিজ্ঞমণি ।” চৈ, ভা, আদি । ইহা বার জানা যায় নিমাই পণ্ডিতের টীকা বঙ্গদেশের টোলগুলিতে প্রচলিত হইয়াছিল ।* তিনি পূর্ববঙ্গের কোন্‌কোন্‌ স্থল ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই ; চৈতন্য ভাগবতকার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পদ্মানদীর তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন ।

নবদ্বীপ ফিরিয়া আসিয়া চৈতন্যদেব সঙ্গীগণের নিকট পূর্ববঙ্গের ভাষার অনুকরণ করিয়া হাত্ত পরিহাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু একটি প্রাক্কল পুতুলের জ্বাশ যখন জননী দেবীর চরণে প্রণত হইলেন, তখন প্রত্যাগত কুমারের মুখ দেখিয়া শচী ঠাকুরাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন । নিমাই জানিতে পারিলেন সর্পদংশনে তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হইয়াছে । নবীন পণ্ডিত মাতাকে প্রবোধ দিলেন, বিষ্ণু প্রিয়া দেবীর পাণীগ্রহণ করিয়া সেই প্রবোধ সম্পূর্ণ করিলেন ; কিন্তু নিজের বোধ হয় প্রবোধ পান নাই । পিতৃপিতৃ প্রদানার্থ গয়া যাত্রা করিলেন ; এবার তাঁহার চিত্ত শোক দ্বারা আবৃত হইয়াছিল, তীর্থ স্থানে যাইয়া ঈশ্বরপুরীর ভক্তির উজ্জ্বল দর্শনে নিমাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, ভক্তিময় ঈশ্বর পুরীর মূর্তি তাঁহার চক্ষে একখানা দেব ছবির জ্বাশ অপরূপ বোধ হইল ; ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান কুমারকট গয়া হইতে ও শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া বোধ হইল ;—“প্রভু বলে কুমারকটেরে

* চৈতন্যভট্টের ব্যাকরণের টীকার কথা অনেক স্থলেই পাওয়া যায়, যথা—“দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈয়া চমৎকার । ব্যাকরণে করয় টিঙ্গনী আপনার ।” ভক্তি রত্নাকর, ১২ তরঙ্গ ।

নবদ্বার। শ্রীকৃষ্ণ পুরী যে গ্রামে অবতীর ॥ * * * ইধর পুরীর ইধর দ্বার ।
এ যুক্তিকা আমার জীবনধন প্রাণ ॥” (চৈ, ভা, আদি) । বলিয়া নিমাই অক্সনেত্রে
কুমারহট্টের ধূলিরেণু জ্বলিত সামগ্রীর দ্বার উত্তরীয় অঞ্চলে বাধিতে
লাগিলেন ।

ইহার পর আর এক দৃশ্য ; সে দৃশ্য চিত্রে অঙ্কিত হওয়ার উপযুক্ত ।
শ্রীবিয়োগকাতর শিক্ষাভিমानी যুবক গয়ায় অঞ্জলি দিতে দাঁড়াইয়াছেন ;
যে চরণ হইতে ভগবতী গঙ্গা নিঃসৃত, যে চরণে বলি দলিত, যে চরণ-
রেণু ধারণ করিতে শুক সন্ন্যাসী, নারদ বৈরাগী, যোগেশ্বরগণ তপোরত—
সেই চরণ দেখিতে দেখিতে নিমাই মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । সঙ্গীগণের
যত্নে মুচ্ছা ভঙ্গ হইল, তখন অজ্ঞান নয়নাশ্রু ফুলারবিন্দুগুচ্ছের দ্বার সেই
শ্রীচরণ উদ্দেশে বর্ষিত হইতেছিল, কাদিতে কাদিতে তিনি পথ দেখিতে
পান নাই, বাম্পরুদ্ধকণ্ঠে সঙ্গীগণকে বলিলেন,—“তোমরা গৃহে কিরিয়া
বাও, আমি আর সংসারে যাইব না ; আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে মধুরায়
চলিলাম ।”

এই অপূর্ণ ভক্তিউচ্ছ্বাসিত পূর্বরাগের আবেশময় যুবককে সঙ্গীগণ
নানা উপায়ে প্রত্যাখ্যস্ত করিলেন ; গৃহে আসিয়া নিমাই সেই পাদপদ্মের
কথা বলিতে পারেন নাই,—বলিতে যাইয়া অশ্রুসিক্তকণ্ঠে কথা স্বগিত
হইয়াছে ; ‘কি দেখিয়াছি’ বলিতে উদ্যত হইয়া একবার শ্রীমানপণ্ডিত
আবার গদাধরের কণ্ঠ জড়াইয়া কাদিতে কাদিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন ।
তিনি বাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভাষায় ব্যক্ত হয় নাই—তাঁহার
মুক্তাদামসম উজ্জ্বল অশ্রুজলে ব্যক্ত হইয়াছিল ।

এই প্রেমোন্মত্ত বালককে শচীদেবী পুত্রবধূর রূপ দ্বারা গৃহে বাধিয়া
রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,—“লক্ষ্মীরে আনিয়া প্রভুর নিকটে বসায় । দুইপাত
করিয়া ও প্রভু নাহি চায় ॥ কোথা কুক কোথা কুক বলে অমুকণ । দিবামি
পাড়ি করয় জ্ঞান ॥”, চৈ, ভা, আদি ।

ইহার পর কাঁটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট বয়স গ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য
নারী গ্রহণ ও সন্ন্যাস অবলম্বন অচিরে সম্পন্ন হইল ; তখন তাঁহার
বয়স ২৪ ব্রাহ্ম । (১৫০৯ খৃঃ) ।

গঙ্গা গমন অবধি তাঁহার ইতিহাস স্বতন্ত্ররূপ । একপা অধিকারী

সৌন্দর্য্যভূষিত হরি ইতিহাস যুগ যুগান্তর পরে একবার প্রকটিত করেন। বক্তৃতার শুণে নহে, রূপ দেখাইয়া চৈতন্যদেব পৃথিবী মোহিত করিলেন; শিশিরস্রোতকুহুমসৌরভ বক্তৃতা দ্বারা উপলব্ধি করাইতে হয় না; চৈতন্যদেব স্বীয় ভক্তিময় অশ্রুসিক্ত মূর্তিখানা দ্বারে দ্বারে দেখাইয়াছেন, যে দেখিয়াছে সেই ভুলিরাছে; সত্যবাই লক্ষ্মীবাই—বেশ্যাক্ষর তাঁহাকে প্রতারিত করিতে বাইরা কাদিয়া পদে স্রবণ লইয়াছে; ভীলপন্থ, নরোজী প্রভৃতি দম্ভাগণ তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া কাদিয়া পায় ধরিয়াছে। হরিনাম করিতে করিতে অঙ্গ পুলকিত ও চক্ষু মুদিত হইয়াছে, তখন সেই চক্ষু কাটিয়া অতি মনোহর মুক্তাদাম পতিত হইয়াছে, তখনকে জড়াইয়া কাদিয়াছেন; কদম্ব বৃক্ষ দেখিয়া অজ্ঞান হইয়াছেন; বিষ্ণুর উদ্দেশে যে ভোষণ প্রদত্ত হইয়াছে সেই ভোগের অন্ন খাইতে চক্ষু, জলে আর্দ্র হইয়াছে ও একএকটি অন্ন অমৃত জ্ঞানে খাইয়া পাগল হইয়াছেন; বেকট নগরের নিকট এক বৃক্ষতলে চারিদিন চারিরাত্র পাগলের মত হরি হরি বলিয়া কাদিয়া ধূলায় লুপ্তিত হইয়াছিলেন, এই সময়ের মধ্যে আহার, নিদ্রা, বাহ্যজ্ঞান কিছুই ছিল না। যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি বিবেচ্য যুক্ত ভাব লইয়া পাড়াইয়াছে, সেও তাঁহার অপূর্ণ গৌরবর্ণ কাস্তিতে বিভ্রাৎলহরী, অশ্রুসিক্ত মুখখানার আশ্চর্য্য ভক্তির ছটা দেখিয়া কাদিয়া ‘হরি বোল’ বলিয়াছে। সত্যই যমুনা ভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন; পুণানগরে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল—“তোমার হরি ঐ পুষ্করিণীতে আছেন” তখন চৈতন্য জলে ঝাঁপ দিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই মূর্তি ঐব, প্রহ্লাদের প্রতিচ্ছায়া।

এই অপূর্ণ মহাব্যটিকে দেখিয়া জাতীর জীবনে যে বিশ্বয় ও প্রেম জন্মিয়াছিল,—তাহা অলৌকিক উচ্ছ্বাসময়। শ্রীবাসঅঙ্কনে সারারাত্রি চৈতন্যদেব লক্ষীগণ সহ হরিনাম কীর্তনে উন্মত্ত ছিলেন, নিশি কিল্লপে ভোর হইল তাহা তাঁহারা জানেন নাই। এই অপূর্ণ সন্মিলনের সুখ উপভোগের বক্ত, ভাষার ব্যক্ত হওয়ার যোগ্য নহে,—“চরকিত হৈয়া সবে চারিধিবে চার। নিশি পোহাইল বলি কীল উভয়ার। কোটী পুষ্করেক ও এত হৃৎক নহে। যে হৃৎক বৈক্য সব অরণেরে চাহে।” চৈ. ভা. দ্বা. পৃ. ৩। অবৈতগোমাই বলিয়াছিলেন,—“শিরে বক্স পাছু যদি পুত্র-বরি যায়। তবুও প্রভুই বিলা। মরব না।

বার ॥” লোকবৃন্দের ভক্তি এতদূর হইয়াছিল,—“বাঁহা বাঁহা পুতুর চরণ পড়ন চমিতে। সে বৃত্তিকালর লোকে গর্ত হয় পথে ॥” ১৫, ৮, ৯ম, ১ম পঃ। চিরসঙ্গী গোবিন্দ ভূত্য পুরীতে চৈতন্যদেবের দিকট হইতে শান্তিপুর পদ্ম নদীয়া বহিতে আদিষ্ট হইলে, দুদিনের বিচ্ছেদ ভাবিয়াই ব্যাকুল হইয়াছিল। ‘এই বালা শুনি মোর চক্ষে বারি বহে। পুতুর বিরহবাণ প্রাণে নাহি সহে ॥ (করচা)। হরি-দর্শনেচ্ছু অশ্রুপূর্ণ চক্ষুদ্বয় দ্বারা যেদিকে চাহিয়াছেন, সেইদিকে কুসুমগুচ্ছ বিক্লিপ্ত হইয়াছে,—“বিশাল নয়নে যেইদিশে যবে চার। সেইদিশে নীলপদ্ম নরবিরা যার ॥’, (গোবিন্দ দাসের করচা)। পরবর্তী প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ দাস “যেহি যিহি তরল বিলোচন পড়ই। তহি উহি নীল উৎপল ভরই ॥”—পদে এই মূর্তির আবেশময় প্রতিবিম্ব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী বর্ণনাগুলিতে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন নাই। আমরা অলৌকিক শক্তির ক্ষুরণ দেখি নাই, বাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা উপমা ও অলংকার ভিন্ন কথা কহিতে পারেন নাই, তাই পৃথিবীর ধর্মকাব্যগুলি রূপকধার ভ্রায় বোধ হয়।

বালালী নবদ্বীপের ছেলোটর রূপে শুণে এখনও মোহিত রহিয়াছে, এখনও সেই স্মৃতিতে সদ্যঃজাত প্রিয় বালকের মুখ চুষন করিয়া তাহাকে ‘নবদ্বীপচন্দ্র’ ‘নগরবাসী’ ‘নদেবাসী’ প্রভৃতি নাম দিয়া ৪০০ বৎসর পূর্বের শিশুটির প্রতি প্রগাঢ় ভালাবাসা জানাইয়া থাকে।

তাঁহার জীবনে ধর্মনীতি।

ফুলের মৃদুতা মেয়েলী গুণ; “মহামুত্তরের চিত্তের স্বভাব এই হয়। পুন্সস কোমল কঠিনবজ্রময় ॥” * কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি।—পৌরুষ ভিন্ন পুরুষ হয় না, ফুলভারানতাত্রাতীজড়িত দেবদারুর ন্যায় প্রকৃত পুরুষ নানা কোমল গুণ বেষ্টিত হইয়া স্থায় চরিত্রের অনমনীয় স্ব অখণ্ডভাবে স্থাপন করেন। চৈতন্যদেবের চরিত্রে কোমলত্ব ও পৌরুষ মিশিয়া গিয়াছিল। একদিক হইতে সেই চরিত্রের ভক্তি, প্রেম ও বিনয় ফুলপুষ্পের ভ্রায় মনোহর দেখায়, অস্তদিক হইতে সে চরিত্রের দৃঢ়ত্ব বিয়য় উৎপাদন করে; একদিকে পাহাড়ের ভ্রায় ঝুঁঝু বিরাট, অন্যদিকে অলি গুল্লুরিত ফুলময়। কিন্তু তাঁহার বিনয় ও প্রকৃত বীররসে পুষ্ট—উহার মৃদুভার ও দৃঢ়তা আছে;

গঙ্গার ঘাটে তিনি লোক পরিচর্য্যার নিযুক্ত;—“তোমার সব সেবিলে সে কৃষ্ণ তত্ত্ব পাই। এতবলি কান্দ পায়ে ধরে সেই ঠাকুর ॥ নিদ্রাডরে বস্ত্র কাড় করিয়া যতনে। ধূতি বস্ত্র তুলি কার দেনত আপনে ॥ কুশ গঙ্গা স্মৃতিকা কাহার দেন করে। সাজি বহি কোন দিন চলে কার ধরে ॥” (চৈ, ভা, মধ্য।) তিনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণগণ শূদ্রজাতির উপর পরিচর্য্যার ভার দিয়া অনেক দিন হয় হস্তের পুণ্য তুলিয়া গিয়াছিলেন,—তাই এ বিনয় বীরের যোগ্য।

কিন্তু এই মৃদু কুল-সম ব্যক্তি কোনও সময় বজ্রবৎ কাঠিন্য দেখাইতেন; তাঁহার নির্মল প্রীতিতে যদি কেহ বিলাসের পক্ষ মিশাইতে যাইত, তখন এই মধুর প্রেমবিগলিত ছবি একটি উজ্জল বজ্রময় মূর্তিতে পরিণত হইত। জগদানন্দ একটি তুলার বালিস তাঁহার জন্য রাখিয়াছিল, তজ্জন্য “জগদানন্দ চাহে আমার বিষয় ভুঞ্জাইতে” বলিয়া তিনি তাঁহাকে অশেষরূপ ভৎসনা করিয়াছিলেন, এক ব্যক্তি এক হাড়ি স্নগন্ধি তৈল তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়াছিল, প্রভুর আদেশে সেই তৈলহাড়ি আঙ্গিনায় ভগ্ন করিতে হইল। হরিদাস স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিল, “পুত্রু কহে সন্ন্যাসী করে পুত্ৰভি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥” (চৈ চ অস্তমধ্য)। চৈতন্য তাহার মুখ আর দেখেন নাই। সনাতন ধনীর পুত্র, তিন টাকা মূল্যের একখানা ভোটকঞ্চল গায় দিয়া আসিয়াছিল, কোপিনসার চৈতন্যদেব নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে নানাপ্রকার সদালাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু “ভোট কঞ্চলের পানে প্রভু চাহে বারে বার।” স্মতরাং তাঁহার ভোটকঞ্চল ত্যাগ করিতে হইল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন যে দিন মুখ হইতে বহির্গত হইল, সেদিন সমস্ত নবদ্বীপবাসী শোকোন্মত্ত ভাবে ঘেহের বাছায়া তাঁহাকে জড়াইয়া রাখিতে চাহিল, তাঁহার শোকক্ষিপ্ত মাতা দ্বাদশ দিন উপবাস করিলেন, “দ্বাদশ উপাসে আই করিলা ভোজন।” (চৈ, ভা, মধ্য)। নির্মম সেদিকে ক্রক্ষেপ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে যাওয়ার সময় শত শত লোক তাঁহার সঙ্গে যাইতে পাগল প্রায়, কাহারও অশ্রুজল লক্ষ্য না করিয়া একবারে ভৃত্য সঙ্গে চৈতন্ত চলিয়া গেলেন। রামানন্দরায়ের বাড়ীতে বিষ্ণু-মন্দির পরিষ্কার করিতে বহুবিধ লোক নিযুক্ত কিন্তু সেখানে দেখা গেল উপবাস-জীর্ণ কৃষ্ণবিরহে ছিন্নদেহ চৈতন্তের আহুত বোকাই সর্কাপেকা বড়। এই কষ্টসঙ্কিত কোপিনধারী সত্যবাক্য

বিবরনিম্হ ব্রাহ্মণবালক সেই প্রাচীন ঋষিগণেরই বংশধর, যুগে যুগে সেই ব্রহ্মনিষ্ঠাপূর্ণ শোণিতের বিগুপ্ততা হিন্দু সমাজে এইভাবে কার্যকরী হইয়াছে।

সময় আছে যখন আরাধ্য ও আরাধক এক হইয়া যায়; ভাগবতে তদবস্থায় গোপীগণ নিজকে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রম করিতেছেন; গোপীগণ,—“সকলেই কৃষ্ণান্ধিকা হইয়া পরস্পর আমিই এই কৃষ্ণ” এই প্রকার কহিতে লাগিলেন” (ভাস্কর্য্য, ১১ম স্কন্ধ, ৩০ অঃ, ৩ শ্লোক)। জয়দেব ও রাধার এই অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, “সুহৃদবলোকিতমণ্ডলীলা। মধুরিপুরহমিতি ভাবনলীলা।” বিদ্যাপতির গীতে ও সেই কথার পুনরুক্তি আছে “অমুখন মাধব মাধব সোভরিতে, সুলক্ষী তেল মাধাই।” ইহাই যোগীর “সোহং”, খ্রীষ্টের “আমি এবং আমার শিষ্য এক।” এইরূপ মুহূর্ত্ত চৈতন্যদেবের জীবনে ও হইত বলিয়া বর্ণিত আছে। যদি ফুলপদ্মে ভ্রমর পতিত হইলে হর্ষ-উজ্জ্বলিত পদ্ম স্বীয়দল মুদিত করিয়া ভ্রমরকে সন্তোষ করে, তখন অন্তঃপ্রবিষ্ট ভ্রমরযুক্ত পদ্মটি যেক্রপ পূর্ণ আনন্দের চিত্র হইয়া দাঁড়ায়, চৈতন্যপ্রভু ও সেইরূপ ঋষীকে মুক্তিভেদে তাঁহাকে সময়ে সময়ে হৃদয়ে পাইয়া মুদিত হইতেন, তখন তাঁহার ছবি অমানুষী প্রফুল্লাভ্য ধারণ করিয়াছে—বাহ্যিকের আলিঙ্গনে তন্ময় হইয়া তখন “মুক্তি সেই মুক্তি সেই কহি কহি হাসে।” (চৈ, ভা, মধ্য)। সেই সময় তাঁহার মুক্তি সাধারণ মানুষ হইতে স্বতন্ত্র হইত, তখন তাঁহার শরীরের দিব্যপ্রভা দর্শনে বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য ও তুলসি চন্দন দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন।

কিন্তু ঐ ভাব অন্ন-কালব্যাপক, তদবস্থানে চৈতন্যদেবের বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে, তখন তাঁহাকে যে ঈশ্বর সন্মোহন করিয়াছে, তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্য হইতে উড়িষ্যায় প্রত্যাগত হইলে বাসুদেব সার্কভৌম গলগন্ধকৃতবাস ও কৃতাজলি হইয়া ঈশ্বর জ্ঞানে তাহার বন্দনা পাঠ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “প্রভু কহে সার্কভৌম আর কথা কহ। আতাল পাতাল কথা কেন বা বলহ।” (গোবিন্দের করচা)। রামানন্দ রায় তাঁহাকে ‘ঈশ্বর’ বলাতে চৈতন্যদেব সবিমর্ষে উত্তর করিলেন, “প্রভু কহে আমি মানুষ আজন্মে সন্ন্যাসী। কামধন ব্যাক্য ব্যবহারে ভ্রম বাসি। শুক্লবস্ত্র কলীকিন্তু কৈছে বা জুয়ার। সন্ন্যাসীর অন্নহিষ্ট সকলোকে গদ্য। • • • সুখিহে প্রভুর কলস। ভরাবিন্দু পাতে কেহ ভায়ে বা করে পরস।” (চৈ, ৪ স্কন্ধবক্ত ১)।

এক গোড়ীয় ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্দিরে তাঁহার পাদোদক পান করিয়াছিল, প্রভুর অসন্তোষহেতু সেই ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বহিকৃত করিয়া দেওয়া হইল। চণ্ডীপুরে ঈশ্বর ভারতী তাঁহাকে ‘শ্রীকৃষ্ণ’ বলিয়া সম্বোধন করাতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীবাসঅঙ্গনে হরির নামে সংকীৰ্ত্তন না করিয়া ‘চৈতন্তজয়’ বলিয়া সংকীৰ্ত্তন আরম্ভ করার তিনি বিরক্ত হইয়া তাহা স্থগিত করিয়া দিলেন। বাহ্য ভয়ে আর উদাহরণ দিব না, একরূপ অনেক স্থলেই পাওয়া যাইবে। তাঁহার মতে বিনয়ী জগতে দুর্লভ, তিনি অহঙ্কারীকে বিনয় দ্বারা পরাজয় করিয়াছেন; বাসুদেব সার্কভৌমের সঙ্গে প্রথম দর্শনের পর বুদ্ধঅধ্যাপক চৈতন্তদেবকে অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করার জন্য ডৰ্শনা করিলেন এবং প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন এবয়সে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার নাই; তদন্তরে “প্রভু কহে শুন সার্কভৌম মহাশয়। সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিও নিশ্চয় ॥ কৃষ্ণের বিরহে মুক্তি বিকিণ্ড হইয়া। বাহির হইয়ু শিখা নৃত্য মুড়াইয়া ॥ সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি। কৃপাকর বেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি ॥” (চৈ, ভা, মধ্য।) তুঙ্গভদ্রাবাসী তুণ্ডিরাম তীর্থ তাঁহার সঙ্গে বিচার করিতে চাহিলে চৈতন্যদেব “মুখ সন্ন্যাসী মুহি কিছু নাহি জানি” বলিয়া তাঁহাকে ‘জয়পত্র’ লিখিয়া দিতে চাহিলেন। চণ্ডীপুরে ঈশ্বরভারতীকে ও রামেশ্বরতীর্থে একযোগীপণ্ডিতকে ও তিনি এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন; কিন্তু এইসব পণ্ডিতগণ সকলেই তাঁহার নরনাশ্রয়িত হরির নাম শুনিয়া, তাঁহার ব্যাকুল উন্নততা দেখিয়া করবোড়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন; আর যেখানে তিনি ইচ্ছাক্রমে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন তখন অবলীলাক্রমে সমস্ত দর্শন ও ন্যায়ের যুক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া সর্বশেষ উন্নতবৎ হরি নামের কথা কহিতে কহিতে উপদেশ শেষ করিতেন, তখন কদম্বকোরকের ন্যায় অঙ্গ পুলকিত হইত ও হরি নাম বলিতে বলিতে কাদিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন; বড় বড় পণ্ডিত তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান, প্রতিভা ও যুক্তির প্রবলমুখে বধন ভুগে ন্যায় ভাসিয়া যাইতে উদ্যত, তখন সহসা বিষয়কারিতনেত্রে তাঁহার অভিনব সৌন্দর্য্যভূষিত ভক্তিময় এই দেবরূপ দেখিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া কৃতার্থ হইতেন, লজ্জা বোধ করিতেন না। চৈতন্যদেব ২০ বৎসরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ১৮ বৎসর সীলাচলে বাস করেন, ৬ বৎসর দ্বারিষাত, বৃন্দাবন, গোড় প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনে ব্যস্ত করেন।

৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে (১৫৩৩ খৃঃ আবারের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে, রবিবার দিনে) তাঁহার অপূর্ণ লীলার অবসান হয়।

অদ্য ৪০০ বৎসর পরে পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমান ও স্পর্দ্ধা সহকারে অগ্রসর নবযুবক সমাজে যে ভাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিতে নিজকে অসমর্থ ও হীনবল মনে করিতেছেন, সেই সময়ের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তনয় সমাজের যন্তকে ও চরণে—ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে সেই সমবেদনামুচক প্রীতি জাগাইয়া দিয়াছিলেন। প্রেমের অভয় পতাকা উড্ডীন করিয়া “চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরারণঃ” বলিয়া বেড়াইয়াছিলেন; ইতর জাতির অন্ন গ্রহণ করিলে সামাজিক ধর্মতা হউক কিন্তু হরিভক্তির দাওয়া লুপ্ত হয় না,—“প্রভু বলে যেজন ডোমের অন্ন খায়। কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্বধায়॥” (চৈ, ভা, অন্তঃখণ্ড) “মুচি যদি ভক্তিসহ ডাকে কৃষ্ণধনে। কোটা নমস্কার করি তাহার চরণে॥” (গোবিন্দের করচা)। দেবরূপী মনুষ্য মনুষ্য জাতির সম্মান বুঝিয়াছিলেন এবং শ্রেণীবিশেষে সমস্ত মনুষ্য জাতির প্রাপ্য মর্যাদা সীমাবদ্ধ নহে, একথা বিনয় সহকারে কিন্তু অটল বীরত্বের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিগণ ব্যতীত ইদানীং কালের মনুষ্যগণের ও জীবনচরিত লিপিবদ্ধ হইতে পারে, ইহা সে সময় হিন্দু-সমাজের বিশ্বাসের কথা ছিল। না; সমাজ পিঞ্জরে আবদ্ধ পুতুলগণ শাস্ত্রের শ্লোক বলা অভ্যাস করিয়াছিল কিন্তু নিজের নৈসর্গিক বুলি ভুলিয়া গিয়াছিল। চৈতন্যদেবের প্রভাবে শ্লোকপরম্পরানিয়ন্ত্রিত যন্ত্রবৎ মনুষ্য জীবনে এক অভিনব প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়; পুরুষোচিত সরলতা ও উদ্যম সহকারে মনুষ্য চরিত্র পুনরায় গঠিত হয়, তাই জীবন-চরিত সাহিত্য এই সময়ে বজ্রভাবার এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দেয়। নরহরির ন্যায় কত ব্রাহ্মণ অসংখ্য প্রণীতাত সহকারে নরোত্তমের ন্যায় শূদ্রের জীবন আখ্যান বর্ণন করিয়া ধন্য হইয়াছেন;—ইহা বঙ্গসমাজের নব সামগ্রী। সাহিত্যের প্রতিবিম্ব কলিত ভাংকালিক সমাজে চৈতন্যদেবের চরিত্রের এক অমিতীন্দ্র মৌলব্যের রক্ষিত হইয়াছে। সাহিত্য ও সমাজের উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে, তিনি স্বর্গজগত চিরকালের জন্য এক অপূর্ণ রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন,—বাহার অকুরত সুখা যুগ যুগান্তরের জন্য বিদ্যুর

উপভোগার্থ সজ্জিত থাকিবে, উহা তাহার চিরস্মারক নাম মহাত্মা প্রচার, কলিযুগের নব গায়িত্রী—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥

পদাবলি-সাহিত্য ।

আমরা পুনর্বার পদাবলি-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি ; মলা নিম্নোক্তজন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ব্যতীত বঙ্গীয় তাবৎ পদকর্তাই টেঁচতলা প্রভুর সমকালিক অথবা পরবর্তী । শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পদসমুদ্র ও পদকল্পতরু অবলম্বন করিয়া পদ সংখ্যা সমেত একটী কবি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন ; আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ।

কবি	পদ সংখ্যা ।	পদ	পদ সংখ্যা ।
১। বিদ্যাপতি ...	১৫০	২০। কান্দু দাস ...	১৩
২। স্তানন্দ ...	৭	২১। আত্মারাম দাস ...	৪
৩। গৌরমোহন ...	১	২২। অগমোহন দাস ...	২
৪। গোকুল দাস ...	১	২৩। শিবাই দাস ...	৫
৫। নন্দন দাস ...	১	২৪। চুড়াগণি দাস ...	১
৬। বিনুদাস ...	২	২৫। কৃষ্ণকান্ত দাস ...	২০
৭। শিবরায় ...	১	২৬। ঘনরাম দাস ...	১৪
৮। যদুপতি ...	১	২৭। মুসিংহ দেব ...	৪
৯। রঘুনাথ ...	১	২৮। বিপ্রদাস ঘোষ ...	৬১
১০। দোপাল ভট্ট ...	১	২৯। মাধব দাস ...	৬
১১। স্তানন্দ ...	১	৩০। বাধুবেল্লা ...	৩
১২। যজ্ঞনাথ দাস ...	১৭	৩১। ব্রজচন্দ্র দাস ...	২
১৩। গোপীকান্ত ...	১	৩২। বলাই দাস ...	৩
১৪। বলরাম দাস ...	১৩১	৩৩। ধরনী দাস ...	১
১৫। বিশ্বকর্ম দাস ...	২	৩৪। বহু রামানন্দ ...	২
১৬। রাধামাধব ...	১	৩৫। মধুর দাস ...	১
১৭। মাধবী দাস ...	১৭	৩৬। মৈথিল দাস ...	১
১৮। বলদেব ...	১	৩৭। জ্ঞানদাস ...	১৩৪
১৯। কৃষ্ণমোহন দাস ...	২	৩৮। আত্মারাম দাস ...	১

পদ	পদ সংখ্যা ।	পদ	পদ সংখ্যা ।
৩৯ । সুন্দর দাস ...	২	৭১ । লোচন দাস ...	২০
৪০ । স্ত্রাম দাস ...	২	৭২ । গোপাল দাস ...	৫
৪১ । কালী কিসোর ...	১৭৯	৭৩ । কৃষ্ণদাস কবিরাজ ...	২২
৪২ । গোবিন্দ দাস ...	৪৫৮	৭৪ । শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ...	৫
৪৩ । উদ্ধব দাস ...	১০২	৭৫ । গদাধর ...	৩
৪৪ । গৌর দাস ...	২	৭৬ । বৃন্দাবন দাস ...	৩৩
৪৫ । দৈবকীনন্দন দাস ...	৪	৭৭ । বংশীবদন দাস ...	৩৪
৪৬ । শঙ্কর দাস ...	৪	৭৮ । সুবল ...	২
৪৭ । রামকান্ত ...	১	৭৯ । মাধবাচার্য্য ...	৫
৪৮ । বাহুবল যোগ ...	১৩৪	৮০ । কবিরঞ্জন ...	৯
৪৯ । রাধাসোহন ...	৪২৮	৮১ । রাধাসিংহ ভূপতি ...	৪
৫০ । দ্বিজানন্দ ...	১	৮২ । জগন্নাথ দাস ...	৯
৫১ । পুরুষোত্তম ...	১২	৮৩ । সিংহ ভূপতি ...	৭
৫২ । শচীনন্দন দাস ...	৩	৮৪ । বৈষ্ণব দাস ...	২৭
৫৩ । ভুবন দাস ...	১	৮৫ । শ্রীনিবাস ...	৩
৫৪ । শিবানন্দ ...	৩	৮৬ । বীরনারায়ণ ভূপতি ...	২
৫৫ । চন্দ্রশেখর ...	৩	৮৭ । মনোহর দাস ...	৪
৫৬ । রসময় দাস ...	২	৮৮ । পরমেশ্বর দাস ...	১
৫৭ । মধুসূদন ...	৫	৮৯ । বসন্ত রায় ...	১০
৫৮ । যদুনন্দন ...	৯৫	৯০ । দ্বিজ ভীম ...	১
৫৯ । গোবিন্দ যোগ ...	১২	৯১ । হরেকৃষ্ণ দাস ...	২
৬০ । রামচন্দ্র দাস ...	৪	৯২ । লক্ষ্মীকান্ত দাস ...	১
৬১ । চণ্ডীদাস ...	১১৯	৯৩ । ব্রজানন্দ ...	১
৬২ । মুরারি গুপ্ত ...	৫	৯৪ । হরিদাস ...	৭
৬৩ । মাধব যোগ ...	৮	৯৫ । মোহন দাস ...	২৭
৬৪ । রায় রামানন্দ ...	১৫	৯৬ । গৌরী দাস ...	৭
৬৫ । নরোত্তম দাস ...	৮৭	৯৭ । পরমানন্দ দাস ...	১১
৬৬ । নরহরি দাস ...	৮১	৯৮ । গৌরচন্দ্র দাস ...	৩
৬৭ । বল্লভ দাস ...	২৬	৯৯ । হরি বল্লভ ...	৪
৬৮ । বসন্ত দাস ...	৪১	১০০ । রাধাবল্লভ ...	১৯
৬৯ । অনন্ত দাস ...	৪৭	১০১ । শিবরাম ...	২৫
৭০ । চন্দ্রপতি ঠাকুর ...	১৬	১০২ । প্রভাস দাস ...	৫

পদ	পদ সংখ্যা ।	পদ	পদ সংখ্যা ।
১০৩। রামচন্দ্র দাস ...	২	১১০। শ্রেয় দাস ...	৩১
১০৪। দীনহীন দাস ...	৩	১১১। ভূপতি নাথ ...	৪
১০৫। রাম দাস ...	২	১১২। রসিক দাস ...	৩
১০৬। কাণাদাস ...	৪	১১৩। হরোরাম দাস ...	২
১০৭। নরনাথ দাস ...	২৫	১১৪। নরানন্দ ...	১
১০৮। জগদানন্দ দাস ...	৪	নাম শূন্য ...	২৮৭
১০৯। চৈতন্ত দাস ...	১৫		

পদকল্পলতিকা, গীতচিন্তামণি প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তকে আরও কতকগুলি নাম বেশী পাওয়া যায় ; এস্থলে আমরা আর একটি ক্ষুদ্র তালিকা প্রদান করিলাম ।

কবি	পদ সংখ্যা ।	পদ	পদ সংখ্যা ।
১১৫। রাম রায় ...	১	১৩১। কান্ত ...	১
১১৬। আনন্দ দাস ...	১	১৩২। গিরিধর ...	১
১১৭। মুরারি দাস ...	১	১৩৩। বিজ রাজেন্দ্র ...	২
১১৮। ভৃগু দাস ...	৫	১৩৪। শশি শেখর ...	৩
১১৯। প্রসাদ দাস ...	২	১৩৫। বিজ হরিদাস ...	২
১২০। বিজয়নন্দ দাস ...	১	১৩৬। বিজ গঙ্গারাম ...	৩
১২১। দীন ঘোষ ...	১	১৩৭। শিবা সহচরী ...	১
১২২। ভূপতি সিংহ ...	১	১৩৮। দুঃখিনী ...	২
১২৩। রামানন্দ দাস ...	১	১৩৯। ভুলসী দাস ...	১
১২৪। গোপীরঘন দাস ...	১	১৪০। শ্রেয়ানন্দ দাস ...	৫
১২৫। জামছরি দাস ...	২	১৪১। নয়নানন্দ ...	১
১২৬। বীর বল্লভ ...	১	১৪২। শ্রাবটাদ দাস ...	১
১২৭। বীরচন্দ্র কর ...	১	১৪৩। বীর হাথির ...	২
১২৮। নরসিংহ দাস ...	১	১৪৪। জয়কৃষ্ণ দাস ...	১
১২৯। কাননোষ ...	১	১৪৫। মহেশ বহু ...	১
১৩০। প্রভাপ দারারণ ...	১		

ইহা ছাড়া ৯ জন মুসলমান কবির পদ পাওয়া গিয়াছে ।

এই দুই তালিকা সম্পূর্ণ কিম্বা বিতর্ক নহে । পদ সমুহ এই এখনও মুদ্রিত হয় নাই ; এখনও অনেক বীতি-সংগ্রহ পুঁথি কাঠচাপে আবদ্ধ

দশায় আছে; তাহাদের একটা সদগতি হইলে অনেক লুপ্ত কবির পদ পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যায়। ইহা ছাড়া প্রসক্ত তালিকায় এক কবির নামে স্থানে স্থানে ২, ৩ কি ততোধিক কবির পদ পরিচিত হইয়াছে,—নিম্নলিখিত ‘গোবিন্দগণ’ বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাসের নামের আড়ালে পড়িয়া যাইতে পারেন * ; দাস শব্দের সাধারণতঃ স্বতন্ত্র; সূচক উপাধিগুলি লুপ্ত হওয়াতে পদদ্বারা তাহাদের পরিচয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছে,—

(১) গোবিন্দদাস চক্রবর্তী—ইনি চৈতন্তের অনুচর ও নবদীপবাসী। (২) জিনিবাস আচার্যের পুত্র মালিহাটী নিবাসী গোবিন্দ আচার্য। ইনি “গতিগোবিন্দ” নামে পরিচিত; (‘জয় জয় শ্রীগতি গোবিন্দ রসময় জয় তছু ভকত সমাজ’ পদকল্পতরু)। (৩) গিরীশ্বর দত্তের পুত্র গোবিন্দ দত্ত। (৪) কুলীনগ্রামবাসী গোবিন্দ ঘোষ; ইনি মধ্যে মধ্যে ‘দাস’ উপাধি গ্রহণ না করিয়া ‘ঘোষ’ সংজ্ঞা দ্বারাও ভণিতা নিয়াছেন; (‘গোবিন্দদাসব বাহুদেব তিন ভাই। বা সবার কীৰ্ত্তনে নাচে চৈতন্ত গোসাঞি’ চৈ, চ)। (৫) কাশীশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য উৎকলবাসী গোবিন্দ। (৬) প্রসিদ্ধ করচা লেখক গোবিন্দ কর্ণকার।

বলরাম দাস ও ৪।৫ টা স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম বলিয়া বোধ হয়।

(১) মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে আগমন সময় পুরীতে এক বলরামদাসকে শিখা বাজাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে দেখা যায়। (“রাম শিখা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত। বলরাম দাস আসে হয়ে পুণ্ডিত।” গোবিন্দের করচা)। বৈষ্ণব বন্দনার ৩ জন বলরামের নাম উল্লিখিত আছে। (২) “সংগীতকারক বন্দো বলরাম দাস। নিত্যানন্দধর্মের বার অনুষ্ঠ বিবাস।” (৩) কানাই খুটরা বন্দো বিশ্বের প্রচার। জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র বার।” বৈষ্ণব বন্দনা (৪) “বন্দো উড়িয়া বলরামদাস মহাশর। জগন্নাথ বলরাম দস বার হয়।” (৫) প্রেমবিলাস রচক নিত্যানন্দ দাস ও “বলরাম” নামে পরিচিত। (৬) নরোত্তমবিলাসে ‘পুজারি বলরাম’ নামধের নরোত্তম ঠাকুরের একজন শিষ্য দেখা যায়। (৭) উক্ত পুস্তকে ‘বলরাম কবিরাজ’ নামক অপর এক ‘বিজ্ঞ’ ব্যক্তির উল্লেখ আছে। (৮) পদকল্পতরুর ভূমিকায়—“কবিশূণ্য বংশজ ভুবনবিদিতবশ জয় বনভ্রাম বলরাম।” পাওয়া যায়। (৯) অদ্বৈত আচার্যের এক পুত্রের নাম বলরাম ছিল। এই বলরাম সম্প্রদায়ের ২ জনই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না। সম্প্রতি শিশির বাবু স্বীকৃত হৃদয় হৃদয় পদে ‘বলরাম দাস’ ভণিতা দেওয়াতে এই বলরাম সম্ভ্রান্ত কালে আরও জটিল হইবে বলিয়া বোধ হয়।

* পূর্বকালেপ্রায় এতদেক বৈষ্ণবই পদ রচনা করিতেন; হুতরাং ইহারা অন্যতরই পদকর্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ না করিলেও পদকর্তা ছিলেন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

(১) বহুদলনচক্রবর্তী * ও (২) বহুদলনদাস উভয়েই পদ কর্তা হলেও ; চক্রবর্তী অনেক স্থলে 'দাস' সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার বাঙী কটোরা, ইনি পদাধরের শিষ্য ও চৈতন্য প্রভুর চরিত লেখক, ("যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আচর্য।—দীনপ্রতি চেষ্টা যৈছে না কহিলে নয়। বৈষ্ণব মণ্ডলে যার অংশসাত্ত্বিয়। যে রচিল গৌরোত্তর অদ্বুত চরিত। তবে দার পাখাপাদি শুনি যার গীত ॥" ভক্তিরসাকর) ।

(১) শ্রীখণ্ড নিবাসী নরহরি সরকার চৈতন্য প্রভুর পার্শ্বচর্য ও বৈষ্ণব সমাজে একজন পরিচিত পদকর্তা । (২) জগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্র নরহরি চক্রবর্তী প্রসিদ্ধ চরিত-লেখক, ইনি ও একজন পদকর্তা—ইহার দ্বিতীয় নাম ঘনশ্রাম ।

এইরূপ অনেক স্থলেই বহুবিধ নাম পাওয়া যায়, অথচ এক নাম দ্বারাই পদকর্তা নির্দিষ্ট হইয়াছেন ; এবিষয়ে দ্বারারা তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত, তাঁহারা সুবিচার দ্বারা মৃত কবিগণের আত্মার সম্যক তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ স্থল । সুতরাং প্রদত্ত কবি-তালিকা বিশুদ্ধ নহে ; উহা এখন ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই ; লুপ্ত কবিগণের উদ্ধার কার্য শেষ হইতে বিলম্ব আছে ; তাহা ছাড়া শাস্ত্রীমহাশয় পদকল্পতরু হইতে মুসলমান কবিগণের নাম বাদ দিয়াছেন ; মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা কোতুকাবহ বিষয়, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ১২৯৯ সনের ভাদ্রের সাহিত্যে দুইজন কবির উল্লেখ করিয়াছিলেন, অন্নদিন হয় শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় সর্বসমেত ৯ জন বৈষ্ণব কবির পদ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাদের নাম ও পদ সংখ্যা এই,—

(১) "সৈয়দ রক্তাঃ ; (২) নসির মামুদ ২, (৩) আকবর সাহা ১, (৪) কবির হবির ১, (৫) সালবেদ ১, (৬) কবীর ১, (৭) সেখজাল ১, (৮) কতন ১, (৯) সেকতিক ১ ।

শাস্ত্রী মহাশয়ের তালিকায় বিদ্যাপতির পদ সংখ্যা ১৫০ ও চণ্ডীদাসের পদ সংখ্যা ১১০ নির্দেশ করিয়াছেন ; কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণে বিদ্যাপতির ১৮৬ টি পদ, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণে চণ্ডীদাসের ১৯৬ টি পদ প্রদত্ত হইয়াছে ।

বৈষ্ণবযুগের চরিত-শাখা সাহিত্য অতি সুবিজ্ঞার ; বড় বড় মহাজন-গণের জীবন বর্ণনার প্রাকৃতিক নানা কবির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে ; এই ঐতিহাসিক অরণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃততত্ত্ব সংগ্রহ করা অতি কঠিন কার্য ; তাহা 'দাস' শব্দের বাহুল্য দ্বারা কাঠিষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে, এমন নহে

* যদুনন্দন চক্রবর্তীর দ্বীর নাম ছিল লক্ষ্মী ; ইহার দুই কন্যা শ্রীমতী ও নারায়ণী দেবীকে বিভাষণ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র বিবাহ করেন ।

কেহ কেহ বিদ্যাপতিকে ‘বিদ্যাবল্লভ’ লিখিয়া ফেগিয়াছেন । * ভ্রাম্মানন্দপুরী
নিজকে “ভৃগুখিনী” ও শিবানন্দ আপনাকে “শিবাসহচরী” বলিয়া ভক্তি
দিয়াছেন । † পাঠক মেঘেন্দ্রী নাম পাইয়া ত্রী কবির খোজ করিতে করিতে
দেখিবেন, ভক্তির ইন্দ্রজালে পূর্ববর্ণিত ত্রীলোকের প্রতিরূপিত প্রতীতি
হইয়াছেন ।

পদকর্তাগণের জীবন-চরিত সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় নাই ; বড় বড়
কবিগণের জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণই পাওয়া যায় ; কবিগণের
সুন্দর পদগুলি আছে, প্রকৃতির বাগানে কুসুম রাশির জায় তাহার অলংকা ;
মনুষ্যের সুন্দর কৰ্ম ও তরুর ফল ফল একই নিয়মে উৎপাদিত ।
বৃক্ষ ও মনুষ্য উপলব্ধ্য মাত্র ;—আমরা প্রকৃত কর্তাকে না পাইয়া উপলব্ধ্য
কর্ত্তর আশ্রয় করিয়া থাকি ; আপাততঃ এইরূপ দর্শনের সহায়তা গ্রহণ
করিয়া কবিগণের জীবন না পাওয়ার ক্ষোভ জনিত ভ্রম হইতে সতর্ক
লাভ করা যাউক ।

এ স্থলে আমরা প্রসিদ্ধ কয়েকজন পদকর্তা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ
দিতেছি । এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দ কবিরাজ চৈতন্য-সহচর
পরমভাগবত চিরঞ্জীবসেনের পুত্র ও ত্রীশঙ্করের প্রসিদ্ধ নৈয়ারিক ও
কবি দামোদরের দৌহিত্র । চিরঞ্জীব সেন ত্রীশঙ্করের নরহরিসরকারের
শিষ্য ও তাঁহার বাড়ী কুমারনগর ছিল ; কিন্তু তিনি দামোদরের কন্যা
সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া ত্রীশঙ্করে আসিয়া বাস করেন । উক্তকালে তাঁহার
পুত্রস্বয় পুনরায় কুমারনগরে গৈত্রিক বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন
কিন্তু উক্ত স্থানের বৈষ্ণবদেবী শাক্তগণ দ্বারা উৎপীড়িত হওয়াতে পদ্মা-
পারস্থিত তেলিমা বৃন্দী গ্রামে বাড়ী করেন ।

গোবিন্দদাসের ছোট ভাতা রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম ঠাকুরের স্তম্ভ
ও স্বয়ং প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ছিলেন । রামচন্দ্রের বাঙ্গলা পদ পদকল্পলতিকার
আছে কিন্তু তিনি বাঙ্গলা ভাষায় প্রসিদ্ধি লাভ করার উপযোগী কোন
গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া আমরা নিশ্চয় প্রমাণ পাই নাই, তাঁহার স্ববর্ণন
বিষয়ে উল্লেখ যোগ্য পুস্তক বহু, গুনিয়াছি ‘বঙ্গভাষা’ নামক মহাপ্রভুর পূর্বরচ

* পীতিভিদ্ভাষনি দেখুন ।

† পদকল্পলতিকা ।

ভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁহার একখানা বড় ঐতিহাসিক পদ্যগ্রন্থ আছে, আমরা তাহা পাই নাই। বাহা হউক রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার সাময়িক বৈষ্ণব সমাজের ভূষণ ছিলেন, কিন্তু ভাষা কবিতার স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করাতে তৎকর্তি গোবিন্দ কবিরাজের খ্যাতি অতীত ও বর্তমান ব্যাপক হইয়া রহিয়াছে; তিনি স্বীয় কবিতার সরস মাধুরী বিতরণ করিয়া বঙ্গীয় যুবকগণের চিরস্মৃদকরূপে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তদপেক্ষা পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিরাজ বাঙ্গলা লেখার চেষ্টা না করাতে এখন প্রাচীন ইতিহাসের অচিহ্নিত পত্রে মগ্ন প্রায়।

প্রেম বিলাস, ডক্কি রত্নাকর, নরোত্তম বিলাস, সারাবলি অমরাপবনী প্রভৃতি বহুবিধ পুস্তকে গোবিন্দ কবিরাজ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বিবরণ আছে; কুঃখের বিষয় ঐ সব বিবরণে তাহার জীবনের কতিপয় স্থল ঘটনা মাত্র অবগত হওয়া যায়। তাঁহার কবিতা হইতেই তাহার হৃদয়ের সুকুমার স্বভাব-প্রবণতা ও অন্তঃ জীবনের পট ধারণা করিয়া লইতে হইবে। পূর্বোক্ত পুস্তকগুলিতে তিনি খেতুরীর মহোৎসবে, তেলিয়া বৃধরীতে, ও বৃন্দাবনে কখনও পথিক কখনও পাচকের তত্ত্বাবধায়ক, কখনও বা প্রাংশিত কবিরূপে সহসা দর্শন দিয়া নিবিড় জনতার অরণ্যে হারা হইয়া যাইতেছেন; ইতিহাস ক্ষুদ্র আলো-প্রক্ষেপে তাঁহার অস্পষ্ট মূর্তি দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে নির্মাণ পাইতেছে, আমরা তাঁহার ধারাবাহিক জীবন-চরিত জানি না।

এরূপ কথিত আছে তিনি ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শাক্ত ছিলেন, তৎপর গ্রহণীয়রূপে আক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণবমত্রে দীক্ষিত হইতে আদিষ্ট হন; তদনুসারে অমুহূর্ত ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি আরও ৩৬ বৎসর জীবিত ছিলেন; তিনি এই অবশিষ্ট জীবন বৈষ্ণব সমাজের প্রীতি ও সম্মান সংহকারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়; উভয় দ্রাবিড় 'কবিরাজ' উপাধিলাভ করিয়াছিলেন, গোবিন্দ দাসের পদসমূহ কাঁচাগড়িয়া নিবাসী চৈতন্য-সহচর বিজ হরিদাসের পুত্র হুগারক ও পদকর্তা গোকুল দাস ও শ্রীদাস দ্বারা বৈষ্ণব মণ্ডলীতে সন্মান্য গীত হইত ও গীতগুলিতে মুগ্ধ হইয়া বীরচন্দ্র প্রভৃ ও জীব গোদামী প্রভৃতি বৈষ্ণব সমাজের আচার্য্যগণ কবিকে ক্রোড় দিতেন। শেষ বয়সে কবিকে স্থায়ীভাবে স্বীয় পদ-সংগ্রহ কার্য্যে ব্যস্ত দেখা যায়, 'নির্বাসন' বসিয়া বিজ পরম্পরায়ণ। করেন একত্র অতি উন্নতিত মনে। (ডক্কিরত্নাকর ১৪-শ্লোক)।

১৫৩৭ খৃঃ * অঙ্কে শ্রীধণ্ডে গোবিন্দ দাসের জন্ম ও ১৬১২ খৃঃ অঙ্কে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। ভাষায় রচিত পদছাড়া তিনি সংস্কৃতে “সংগীতমাধব” নামক নাটক ও ‘কর্ণামৃত’ নামক কাব্য রচনা করেন। ভক্তি রসাকরে “সংগীত মাধবের” অনেক শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। এস্থলে আর একটা কথা বলা উচিত, বিদ্যাপতির কয়েকটি পদে গোবিন্দদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পদসমুহের স্বকৃত টীকায় ইহার একটি সম্বন্ধে এই বাখ্যা দিয়াছেন ;—

“বিদ্যাপতিকৃতত্রিচরণগীতঃ লক্ষা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজেন চরণৈকঃ কুহা পূর্ণং কৃতঃ।” †

পূৰ্ণএকপদ্রে ৯ বার বলরামদাসের উল্লেখ করিয়াছি; ইঁহার প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন। পদকর্ত্তা বলরাম দাস উক্ত ৯ স্থলের অন্ততঃ ৪ টির উদ্দিষ্ট কবি বলিয়া বোধ হয়। প্রেম-বিলাসের লেখক নিত্যানন্দের অপরা নাম বলরাম দাস। ইনি শ্রীধণ্ডের কবিরাজ বংশীয়, বৈদ্যজাতীয় কবি। পদকল্পতরুর কবি-বন্দনায় পদকর্ত্তা বলরাম দাসকে “কবিনৃপবংশজ” (কবিরাজ) বলা হইয়াছে; এই “বলরাম কবিরাজ” নরোত্তম বিলাস প্রভৃতি পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইনিই বৈষ্ণব বন্দনায় “সংগীতকারক” ও “নিত্যানন্দশাখাভুক্ত” বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। প্রেম-বিলাসরচক বলরামদাস ও বৈদ্য এবং স্পষ্টতই নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত। সুতরাং পদকর্ত্তা বলরাম দাস ও প্রেম-বিলাস রচক অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। ‡ বলরাম দাসের পিতার নাম আত্মারাম দাস

* ঐহুজ বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে ১৫২৫ খৃঃ (সাহিত্য ১২৯৯ আখিন)।

† এক কবির পদের সঙ্গে অন্ত কবির ভণিতা দেওয়ার পদ্ধতি আরও অনেক স্থলে দেখা যায়, যথা—“গোবিন্দ দাস কহয় মতিমত্ত। ডুলল বাহে বিজরাজ বসন্ত॥” “রাম দাসের পহি হৃদয় রসবর পৌরীদাস নাহি জানে। অখিল লোক বত ইহ রসে উন্মত্ত জামদার ভণদাসে।” (পদকল্প লভিকা)।

‡ পৌরবংশ ঐহুজ অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাপায় অনুমান করেন, ইঁহার দুইজন এক ভক্তি বংশ। কারণ বলরামের পদ প্রাঞ্জল, প্রেম বিলাসের রচনা কুটিল। বরহরিষ বরোত্তম বিলাস ও ভক্তি রসাকরের ভাষা সাধা সিদ্ধা গবোর ভাষা কিন্তু তৎকৃত পদভাষা কথিবদয়; বন্দাবন দাসের পদ ও ভাগবতের রচনা এক কথিই দেখায় একে শুনার কা। আধরা এনধকে আধেরা পৌরবংশ মহাপদের মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

ও স্বাভাবিক মৌদামিলী; পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ পুস্তকে আশ্বারাম দাস কৃত কয়েকটি পদ পাওয়া যায়।

জ্ঞানদাস সৰ্ব্বদে অতি অল্প বিবরণই পাওয়া যায়; বীরভূম জেলার একচক্রাগ্রামে (ঝালারপুর ষ্টেশনের নিকট) নিত্যানন্দ প্রভুর পিতৃগৃহ ছিল; তাঁহার দুই ক্রোশ পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রাম; তথায় ‘মঙ্গল ঠাকুরের’ বংশ বলিয়া একটি গৌসাই বংশ আছে। এই বংশেই জ্ঞান দাস জন্ম গ্রহণ করেন; ইনি নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত; শ্রীখেতুরীর উৎসবে ইঁহাকে উপস্থিত দেখা যায়, সুতরাং ইনি গোবিন্দ দাস, বলরামদাস প্রভৃতির সমকালিক কবি। কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞান দাসের একটি মঠ এখনও আছে, ঐশ্বর্য্য দাসের পূর্ণিমার সেখানে প্রতিবৎসর মহোৎসব ও সেই সঙ্গে তিনদিন ব্যাপিয়া মেলা হয়। গদাধরের শিষ্য যত্নন্দন চক্রবর্তীর কথা ইতি পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে; ইনি লুকাই ছিলেন কিন্তু মালিহাটির বৈদ্য বংশজ কবি যত্নন্দন দাস তাঁহার অপেক্ষা বেশী বয়স্ক। পদ কল্পতরুর রচনার ইহার সৰ্ব্বদে সিদ্ধি আছে,—“প্রভু স্তুতা চরণ সরোবর মধুকর জয় যত্নন্দন দাস।” প্রভু অর্থে শ্রীনিবাস আচার্য্য; যত্নন্দন শ্রীনিবাসকন্যা হেমলতার আদেশে ১৬০৭ খৃঃ অব্দে কর্ণামৃত গ্রন্থ রচনা করেন; গোবিন্দ লীলামৃতের অনেক স্থলে ও ইনি “শ্রীল হেমলতার” ওণ বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র সুবলচন্দ্রের মহাশিষ্য, যত্নন্দন ‘কর্ণামৃত’ নামক ঐতিহাসিক পদ্যগ্রন্থ, কৃষ্ণদাসকবিরাজের গোবিন্দ লীলামৃত ও রূপগোস্বামীর বিদগ্ধ মাধব নাটকের পরারাম্বাদ সঙ্কলিত করেন। কিন্তু পদকর্তা বলিয়াই ইঁহার বশঃ স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরুষোত্তমের গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস ইনি নবদ্বীপের কুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাদাস; ইনি গোরিন্দদেবের শ্রদ্ধিরেব (ব্রহ্মাবদেব) গুজারি ছিলেন। ১৭১২ খৃঃ অব্দে ইনি বংশীলিলা গ্রন্থ রচনা করেন, কর্ণামৃতের চৈতন্যচন্দ্রোদয় অষ্টকের বঙ্গীকৃতবাদ প্রকাশ করেন। পদকর্তা গৌরীদাস সঙ্কিত প্রসিদ্ধ ব্রহ্মদাস সরবেলের * ভ্রাতা; গৌরীদাসের বাড়ী নীলগুরের নিকট অধিকাগ্রাম; ইনি চৈতন্যদেবের অনুচর ছিলেন,

* ইহার দুই কন্যা বহু ও জাহ্নবীদেবীকে নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ করেন।

কথিত আছে চৈতন্যদেবের সহস্র-লিখিত স্তোত্রগ্রন্থ ইহার নিকট রক্ষিত ছিল। চৈতন্য প্রভুর তিরোধানের পর ইনি নিষকর্ষে চৈতন্যবিগ্রহ পূজা করিয়া মনস্বীপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। প্রসিদ্ধ ভক্ত সঙ্গোপকুল-ভূষণ শ্রীমানন্দ নরসীপ ভ্রমণকালে ইহাকে উক্ত বিগ্রহ পূজায় নিযুক্ত দেখিয়াছিলেন। রায়বসন্ত নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। ইনি শেষ বয়সে দ্বন্দ্বাবনবাসী হইয়া ছিলেন। জীব গোস্বামীর পত্র লইয়া গোড়ে একবার শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট আসিয়াছিলেন; ভক্তি রত্নাকরে উল্লিখিত আছে “হেনই সময় বিজ্ঞ শ্রীবসন্ত রায়। পত্নী লৈয়া আইল তেহৌ আচার্য্য সভায়।।” (১৪ তরঙ্গ)। এই বিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বোধ হয় নরহরি পুনর্বার নরোত্তম-বিলাসে বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন, “জয় জয় মহাকবি শ্রীবসন্ত রায়। সন্না মদ্য রাখা কুল চৈতন্ত লীলার।” ১২ বিলাস। সুতরাং ইহাকেই পদকর্তা ‘বিজ্ঞবসন্তরায়’ বলিয়া বোধ হয়। যশোহর নিবাসী কায়স্থ “রায় বসন্তের” নাম ইদানীং প্রবন্ধাদিতে পাঠয়া থাকি, কিন্তু কোন ও প্রাচীন পুস্তকে উক্ত পদকর্তা সম্বন্ধে প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। শ্রীখণ্ডের নরহরিসরকার মহাপ্রভুর একজন অমুচর ছিলেন; ইনি নীলাচলে চৈতন্যদেবের অতি অমুরক্ত সঙ্গী ছিলেন; কথিত আছে নরহরি চির-কৌমার-ব্রত পালন করেন। নরহরি সরকার প্রসিদ্ধ লোচন দাসের গুরু ও ‘চৈতন্য মঙ্গল’ রচনার উপদেষ্টা ছিলেন। একটি সংস্কৃত বন্দনায় জানা যায়, নরহরির বর্ণ বিষ্ণু গৌর ও তাঁহার পিতার নাম নারায়ণ ছিল। নরহরি গৌর লীলার পদ রচনার প্রবর্তক বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে আদৃত; ইহার পথ অনুসরণ করিয়া বাসুদেব ঘোষ যশস্বী হইয়াছেন। নরহরি সরকার ১৫৪০ খৃঃ অব্দে গুপ্ত হন। বসু রামানন্দ কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ মালাধর ব্রহ্মর পৌত্র; ইনি দ্বারকা নগরী হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। কথিত আছে মহাপ্রভু ইহাকে মিত্র সর্বাধন করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ রায়রামানন্দ উড়িয়া রাজ প্রতাপরুদ্রের একজন উচ্চতম কর্মচারী ছিলেন; ইনি বিখ্যাত ‘জগদ্বৈবভূত’ নাটক রচনা করেন; চৈতন্যদেব ইহার মর্শ্বনেক্ষর দ্বিজে বিদ্যমানগর গিয়াছিলেন। ইনি বসিক ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে প্রসিদ্ধ। ১৫৩৪ খৃঃ অব্দের মাঘমাসে রায়রামানন্দের তিরোধান হয়। নরহরিচন্দ্রস্বামী

পদকর্তা যনশ্রাম বলিয়া পরিচিত কিন্তু “কবি কৃপাংশজ কুবল-বিকিত বল
জ যনশ্রাম বলরাম।” পদ কল্পতরুর এই শ্লোক দ্বারা জানা যায়, যনশ্রাম
নামে অপর একজন পদ-কর্তা কবিরাজ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।
শ্রীধর পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তি-নিধিমালায় অনুমান করেন, এই
যনশ্রামই পদকর্তা; নরহরি চক্রবর্তীর অপর নাম যনশ্রাম, হইলেও তিনি
শেষোক্ত নামে কোন ও পদ রচনা করেন নাই। * ভক্তি রত্নাকরে
“যনশ্রাম” ভণিতার পদ পাঠ করিলে এইমত সমর্থন করা যায় না।

এইসব পদকর্তা ছাড়া, বিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণীর শিষ্য বংশীবন্দন ঠাকুর,
শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য বৃন্দারী নিকটস্থ রাধানগরবাসী বংশীদাস,
বংশীদাসের পুত্র চৈতন্য দাস, অষ্টৈশিষ্য পরমেশ্বর দাস, রামচন্দ্র
কবিরাজের শিষ্য হরিরাম আচার্য প্রভৃতি পদকর্তা উল্লেখ যোগ্য।
বন বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ রাজা বীর হাম্বির † ও মানভূমের রাজা নৃসিংহ দেব
পদকর্তা বলিয়া বিখ্যাত। নীলাচলবাসী শিখি-মাহিতীর ভগ্নী (প্রসিদ্ধ ও
রসিক ভক্তের ২ জন) মাধবীর পদ ও পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়।

এখানে বলা উচিত যাহারা বড় বড় গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ
করিয়াছেন অথবা যাহাদের রচিত পদাপেক্ষা ভক্তিরসময় জীবনই বেশী
সুখভিন্ন, যথা,—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস, ত্রিলোচন দাস ও নরহরি
চক্রবর্তী প্রভৃতি গ্রন্থকার ও শ্রীনিবাস আচার্য; নরোত্তম দাস ও শ্রামানন্দ
প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজন,—তাহাদের প্রসঙ্গ পরে প্রদত্ত হইবে।

এই যুগের পদকর্তাগণ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি হইতে নিম্নে স্থান পাইবার
যোগ্য, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকটী উৎকৃষ্ট কবি আছেন; এই দলে
গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, বলরাম দাস, রায়শেখর, যনশ্রাম, রায়বসন্ত,
বহুমান, বংশীবন্দন এবং বাহুবোধ প্রভৃতি। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের
কবিতার প্রেম ভিন্ন অজ্ঞতা নাই কিন্তু গোবিন্দ দাস প্রভৃতির পদে প্রেমের
সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত হইয়াছে, ভক্তির সঙ্গে নির্মলতা এবিষ্ট হর, কিন্তু
কাদম্বার হাল হর; প্রেমের অস্তিত্ব নষ্ট আলিসন করিলে প্রাণ ছুড়ার,
অস্তিত্বে অস্তিত্ব মূর্তির পদ স্পর্শ করিতে পারিলে কৃতার্থ জ্ঞান হয়,

ভক্তিরসি মহাপর এইমত প্রকাশ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন।

ভক্তি রত্নাকরে ইহার দুইটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

সুতরাং প্রেম অপেক্ষা ভক্তিতে উদ্দিষ্টত্বই একটু দূরে স্থাপিত হয়। ভক্ত তাঁহার আরাধ্যকে না পাইলে আবার তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইল, প্রেমিকের ক্ষত তাঁহার রাগ ও মান করিবার শক্তি নাই—কিন্তু আত্ম সমর্পণের ইচ্ছা আছে। নিম্নোক্ত পদটিতে প্রেম অপেক্ষা তপস্যার কণ্ঠ বেশী আছে :—

“বীহা পহ অরণ চরণে চলি বাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মধু পাত। যো সন্নোষকৈ পহ নিতি নিতি বাহ। হামভরি সলিল হোই তথি মাহ। যো মরণে পহ বিজ মূখ চাহ। মধু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ। যো বীজনে পহ বীজই গাত। মধু অঙ্গ তাহি হোই মুহুবাৎ। বীহা পহ ভরমই জলধর শ্রাম। মধু অঙ্গ পগন হোই তছু ঠাম। গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন গোরি। সো মরকত তছু তোহে কিএ ছোড়ি।”

বৈষ্ণবকবিগণের প্রেম পণ্যদ্রব্য নহে। দানই এ প্রেমের ধর্ম, দানই এ প্রেমের সুখ; প্রতিদান চাহিয়া এ উদ্যানে কেহ প্রবেশাধিকার পায় না, ফুলের সুরতি বিনামূল্যে বিতরিত হয়; চাঁদের জ্যোৎস্না, মল্লর সমীর ক্রয় বিক্রয়ের সামগ্রী নহে; প্রাতঃ সূর্য্য রশ্মি শীতকালে কত মধুর, কিন্তু শাল বনাতির মত তাহার মূল্য নাই; বনের কুন্দ যুধি, জাতি, গোলাপ, গৃহ-সুন্দরীগণ হইতে কম সুন্দর নহে কিন্তু উহাদের পণে বিক্রয় হয় না; এ প্রেমও তেমনি অমূল্য। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় প্রেমিক এ প্রেম-ডরে উন্মত্তভাবে যাহা খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহা প্রতিদান নহে,—

“সো যদি সিনান লাগিলা ঘাটে, আর ঘাটে পিয়া নায়। মোর অঙ্গের জল, পরশ লাগিরা, বাহ পশারিয়া রয়। বসনে বসন লাগিবে বলিয়া একই রজকে দেয়, আমার নামের একটি আখর, পাইলে হরিবে লেয়। ছারায় ছারায় লাগিবে বলিয়া, কির কতই পাকে। আমার অঙ্গের বাতাস বেদিকে সে দিন সে মুখে থাকে। যনের কাকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে, পায়ের সেবক রায়শেখর কিছু জানে অহুমান।”

এই অপরূপ ত্রুতের এই অপূর্ণ কথা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে প্রেম ও সৌন্দর্য্য পূজার বিশেষতাল দেখা দিয়াছিল; বিরল-ক্রম নগর-রাজিতে বসন্তের সৌষ্ঠব এখন বিকাশ পায় না; এখন বসন্ত বনে আসে—কোকিলের জন্য, রক্ত-কিশলয়ের জন্য, বনকুরঙ্গ ও কুরঙ্গীর জন্য; মনুষ্য সমাজে এখন বিজ্ঞানের শীতল বায়ু কবিশ্বের মূল-পত্রের সংস্কার করিয়া সত্যের তহি পত্রের দেবাইতেছে; এখনকার প্রেমের কবিতা পঞ্চদশ-শতাব্দীর পুতিমাতে পর্য্যবসিত; সেরগ মধুর কথা এখন আর

লেখা হইবে না ; সেইসব সুন্দর চিত্র লেখা বিজ্ঞানের শীতল বীহারিকা-
কল্পিত হইয়া এখন চিত্র অংশট হইয়া দিয়াছে, এই সুলভরূপবস্তুর
কল্পিত লুপ্তবী পূর্বে ও বেক্স, এখনও অবশ্য সেইরূপ সুন্দর আছে—কিন্তু
আমরা ইহাকে সুন্দর দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

পদকর্তাগণের মধ্যে গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতির অনুসরণ করিয়াছেন।
তাঁহার রচিত পদে বিদ্যাপতির রস-পূর্ণ উচ্ছ্বাসের অপ্রকৃষ্ট প্রতিবিম্ব
খড়িলছে ; মৈথিল কবির পদে অনুভবের তীব্রতা ও উদ্দীপনাশক্তি বেশী
কিন্তু গোবিন্দের পদে স্বার্থত্যাগ ও পবিত্রতা অধিক, কবিশ্বেশ্বর হিসাবে
গোবিন্দ বিদ্যাপতি হইতে নিম্নে দাঁড়াইবেন কিন্তু বহু নিম্নে নহে। বিদ্যাপতি
বেঙ্গল গোবিন্দ দাসের আদর্শ, চণ্ডীদাস সেইরূপ জ্ঞান দাসের আদর্শ ;
জ্ঞানদাসের কতকগুলি পদ চণ্ডীদাসের চরণ-ডাঙ্গা ; তাহা দৃষ্টে
মনোহর ও ভাবসমৃদ্ধ মূলের ক্ষয় ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া বলিয়া গ্রহণ করা
যায় ; জ্ঞানদাস বর্ণিত নায়কের প্রেম-প্রকাশ-চেষ্টা নানা বিচিত্র বর্ণ পাতে
সুন্দর এবং সেই সৌন্দর্য্য সততই নির্মল অশ্রুজলে উজ্জল হইয়াছে।
বলরামদাস কাঁহাকে ও আদর্শ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না,
চণ্ডীদাসের জায় এই কবি ও স্বভাবের সংস্করণ, চণ্ডীদাসের ন্যায় সরল
বক্তা কিন্তু ততদূর গভীর নহেন। তাঁহার পদ সরল প্রেমের সুন্দর
অভিব্যক্তি। গোবিন্দ দাস ও জ্ঞানদাসে, জ্ঞানদাস ও বলরাম দাসে
শক্তির পার্থক্য আছে ; যে ক্রমে এই সমালোচনা লিখিত হইল, এ পার্থক্য
সেই ক্রমে, কিন্তু তাহা কেশ প্রমাণ।

বৈষ্ণব কবিগণের পদ প্রথম সংগ্রহ করেন, বাবা আউল মনোহর দাস ;
হুগলী জেলার বদনগঞ্জে ইঁহার সমাধি আছে ; কথিত আছে ইনি জ্ঞানদাসের
বন্ধু ছিলেন ও বোম্বাইয়ে অতি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন ; ইঁহার
রচিত সংগ্রহের নাম পদ-সমুদ্র । * খৃষ্টীয়দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে এই সংগ্রহ

* পদ সমুদ্র পুঁথি প্রকৃত পণ্ডিত হারাধরদত্ত ভক্তিচিনি মহাপুরের নিকট আছে ;
কলিকাতার কোম লোকালয় ২০০০ টাকা মূল্যে এই গ্রন্থের পরিচালিত চাহিয়াছিলেন,
কিন্তু ভক্তিচিনি মহাপুর ডায়া সেন নাই ; বৃদ্ধ বয়সে তিনি এই পুস্তক নিজের তত্ত্বাবধানে
চালাইয়া পাঠ্যবিশেষ বিতরণ করিষেন, ইহাই তাঁহার সম্বন্ধ ; এখন তাঁহার বয়স ৭২ ;
আজ্ঞা করিয়া পুস্তকের বৃদ্ধকরণ বিলম্ব করিয়াছেন, এরূপ অর্থ সঙ্গতি নাই,—কিন্তু এই

সঙ্কলিত হয়। ইহার পদ-সংখ্যা ১৫০০০ ; বোধ হয় পদসমুদ্রের অব্যবহিত পরেই ত্রিনিবাসআচার্যের পৌত্র রাধামোহনঠাকুর পদাসুতসমুদ্র সঙ্কলন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরু প্রণয়ন করেন। পদকল্প-লতিকা গোবীন্দমোহনদাসকৃত ; গীতচিন্তামণি হরিবল্লভকৃত ; গীতচন্দ্রোদয় নরহরিচক্রবর্তীকৃত ; পদচিন্তামণিমালা প্রসাদদাসকৃত ; ইহা ছাড়া লীলাসমুদ্র, পদার্ণবসারাবলী, গীতকল্পতরু, প্রভৃতি বহুবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ আছে।

পদ-সমুদ্র অতি বিরাট গ্রন্থ,—রিচার্ডসনের সিলেক্সনের ন্যায়। ছাপা হইলে উহা বড় বড় পুস্তকাগারে শোভা পাইতে পারে। রাধামোহন ঠাকুরের সংগ্রহপুস্তকের অনেকাংশ তিনি স্বকৃত পদ দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। কতকগুলি বাঙ্গলাপদ ও ব্রিজবুলির সংস্কৃত টীকা এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। গোবীন্দমোহনদাসের সঙ্কলন দৃষ্টে বোধ হয়, ভাল ভাল পদ জ্ঞানমাত্রে পরিচয় পাওয়ার শক্তি ইহার বেশ ছিল, পদ-সন্নিবেশ ও বড় সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু সংগ্রহকারকের দৃষ্টি গাঢ়ভাবাপেক্ষা সুললিত শব্দটির উপর বেশী এবং পুস্তকখানা বড় ক্ষুদ্র ; মাত্র ৩৫১ পদে সম্পূর্ণ। মোটের উপর বৈষ্ণব দাসের সংগৃহীত পদ-কল্পতরুই ব্যবহার পক্ষে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার পদ সংখ্যা ৩১০১ ; পদাসুতসমুদ্র ইহা হইতে অনেক ছোট পুস্তক, অথচ সংগ্রাহক তন্মধ্যে ৪০০ টির ও অধিক স্বকৃত পদ দিয়াছেন, বৈষ্ণবদাস স্বীয় বিরাট সংগ্রহে মাত্র ২৭ টি স্বকৃত পদ দিয়াছেন, সে কয়েকটি পদ ও বন্দনা-নৃতক স্মরণ্য সংগ্রহগ্রন্থে অপরিহার্য। বৈষ্ণবদাস এই সংগ্রহ সঙ্কলন করিতে যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা প্রবীন ব্যক্তির উপযুক্ত। পদকল্পতরু ৪ শাখায় বিভক্ত ; প্রথম শাখায় ১১ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ২৬৫। দ্বিতীয় শাখায় ২৪ পল্লব, মোট পদ-সংখ্যা ৩৫১। তৃতীয় শাখায় ৩১ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ২৬৫ ; চতুর্থ

• পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ ভিন্ন তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের আর লক্ষ্য নাই। বঙ্গদেশে বঙ্গভাষার উন্নতি করে এইরূপ লোক দেখা যায়—ইহা ভাবী উন্নতির শুভ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয় ; এই কার্য অর্থাভাবে অসম্পূর্ণ থাকিলে তাহা আমাদের জাতীয় মনস্তাপের কারণ হইবে ; যে কল্যাণ ব্যক্তি এই সাধু কার্যে সহায় হইবেন, বঙ্গদেশের সাহিত্যে তাঁহার সেই বদান্ততার স্বাক্ষর চিরদিন উল্লিখিত থাকিবে।

শাখার ৩৬ পত্রব, মোট পদসংখ্যা ১৫২০। ইহার কোন পত্রবে কত পদ তাহা ও পুস্তকের শেষভাগে নির্দিষ্ট আছে। প্রকাশিত পদকল্পতরু অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়; বৈষ্ণব দাস তৎকৃত স্থতীপত্রে নির্দেশ করিয়াছেন, ৪র্থ শাখায় ২৬ পত্রবে বিদ্যাগতি ও চতুর্দাসের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে উক্ত পত্রটি বর্জিত হইয়াছে; এরূপ আরও কয়েক স্থল স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ দেখা যায়। স্থচিনির্দিষ্ট ৩১০১ পদের মধ্যে মুদ্রিত পুস্তকে মাত্র ৩০৩০টি পদ দৃষ্ট হয়। যে অংশটুকু ঐতিহাসিক, হিন্দুস্থানবাসীগণের তাহা লুপ্ত করিবার একটা বিশেষ শক্তি আছে। পদকল্পতরুর আগাগোড়াই সুন্দর সুন্দর পদবিশিষ্ট নহে। হোমার ও মধ্যে মধ্যে নিদ্রালস হন, বৈষ্ণব কবিগণের প্রতিভাশ্র ও বিরামচিহ্ন আছে, অনেক স্থল পুনরাবৃত্তি-দোষ-দুষ্ট; কিন্তু পদকল্পতরুর প্রতিপত্রই এমন দু'একটি ছত্র বা পদ আছে, যাহা পড়িলে বোধ হয় কবি বাগ্বেবীর কলম কাড়িয়া লইয়া তাহা লিখিয়াছেন, পাঠকের নয়নাশ্রের উপর সেই সব পদের অঞ্চল আধিপত্য।

বিদেশী ভাবাপন্ন পাঠক বর্ণমালামুক্রমে পদগুলি সম্বিষ্ট হয় নাই, দেখিয়া বিরক্ত হইতে পারেন। পূর্বে লিখিয়াছি এই পদাবলীসাহিত্য ভালবাসার বিজ্ঞান; ভালবাসারহস্তের এরূপ গূঢ়ভেদ আর কোনও দেশের সাহিত্যে নাই। লতা যে ক্রম ও কৌশলে তরুকে জড়াইয়া বশীভূত করে, এই বিজ্ঞানে সেই ক্রম লিখিত হইয়াছে। প্রেমের নানা লীলা হইতে অলঙ্কার-শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ সূত্র রচনা করিয়াছেন; অলঙ্কার গ্রন্থে ৩৬০ রূপ নাস্তিক-ভেদ বর্ণিত আছে; এই ভেদপ্রকাশকসূত্রে এক একটি চিত্র নির্দেশক রেখাপাত করা হইয়াছে, সেই রেখার উপর কবিগণ তুলি দ্বারা সজীব বর্ণ ফলাইয়াছেন; এই সূত্রগুলি অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সূত্রের ম্যায় কঠোর নহে, যুবকগণ তৎপাঠে আনন্দ অমুভব করিবেন সন্দেহ নাই; যথা,—নায়িকা স্বীয় সৌন্দর্য্য-মর্পে মানিনী হইয়া কর্ণোৎপল দ্বারা নায়ককে তাড়না করিতেছেন, এই চিত্র প্রগল্ভার; তমালকুঞ্জে অধীর নায়িকা প্রণয়ী-সঙ্গ অপেক্ষায় পত্রকল্পনে আশাবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছেন এই চিত্রের নাম বাসকসজ্জা; এই অপেক্ষা যখন আক্ষেপে পরিণত হইতেছে, তখন বিপ্রলঙ্কা; মানিনী খণ্ডিতার বিষাদও রোষ-ক্ষীতা; প্রোষিত ভর্তৃকা-ভাব সর্গশ্রেষ্ঠ; এখানে মান ও ক্রোধ অশ্রুজলে মগ্ন; এখানে নায়িকার মূর্তি

বড়ই সুন্দর, কারণ “যা কান্ডারাঃ মুখে চিত্তার বিরহে সা মাধুরী মাধুরী ।”
এইরূপ আরও অসংখ্য সূত্র আছে ।

বঙ্গীয় পদসমূহে এইসব লীলাময় ভাব ভক্তি দ্বারা খোঁত হইয়া স্বর্গীয়
ভালবাসার উপাদান হইয়াছে, তাহাদের উদ্ধোধিত গতি ও নিকাম আবেগ
বিলাসকলা হইতে স্বতন্ত্র ।

বলা নিম্নায়োজন সংগৃহীত পদগুলি পূর্বোক্ত সূত্রানুসারে সন্নিবিষ্ট
হইয়াছে । আমরা এস্থলে পদকল্প-লতিকা হইতে সংগ্রহ নৈপুণ্যের কিছু
নমুনা দিতেছি ; পাঠক দেখিবেন, সংগ্রাহক নানা কবির পদ নানাত্বান
হইতে সংগ্রহ করিয়া কেমন সুন্দরভাবে যোজনা করিয়াছেন, বিন্যাস-
কৌশলে একধানা সম্যকভাবে চিত্র কেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, নানা কবির
বর্ণ দ্বারা যেন একই বর্ণ কলিত হইয়াছে ;—

মুরলী শিক্ষা ।

কামোদ । বহুদিনের সাথ আছে হরি । বাজাইব মোহন মুরলী । তুমি লহ মোর
নীল সাড়ী । তব পীতধরা দেহ পরি । তুমি লহ মোর গজমতি । মোরে দেহ তোমার
মালতী । ঝাঁপা খোঁপা লহ খসাইয়া । মোরে দেহ চুড়াটি বাধিয়া । তুমি লহ সিন্দূর
কপালে । তোমার চন্দন দেহ ভালে । তুমি লহ ককণ কেওড়ি । তোড় তাড়বালা দেহ
পরি । তুমি লহ মোর অভরণ । মোরে দেহ তোমারি ভূষণ । শুন মোর এই নিবেদন ।
শুনি হরষিত বৃন্দাবন ॥ ১ ॥

কানোড়া । মুরলী কর্ত্তাও উপদেশ । যে রক্তে যে ধনি উঠে জানহ বিশ্বের । কোন্
রক্তে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম । কোন্ রক্তে রাধা বলি লয় আমার নাম । কোন্
রক্তে বাজে বাঁশী হুললিত ধনি । কোন্ রক্তে কেঁকা শব্দে নাচে ময়ূরিনী । কোন্ রক্তে
রসালে ফুটয় পারিজাত । কোন্ রক্তে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ । কোন্ রক্তে বড়বড় হর
এক কালে । কোন্ রক্তে নিধুবন হর ফুল কলে । কোন্ রক্তে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় ।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্রাম রায় । জ্ঞান দাস কহে হাসি হাসি । রাধা মোর বলি
বাজিবেক বাঁশী । ২ ॥

কামোদ । কোতুকে মুরলী শিখে রসবতী রাধা । মদন মোহন মনোমোহিনীর
সাধা । প্রেমরঙ্গে শ্রাম-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া । মুরলী পুরয় রাই জিতজ হইয়া
বিনা তন্ত্রে, বিনা মন্ত্রে কত কুক দেই । বাজে বা না বাজে বাঁশী পিরাখু চাই ।
রাধার অধরে বেসু ধরে বনমালী । পানি পঞ্চদ ধরি লোলয় অঙ্গুলি । কানু কোলে
কলাবতী কলির বিলাসে । দুহকল্প দেখি শিবানন্দ ভাবে ॥ ৩ ॥

বেহাগ । আজু কে গো মুরলী বাজায় । এত কড়ু নহে শ্রাম রায় । ইহার মৌরবরণে

করে আলো। চূড়াটি বাঁধিয়া কেবল ছিল। তাঁহার ইন্দ্রনীলকান্ত তনু। এত নহে নল
হৃত কানু। ইহার রূপ দেখি নবীন আরতী। মটবর বেশ পাইল কতি। বনমালা
গলে দোলে ভাল। এনাবেশ কোন দেশে ছিল। কে বানাইল হেনরূপ ধানি। ইহার
বামে দেখি চিকণ বরণী। নীল উন্নয়নী নীলমণি। হবে বুঝি ইহার সুলক্ষণী। সখীগণ করে
ঠাঠাঠারি। কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী। কোথা গেল কিছুই না জানি। আজু কেনে দেখি
বিপরীত। হবে বুঝি দোহার চরিত। চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে। এরূপ হইবে কোন
দেশে। ৪।

পদের অতল রত্নাকর হইতে ভিন্ন ভিন্ন নামাক্ত এই চারিটি
রত্নের উদ্ধার করিয়া এরূপ সুন্দর সমন্বয় করাতে সংগ্রাহক একটি উৎকৃষ্ট
মণিকারের সম্মান পাইবার যোগ্য।

পদাবলী সাহিত্য হইতে আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি; বঙ্গদেশের
ভক্তির অবতার চৈতন্যদেবের জীবন একটি গীতির ন্যায়; এদেশের
গীতি-কবিতাই উৎকৃষ্ট কবিতা; যে জাতি উদ্যমপূর্ণ, উন্নতি পথে ধাবিত,
তাঁহাদের মধ্যে পুরুষকারের চিত্র জীবন্ত; সে দেশে নরনারীজীবন নাটকীয়
চরিত্রের গূঢ়সৌন্দর্য ও মহত্ব ব্যক্ত হয়; রামায়ণে ও মহাভারতে
একদা হিন্দুর সেইরূপ চরিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু অবস্থার
ক্রীড়াশীলচক্রে পতিত ছিন্ন ভিন্ন জাতির অশ্রুই সঞ্চল; সেই অশ্রু কখনও
দুঃখ জ্ঞাপক হইয়া মর্শ্মস্পর্শী হয়, কখনও বা ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত
হইয়া গীতি-কবিতার মূহু উপাদানের মধ্যে ও এরূপ মহত্ব ও সৌন্দর্যের
ছায়া দেখাইতে পারে, যাহাতে সেই দুঃখে দয়া করার অধিকার হয় না,
সে দুঃখ ধনাঢ্য দুঃখ নামে বাচ্য হইবার যোগ্য হয়।

এই গীতি কবিতাগুলি আমরা ইংলণ্ডের ও আমেরিকার সাহিত্য
প্রদর্শনীতে লইয়া দেখাইতে পারি, আত্মগরিমার রাজ্যে, আত্মবিসর্জনের
কথা ওনাইয়া মুদ্র করিতে পারি।



(ক) গোবিন্দদাসের করচা।

(খ) চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত।

(গ) ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, প্রেমবিলাস প্রভৃতি।

(ক) গোবিন্দদাসের করচা।

মহাপ্রভুর মহিমাধিত আদর্শ হইতে বঙ্গসাহিত্যে জীবন-চরিত লেখার প্রথা প্রবর্তিত হয়। মহুয্যের নৈসর্গিক চরিত্র এক সময়ে শাস্ত্রীয় যবনিকার আড়ালে পড়িয়াছিল, তাই চৈতন্যদেবের পূর্বে শাস্ত্রীয় অমুবাদ ও শাস্ত্রোক্ত ধর্ম ভিন্ন অত্র কিছুই অবতারণা হয় নাই। মহাপ্রভু নিজের সুন্দর ছবি দেখাইয়া বুঝাইলেন, মহুয্য-মূর্তির সৌন্দর্য্যপাতেই শাস্ত্র উজ্জ্বল হয় ও মহুয্য শাস্ত্র হইতে মহত্তর। পুস্তকে যে সকল ভাব ও চরিত্রের কথা বর্ণিত হয়, মহাজনগণের জীবনে তাহা জীবন্তভাবে ক্রিয়া করে।

জীবন-চরিত সাহিত্যের সূত্রপাত হইল; বঙ্গদেশীগণ পৌরাণিক চরিত্রগুলির দেবদত্ত অমামুখী শক্তির বিষয় অবগত হইয়া মামুখীগুলির প্রতি অবহেলা করিতে শিখিয়াছিল; সরলতা দয়া-ভক্তি-রঞ্জিত ছবিই প্রকৃত পূজনীয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অমামুখী বিরাট হু বা বহুল প্রকৃত শোভা বা মহত্ত্ব দান করিতে পারে না—একথা বাঙ্গালী জনসাধারণ তখনও ভাল করিয়া বুঝে নাই; তাই চৈতন্যদেবের ভক্তের মধ্যে অনেকে তাঁহার চরিত্রে অলৌকিক বর্ণপাত করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন সুতরাং শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ চৈতন্যদেবের জীবনের অমামুখী প্রভাব প্রতিপন্ন করিতে অক্ষম হন নাই।* সে সময়ে ধর্ম প্রচারের

* ১০০ বৎসর হইল কবি প্রেমানন্দ দাস চৈতন্যদেবের অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যে সব প্রমাণ উদ্ধার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইসব প্রমাণসহ কবির অস্বত্বলিখিত কাগজ খানা আমি পাইয়াছি; তাহার কতকংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—বামনপুরাণে ব্যাসঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যান্—“অহমেব কচিৎপ্রকৃ সন্ন্যাসাশ্রমমাজিতঃ। হরিতত্ত্বং ব্রাহ্মিন্যে কলোপাগহতাম্ভরান্।” বায়ুপুরাণে, “দ্বিবিজ্ঞাতুবিজ্ঞায়কং জায়কং ভক্তিরূপিনঃ। কলো-সংকীর্ণনারঙ্গে ভবিষ্যামি শচীহতঃ।” মন্ত্র পুরাণে, “শুদ্ধগৌরঃ হৃদীর্ঘাঙ্গো গন্ধাতীক্ষ্মসুভবঃ। দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলি-যুগে।” এইরূপে গরুড় পুরাণ, কুর্ধপুর্ধপুর্ধ, বিষ্ণুপুরাণ, দেবীপুরাণ, স্বল্পপুরাণ, বাস্কীকপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, বৃহৎবায়ল প্রভৃতি অনেক পুরাণের নাম করিয়া ন্যাক উদ্ধৃত হইয়াছে; এসব প্রেমানন্দদাস উদ্ধৃত করিয়াছেন, পূর্বোক্ত পুরাণগুলির নবসংস্করণে সেগুলি খুঁজিয়া না পাইলে পাঠক আমাকে ধায়ী করিবেন না।

জন্ত সেরূপ করা আবশ্যক ছিল। চৈতন্ত্যদেবের জীবন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গীগণের কেহ কেহ নোট রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই নোটও জনশ্রুতি অবলম্বনে ও তাঁহার কোন কোন সঙ্গীর কথিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বন্দাবনদাস চৈতন্ত্যভাগবতের জায় উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও পরে কৃষ্ণদাস চরিতামৃতের জায় উজ্জল ভক্তিমিশ্র দর্শনাত্মক চরিতাখ্যান প্রণয়ন করেন। নোটগুলিকে সাবেকী বাদলায় করচা বলিত; ইহাদের মধ্যে মুরারি গুপ্তের করচা থানা বিশেষ প্রসিদ্ধ, কিন্তু উহা সংস্কৃতে লিখিত সুতরাং এপ্রবন্ধে উল্লেখ যোগ্য নহে।

করচা লেখকগণের মধ্যে গোবিন্দদাস একজন। ইনি উচ্চ-শিক্ষিত ছিলেন না; যে হুই বৎসরের বৃত্তান্ত লইয়া ইনি স্থায়ী পুস্তক লিখিয়াছেন, সে হুই বৎসর ইনি দিবা রাত্র মহাপ্রভুর পরিচর্যা করিয়াছেন, কখনও সঙ্গ-বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার লেখায় এমন একটু সারল্যমাথা সত্য-প্রিয়তা আছে, যাহাতে করচাখানা ফটোগ্রাফের জায় সুন্দর ও বিস্তৃত হইয়াছে। মনুষ্য-বর্ণিত ইতিহাস কখনও পূর্ণ ও অবিসম্বাদীভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, তবে গোবিন্দের করচায় ঐ সব গুণ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইবে।

এই পুস্তকের রচনা নানাবিধ গুণাঙ্কিত; যাহার চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তি ও বিশ্বাসের ভাবমণ্ডিত অশ্রুসিক্ত অনুচর এই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার এরূপ প্রেমমধুর চিত্র-লেখা আর কোনও পুস্তকে লিখিত হয় নাই। বন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাসকবিরাজ মহাপ্রভুকে দেখেন নাই; জনশ্রুতি, ভক্তগণের বর্ণিত বৃত্তান্ত ও করচার প্রতিবিম্ব হইতে তাঁহার উজ্জল ছবি উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দ তাঁহার রূপ অমু-ক্ষণ দর্শন করিয়াছেন ও সেই রূপমাধুরী অমুকুণ ধ্যান করিয়াছেন; তাঁহার করচা স্বভাব হইতে এক পর্যায় অন্তর কিন্তু পরবর্তী চরিতগুলি স্বভাব হইতে হুই বা বহুপর্যায় দূরে; গোবিন্দ যে ছবিখানা দেখিতে পাইতেন, তাহা শাস্ত্রজ্ঞানের অনুজ্জল কৃত্রিমতায় জড়িত হইয়া রূপান্তরিত হয় নাই। অশিক্ষিত সরল ভূত প্রভুর ধরম হইখানা ক্ষুদ্র করিয়া কিছু প্রসাদ ভক্তগণের লালসার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেন; তিনি বাগ্বেবীর বরে চিত্র-বশবী হইয়া ব্যাস ও বাম্বীকির কলমের উত্তরাধিকারী হইবেন, এইরূপ কোন অহঙ্কারের ছায়া তাঁহার রচনার আবেগপূর্ণ সারল্য আবৃত

করিতে পারে নাই; আমরা নানা কারণে এই পুস্তকখানা চৈতন্তদেব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করি।

১৫০৮ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানস্থ কাঞ্চননগরবাসী শ্রামদাসকর্মকারের পুত্র গোবিন্দকর্মকার জ্যৈষ্ঠক ‘মূর্থ’, ‘নিষ্ঠূর্ণ’ প্রভৃতি মধুর শব্দে তিরস্কৃত হইয়া অতিরাগে গৃহত্যাগী হন। পরবর্ষের মাঘ মাসের প্রথমার্দ্ধে চৈতন্তদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, স্মরণ্য সন্ন্যাস গ্রহণের কিঞ্চিদধিক একবর্ষ পূর্বে গোবিন্দ চৈতন্তপ্রভুকে প্রথম দর্শন করেন, তখন প্রভু মানার্থ গঙ্গাতীরে; গোবিন্দ দেখা মাত্র মুগ্ধ হইল।

“কটিতে গামছা বাধা অপূর্ব দর্শন। সঙ্গে এক অবধূত প্রদত্ত বদন। * * * অবশেষে আইলা তথি অশেষ গোঁসাই। এমন তেজস্বী মূই কভু দেখি নাই। পুরুষ পক্ষ দাড়ী বড়মোহিনিয়া। দাড়ী পড়িয়াছে তার হৃদয় ছাড়িয়া। * * * আশ্চর্য্য প্রভুর রূপ হেরিতে লাগিলু। রূপের ছটায় মুক্তি মোহিত হইলু। * * * ঘাটে বসি এই লীলা হেরিলু নয়নে। কি জানি কেমন ভাব উপজিল মনে। কদম কুহুমসম অঙ্গে কঁটা দিল। ধরধরি সব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। ঘামিয়া উঠিল দেহ তিতিল বদন। ইচ্ছা অশ্রুজলে মুক্তি পাখালি চরণ।”

প্রভুর দর্শনেই গোবিন্দ পূর্বরাগের ভাবাবেশ অনুভব করিলেন। চৈতন্তদেব গোবিন্দকে আশ্রয় দিলেন; গোবিন্দ পেটুক ছিলেন বলিয়া কাহারও ধারণা হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পেটুকের ততদূর সারল্য থাকা সম্ভবপর নহে; গোবিন্দের যে ভাব যখন মনে হইয়াছে অকপটে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন; অনেক সাধু মহাজন ও সে ভাবে আপনাকে পাপী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদের স্বকীয় কঠোর সমালোচনা যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা নিষ্ঠুরতার কার্য্য; গোবিন্দের সম্বন্ধে ও সেই কথা বলা হইতে পারে। দামোদরতীরবাসী কাশীমিত্রের বাটীতে তিনি “অষ্টখানা ককলার ভাজি” ও নারায়ণ গড়ে “পাঁচ গুণা লাড়ু” খাইয়া ছিলেন; ইহা বোধ হয় বড় একটা অলৌকিক পেটুকেষ্বর পরিচায়ক নহে। গোবিন্দ যখন বাহ্য দেখিয়াছেন, তাহা দেখিতে দেখিতে নোট করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেক কথাই নূতন নূতন চিত্র লক্ষিত হয়;—চৈতন্ত-প্রভুর বাড়ী সম্বন্ধে :—

“গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর। পাঁচখানা বড় ঘর দেখিতে হুন্দর।

শান্তমুখী শচীদেবী অতি বর্ধকায়। নিমাই নিমাই বলি সঙ্গ সুকরায়। বিকুশিলা দেবী

হন প্রভুর ঘরপী। প্রভুর সেবার বাস্তব দিবস রজনী। লজ্জাবতী বিনয়িনী যুহু যুহু ভাব।
মুই হইলাম গিয়া চরণের দাস।”

গোবিন্দের করচা হইতে আমরা চৈতন্তদেবের একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ
বৃত্তান্ত সংকলন করিয়া নিম্নে প্রদান করিলাম। ছুটনোটে আমরা স্থানগুলি
সম্বন্ধে মন্তব্য দিয়া যাইতেছি।

কণ্টকনগর (কাঁটোয়া) হইতে বর্ধমান; কাঞ্চননগরে গোবিন্দের স্ত্রী
তাঁহাকে ফিরাইয়া লইতে আসে; দামোদর নদ পার হইয়া কাশী মিত্রের
বাটীতে অবস্থান; তথা হইতে হাজিপুরে, হাজিপুর হইতে মেদিনীপুরে;
এস্থলে কেশবসামন্ত নামক ধনী ব্যক্তি মহাপ্রভুকে কটুক্তি করে;
মেদিনীপুর হইতে নারায়ণ গড়ে, তৎপর জলেশ্বরে, স্নবর্ণরেখা পার হইয়া
হরিহরপুরে, হরিহরপুর হইতে বালেশ্বরে সেস্থান হইতে নীলগড়ে, বৈতরণী
নদী পার হইয়া মহানদীর তীরে গোপীনাথদেব ও সাক্ষী গোপাল দর্শন,
নিংরাঙ্গের মন্দির দর্শন, ইহার পর আঠারনালায় জগন্নাথের মন্দিরের ধ্বজা
দর্শনে চৈতন্য প্রভুর উন্মত্তাবস্থা, পুরীগমন। ৩ মাস কাল পুরীতে অবস্থানের
পর ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ চৈতন্তপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত
হন। পুরী হইতে গোদাবরীতীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করেন। *
তথা হইতে ত্রিমল্লনগরে† গমন করিয়া তুঙ্গভদ্রাবাসী চুণ্ডিরামতীর্থকে
ভক্তি পথে প্রবর্তিত করেন। ত্রিমল্ল হইতে সিন্ধবটেখর গমন করেন‡

* চৈতন্ত চরিতামৃত ও লিখিত আছে চৈতন্তদেব গোদাবরী তীরে রামানন্দ রায়ের
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; রামানন্দের বাড়ী বিদ্যানগর গোদাবরী হইতে অনেক উত্তরে;
রাজকার্যোপলক্ষে রামানন্দের গোদাবরীতীরে থাকা সম্ভব। পুরী হইতে গোদাবরী অনেক
দক্ষিণে। এই দুইএর মধ্যে কোন্ কোন্ দেশ চৈতন্তদেব অতিক্রম করেন করচায় তাহা
নির্দিষ্ট নাই। গোদাবরীর কোন শাখা তখন উত্তরদিকে প্রবাহিত ছিল কি না জানা
যায় না।

† ‘ত্রিমল্ল’ শিশির বাবুর অসিরনিমাইচরিতে ত্রিমল্ল বলিয়া উল্লিখিত দৃষ্ট হয়,
কিন্তু চৈতন্ত চরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর ও চৈতন্তভাগবতে উহা ত্রিমল্ল বলিয়া অভিহিত; বেঙ্কট
ভট্ট ও ত্রিমল্ল ভট্ট দুই সহোদরের নাম অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থেই পাওয়া যায়, বেঙ্কট ও ত্রিমল্ল দুইটি
নিকটবর্তী স্থানের নামানুসারেই ভাটখর উক্তরূপে অভিহিত হইয়া থাকিবেন; ‘ত্রিমল্লই’
প্রকৃত নাম বলিয়া বোধ হয়; উহা হারেন্দ্রাবাদ নগরের নিকটস্থ আধুনিক ‘ত্রিমল্লবেরী’
বলিয়া বোধ হয়।

‡ সিন্ধবটেখর (‘সিন্ধবটেখরম’) কাডোয়ানগরের নিকটবর্তী ও পান্নায় নদীর তীরস্থ।

এই স্থানে তীর্থরাম নামক ধনী সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নামক বেঙ্গালবাসী দ্বারা চৈতন্যপ্রভুকে প্রসূক করিতে চেষ্টা করেন, পরে তাঁহার প্রভায়ে নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ৭ দিন বটেশ্বরে থাকিয়া ২০ মাইল ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন, তৎপর মুন্নানগরে* গমন, মুন্না হইতে বেকটনগরে,† শেখোক্ত স্থানে তিন দিন থাকিয়া বগুলাবনে পহুডিল নামক দহ্মাকে ভক্তিদান করেন, তৎপর এক বৃক্ষতলে ৪ দিবস হরি নাম করিতে করিতে উন্নাস্তাবস্থায় কর্তন, তৎপর গিরীশ্বরে দুই দিবস যাপন, গিরীশ্বর হইতে ত্রিপদীনগরে,‡ তথা হইতে পানানরসিংহ দর্শন, বিষ্ণুকাঞ্চীতে¶ গমন ও তথা হইতে কালতীর্থ ও সন্ধিতীর্থে প্রবেশ,—তৎপর ঙ্গাইপন্নীনগরে, সেস্থান হইতে নাগরনগরে॥ ও নাগর হইতে তাঞ্জোরে** গমন করেন,

* মুন্নানগরের নাম পোষ্টালগাইডে পাইলাম না; বড় ও ভাল মানচিত্রে মুর্শা নামক নদী মাহাঞ্জের নিকটে দৃষ্ট হয়; এই নদীর তীরে মুন্নাগ্রাম অবস্থিত ছিল (হয়তঃ এখনও আছে) বলিয়া বোধ হয়।

† বেকটন নগর পাওয়া গেল না; বোম্বের নিকট বেকটন নগর আছে কিন্তু ইহা সে “বেকট” কখনই হওয়া সম্ভব নহে; এক নামের অনেকগুলি স্থান সর্বত্রই পাওয়া যায়; এই করচানিদিষ্ট ত্রিপাত্র নগর ও নাগরনগর আমরা দুই দুই পৃথক স্থানে পাইয়াছি; বেকটননগর ও মুন্নানগর সিদ্ধবটেশ্বর ও ত্রিপদী নগরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোন স্থলে অবস্থিত থাকা সম্ভব; এই দুই স্থানের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৬০ মাইল। গিরীশ্বর ও ত্রিপদীনগরের নিকটবর্তী বলিয়া বর্ণিত আছে।

‡ ত্রিপদীনগর হইতে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান রেখা অতি শুদ্ধরূপে অনুসরণ করা যায়; পুরী হইতে ত্রিপদীনগর পর্যন্ত বিস্তারিত প্রদেশের মধ্যে কোন কোন স্থান পাওয়া গেল না এবং অস্পষ্ট স্থান সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য একেবারে শুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতে সাহস হয় না, কিন্তু ত্রিপদী হইতে চৈতন্যদেবের পরবর্তী পর্যটনের সঙ্গে বর্তমান মানচিত্রের রেখায় স্বেচ্ছায় মিল পড়িয়া বাইতেছে। ত্রিপদী নগর মাদ্রাজ হইতে ৪০ মাইল উত্তর পশ্চিমে।

¶ পানানরসিংহ প্রভৃতি ছোট ছোট স্থান দর্শন করিয়া চৈতন্য “বিষ্ণুকাঞ্চীপুরে” গমন করেন, ইহা আধুনিক “কাঞ্চিভরম” (কাঞ্চীপুরম্); কাঞ্চিভরম ত্রিপদী হইতে প্রায় ৪৭ মাইল দক্ষিণে।

ঙ কাঞ্চিভরম হইতে চাইপন্নী (আধুনিক ত্রিচিনপন্নী অথবা ত্রিচাইপন্নী) প্রায় ১২৫ মাইল দক্ষিণে।

॥ ত্রিচাইপন্নী হইতে নাগরনগর ৪৫ মাইল পূর্বে, ও সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। বোম্বের উপকূলে তুঙ্গনদীর তীরবর্তী এক নাগরনগর (বেদভূমির সমীপবর্তী) আছে, ইহা সেই স্থান নহে।

** তাঞ্জোরে,—নাগর হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে।

তথা হইতে চণ্ডাল পর্বত পার হইয়া পদ্মকোট, তার পর ত্রিপাত্র নগরে,† সেই স্থান হইতে ৩০০ মাইল ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন, ইহাতে একপক্ষ ব্যয়িত হয়, জঙ্গল পার হইয়া রত্নধামে‡ নৃসিংহ মূর্তি দর্শন করেন, রত্নধাম হইতে রামনাথ নগরে¶ ও রামনাথ হইতে রামেশ্বরে গমন করেন। তথা হইতে মাধ্বীবনে প্রবেশ করেন ও তাম্রপট্টী পার হইয়া কস্তা কুমারীতে উপস্থিত হন। কস্তাকুমারী হইতে “ত্রিবন্ধু”§ দেশে প্রবেশ করেন; এই দেশ পর্বতবেষ্টিত ও ইহার সেই সময়ের রাজা কল্পপতি অতি ধর্মনিষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ত্রিবন্ধু হইতে পন্নোক্ষি॥ নগরে, তথা হইতে মংগুতীর্থ, কাচাড়, ভজানদী, নাগপঞ্চপদী অতিক্রম করিয়া চিতোলে** গমন করেন। চিতোল হইতে চণ্ডপূর, গুজ্জরীনগর,†† ও পরে পূর্ণনগরে‡‡ প্রবেশ করেন, পূর্ণনগর তখন (দাক্ষিণাত্যের নবদ্বীপ) অর্থাৎ শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্র স্থান ছিল। পূর্ণনগর হইতে পটাননগরে, তথা হইতে জিজুরীনগরে, গমন করেন; এই স্থলে খাণ্ডবাদেবের পরিচারিকা অভাগিনী মুরারিদের বিবরণ দেওয়া আছে। তৎপরে চোরানন্দী বনে নারোজী নামক ব্রাহ্মণদম্পত্যকে সন্ন্যাস গ্রহণে প্রবর্তিত করেন; মুলানন্দী পার হইয়া নাসিকে, নাসিক হইতে ত্রিমুক ও দমননগর এবং তাপ্তীনদী অতিক্রম করিয়া ভঁরোচ নগরে¶¶ প্রবেশ; ভঁরোচ হইতে বরদা, তথায় নারোজির

* পদ্মকোট—তাম্রোর হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণে।

† ত্রিপাত্র—পদ্মকোট হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে; পদ্মকোট হইতে প্রায় ১২৫ মাইল উত্তরে আরকটের নিকট অপর এক ‘ত্রিপাত্র’ নগর আছে; ইহা সেটি নহে।

‡ রত্নধাম,—ইহা আধুনিক শ্রীরঙ্গম, ত্রিপাত্রের দক্ষিণ পশ্চিমে; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে এই স্থানকে শ্রীরঙ্গপটম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (৭৬ পৃষ্ঠা) কিন্তু শ্রীরঙ্গপটম ত্রিপাত্র হইতে প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে; পরবর্তী স্থানগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে শ্রীরঙ্গমকেই রত্নধাম বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়।

¶ রামনাথ—সমুদ্রের উপকূলে, রামেশ্বরের অতি নিকটে।

§ ত্রিবন্ধু—ত্রিবাঙ্কুর।

॥ পন্নোক্ষি—আধুনিক পনোনি।

** চিতোল—বোধ হয় আধুনিক চিতোলদুর্গ, ইহা মহীশূরের উত্তর সীমান্তে।

†† গুজ্জরী—গুজরাট নহে, ইহা হারদ্রাবাদ রাজ্যের মধ্যে।

‡‡ পূর্ণ—পূনা; এখনও তন্নিকটবর্তী নদীর নাম পূর্ণ রহিয়াছে।

¶¶ নাসিক—নাসিক, ত্রিমুক (বোধ হয় আধুনিক ত্রিমুক) ও দমননগর পরস্পরের নিকটবর্তী।

মৃত্যু, আহামদাবাদের ঐশ্বর্য্য বর্ণন; শুভ্রামতী নদী অতিক্রম করেন,*
এস্থলে কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ ও গোবিন্দচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ও
তাঁহারা চৈতন্তদেবের সঙ্গী হন। ঘোঁগা নামক গ্রামে গমন,† বারমুখী
বেশ্যার উদ্ধার; জাফরাবাদ পরে সোমনাথ গমন।‡ সোমনাথের পরে
জুনাগড়ে, গুনীর পাহাড় অতিক্রমণ, ১লা আশ্বিন দ্বারকায় গমন, ১৬ই আশ্বিন
দ্বারকা হইতে নর্মদাতীরে দোহদনগরে, তথা হইতে কুক্ষি, আমঝোড়া,
মন্দুরা, দেওঘর (বৈদানাথ নহে) চণ্ডীপুর, রায়পুর, বিদ্যানগর, রত্নপুর
গমন ও মহানদী পার হইয়া স্বর্ণগরে প্রবেশ, তথা হইতে সম্বলপুর,
দাসপাল নগর ও আলাননাথ আগমন—এই স্থান হইতে পুরীতে উপস্থিত
হন।¶

এই করচার মধ্যে পাঠক ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক নানা তথ্য পাই-
বেন; ইহাকে ‘নোট’ সংজ্ঞা দেওয়া উচিত নহে; করচা, কাব্য বা
ইতিহাসের রেখাপাত মাত্র; ইহা একখানা বিস্তৃত চরিতাখ্যান। উৎকৃষ্ট
শিল্পী কৰ্ম্মকার বহুমূল্যমণিখচিত স্বর্ণময় দেব-বিগ্রহ নির্মাণ করিলে
বতদূর সুন্দর হইতে পারে, গোবিন্দকৰ্ম্মকারের লেখনী-নির্মিত চৈতন্তমূর্ত্তি
তাহা হইতে ও সুন্দর হইয়াছে। সিদ্ধ বটেস্বরে তীর্থরাম নামক ধনী ব্যক্তি
চৈতন্যদেবকে পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন
সেই স্থলটি উদ্ধৃত করিতেছি;—

এই দুই স্থানের মধ্যে কালতীর্থ, সক্তিীর্থ, পক্ষতীর্থ প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ পাওয়া
যায়, এইসব তীর্থ এখন জাগ্রত অবস্থায় কি না বলা যায় না।

* ভরোচ—তাপ্তী নদীর নিকট আধুনিক মানচিত্রে ভরোচ নগর।

† আহমদাবাদ নগর ও শুভ্রামতী নদী—মানচিত্রে দেখুন।

‡ ঘোঁগা—পোষ্টালগাইড দেখুন।

¶ সোমনাথ হইতে সমস্তস্থানই মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়া যায়; রামানন্দ রায়ের বাড়ী
বিদ্যানগর রায়পুর ও রত্নপুরের মধ্যে অবস্থিত থাকা সম্ভব। রায়পুর ও রত্নপুর ভারতবর্ষের
যে কোন মানচিত্রে পাওয়া যাইবে; উহার সেন্ট্রাল এজিলের অন্তর্ভুক্ত; স্বর্ণমূর্ত্তির
এখনকার নাম রায়গড়। গোবিন্দের স্থান নির্দেশগুলি এরূপ বিস্তৃত যে মানচিত্রে অনুসরণ
করিতে করিতে তাঁহাকে বতঃই সাধুবাদ দিতে প্রবৃত্তি হয়; এই বৃত্তান্তে নিশ্চিতরূপে
জানা যাইতেছে চৈতন্তদেব পুরী হইতে পূর্ব উপকূলের সমস্ত দক্ষিণাংশ ক্রমে পরিভ্রমণ
করিয়া পশ্চিম উপকূলে ক্রমে শুভ্রাট পর্যন্ত দর্শন করেন, শুভ্রাট হইতে নর্মদা ও
বিষ্ণুদ্বারীর সমন্বয়ে প্রায় এক সরলরেখায় পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের
৭ই বৈশাখ তিনি দক্ষিণাভ্যাস অত্রিমুখে রওনা হন ও ১৫১১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মাঘ পুরীতে
প্রত্যাগমন করেন; হুতরাং এই ভ্রমণ কাব্য ১ বৎসর ৮ মাস, ২৬ দিনে নির্বাহিত হইয়াছিল।

“হেমকালে আইল লেখা তীর্থ ধনবান্। দুইজন বেশা সঙ্গে আইলা দেখিতে। সন্ন্যাসীর ভারিভূরি পরীক্ষা করিতে। সতাবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশাধর। প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়। ধনীর শিকায় সেই বেশা দুইজন। প্রভুর বৃত্তিতে বহু করে আয়োজন। তীর্থ-রাম মনে মনে নানা কথা বলে। সন্ন্যাসীর তেজ এবে হরে লব ছলে। কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সতাবালা হাসে। সতাবালা হাসি মুখে বসে প্রভু পাশে। কাঁচলি খুলিয়া সতা দেখাইলা স্তন। সতারে করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন। ধরধরি কাঁপে সতা প্রভুর বচনে। ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে। কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে। ধৈর্যে গিয়া সতাবালা পড়ে চরণেতে। কেন অপরাধী কর আমারে জননী। এইমাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী। বসিল জটায় তার ধুলার ধূসর। অমুরাগে পরধর কাঁপে কলেবর। সন এলোথলো হলো প্রভুর আমার। কোথা লক্ষ্মী কোথা সতা নাহি দেখি আর। নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি। লোমাকিত কলেবর অশ্রু দরদরি। গিঘাছে কোপীনখুলি কোণা বহির্বাস। উলাঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহুধ্বাস। আছারিয়া পড়ে নাহি মানে কাটা খোচা। ছিড়ে গেল কণ্ঠ হৈতে মালিকার গোছা। না থাইয়া অস্থিচৰ্ম হইয়াছে সার। কীর্ণ অঙ্গে বহিতেছে শোণিতের ধার। হরি নামে মত্ত হয়ে নাচে গোরারায়। অঙ্গ হতে অদভূত তেজ বাহিরায়। ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল। চরণ তলেতে পড়ি আশ্রয় লইল। চরণে দলেন তারে নাহি বাহুজ্ঞান। হরি বলে বাহুতুলে নাচে আশ্রয়। সতারে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি। হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুল মুরারি। কোথা প্রভু কোথায় বা মুকুল মুরারি। অজ্ঞান হইল সবে এইভাবে হেরি। হরি নামে মত্ত প্রভু নাহি বাহুজ্ঞান। যাড়ি ভাঙ্গি পড়িতেছে আকুল পরাণ। মূখে লালি অঙ্গে ধূলা নাহিক বসন। কণ্টকিত কলেবর মুদিত নয়ন। ভাব দেখি যত বোদ্ধ বলে হরি হরি। শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অশ্রুবারি। পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল। ইহা দেখি তীর্থরাম কানিয়া উঠিল। বড়ই পামণ্ড মুই বলে তীর্থরাম। কৃপা করি দেহ মোরে প্রভু হরিনাম। তীর্থরাম পাৰ্শ্বতরে করি আলিঙ্গন। প্রভু বলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন। পবিত্র হইশু আমি পরশে তোমার। তুমিত প্রধান ভক্ত কহে বারেবার।”

এইমত্রে নরোজি, ভীলপঙ্ক দম্ভাধর ও বারমুখী বেশা পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল; যে গ্রামে চৈতন্যদেব গমন করিয়াছেন, সে গ্রামের লোক তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই,—গুর্জরীনগরে তাঁহার প্রেমময় মূর্তির এইরূপ একটি প্রতিচ্ছায়া প্রদত্ত হইয়াছে,—

“একবলি কুক হে বলিয়া ডাক দিল। সে স্থান অমনি ঘন বৈকুণ্ঠ হইল। অমুকুল বায়ু তবে বহিতে লাগিল। দলে দলে গ্রামালোক আসি দেখা দিল। ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি। অজ্ঞান হইয়া নাম করে পৌরহরি। প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন। কর কর করি অশ্রু পড়ে অশ্রুধর। বড় বড় মহারাজী আসি দলে দলে। শুমিতে লাগিল নারি মিলিয়া সকলে। পদ্মাৎভাগেতে সুই দেখি ভাকাইয়া। শত শত কুলবধু আছে

দাড়াইয়া। নারীগণ অশ্রুজল মুছিতে আঁচলে। ভুক্তিরে হরি নাম শুনিছে সকলে।
অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া। হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদ্রিয়া।”

এই মনুষ্য-দেবটির ভক্তির পূর্ণআবেগের সময় আশ্চর্য্য একরূপ
প্রতিভা-দীপ্তি শরীরে প্রকাশ পাইত; অনূচর গেম্বিন্দ ও সেইরূপ ভীত হইয়া
দর্শন করিত,—

কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই। এমন আশ্চর্য্যভাব কভু দেখি নাই। কৃষ্ণকে
বলিয়া ডাকে কথায় কথায়। পাগলের নায় কভু ইতি উতি চায়। কি জানি কাহারে
ডাকে আকাশে চাহিয়া। কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া। উপরাসে কেটে যায়
দুই একদিন। অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ। একদিন গুহা মধ্যে পঞ্চবটী বনে।
ত্রিষ্ণু হতে এসে মুই দেখি সঙ্গোপনে। নিখর নিঃশব্দ সেই জনশূন্য বন। মাঝে মাঝে
বাস করে, দুই চারিজন। থিম থিম করিতেছে বনের ভিতর। চক্ষু মুদি কি ভাবিছে
গৌরান্ন হৃদয়। অঙ্গ হৈতে বাহির হইছে তেজ রাশি। ধ্যান করিতেছে মোর নবীন
সন্ন্যাসী। এইভাবে হরি মোর ধাঁখিল নয়ন।”

বঙ্গালী এই জলপ্লাবিত শস্ত্রাশ্রমাল প্রদেশে খরের ঘরে কোনরূপে
দীর্ঘ জীবনটি কাটাইয়া দেয়; উত্তরে হিমাদ্রি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর,
পশ্চিমে বিষ্ণা,—নিকটবর্তী প্রকৃতির এই মহান আলেখ্য বঙ্গালীকে
মাতৃ ভূমির কোড় হইতে বড় ভুলাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। এদেশের
উর্বর ক্ষেত্ররাশি অকাতরে শস্ত্র দান করিত, উদর স্বচ্ছন্দে পূর্তি করিয়া
বঙ্গবীরগণ বাড়ীর চতুঃসীমানায় ভ্রমণ ও নিয়মিতরূপে রজনীপাত
করিতেন। রণক্ষেত্রে যাইতে সিপাহীর যে আগ্রহ পাঠশালা, গোশালা কিবা
তজ্রপ নিকটবর্তী অল্প কোন কৰ্মশালা হইতে বঙ্গালীর স্বমন্দিরে
প্রত্যাবর্তনের তজ্রপই আগ্রহ,—ইহা তাঁহার ঐতিহাসিক হৃদ্যাম। এইদোষে
বঙ্গীয় প্রাচীন কাব্যে স্বভাবের মহিমাষিত পট চিত্রিত হয় নাই। বাইরণ,
স্বট কি ওয়ার্ডসোয়ারথের রচনায়, কোথাও ক্রিটামনাসের উজ্জল ও ভীতিকর
চিত্র, বঙ্গনাদী স্বরণার শব্দে প্রতিশব্দিত জাদুক্ষে ও আপিনাইনের
ভুষার ধবল উদাসকান্তি, কোথাও লকলেমন, লককেট্টিন প্রভৃতি পাহাড়-
বেষ্টিত তড়াগের সুন্দর ও বিস্ময়কর কান্তি, কোথাও টিনটারগের সুহু
নীলোজ্জল সলিলের গতির বর্ণনায় যে অভিনব মহত্ত্বমিশ্র সৌন্দর্য্যের
আভা পড়িয়াছে,—ঈশ্বর উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বঙ্গালীর তাহা হইতে
শতগুণ শোভা ও মহিমাষিত প্রকৃতির মূর্তি, কিন্তু গৃহস্থ বাঙ্গালী ভ্রমণ

কার্যে নিতান্তই অপারগ ছিল, তাই প্রাচীন সাহিত্যে ভেরাণ্ডার ধাম ও জবাপুন্সের বর্ণনা ভিন্ন কোন বড় ছবির অঙ্কন প্রায়ই দৃষ্ট হয় না; কিন্তু গোবিন্দের প্রকৃতিবর্ণনার বঙ্গীয় প্রাচীনসাহিত্যে ছল্লভ রূপের প্রভা পড়িয়াছে; ঘরের নিরুদ্ধ বায়ু সেবন অভ্যস্ত বাঙ্গালী ঘরের বাহির হইয়া প্রকৃতির নব নব চিত্র দর্শন করিয়াছেন তাই তাঁহার লেখায় এক প্রফুল্ল নব সৌন্দর্যের বায়ু প্রবাহিত হইয়া চিত্রগুলি ক্ষুণ্ণিশালী ও জীবন্ত করিয়াছে:—নীলগিরির বর্ণনাটি আধুনিক কবির রচনার ন্যায় সরল ও সুন্দরভাবে প্রণীত।

কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরীরাজে। ধানমগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে ॥ কত শত শুভা তার নিম্নে শোভা পায়। আশ্রয় তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায় ॥ বড় বড় বৃক্ষ তার শির আরোহিয়া। চমর বাজন করে বাতাসে ঢুলিয়া ॥ ঝর ঝর শব্দে পড় ঝরনার জল। তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতূহল ॥ পর্বতের নিয়ড়েতে ঘুরিয়া বেড়াই। নবীন নবীন শোভা দেখিবার পাই ॥ কত শত লতা বৃক্ষ করিয়া বেটন। আদরেতে দেখাইছে দম্পতি বন্ধন ॥ ময়ূর বসিয়া ডালে কেঁকীরব করে। নানাজাতি পক্ষী গায় হুমধুর স্বরে ॥ নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা। প্রকৃতির গলে যেন ঢুলিতেছে মালা ॥ রজনীতে কত লতা ধগধগি অলে। গাছে গাছে জোনাকি অলিছে দলে দলে ॥ ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুক ঝুক স্বরে। তাঁর ধারে বসি প্রভু সন্ধ্যা পূজা করা ॥”

কিন্তু স্থানে স্থানে গম্ভীরতরতাবের ছায়া আছে, কন্যা কুমারীর বর্ণনায়, “তাত্রপর্ণীপার হয়ে সমুদ্রের ধারে। প্রভু—কন্যাকুমারী চলিল দেখিবারে ॥ কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবার পাই। পর্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাই ॥ হাঁ হাঁ শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর। কি কব অধিক সেখা সকলি সুন্দর ॥ দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন। সেখানে সৌন্দর্য দেখে শুদ্ধ যার মন ॥”

কবির চিত্তে প্রকৃতি অলক্ষিতভাবে একটি অস্পষ্ট, নিগূঢ় উচ্চভাব বিধিত করিয়া দিয়াছিল।

গোবিন্দের করচারণ আর একগুণ, ইহাতে সাম্প্রদায়িক সন্ধীর্ণতার সন্নিহিত নাই, এই অনাবিল রচনা সর্বত্র সুকচিসঙ্গত ও সুস্বাদু; পরম্পর লেখকগণের বৈষ্ণবী বিনয় ও স্থলে স্থলে সাম্প্রদায়িকতার মিশ্রনে ছষ্ট হইয়াছে; কিন্তু বাহার নাম করিয়া সাম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি নিজে অসংশ্লিষ্ট ও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন; তাঁহার প্রিয় অনুচরের লেখায় ও অসাম্প্রদায়িক উদারতার প্রীতিকরভাবে শ্রেণীনির্কিশেবে সকলের মনোনিবেশ করিবে।

গোবিন্দদাসের করচার চৈতন্যদেবের উপদেশগুলির মনোহারীত্ব নষ্ট হইয়াছে; অশিক্ষিত ভৃত্য হইতে আমরা তাহা প্রত্যাশা করিতে পারি না। যে উপদেশ শ্রবণে শত শত লোক মস্তমুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে উপদেশ গোবিন্দের লেখনীতে ভালরূপ ফোটে নাই। রামানন্দরায়ের সঙ্গে আলাপ ও দাক্ষিণাত্যের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে চৈতন্যপ্রভুর বিচার উচ্চ শিক্ষার অভাবে গোবিন্দ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই; কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেইসব স্থলে থাকিলে উপযুক্ত বিবরণ পাওয়া যাইত।

গোবিন্দদাসের করচা পড়িয়া মনে হয় সেকালে ও “অজ্ঞহাত্য বেড়িপড়া” অপেক্ষা কর্মকারশ্রেণীর মধ্যে ও কেহ কেহ উৎকৃষ্টতর ব্যবসায়ের জন্য যোগ্যতা দেখাইতেন; সমাজের অস্থায়ী সীমাবন্ধনী কোন কালেই মানব প্রকৃতির প্রকৃত সীমাবন্ধনী বলিয়া গণ্য হয় নাই।*

* ৪১০ পৌরান্যের কার্তিক মাসের ত্রিবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় মুদ্রিত গোবিন্দদাসের করচা সম্বন্ধে প্রক্কেয় ত্রিযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হস্তলিখিত করচার কতকাংশ হারাইয়া গিয়াছে, পুস্তকপ্রকাশক জয়মোহনপালস্বামী মহাশয় অপর কোথা হইতে সেই অংশ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সমস্ত জাল। তাহার মতামুসারে জাল অংশ ৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপক। নিম্নলিখিত কারণগুলিহেতু তিনি এই অংশ জাল বলিয়া নির্দেশ করেন। (১) তাহার দৃষ্ট যে কয়েক পৃষ্ঠা হারা গিয়াছে তন্মধ্যে সংগৃহীত অংশের স্থলে স্থলে একা থাকিলেও কোন কোন অংশে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। (২) প্রকাশিত পুস্তকে চৈতন্যপ্রভুকে গোবিন্দের স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিতে দেখা যায় কিন্তু জাল-“লেখকের এ কাণ্ড জ্ঞান নাই যে স্ত্রীলোককে সম্ভাষণ করা দূরে থাকুক সম্ভাষ্য অথবা প্রভুর স্ত্রীলোকের মুখ পর্দাস্ত দেখা নিষিদ্ধ।” (৩) কাশীমিত্রের বাড়ীতে প্রভু “উদ্বোধন করিয়া আহ্বান করিলেন।” এরূপ বর্ণিত আছে,—কিন্তু মতি বাবু বলেন “সম্ভাষ্যগ্রহণের পর তিনি অন্নভোজন একরূপ পরিত্যাগ করেন, কেবল নাসিকা দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ আহ্বান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন।” (৪) প্রকাশিত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে সম্ভাষ্যের পর চৈতন্যপ্রভু পূর্বদিকে রওনা হন কিন্তু কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার পশ্চিমদিকে বাজার কথা লিখিত হইয়াছে। (৫) গোবিন্দের পেট ফুলিলে চৈতন্যপ্রভু তাহার পেটে ত্রিহস্ত বুলাইয়াছিলেন একথা মতিবাবুর মতে অবিদ্যাত।

আমরা দুঃখের সহিত বলিতেছি মতি বাবুর সহিত এসবকে আমরা একান্ত হইতে পারি না। তিনি গোবিন্দদাসের যে করচা দেখিয়াছিলেন তাহার পূর্বাংশের সঙ্গে প্রকাশিত গ্রন্থের স্থলে স্থলে অনৈক্য হওয়াই উহার জাল হওয়ার কারণ হইতে পারে না। যে লেখক ঐ স্থল নকল করিয়াছেন তিনি কার্যকর কাব্য বলিয়া একটি কামনিক বাধ্যবলী

(খ) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত।

পরবর্তী চরিত-সাহিত্য চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে রচিত, তখন নিম্নকর্ণে গৌরীদাস পণ্ডিত চৈতন্য বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাঁহাকে

প্রস্তুত করিবেন কেন? মতি বাবু এইরূপ করার কারণ অনুসন্ধান করিয়াও কিছু পান নাই, তিনি লিখিয়াছেন “লেখক কি অভিপ্রায়ে এই অলৌকিক অংশটুকু লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না।” দ্বিতীয়তঃ প্রকাশিত পুস্তকের প্রথমভাগের রচনা ও পরবর্তী রচনা স্পষ্টতঃই এক লেখনীর দ্বারা বিশিষ্ট, কি ভাব কি ভাষার কোনরূপ অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। বলালেই দাঁড়ি, চৈতন্যপ্রভুর বাড়ী, দেবা নাপিতের দ্বারা শির মুণ্ডন প্রভৃতি বর্ণনায় সরল স্পষ্ট বিষয় অনুসন্ধিৎসু চক্ষুর দৃষ্টি বাস্তব হয়; তাহা কল্পনার সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও নূতন নূতন তত্ত্বাঙ্গক; এসম্বন্ধে পাঠকমহাশয় নিজের পড়িয়া বিচার করিবেন। বর্তমান অংশ যে কোন প্রাচীন পুঁথি হইতেই নকল করা হউক না কেন তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়; মতি বাবুর দৃষ্ট কয়েক পৃষ্ঠা কি ছিল তাহা এখন পাওয়া যাইবার সম্ভব নাই,—কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া তুলনায় সমালোচনা করা চলে না।

(২) গোবিন্দের দ্বারী মহিত চৈতন্যপ্রভু কথা বার্তা বলেন, মতি বাবু ইহাতে অসঙ্গতি দেখেন; কিন্তু করচার পরবর্তী অংশ তিনি ত সম্পূর্ণরূপ প্রামাণিক মনে করেন, তাহাতে চৈতন্যপ্রভু সত্যবাই, লক্ষ্মীবাই, বারমুখী বেণী ও অভাগিনী মুরারিগণের সঙ্গে কথা বার্তা বলিলেন কিরূপে? কেবল কথাবার্তা নহে, ‘সত্যেরে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি’—পদে প্রভু যে বেণীকেও নির্মলভক্তিবিহীনতায় আলিঙ্গন দিয়াছিলেন, তাহা পর্যাপ্ত জ্ঞান যাইতেছে।

(৩) কাশীমন্দিরের বাড়ীতে প্রভু “উদরপূর্তি” করিয়া জগন্নাথ-ভোগ খাইয়াছিলেন, মতি বাবু ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করেন। ‘উদরপূর্তি’ করিয়া খাওয়ার কথা মুদ্রিত করচায় পাণ্ডুরা যায় না। চৈতন্যপ্রভুর “কেবল নাসিকা দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্র আহার” করার বিষয় তিনি লিখিয়াছেন, এসম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের প্রমাণে তাঁহার যুক্তি খণ্ডিত হইবে। প্রভু পুরীতে প্রসাদ খাইতেছেন, “তার অন্ন লঞা প্রভু জিহ্বাতে যদি দিল। • • • কোটী অনুতের স্বাদ পাঞা পুতুর চমৎকার। সর্বদা পলকনেত্র বহে অশ্রুধার।” চৈ, চ অন্তঃ। কলা বাহুল্য এই অংশের সঙ্গে মুদ্রিত করচার বর্ণিত স্থলের চমৎকার সাদৃশ্য আছে।

(৪) সন্ন্যাসগ্রহণের পর চৈতন্যপ্রভু পূর্বদিকে যাওয়ার কথা করচায় দৃষ্ট হয়,—ইহার • সঙ্গে কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থের অনৈক্য ঘটিয়াছে। এসম্বন্ধে মতি বাবু অপর স্থলে যে যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এখানেও খাটিতে পারে। চৈতন্যচরিতামৃতাদিগ্রন্থ চৈতন্য-পুতুর সন্ন্যাস গ্রহণের ৭৫ ও তদুৎকালের পরে রচিত হয় এবং সেইসব গ্রন্থকার অনেক “শ্রদ্ধাকথা” লিপিরুদ্ধ করেন।

বৃন্দাবন সম্বন্ধে অবিশ্বাস কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

সাক্ষাৎ বিষ্ণু প্রতিপন্ন করিয়া পণ্ডিতগণ শ্লোক রচনার নিযুক্ত হইয়াছেন ; ভক্তির যে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে নির্ধিত হইয়া উহার কোণে লুপ্তায়িত ছিল, তাহা তখন উক্ত সমাজের সীমা অতিক্রম করিয়া স্বীয় স্বাভাব্য স্থাপন করিয়াছে ; এই বিচ্ছিন্ন নব-উপাদান বিশিষ্ট সম্প্রদায়টির উপর হিন্দুসমাজের বিদ্বেষভরিত নিয়ন্ত আঘাত করিতেছিল ; আত্মরক্ষনশীল ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টির স্তম্ভের বিনয়বর্ষণ অবিরত লোনাঙ্গল লাগিয়া তাই ক্রমে একটু স্থান হইল।

বৈষ্ণবগণ নির্দেশ করেন, ১৪২৯ শকে (১৫০৭ খৃঃ অঙ্গে) শ্রীনিবাসের (শ্রীনিবাসের ভ্রাতা) কন্যা নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন ; তাহা হইলে চৈতন্যপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের দুই বৎসর পূর্বে বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাব হয় ; কিন্তু তিনি মহাপ্রভুকে দেখেন নাই বলিয়া বারংবার আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন,—“হইল পাণিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখন” (চৈ, ভা, আদি ১০ অঃ ও মধ্য ১ম ও ৮ম অঃ) তাঁহার দুই বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রভু নবদ্বীপেই ছিলেন, স্মৃতরাং একথাটির ভাল সম্বন্ধ হয় না ; তবে এক্ষণে হইতে পারে তিনি নিতান্ত শিশু বলিয়া এ আক্ষেপ করিয়াছেন ; ১৫০৭ খৃঃ অঙ্গে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকিলে মহাপ্রভুর তিরোধানের সময় তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর ছিল ; তিনি চৈতন্যপ্রভুর পরম ভক্ত চরিতলেখক, নীলাচলে যাঁহা তাঁহাকে দেখেন নাই কেন বলা যায় না। বৃন্দাবনদাস ৮২ বৎসর জীবিত ছিলেন, ১৫৮৯ খৃঃ অঙ্গে তাঁহার অদর্শন হয় ; এই দীর্ঘ জীবন তিনি বৈষ্ণবসমাজের পরম আদরে অতিবাহিত করেন, ষেতুরির উৎসব-উপলক্ষে “বিজ্ঞবর” বৃন্দাবনদাস উপস্থিত ছিলেন ; ১৫৩৫ খৃঃ অঙ্গে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধানের ২ বৎসর পরে তিনি ‘চৈতন্যভাগবত’ ও ১৫৭৩ খৃঃ অঙ্গে ‘নিত্যানন্দ বংশমালা’ রচনা করেন। তিনি নিত্যানন্দের পরম ভক্ত শিষ্য ছিলেন, তাঁহার রচিত দুই পুস্তকেই বিদ্যেবীর প্রতি ভীত কটাক্ষযুক্ত রোষদীপ্তভাষায় নিত্যানন্দ বন্দনা পাওয়া যায়। বর্ধমান জেলায় দেহুড়গ্রামে (মন্ত্বেশ্বর থানা) বৃন্দাবনদাস একটি মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন করেন, উহা দেহুড় শ্রীপাঠ নামে এখন ও পরিচিত।

চৈতন্যভাগবতকে শ্রীমদ্ভাগবতের ছাঁচে ফেলিয়া গড়া হইয়াছে। শিশু চৈতন্যপ্রভু অতিথি ব্রাহ্মণের উৎসর্গ করা অন্নাদি উচ্ছিষ্ট করিয়া দিতেছেন,—

তঁাহাকে পরক্ষণে শব্দচক্রে গদ্যপদ্যধারীরূপ দেখাইয়া বিমুগ্ধ করিতেছেন, কখনও শচী মাতাকে বিশ্বরূপ দেখাইতেন—তঁাহার পদাঙ্কে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন ধরা পড়িতেছে—এইসব স্থল ভাগবতের পুনরাবৃত্তিমাত্র। অতিক্রান্ত শৈশবে চৈতন্যদেব বিদ্যারূপ যুবক, পরে ভক্তির উজ্জ্বল দেবমূর্তি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতারণা। তথাপি বৃন্দাবনদাস সততই চৈতন্যদেবকে ভাগবতের লীলাদ্বারা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, চৈতন্যলীলা হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলাই তঁাহার কল্পনায় স্পষ্টতররূপে মুদ্রিত ছিল, তাই তিনি শিষ্য বেষ্টিত চৈতন্যদেবকে “সনকাদি শিষ্যগণ বেষ্টিত বদরিকাশ্রমে আসীন নারায়ণের” সঙ্গে উপমা দিয়াছেন এবং দিগ্বিজয়ীর পরাজয় উপলক্ষে “ঐহবয়, বাণ, নহস, নরক, রাবণ” প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কল্পিত ঐক্যের কেশ-প্রমাণ সূত্র যথাসম্ভব সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করিয়াছেন ও চৈতন্যলীলার সঙ্গে কৃষ্ণলীলার রেখায় রেখায় মিল রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আধুনিক ইতিহাস দর্শনের ছাঁচে ঢালা; শুইজো, বাকল, ফ্রিজওয়েল ইতিহাস হইতে সূত্র সংকলন করার চেষ্টা করিয়াছেন; ঘটনার তালিকা দিলেই ইতিহাস হয় না, কিন্তু জড় জগতের নিয়মগুলির ন্যায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মজীবন হইতেও নিয়ম সংকলন করা ইতিহাসের বড় একটা কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রথা সর্বত্রই উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ কি না বলা যায় না; এইভাবে অনেক লেখক স্থায় মনঃকল্পিত সূত্রের বর্ণে ঘটনাক্রমশি বিবর্ণ করিয়া ফেলিতে পারেন; বড় বড় লেখকের সহস্র ও এ আশঙ্কা না আছে এমন নহে, কিন্তু তঁাহাদের ঐক্যজালিক লেখারশৃঙ্গে মিথ্যাসুন্দরী ও অনেক সময়ে সত্যের পোষাকে আসিয়া প্রতারণা করিয়া যায়। বৃন্দাবনদাস গীতার “যদা যদাহি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত”—আদি শ্লোক ও ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের যুগাবতার সহস্রে অপর একটা শ্লোককে সূত্ররূপে ব্যবহার করিয়া চৈতন্যপ্রভুর অবতারের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। সান্নোপাস্ত্রের আবির্ভাব ও যুগপ্রয়োজন বেশ সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। চৈতন্যভাগবতের সুন্দর প্রারম্ভটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

“স্বার জয় নবদীপে কারো চাটীগ্রামে। কেহ রাঢ় উড়দেশে শ্রীহটে পশ্চিমে। নানান্থানে অবতীর্ণ হৈলো ভক্তগণ। নবদীপে আসি হৈল সবার মিলন। নবদীপে হইল প্রভুর অবতার। অতএব নবদীপে মিলন সবার। নবদীপ সম গ্রাম জিহুবনে নাই। যথা

অবতীর্ণ হৈল চৈতন্য গৌসাক্ষি ॥ সর্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে । কোন মহাপ্রিয়-
বসে জন্ম অস্ত্রস্থানে ॥ শ্রীবাসপণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত । শ্রীচন্দ্র শেখরদেব দ্বৈলক্য-পুজিত ॥
ভবরোপবেদা শ্রীমুরারি নাম যার । শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার ॥ পুণ্ডরীক বৈদ্যানিধি
বৈষ্ণব প্রধান । চৈতন্য বলভদ্র বান্ধব নাম ॥ চাট্টগ্রামে হৈল তা সবার পরকাশ ।
বুড়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস । রাঢ়মাঝে এক একট্রা আছে গ্রাম । যথা অবতীর্ণ
নিতানন্দ ভগবান ॥ * * * নানাহানে অবতীর্ণ হৈল ভক্তগণ । নবদ্বীপে আসি সবে
হইল মিলন ॥ নবদ্বীপ সম গ্রাম ত্রিভুবনে নাই । যথা অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গৌসাক্ষি ॥
অবতারিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা । সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা ॥ নবদ্বীপ সম্পত্তি
কে বর্ণিবার পারে । এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে । ত্রিবিধ বৈসে একজাতি লক্ষ
লক্ষ । সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ ॥ সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ভ ধরে । বালকে
ও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে ॥ নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায় । নবদ্বীপ পড়ি
লোক সে বিদ্যার পায় ॥ অতএব পড়ুর নাহি সমুচ্চর । লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক
নির্ঘয় ॥ রমাদৃষ্টিপাতে সর্বলোক স্থখে বসে । বার্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে । কৃষ্ণনাম
ভক্তিশুভ সকল সংসার । প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ॥ ধর্ম কর্ম লোক সব এই
মাত্র জানে । মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥ দস্ত-করি বিষহরি পূজে কোনজন ।
পাতুলি করয় কেহ দিয়া বহুধন ॥ ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায় । এইমত জগতের
বার্থকাল যায় ॥ যে বা ভট্টাচার্য্য চন্দ্রবর্তী মিশ্রসব । তাহার ও না জানয়ে গ্রন্থ অদ্বৈত ॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে । শ্রোতার সহিত সমপাশে ডুবে মরে ॥ না বাধানে
যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন । দোষ বিনে কারো গুণ না করে কখন ॥ যেবা সব বিরক্ত তপস্বী
অভিমানী । তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি ॥ অতি বড় স্মৃতি যে স্নানের সময় ।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারণ ॥ গীতা ভাগবত যে জনাতে পড়ায় । ভক্তির বাখ্যান
নাই তাহার জিহ্বায় ॥ বলিলও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ নাম । নিরবধি বিদ্যা, কুল করেন
বাখ্যান ॥ * * * সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে । কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণ ভক্তি নাহি
কারো বাসে ॥ বাহকী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে । মদ্য মাংস দিয়া কেহ যজ্ঞ পূজা
করে ॥ নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল । না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥ কৃষ্ণ
শুভ্র-মঙ্গল দেহের নাহি স্থখ । বিশেষ অবৈত মনে পায় বড় দুঃখ ॥ * * * সর্ব
নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ । কোথাও না শুনে ভক্তি যোগের কথন ॥ কেহ দুঃখে ভায়
নিজ শরীর তাকিতে । কেহ কৃষ্ণ বলি শাস ছাড়য়ে কাঁদিতে ॥ অন্ন ভালমতে কার না
রুচয়ে মুখে । জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে ॥ ছাড়িলেন ভক্তগণ সব উপভোগ ।
অবতারের প্রভু হইলেন উদ্যোগ ॥”

উদ্ধৃত স্থলটি সূত্রাংশে ও ঐতিহাসিক অংশে মন্দ হয় নাই । কিন্তু
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সূত্রের পশ্চাতে ধাবিত হওয়া সর্বদা নিরাপদ
নহে । বৃন্দাবনদাস মধ্যে মধ্যে ভাগবতের সূত্রে এত বিভোর হইয়া

পড়িয়াছেন যে তাঁহার চৈতন্যপ্রকৃতির স্বরূপ দেখার অবকাশ হয় নাই ।

চৈতন্যভাগবতে যে অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, সেগুলি বৃন্দাবন দাসের উদ্ভাবনী-শক্তির উপর চাপাইয়া দেওয়া উচিত নহে । তিনি যেরূপ গুনিয়াছেন, সম্ভবতঃ সেই ভাবেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । তাঁহার নিজের জন্ম এক অলৌকিকগুণে জড়িত, সুতরাং অলৌকিকত্বে বিশ্বাস কতকটা তাঁহার প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছিল । ঘটনা বিশ্বাস করা বা পরিহার করা পাঠকের ইচ্ছাধীন, কিন্তু আমরা লেখককে করুণাশীল অথবা কপট বলিতে অধিকারী নহি ।

বৃন্দাবনদাস অঐশ্বর্য সমাজকে লক্ষ্য করিয়া যে কটুক্তি করিয়াছেন তজ্জন্ত সমালোচকগণ এক বাক্যে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন । কচি সকল সময় একরূপ থাকে না ; সে কালের কটুক্তি পরীগ্রামের ক্লষকের মোটাহলের ছায় অমার্জিত অপভাষার কথায় প্রকাশ পাইত । সভ্যতার দোকানে অস্ত্রাস্ত্র অস্ত্রের ছায় বিদেহসূচক কথাগুলি ও মার্জিত ও তীক্ষ্ণ করা হইয়াছে ; কটুক্তি করার জন্ত এইসব তীক্ষ্ণ অস্ত্র বৃন্দাবনদাসের আয়ত্ত ছিল না, সুতরাং তিনি রাগেরবশে প্রকৃতির অসংযতবাক্ একটা বড় ছুঁকাস্ত শিশুর ছায় অকৃত্রিম ইতর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন । কিন্তু বৃন্দাবনদাসের ভৎসনাপূর্ণ রচনায় আমরা এক পক্ষের ক্রোধ চিত্রিত দেখিতেছি মাত্র ; উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ এখন সম্পূর্ণভাবে যবনিকার পৃষ্ঠাংশভাগে, তথাপি বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে তাঁহাদের ভীষণ বিদ্রোহের কিছু কিছু পরিচয় না পাওয়া যায় এমন নহে ; চৈতন্যভাগবতে ইহাদের উপহাস ও বিদ্রোহের কথা অনেকস্থলে উল্লিখিত আছে । ভক্তিরত্নাকরে দেখিতে পাই, সংকীৰ্ত্তন-কারীগণ এক রাতেই মরিয়া যায় এজন্য বৈষ্ণবধৈর্যী সম্প্রদায় কালীমন্দিরে ঘাইয়া মানসিক করিতেছে ও নরোত্তমদাসের শবের পৃষ্ঠাংশ পৃষ্ঠাংশ ঘাইয়া করতালি দিয়া ব্যঙ্গ করিতেছে ; ইহার চৈতন্যদাসের প্রবল বিকুণ্ঠিত হেতু নির্দেশ করিয়া তাঁহার দারিদ্র্য ও পুত্রহীনতা ব্যাখ্যা করিয়াছিল এবং “ইন্দ্রনামা বলয়িত বাহ । পরধনহরণে সাক্ষাৎ রাহ ॥ * * ভঞ্জে বীর । কীৰ্ত্তনে পতনে মল্লশরীর ॥” প্রভৃতি তীব্র নিন্দাযুক্ত শ্লোক রচনা করিয়াছিল । ইহাছাড়া ও বৃন্দাবনদাসের ক্রোধের গুরুতর কারণ বহুমান ছিল বলিয়া বোধ হয়, সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম নইয়া ইতরভাবের

পরিহাস চলিতেছিল চৈতন্যভাগবতে একস্থলে তাহার আভাস আছে,—
 “চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী। যারে যেই আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য। সেই
 আসি অবিলম্বে হয় উপপন্ন। এসব বচনে যার নাহিক প্রতীত। সদা অধঃপাত তার
 জানিহ নিশ্চিত।” চৈ, ভা, মধ্য। বৈষ্ণবগণ বিনয়ের আদর্শ; “মুদুনি কুসুমা-
 দপি” তাঁহাদেরই জীবনে প্রমাণিত। সমুচিত উত্তেজনার কারণ না
 থাকিলে তাঁহাদের বিনয়ভঙ্গ হয় নাই। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম সম্প্রদায়
 প্রথম উদ্যমকালে অত্যধিক নিপীড়ন নিবন্ধন অবশেষে মানবজাতির জন্য
 অঙ্গীকৃত শ্রীতিরফুল ভাসিয়া শূল প্রস্তুত করিয়াছেন; মানুষ-রক্তে পৃথিবী
 রঞ্জিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ অত্যাচার সহ্য করিয়া যদি লেখনীমুখে
 মাত্র কিল্লিং ক্রোধের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা অমার্জনীয় নহে।

বৃন্দাবনদাস ২৮ বৎসর বয়সে (১৫৩৫ খৃঃ অব্দে) ভাগবত রচনা করেন।
 এই বয়সে তাঁহার বিরাট ঘটনা রাশি আয়ত্ত করিয়া নিয়ন্ত্রিত করার
 ক্ষমতা জন্মিয়াছিল; তাঁহার রচনায় তরুণ বয়সোচিত কিছু কিছু দোষ
 আছে সত্য, কিন্তু নানা কারণে আমরা চৈতন্য-ভাগবতকে বঙ্গভাষার একখানা
 শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করি; প্রাচীন বঙ্গদেশের যে কোন
 বিষয় লইয়া ইতিহাস রচনার প্রয়োজন হইবে, চৈতন্যভাগবত হইতে
 ন্যূনাধিক পরিমাণে তজ্জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যিক হইবে।
 চৈতন্যভাগবতের মূলবিষয়বর্ণনা হইতে ও প্রাসঙ্গিক আলোপাত বেশী
 আবশ্যকীয়। প্রসঙ্গ ক্রমে ইত্যন্ত নানা বিষয় সম্বন্ধে এমন কি বৈষ্ণবদেবী
 সমাজ সম্বন্ধে ও যেসব কথা উল্লিখিত আছে, তাহা কুড়াইয়া লইলে
 বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের এক একখানা
 মূল্যবান পৃষ্ঠা সংগৃহীত হইবে। ভক্তিমান পাঠক বিনয় সহকারে চৈতন্য-
 ভাগবত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে নয়নাশ্রুর মধ্য দিয়া ইহার এক অশ্রুর
 রূপ দেখিতে পাইবেন; কঠোর, ক্রোধ-পূর্ণ প্রাচীন রচনার মধ্যে মধ্যে
 চৈতন্য-প্রভুর যে মুক্তি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার বর্ণক্ষেপ প্রগাঢ় ভুলি করের
 উপযুক্ত,—তাহা প্রস্তরমূর্তির ন্যায় স্থায়ী ও ছবির ন্যায় উজ্জ্বল; দৃষ্টান্তস্বলে
 চৈতন্যপ্রভুর গয়া গমন ও প্রত্যাগমনের বৃত্তান্তটি বারংবার পাঠ করুন।

চৈতন্য-ভাগবত ৩ খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে গৌরপ্রভুর গয়া গমন,
 পর্য্যন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মধ্যমখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত ও
 অন্ত্যখণ্ডে শেষলীলা বর্ণিত হইয়াছে। আদিখণ্ড পঞ্চদশ অধ্যায়ে, মধ্যমখণ্ড

ষড়বিংশ অধ্যায়ে ও শেষখণ্ডমাত্র অষ্টম অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। শেষ খণ্ডের এই অসম্পূর্ণতা পরসময়ে অন্য একজন শ্রেষ্ঠ লেখককে চৈতন্য জীবন বর্ণনায় প্রবর্তিত করে; চৈতন্য-প্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিণত লেখনীতে দর্শনাঙ্কক সৌন্দর্য্যে জড়িত হইয়াছে, আমরা যথা সময়ে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। চৈতন্যভাগবত বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ আদরের দ্রব্য, এ আদর ভেঁকধারী বৈষ্ণব অপাত্রে প্রয়োগ করেন নাই; কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বয়ং সর্বদা বৃন্দাবনদাসকে চৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যভাগবত ও নিত্যানন্দবংশমালা ব্যতীত বৃন্দাবন দাস বহুসংখ্যক পদ রচনা করেন সেগুলি পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ-পুস্তকে পাওয়া যায়।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ।

লোচনদাস ১৪৪৫ শকে (১৫২৩ খৃঃ অব্দে) বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন; ইহার পূর্ণ নাম ত্রিলোচনদাস; লোচনদাসের বাড়ী কোগ্রাম বর্দ্ধমানের ১৫ ক্রোশ উত্তরে,—গুপ্তরা ষ্টেসন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে। ছল্লভসার ও চৈতন্যমঙ্গলের ভূমিকায় তিনি এই ভাবে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন :—

“বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কো গ্রামে বাস। মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তাঁর নাম। বাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ নাম। কমলাকরদাস মোর পিতা জন্মদাতা। শ্রীনরহরিদাস মোর প্রেম ভক্তিদাতা। মাতৃকুল পিতৃকুল, হয় এক গ্রামে। ধন্য মাতামহী সে অভয়াদেবী নামে। মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত। সর্ব্ব তীর্থ পূত তিহ, তপস্তায় তৃপ্ত। মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র। সহোদর নাই মোর, মাতামহের পুত্র। যথা যাই তথাই ছল্লি করি মোরে। ছল্লি দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে। মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাল আখর। ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত তাহার॥”

চৈতন্যমঙ্গল তাঁহার ১৪ বৎসর বয়সের রচনা, এই পুস্তক তিনি তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের আদেশে ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে রচনা করেন; বৈষ্ণবসমাজে এ পুস্তকখানা বেশ আদৃত কিন্তু চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতের ন্যায় প্রামাণিক বলিয়া গণ্য নহে।

কথিত আছে কোন ঘটনা বশতঃ লোচনদাস তাঁহার জীবন সহিত ছিন্নকাল ব্রহ্মচর্য্য অমুষ্ঠান করেন এ সম্বন্ধে গৌরভূষণ অচ্যুতচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বলেন,—“গৌরভক্তগণের প্রভাব এইরূপই। ইন্দ্রিয় তাঁহাদের কাছে দম্ভোৎপাদিত সর্পের স্থায় খেলার বস্তু। দেখিতে হৃদয় কিন্তু দংশনের ক্ষমতা-রহিত।”

চৈতন্যভাগবত প্রথমতঃ ‘চৈতন্যমঙ্গল’ নামেই অভিহিত ছিল, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যভাগবকে ‘চৈতন্যমঙ্গল’ নামেই উল্লেখ করিয়াছেন ; কথিত আছে লোচনদাসের গ্রন্থের নাম “চৈতন্যমঙ্গল” রাখাতে বৃন্দাবনদাসের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ ঘটে ; বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণীদেবী বৃন্দাবনের পুস্তকের নামের ‘মঙ্গল’ শব্দ উঠাইয়া তৎস্থলে “ভাগবত” করেন ; এইভাবে জুই কবির বিবাদের মীমাংসা হয়।

চৈতন্য-প্রভুর তিরোধানের পর তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক-উপাখ্যান প্রচলিত হইয়াছিল ; বৃন্দাবনদাস লেখনী দ্বারা ঘটনা-রাশি আয়ত্ত করিতে জানিতেন ; তাঁহার বর্ণিত ঘটনার সুবিস্তার সমতটক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে অলৌকিকগল্পের উপলব্ধি বাচ্ছিয়া ফেলিয়া পাঠক সত্যের পথ পরিষ্কার রাখিতে পারেন। কিন্তু লোচনদাসের পুস্তক অন্যরূপ, চৈতন্যপ্রভু সম্বন্ধে অলৌকিক গল্পগুলি তাঁহার কল্পনার চক্ষু হরিতবর্ণ করিয়া দিয়াছিল তিনি ঘটনা প্রকৃতবর্ণে ফলাইতে পারেন নাই ; তাঁহার পুস্তক হইতে গল্পাংশ ছাকিয়া ফেলিয়া নির্মূল সত্যাংশ গ্রহণ করা একরূপ অসম্ভব। তাঁহার পুস্তক ইতিহাসের মলাট দেওয়া খাঁটি কল্পনার দ্ব্য।

বৃন্দাবনদাস যুগতবতারের প্রয়োজনীয়তা কেমন সুন্দরভাবে দেখাইয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। কিন্তু লোচনদাস গোলকধামে রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের কল্পিত কথোপকথন অবলম্বন করিয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্য-মঙ্গলের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কেবল দেবলীলা ; মানুষী মহিমার প্রের্ষই যে প্রকৃত দেবত্ব, বালক লোচন তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। চৈতন্যমঙ্গলে উপাখ্যানরাশির নিবিড় মেঘরাশি ভেদ করিয়া কচিং চৈতন্যদেবের নির্মূল দেব-হাস্তটুকু বিকাশ হয় কিন্তু তাহা পরক্ষণে ক্ষিপ্ৰভাবে আঁধারে লীন হইয়া যায়। সে ছবির প্রতি ভালবাসা আকৃষ্ট হওয়া মাত্র অলৌকিক ঘটনারাশির নিবিড় অরণ্যে মন পথহারা পাছের ন্যায় একটু স্বাভাবিক পথে বহির্গত হইবার জন্য অবকাশ চায়।

চৈতন্যজীবন সম্বন্ধে চৈতন্যমঙ্গলকে আমরা প্রামাণ্যগ্রহ মনে করি না এবং বৈষ্ণবসমাজ ও সঙ্ঘিবেচনার সহিতই ইহার স্থান চৈতন্যভাগবত

ও চৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নে নির্দেশ করিয়াছেন। চৈতন্য চরিতামৃত লেখক বহু সংখ্যকবার প্রকারসহিত চৈতন্য ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্যমঙ্গলের স্বেচ্ছা উল্লেখ করেন নাই। ভক্তিরসাকরে নরহরি চক্রবর্তী চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত হইতে বহু সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু চৈতন্যমঙ্গলের উল্লেখ করেন নাই।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য হইলেও উহা একবারে নিঃশূন্য নহে; ৩০০ বৎসরকাল যাহা লুপ্ত হয় নাই, সে সামগ্রীর অবশিষ্টই আশ্চর্য্যবল আছে। চৈতন্যমঙ্গলের রচনা বড় সুন্দর। লোচনদাসের লেখনী ইতিহাস নিখিতে অগ্রসর হইয়াছিল কিন্তু তাহার গতি কবিত্বের ফুলপল্লবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্যের পথে ধাবিত হইয়া করুণ ও আদিরসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে; বৃন্দাবনদাসের সাদাসিদা রচনার কিম্বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নানাভাষামিশ্রিত জটিল লেখায় কবিত্বের ভ্রাণ নাই; এই দুই পুস্তক ইতিহাসের নিবিড় বন, প্রভু-তত্ত্ববিৎ ও বৈষ্ণব ভিন্ন অপর কেহ ধৈর্য্যসহ এই ঘোর অরণ্য পর্য্যটনশ্রম স্বীকার করিবেন না; কিন্তু লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের অনেক স্থলে কবিত্বের সৌন্দর্য্য আছে; ইতিহাসের রেখাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ডের নিম্নলিখিত খোঁজে পাঠক বিরক্ত হইলে পথে পথে মাধবী ও কুন্দকুমুম কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহার শ্রম অপনোদনে সাহায্য করিবে। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ-সংবাদে শোক-বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়া রূপ এইভাবে আঁকা হইয়াছে●,—

“চরণ করল পাশে, নিখাস ছাড়িয়া বৈসে, মেহারয়ে কাতর নরানে। হিয়ার উপরে গুইয়া, বাক্যে জ্বল লতা দিয়া, প্রিয় প্রাণনাথের চরণে ॥ ছনমনে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর, বুক বাহিয়া পড়ে ধার। চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে, বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে আরবার ॥ মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি, কাদ কি কারণে জানি, কহ কহ ইহার উত্তর ॥ গুইয়া হিয়ার পরে, চিবুক লক্ষিণ করে, পুছে বাণী মধুর অঙ্কর। কাদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। অনিতে বিনয়ে ছিন্ন, পুছিতে না কহে কিছু বাণী। অন্তরে লগনে প্রাণ, মেহে নাই সখিবান, নয়নে স্বরয়ে মাত পানি। পুনঃ পুনঃ পুছে অঁজু, সখিতে বারে তবু। কাদে মাত চরণ ধরিয়া ॥ প্রভু সর্ব্ব কলা জানে, কহে বিষ্ণুপ্রিয়া স্থানে, অজ্ঞবাসে বসন মুছিয়া ॥ নানারূপে কথা ভাব, কহিয়া যাড়ার ভাব, বে কথায় পাবাশ মুগ্ধরে। অঁজুর বাগ্নতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চাকমুখী, কহে কিছু বলগত করে ॥ শুন শুন প্রাণনাথ, মোর নিরে সের হাত, সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি। লোক হুখে শুনি ইহা, বিবরিয়া যায় হিয়া, আঁকনেতে প্রবেশিব আমি ॥ তো লাগি জীবন ধন, এলপ যৌবন, বেশ লীলা রস কলা।

তুমি যদি ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছাড় জীবক, হিয়া পোড়ে যেন বিব ছালা। অমন
হেন ভাগ্যবতী, শাহি হেন যুবতী, তুমি হেন মোর প্রাণনাথ। বড় আশা ছিল মনে,
এ নথ বৌবনে, প্রাণনাথ দিব তোমা হাতে। বিক ঘাছ মোর দেহে, এক নিবেদন তোহে,
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পাথে। গহন কটক বনে, কোথা যাবে কার সনে, কেবা গুব
যাবে সাথে সাথে। শিরীষকুহম যেন, সুকোমল চরণ তেন, পরশিতে মনে লাগে ভয়।
ভূমেতে দাঁড়াও যবে, প্রাণে মোর লয় তবে, হেলিয়া পড়এ পাছে পাএ। অরণ্য কটক
বনে, কোথা যাবে কোন স্থানে, কেমনে হাঁটিবে রাজ্য পায়ে। স্বপ্নময় মুখ ইন্দু, তাহে বর্ষ
বিন্দু বিন্দু, অন্ন আশ্রয়ে মাত্র দেখি। বরিষা বাদল ধারা, কণে জল কণে ধরা, সন্ধ্যাস
করণ বড় দুঃখী। তোমার চরণ বিনি, আর কিছু নাহি জানি, আমারে ফেলাই কাঁ
টাই। * * * কি কহিব সুই ছার, আমি তোমার সংসার, সন্ধ্যাস করিবে মোর
তরে, তোমার নিছনি লইয়া, মরি যাব বিব খাইয়া, হবে তুমি বড় এই ঘরে। চৈ, ম,
হস্তলিখিত পুঁথি।

কো গ্রামের নিকটবর্তী কাঁকড়া গ্রামের (গুপ্তরা টেনেনের নিকট)
বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গলগায়ক শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর বাড়ীতে লোচনের
স্বহস্ত লিখিত চৈতন্যমঙ্গল আছে। প্রাণকৃষ্ণ বলেন “লোচনের আখর
উঠানষোড়া কএর মত।” লোচন যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া
চৈতন্যমঙ্গল লিখেন, তাহা এখনও আছে।

চৈতন্যমঙ্গলও ৩ খণ্ডে বিভক্ত কিন্তু ইহা চৈতন্যভাগবৎ হইতে অনেক
ছোট, -চৈতন্যভাগবতের ২ অংশ হইবে। লোচনদাস ১৫৮৯খৃঃ অব্দে ৬৬ বৎসর
বয়সে তিরোহিত হন, চৈতন্যমঙ্গল ভিন্ন ইহার ‘দুর্লভসার’ নামক অপর
একখানা পুস্তক আছে; এতদ্ব্যতীত লোচনদাস বহুসংখ্যক সুমিষ্ট পদ
রচনা করেন।

এস্থলে বলা আবশ্যক বটতলার ছাপা চৈতন্যমঙ্গল নিতান্ত অসম্পূর্ণ;
উহাতে আত্মপরিচয়ট নাই এবং তন্নিহ্ন অন্যান্য কতকগুলি স্থানও
বর্জিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর তিরোধান সঙ্ঘর্ষে হস্ত-লিখিত পুস্তকে এই
বিবরণটি পাওয়া যায়, তাহা বটতলার ছাপা পুস্তকে নাই।

“সুন্দারন কথা কহে বাবিত অন্তরে। সত্তরে উঠিয়া প্রভু জগন্নাথ দেখিবারে। ক্রমে
ক্রমে সিঁদা উত্তরিল সিংহ ধারে। সঙ্গে নিজ জন যত তেমতি চলিল। সত্তরে উঠিয়া গেল
দশির ভিতরে। সিরখে বাদল ঝড়, দেখিতে না পার। সেইখানে বনে প্রভু চিহ্নিল
উপার। তখণে চরণে নিজ লাগিল। কথটি। সত্তরে উঠিয়া দেখে সত্তরে উঠিয়া।

আবাচমাসের তিথি সপ্তমী দিবসে। নিবেশন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে। সত্তা ত্রেতা
 যাপন সে কলিযুগ আর। বিশেষতঃ কলিযুগে সংকীর্তন মার। কৃষ্ণাকর জগন্নাথ পতিত
 পাবন। কলিযুগে আইল এই বৈহত শরণ। এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
 বাহুভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ার। তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন
 প্রভু হইলা আপনে। গুজ্জা বাড়ীতে ছিল পাণ্ডা বে ব্রাহ্মণ। দেখিয়া সে কি কি বলি
 আইলা তখন। বিপ্রে দেখি প্রভু কহে শুনহ পড়িহা। ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখি বড়
 ইচ্ছা। তত্ত্বার্থি দেখি পড়িহা কহয় কখন। গুজ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অবশন।
 সাক্ষাৎ দেখিল গৌর প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন। এবোল শুনিয়া
 ভক্ত করে হাহাকার। শ্রীমুখ চলিয়া প্রভুর না দেখিব আর॥”

এই বিবরণের সঙ্গে ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত বিবরণের ঐক্য নাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত।

চৈতন্য-চরিতামৃতরচক কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৪৯৬ খৃঃঅব্দে বর্দ্ধমান
 জেলার ঝামটপুরগ্রামে বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন।* তাঁহার পিতা ভগীরথ
 সামান্য চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা পরিবার ভরণ পোষণ করিতেন; কৃষ্ণদাসের
 যখন ৬ বৎসর বয়ঃক্রম তখন পিতার কাল হয়, কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ শ্রামদাস
 তখন ৪ বৎসরের শিশু; এই দুই শিশুপুত্র লইয়া মাতা সুনন্দার বড়
 ভাবিতে হয় নাই, তিনি ও স্বামীর মৃত্যুর কিছু দিন পরেই কালগ্রাসে
 পতিত হন। কৃষ্ণদাস ও শ্রামদাস পিতৃদ্বন্দ্বের গৃহে পালিত হন।

সুতরাং কৃষ্ণদাস শৈশব হইতেই কষ্টে অভ্যস্ত; কিন্তু একদিন ব্যতীত
 কষ্ট তাঁহাকে কখনই অভিভূত করিতে পারে নাই, সে দিন—জীবনের
 শেষ দিন; সে বড় শোচনীয় কথা, পরে বলিব। বালক কৃষ্ণদাস লিখিতে
 পড়িতে শিখিলেন কিছু সংস্কৃত পড়িলেন; জীবনে ভাগ্যের হাসিমুখ
 দেখেন নাই; প্রকৃতি তাঁহাকে বিয়াতার চক্ষে দেখিয়াছিলেন; ধাতুকোড়ে
 স্ফলিত শিশুর ন্যায় তিনি প্রকৃতির অনাবৃত আঙ্গিনার উপেক্ষিত ছিলেন;

* দুইশতাব্দে গোঁসারী নামক কৃষ্ণদাস কবিরাজের একজন শিষ্য উৎকৃত “আনন্দরহস্যবসী”
 নামক পুস্তকে কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে এই সমস্ত বিবরণ লিখিয়া দিয়াছেন। বিবর্তবিলাস-
 প্রণেতা চৈতন্যচরিতামৃতের অলৌকিক প্রতিভার করিতে যে সমস্ত আখ্যান দিগ্বিদিক
 করিয়াছেন,—তাহা অথবা পরিত্যাগ করিয়াস।

কিন্তু সংযত-চিত্ত কৃষ্ণদাস সংসারের ভোগ হুথ তাক্কল্যের সহিত উপেক্ষা করিলেন, তিনি দ্বার পরিগ্রহ করেন নাই।

একদিন কামটপুরে ‘মীনকেতন’ রামদাস ভৃত্যের সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু আগমন করেন; আজন্মদুঃখী কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব প্রভাবে মুগ্ধ হইলেন; ইহসংসার হইতে এক উৎকৃষ্ট সংসারের চিত্র তাঁহার চক্ষে পড়িল; শ্রামদাসের চপল বাগবিতণ্ডায় যখন একটু ক্ষুব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে-ছিলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিলেন; নিঃসঙ্গ কৃষ্ণদাস ভিকারিত দ্বারা পাথের নিকাহ করিয়া তথায় উপনীত হন। ‘যমুনার মুহু-তরঙ্গ-নাদিত নীপিতরুমুল, শ্রামতমালাবৃতকুঞ্জ বৈষ্ণবের চিত্রে নানা উৎসে ভক্তির কথা সঞ্চারিত করে; কৃষ্ণদাস সংসারে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহার চিত্ত নির্মল,—গুহ্রপুষ্পসম; স্মৃতরাং যখন সনাতন, রূপ, জীব, রঘুনাথদাস, গোপালভট্ট ও কবিকর্ণপুর এই ছয় বৈষ্ণবাচার্যের নিকট ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, তখন সেই নির্মল চিত্তে ভক্তির কথা অতি প্রস্ফুট রেখায় চিরদিনেব’তরে মুদ্রিত হইয়া গেল; এই সময়ে তিনি সংস্কৃতে “গোবিন্দলীলামৃত” ও “কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী” প্রণয়ন করেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকায় ও কবিত্বশক্তি গোবিন্দ লীলামৃতে বৈষ্ণব সমাজে বিদিত হয়। ইহা ছাড়া তিনি বাঙ্গালা ভাষায় “অষ্টৈতমৃত করচা,” “স্বরূপ বর্ণন” প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন।

বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ “চৈতন্যভাগবত” রীতিমত প্রত্যহ সায়ংকালে একত্র হইয়া পাঠ করিতেন; কিন্তু উহাতে চৈতন্যপ্রভুর অন্তলীলা বিশেষরূপে বর্ণিত না থাকায় বৃন্দাবনবাসী কাশীধর গোস্বায়ের শিষ্য গোবিন্দ গোসাঁই; যাদবচার্য্য গোসাঁই, ভৃগুর্ভ গোসাঁই, চৈতন্যদাস, কুহুদানন্দ চক্রবর্তী, কৃষ্ণদাস ও শিবানন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে চৈতন্য-দেবের শেষজীবন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে অনুরোধ করেন,—তখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গুহ্রকেশমণ্ডিত ৭৩ বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ, ধীরে ধীরে কালের অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যক সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর সন্নিহিত হইতে-ছিলেন; এ বিষয় অনুরোধ প্রাপ্ত হইয়া তিনি একটু গোলে পড়িলেন; পুজক আসিয়া গোবিন্দজীর আদেশমালা হস্তে আনিয়া দিয়া গেল, কখন

সেই অসুস্থরোধ আশ্রয়ের শক্তি লাভ করিল, তিনি আর একাইতে পারিলেন না।

কিন্তু দুঃশক্তি হারা হইয়াছে, লিখিতে বারংবার হস্ত কম্পিত হয়; বৃদ্ধ এই ব্যাপার সমাধা করিয়া যাইতে পারিবেন,—এ বিশ্বাস তাঁহার মনে স্থির থাকে না। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবৎ, মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের করুণা এবং কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক মূলতঃ অবলম্বন করিয়া এবং শ্রীদাস, লোকনাথ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট মৌখিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ৮৫ বৎসর বয়সে কৃষ্ণদাস প্রবল ও অমাত্যবী অধ্যবসারে ১৫৭২ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৮২ খৃঃ অব্দ এই নয় বৎসরের চেষ্টায় চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন।

চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যভাগবৎ ও চৈতন্যমঙ্গলমূলভ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ভ্রাণ নাই; বৃন্দাবনের ঠাণ্ডা বায়ু ও নির্মল আকাশের তলে ভক্তির অবতার চৈতন্যমূর্ত্তি কৃষ্ণদাসের চিত্তে যেরূপ নির্মল ও সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, চৈতন্যচরিতামৃতে তাহার সুন্দর প্রতিলিপি উঠিয়াছে। গোড়দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ গাঢ় বিদ্বেষে পরিণত হইতেছিল ও উভয় পক্ষের ক্রোধোন্মত্ত যুবকগণ লেখনী ও জিহ্বার তীব্রতা দ্বারা পরস্পরকে তাড়না করিতেছিলেন; সুদূর বৃন্দাবনতীর্থে এই দলাদলির কলুষিত বায়ু বহে নাই ও অশীতিপর বৃদ্ধ সেইসবগ্রন্থক অবগত থাকিলে ও সেইসব চাপল্যে যোগ দিতে প্রস্তুতি বোধ করেন নাই। বৃদ্ধের হৃদয়টি শিশুর ন্যায় স্নকুমার ও বিনয়মাধা; আমরা কোন বিষয়ে পুস্তক লিখিলে তদ্বিষয়ে পূর্ববর্ত্তী পুস্তকের দোষ সাহিয়া মুখবন্ধ করিয়া থাকি, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত কোন কোন বিষয়ে চৈতন্যভাগবৎ হইতে অনেক উৎকৃষ্ট হইলে ও কৃষ্ণদাস পত্র পত্র নারায়ণীকৃত বৃন্দাবনের প্রশংসা করিয়াছেন, সেই প্রশংসোক্তি পড়িয়া আমরা তাঁহার মিজের বিষয়েরই অধিক প্রশংসা করিয়াছি। চৈতন্যপ্রভুর জীবনসংকে গোবিন্দদাসের করুণার পরে চৈতন্যচরিতামৃতই শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্যিক গ্রন্থ; কিন্তু পতীর পাণ্ডিত্য ও প্রবীণতাগুণে এই পুস্তক পূর্ববর্ত্তী সকল পুস্তক হইতেই শ্রেষ্ঠ। চৈতন্যভাগবতের ন্যায় ইহাতে ঘটনার তত্ত্ব ঘন সমাবেশ নাই; বর্ণিত ঘটনাস্থলির

মধ্যে মধ্যে অবকাশ আছে,—কিন্তু সেই অবকাশ, ছবির পশ্চাতে বিরাট-দৃশ্যের ন্যায় মূল ঘটনার সৌন্দর্য্য গাঢ়ভাবে স্পষ্ট করে। বৈষ্ণবোচিত স্নানর বিনয়, ভক্তির ব্যাখ্যা, স্বচ্ছন্দে সংঘত লেখনী দ্বারা বহুবিধ সংস্কৃতগ্রন্থ আলোড়ন ও প্রেমকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুসংহত করার নৈপুণ্য,—এই বহুগুণ সমন্বিত হইয়া চৈতন্যচরিতামৃত এক উন্নত প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে ক্ষুদ্র লতাশুষ্কপুষ্প হইতে দৃঢ় পাদপের বিচিত্র সমাবেশযুক্ত বৈভব প্রকটিত করিতেছে।

কেবল্য অনুলীলায় নহে, আদি ও মধ্যলীলার যে যে স্থান বৃন্দাবনদাস ভাল করিয়া লিখিতে পারেন নাই, কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেইসব স্থল বিচক্ষণ ভাবে পূরণ করিয়াছেন। দিঘিজয়ী ও রামানন্দ রায়ের সঙ্গে বিচার বর্ণনায় চরিতামৃতে পাণ্ডিত্যের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। পুস্তকখানা সংস্কৃতশ্লোকে পূর্ণ, ইহার অনেক শ্লোক তাঁহার নিজের রচিত আর অনেকগুলি নানাবিধ সংস্কৃত পুস্তক হইতে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত।*

এই পুস্তকের মোট শ্লোক সংখ্যা ১২০৫১, তন্মধ্যে আদিখণ্ডে, ১৭ পরিচ্ছেদ

* চৈতন্যচরিতামৃতে কোন্ কোন্ সংস্কৃতগ্রন্থ হইতে প্রমাণ স্বরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত অগ্ণবকৃত মহাশয় বর্ণমালামুক্রমে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, (অমুসন্ধান ; ১৩০২ সাল, ৫ম সংখ্যা।) তাহা এই ;—

(১) অভিজ্ঞান শকুন্তলা, (২) অমরকোষ, (৩) আদি পুরাণ (৪) উত্তরচরিত (৫) উজ্জ্বল নীলমণি (৬) একাদশী তত্ত্ব (৭) কাব্য প্রকাশ (৮) কৃষ্ণকর্ণমৃত (৯) কৃষ্ণসন্দর্ভ (১০) কুর্ধ-পুরাণ (১১) ক্রমসন্দর্ভ (১২) ধরুড়পুরাণ (১৩) গীতগোবিন্দ (১৪) গোবিন্দলীলামৃত (১৫) গৌতমীয়তন্ত্র (১৬) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (১৭) জগন্নাথবল্লভ নাটক (১৮) দানকেনিকোমদী (১৯) নারদ পঞ্চরাত্র (২০) নাটকচন্দ্রিকা (২১) নৃসিংহপুরাণ (২২) পদ্মাবলী (২৩) পঞ্চদশী (২৪) পদ্মপুরাণ (২৫) পার্বিনিয়ত্র (২৬) বরাহপুরাণ (২৭) বিষ্ণুপুরাণ (২৮) বিদগ্ধমাধব (২৯) বিশ্বপ্রকাশ (৩০) বীরচরিত (৩১) বৃহৎগৌতমীতন্ত্র (৩২) বৃহন্নারদীয়পুরাণ (৩৩) ব্রহ্মসাহিত্য (৩৪) ব্রহ্মকৈবর্তপুরাণ (৩৫) বৈষ্ণবভোগিণী (৩৬) বৈষ্ণবভাষ্য (৩৭) ভগবদ্গীতা (৩৮) ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু (৩৯) ভক্তিসন্দর্ভ (৪০) ভক্তিলহরী (৪১) ভাবার্থদীপিকা (৪২) ভগবতী (৪৩) ভাগবতপুরাণ (৪৪) ভাগবতসন্দর্ভ (৪৫) মলমাসতত্ত্ব (৪৬) মহাভারত (৪৭) মধু সাংহিত্যা (৪৮) যামুনোচারণাকৃতালকমলারস্ত্রোজ (৪৯) রামায়ণ (৫০) রঘুবংশ (৫১) রূপগোবিন্দীয় করচা (৫২) লক্ষ্মণবতামৃত (৫৩) ললিতমাধব (৫৪) স্তবমালা (৫৫) স্বাধ্যতত্ত্ব (৫৬) স্বরূপ গোবিন্দীয় করচা (৫৭) সাহিত্যদর্শণ (৫৮) সংক্ষেপভাগবতামৃত (৫৯) হরিতত্ত্ববিলাস (৬০) হরিতত্ত্ব হৃদোদয়।

লোক সংখ্যা ২৫০০; মধ্যে ২৫ পরিচ্ছেদ, লোক সংখ্যা ৬০৫১, ও অন্তে ২০ পরিচ্ছেদ লোক সংখ্যা ৩৫০০। অন্তর্ভুক্ত মহাপ্রভুর যে সকল ভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিগূঢ় ভক্তিরসাত্মক; আমরা গোবিন্দদাসের করচার চৈতন্যপ্রভুর উৎকর্ষ পূর্ব্বরাগের প্রেমাবেশের লক্ষণ দেখিয়াছি, তখন তাঁহার ভাবের পূর্ণ আবেশ এক ক্ষণে হইয়াছে, পর ক্ষণে তিনি সুস্থ হইয়াছেন; তাঁহার মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের মধ্যে পরিভ্রম একটা ব্যবচ্ছেদরেখা অনুভব করা যায় কিন্তু চরিতামৃতের শেষখণ্ডে তাঁহার ভাবোন্মত্ততা কচিৎ মাত্র ভঙ্গ হইয়াছে; তাঁহার জীবনে পূর্বে যে ভাব মেঘাস্তরিত আলো রেখার স্তায় মধ্যে মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ করিত, সেই ভাব শেষে জীবনব্যাপক হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে; জাগরণ স্বপ্নে, জ্ঞান ভ্রান্তিতে তখন মিশিয়া গিয়াছে। এই ভাব-বিহ্বলতার ক্রমবিকাশ কৃষ্ণদাস অন্তর্ভুক্ত আঁকিয়াছেন। চৈতন্যপ্রভু কখন ও বিরহে জগন্নাথ-মন্দিরের গাভীরায় সারারাত্রি মন্তক ঘর্ষণ করিয়া শোণিত-সিক্ত মৃতকর হইয়া রহিয়াছেন, কখনও সলিল হইতে তাঁহার শিথিল অস্থি-বিশিষ্ট প্রেমের শেষ দশার আকৃতিটি উঠাইয়া লোকবন্দ কর্ণে হরিনাম বলিয়া চৈতন্য সঞ্চার করিতেছে; কখনও প্রভু জয়দেবের গান শুনিয়া উন্মত্তভাবে গায়িকা রমণীকে আলিঙ্গন করিতে কণ্টকবিন্দু পদে ছুটিতেছেন,—স্বামী পুরুষ ভেদ জ্ঞান তখন বিলুপ্ত হইয়াছে; রাত্রিকালে বহুবিধ লোক তাঁহাকে প্রহরীরূপে রক্ষা করিতেছে, তাহাদের জ্বলন্ত তজ্জাবেশ হইলে পাগলের স্তায় জ্বলে ছুটিয়া অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছেন; শরীর বিশীর্ণ, চর্ম্মসার, “চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হৈরা। দুঃখিত হইলা তবে প্রভুরে দেখিয়া।” চৈ, চ, অন্ত। তাঁহার জাগরণ ও স্বপ্ন একইরূপ, “একদিন মহাপ্রভু করেছে শয়ন। কৃষ্ণদাস লীলা হয় দেখিলা শয়ন।” চৈ, চ, অন্ত। জাগরণে ও ত নিত্য তাহাই দর্শন।

যদিও চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর ঠিক তিরোধানটি বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু এই ভক্তি বিহ্বলতার ক্রমবৃদ্ধিজনিত দেহত্যাগল্যে পরিণামের ছায়াপাত করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

শেষ সময়ে ও মা বলিয়া মধ্যে মধ্যে মনে হইত; আমাদেরিগের ধর্ম্মের কথা যেমন কোনও অতি শুভরূপে ছায়ার ন্যায় মনে হইয়া লয় হয়, চৈতন্যপ্রভুর ও সেইরূপ ইহলংসারের কথা কচিৎ ছায়ার ন্যায় মনে

হইয়া লয় হইত; জগদানন্দকে বৎসর বৎসর নদীয়া পাঠাইতেন, একবার মার উদ্দেশে বলিয়াছিলেন,—“তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস। বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ। এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার। তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার।” চৈ, চ, অন্ত ।

চৈতন্যচরিতামৃতের দোষ তাহার ভাষাটি; কবিরাজ ঠাকুর সংস্কৃত সূক্ষ্ম থাকিলে ও বাঙ্গলার বড় নিপুণ ছিলেন না। বিশেষ বৃন্দাবনে দীর্ঘকাল থাকাতে তাঁহার বাঙ্গলাভাষায় বৃন্দাবনী একরূপ মিশিয়া গিয়াছিল যে একজন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক কয়েকবর্ষ বাঙ্গলামূলকে থাকিলে যে রূপ বাঙ্গলা কহে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষাটি ও মধ্যে মধ্যে তাহাই ইয়াছে। এই পুস্তক সংস্কৃত, বৃন্দাবনী ও বাঙ্গলা এই তিনরূপ পদার্থের সাময়িক সংযোগে প্রস্তুত। কিন্তু গ্রন্থের সর্বত্রই ভাষা একরূপ নহে এধ্যে মধ্যে পরিষ্কার বাঙ্গলাও পাওয়া যায়; ভাষা সম্বন্ধে পরিশিষ্টে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। চরিতামৃত পরিপক্ব লেখনীর রচনা, উহা সর্বত্রই সুমিষ্ট না হউক, মনের ভাব জ্ঞাপন করিতে উৎকৃষ্টরূপ উপযোগী।

৮৫ বর্ষ বয়সে ১৫৮২ খৃঃ অব্দে পুস্তক সমাধা করিয়া কবিরাজ এই কয়েকটি কথা লিখেন,—“আমি লিখি ইহ মিথ্যা করি অমুমান। আমার শরীর কাষ্ঠপুতঙ্গী সমান। বৃদ্ধ জরাতুর আমি এক ববির। হস্তহালে মনোবুদ্ধি নহে আর হির। নানা রোগগ্রস্থ চলিতে বসিতে না পারি। পক্ষরোগ পীড়া ব্যাকুল রাত্রিদিন যরি।”

কৃষ্ণিবাস, কাশীরাম দাস, প্রভৃতি লেখকগণ তাঁহাদের পুস্তকপাঠ ভবসিদ্ধ পার হইবার একমাত্র সেতু বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন, “কাশীরাম দাস কহে শুনে পুন্যবাণ” ইত্যাদি ভাবের ভণিতাপাঠ অভ্যস্ত বাঙ্গালীপাঠক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য কৃষ্ণদাসের ভণিতায় বিনয়ের নূতন আদর্শ পাইবেন সন্দেহ নাই,—

“চৈতন্যচরিতামৃত খেইজন শুনে।

তাঁহার চরণ দুঞা করো মুক্তি পানে।” চৈ, চ, অন্ত ।

কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন, জীবনে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সংসারের নানা বিচিত্র উপজীব সহ করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি অকাতরে মাথায় বহিয়া যে দৃঢ় চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছিল সে চরিত্রের শেষফল এই যে চরিতামৃত রচিয়া গিয়াছেন তাহা ভবধামের অন্ত বলিয়া এখনও অনেকে

উপভোগ করেন; পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন “যেদিন এই পুস্তক পাঠ না হয় সেদিনই বিকল

এই পুস্তক লেখার পর তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কৰ্ত্তব্য সাধিত হইল—একথা মনে উদয় হইয়াছিল; এখন তিনি নিশ্চিত মনে প্রাণ দিতে ~~হইল~~ ছিলেন। জীব গোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই পুস্তক অনুমোদন করিলে কবিরাজের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি গৌড়ে প্রেরিত হয়; কিন্তু পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাষিরের নিযুক্ত দম্মাগণ পুস্তক লুণ্ঠন করে (১৫৮২ খৃঃ অঃ) এই পুস্তকের প্রচার চিন্তা করিয়া কৃষ্ণদাস মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন, মহা বনবিষ্ণুপুর হইতে বন্দাবনে লোক আনিয়া এই শোকাবহ সংবাদ জ্ঞাত করাইল। অবস্থার কোন আঘাতে যে কৃষ্ণদাস ব্যথিত হন নাই আজ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব—মহাপ্রভুর সেবায় উৎসর্গ মহা পরিশ্রমের বস্ত্র অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া কৃষ্ণদাস জীবন বহন করিতে পারিলেন না। জীবনপণে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন তাহার শোকে জীবন ত্যাগ করিলেন,—“রঘুনাথ, কবিরাজ শুনিলা দুজনে। আছাড় খাইয়া কাদে লোটাওয়া ভূমে। বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে। অন্তর্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে।” প্রেমবিলাস। এই উপলক্ষে পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন “কবিরাজের অন্তর্ধানের কথা লেখা উচিত নহে এবং আমাদের তাহা লিখিতে নাই, লিখিতে গেলে বুক কাটে।”†

চরিতামৃতের ভাবী ব্যাপক যশের বিষয় কবিরাজ জানিয়া মরিতে পারেন নাই—শেষে দেশবিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই পুস্তকের সংস্কৃত টিপ্পনী প্রণয়ন করেন, বৈষ্ণবসমাজে এখনও এপুস্তক রীতিমত পূজিত হইয়া থাকে; কবিরাজ ইহার একটু পূর্বাভাস জানিয়া মরিলে আমাদের দুঃখ হইত না;—তিনি উপযুক্ত বয়সেইত প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কবিরাজ প্রেমধর্ম ও আরাধ্য ও আরাধকের সম্বন্ধ বিষয়ে যে স্নন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—তাহার দুইটি অংশ উদ্ধৃত হইল;—

(১) কাম প্রেম দোহাকর বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম বৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ।^১
আন্তরিক প্রীতি ইচ্ছা তাঁরে বধি কান। কৃৎজিহ্বা প্রীতি ইচ্ছা তাঁর প্রেম দান। কামের

তাপসর্গ নিজ স্বকীয় দেবতা । কৃষ্ণের তাপসর্গ স্বয়ং প্রেরিত স্বকীয় । তাপসর্গের প্রেরণ বোধগম্য কর । সত্যই যেরূপ দেহ হৃৎ আত্ম হৃৎ মর্ম । ইত্যাদি আত্ম পদ নিজ পরিচয় । তাপস করিব যত ভাঙন ভংগন । সর্বভাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন । কৃষ্ণহৃৎকৃত করে প্রের সেবন । ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ । যত্ন যৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ । অতএব কাম প্রেমে বহত অন্তর । কাম অকৃতমঃ প্রেমে নির্মল তাকর ।”

চৈ, চ, আদি ।

(খ) “মোর রূপে আপ্যাসিত করে জিতুবন । রাখার দর্শনে মোর জুড়ার নয়ন । মোর গীত বংশীধরে আকর্ষে জিতুবন । রাখার বচনে হরে আমার শ্রবণ । যদ্যপি আমার গঞ্জে অগৎ অগন্ধ । মোর চিত্ত গ্রাণ হরে রাখাঅঙ্গগন্ধ । যদ্যপি আমার রসে অগত সরস । রাখার অধররসে আমা করে বস । যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটিলু শীতল । রাখিকার স্পর্শে আমা করে হুশীতল । এইমত অগতের হৃৎ আমা হেতু । রাখিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু । এইমত অমুভব আমার প্রতীত । বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত । রাখার দর্শনে মোর জুড়ার নয়ন । আমার দর্শনে রাখা হৃৎ অংগনাম । পরস্পর বেগুগীতে হরয়ে চেতন । মোর জেস তমালেয়ে করে আলিঙ্গন । কৃষ্ণআলিঙ্গন পাইমু জনম সকলে । এই হৃৎ মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে । অমুকুল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ । উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয়ে অন্ধ । তাহুল চর্কিত যবে করে আবাদনে । আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে । আমার সম্মুখে রাখা পায় যে আনন্দ । শতমুখে বলি তবু না পাই তার অন্ত ।

চৈ, চ, আদি ।

চৈতন্যপ্রভুর বৃন্দাবন দর্শন বর্ণনায় প্রাচীন লেখক নবীন কবির ক্ষুণ্ণি দেখাইয়াছেন ; তাঁহার পরিণত ইতিহাসের স্বচ্ছ ছায়ায় সেই দৃশ্যটি অতি সুন্দরভাবে বিদ্রিষ্ট হইয়াছে ; দেবদর্শকের পদার্পণে বৃন্দাবন দেবোদ্যানের ন্যায় সুন্দর হইয়া উঠিল, “প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ লতাগণ । অজুর, পুলক, মধু, অশ্রু বরিষণ । ফুল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু পায় । বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লৈয়া যায় ।” উন্নত ভক্তির আবেশে, “প্রতি বৃক্ষলতা প্রভু করে আলিঙ্গন । পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পন ।” তখন তাঁহার অশ্রুবিন্দু তরুফলপত্রবের শিশিরবিন্দুর সহিত জড়িত হইয়া গেল ; তাঁহার কণ্ঠের ব্যাকুল “কৃষ্ণ”-ধ্বনি বিহগকুল আকাশে প্রাতিধ্বনিত করিল ; “গুণ শারিকা প্রভুর হাতে উড়ে পড়ে । প্রভুকে শুনায়ে কৃষ্ণের গুণ লোক পড়ে ।”

তুলিতে আঁকিতে পারিলে এখানে একটি উজ্জ্বল চিত্র সম্ভাব্যশেষের সুযোগ ছিল ।

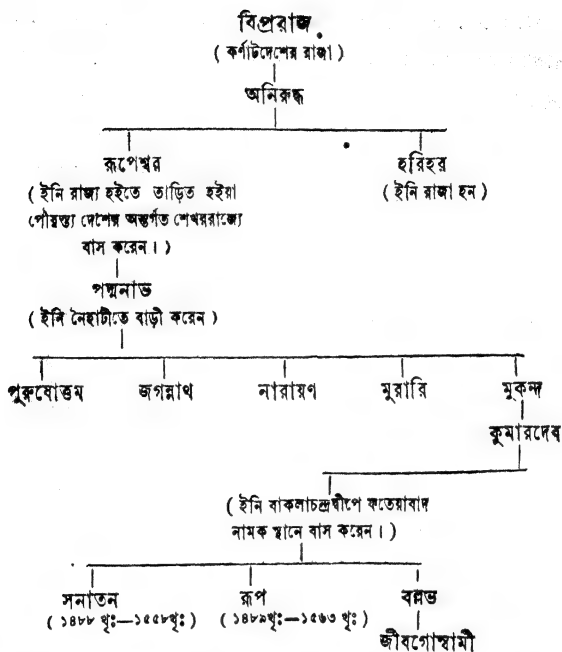
পূর্বে উল্লিখিত পুস্তকগুলি ছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ “রসভক্তিলহরী

নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক বাঙ্গলায় রচনা করেন; ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন
নায়িকার লক্ষণ বর্ণিত আছে। * কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত
হন।

নরহরিচক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস ও নিত্যানন্দদাসের প্রেম-বিলাস প্রভৃতি ।

পরবর্তী চরিতসাহিত্যে চৈতন্য-প্রভুর পারিষদগণ ও অত্যাচ্ছ বৈষ্ণবা-
চার্যগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্য-প্রভুর সমস্ত জীবনচরিত
গুলিতেই প্রসঙ্গক্রমে নিত্যানন্দপ্রভুর বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতিপূর্বে
আমরা বৃন্দাবনদাসের “নিত্যানন্দ-বংশাবলী”র কথা উল্লেখ করিয়াছি।
নিত্যানন্দ প্রভুর পিতামহের নাম সুল্করামন বাড়ুরী, পিতার নাম হরাই
ওষা ও মাতার নাম পদ্মাবতী—বাসস্থান বীরভূম জেলাস্থ একচক্রগ্রাম,
তিনি ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ অধিকাংশের
সম্মিলিত শালিগ্রামনিবাসী সূর্য্যদাস সরথেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবী
দেবীকে বিবাহ করেন; জাহ্নবীদেবীর নাম বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপরিচিত।
জাহ্নবীদেবীদ্বারা নিত্যানন্দের গঙ্গা নামে কন্যা ও বীরভদ্র নামক
পুত্র লাভ হয়; ভগীরথ আচার্য্যের পুত্র মাধবাচার্য্য (মহাপ্রভুর পড়ুয়া)
গঙ্গাদেবীর পাণীগ্রহণ করেন। অদ্বৈত আচার্য্যের পিতামহের নাম নৃসিংহ,
পিতার নাম কুবেরপণ্ডিত, মাতার নাম নাভাদেবী ও পত্নীর নাম
সীতাদেবী;—আদিম বাসস্থান গ্রীহটাস্তগর্ত নবগ্রাম, পরে শান্তিপুরে
বসতি স্থাপন করেন। ইনি ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; গ্রামদাসপ্রণীত
“অদ্বৈতমঙ্গল”, ঈশাননাগরপ্রণীত “অদ্বৈত প্রকাশে” ও লাউড়িয়াকৃষ্ণদাস
প্রণীত “অদ্বৈতের বালালীলাসূত্রে” ইহার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, পরন্তু
সমস্ত বৈষ্ণব-সাহিত্য ব্যাপিয়াই নিত্যানন্দ ও চৈতন্যপ্রভুর সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক
আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। রূপসনাতন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অগ্রগণ্য ও
মহাপ্রভুর পরমভক্ত পাণ্ডুর। ইহার কণ্ঠাধিপ বিপ্ররাজের বংশোদ্ভূত।
নিম্নে বংশাবলী প্রদান করিতেছি।

* এই পুস্তকের হস্ত-লিপি একখানা। প্রাচীন কালি আমার নিকট আছে, অন্য
কোথাও আছে বলিয়া জানিলাম।



রূপ, সনাতন, ও জীবগোস্বামী বহুবিধ সংস্কৃতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ইঁহারা একদিকে শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব, অপরদিকে আশ্চর্য্য-প্রতিভাপন্ন কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু হুঃখের বিষয় সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃতে রচনা করাতে ইঁহারা আমাদের প্রসঙ্গ-বহির্ভূত হইরাছেন।*

* সনাতন গোস্বামী 'দিক্ প্রদর্শিনী' নামক 'হরিতত্ত্ব বিলাসের' গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'বৈষ্ণবভোষিণী' নামক গীতা, 'লীলাস্তব' ও 'গীতাসহ দুইখণ্ড ভাগবতাস্তব' প্রণয়ন করেন। রূপগোস্বামী 'হংসদূত', 'উজ্জ্বল মল্লেশ', 'কৃষ্ণ জন্ম তিথি', 'গণেশের দীপিকা', 'স্তবমালা', 'বিদগ্ধ মাধব', 'ললিতমাধব', 'দানকেশি কৌমুরী', 'আনন্দ মহোদধি', 'ভক্তিরাসাস্তব-সিদ্ধি', 'উজ্জ্বল নীলমণি', 'প্রযুক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা', 'মথুরা মহিমা', 'পদ্যাবলী', 'নাটক চন্দ্রিকা', 'লঘু ভাগবতাস্তব', 'গোবিন্দ বিজ্ঞানাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। জীব গোস্বামী 'হরিনামাস্তব ব্যাকরণ', 'হজ মালিকা', 'কৃষ্ণার্জুনগীতা', 'গোপাল বিজ্ঞানাবলী', 'মাধব-মহোদধি', 'সঙ্কল্প কল্পরুদ্ধ', 'ভাবার্থ সূচক চম্পু' প্রভৃতি ২৫ খানা সংস্কৃতগ্রন্থ বৈষ্ণব সম্বন্ধে লিখিত। ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ ভক্তিরসাকর প্রথম তরঙ্গে প্রদত্ত হইরাছে।

পূর্বোক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্যতীত বেঙ্কটভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট, মাধব-মিশ্রের পুত্র গদাধর (১৪৮৬ খৃঃ—১৫৩৪ খৃঃ), সপ্তগ্রামবাসী গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র রঘুনাথ দাস, শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর (চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক প্রণেতা) প্রভৃতি মহাপ্রভুর পার্শ্বচরগণের বৃত্তান্ত অনেক পুস্তকেই পাওয়া যায় ।

বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য ও গদাধর দাস একসময়ে যে সম্মানলাভ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রামানন্দ ও সেইরূপ শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন । এমন কি বৈষ্ণব সমাজে শ্রীনিবাস ও নরোত্তম মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া আদৃত । ইঁহাদের জীবন বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতে বহুসংখ্যক গ্রন্থকার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । এই বিরাট অধ্যবসায়চিহ্নিত কীর্ত্তির প্রাপ্তে দাঁড়াইয়া আমাদের বিন্ময়ে অভিভূত হইতে হয় ; বটতলার কৰ্ম্মঠতা ও উদ্যম এই সাহিত্যের অতি নগণ্য অংশ মাত্র এপর্য্যন্ত মুদ্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছে । কীট, অগ্নি ও তাচ্ছল্যের হস্তে বৎসর বৎসর এই প্রাচীন কীর্ত্তিরাশি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে । তাহাদিগকে উদ্ধার করার উপযুক্ত কোন আয়োজন এখন পর্য্যন্তও হয় নাই ।

শ্রীনিবাসের পিতা গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তীর নিবাস গঙ্গাতীরস্থ চাখন্দিগ্রামে ; গঙ্গাধর শেষে চৈতন্যদাস নাম গ্রহণ করেন ; শ্রীনিবাসের মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া ও মাতুলালয় জাজিগ্রামে । নরোত্তমদাস পদ্মানদীর তীরস্থ গোপালপুরের কায়স্থরাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র, মাতার নাম নারায়ণী, ইনি বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হন, নরোত্তম রাজপুত্র হইয়া ও রঘুনাথ দাসের ন্যায় সংসারত্যাগী হন, তাঁহার জ্যেষ্ঠাতাতজ্যাতা সন্তোষদত্ত (পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র) তৎস্থলে রাজা হন ; এই সন্তোষ দত্তই ত্রিবেতুরীর ষড়বিগ্রহস্থাপন উপলক্ষে প্রসিদ্ধ উৎসব করিয়া সমস্ত বৈষ্ণব মণ্ডলীকে একত্রিত করেন ।

শ্রামানন্দ দত্তের গ্রামবাসী কৃষ্ণমণ্ডল নামক এক মণ্ডোপের পুত্র, মাতার নাম ছুরিকা । ছোট বেলা ইঁহাকে সকলে হুংখী বলিয়া ডাকিত, তৎপর ‘কৃষ্ণদাস’ ও বৃন্দাবনে বাস-কালে ‘শ্রামানন্দ’ আখ্যা প্রাপ্ত হন । ইঁহার দীক্ষাগুরুর নামে হৃদয়চৈতন্য ।

ষুড়ীর ষোড়শশতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ-

মধ্যে এই তিনজন প্রেমবীর বৈষ্ণব সমাজে প্রাদুর্ভূত হন। ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র জিনিবাস ব্রাহ্মণ ছিলেন, নরোত্তমদাস শূদ্র হইলেও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কবি বসন্তরায় ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী। সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ছদ্মবেশী গঙ্গানারায়ণচক্রবর্তী পঞ্চপল্লীর রাজা নৃসিংহের সমস্ত সভাপণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্মে প্রবর্তিত করেন। সেইসব পণ্ডিতগণ যে রাশীকৃত সংস্কৃতগ্রন্থ বহুসংখ্যক বাহকের দ্বন্ধে চাপাইয়া তর্কবুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেগুলি দ্বারা তাঁহারা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে সক্ষম হন নাই; সুতরাং বিচারজয়ী ব্রাহ্মণটি যে শূদ্রগ্রন্থের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজকে সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন, সদলে পঞ্চপল্লীরাজকে তাঁহার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

এই সাধু ভাগবতগণের জীবন বর্ণন করিতে যে সকল লেখক অগ্রসর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভাগবতের টীকাকার প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্র গঙ্গাতীরবাসী নরহরি চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ। নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তি রত্নাকর—রত্নাকর সদৃশই বিরাট, ও রত্নাকরের নিম্নে যেরূপ নানা মূল্যবাণ ও মূল্যহীন দ্রব্য ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে, এই পুস্তকে ও সেইরূপ নানা মূল্যবান ও মূল্যহীন কথার একত্র সমাবেশ হওয়াতে ইহা হইতে সার উদ্ধার করা একটু অধ্যবসায়শীল ও সহিষ্ণু পাঠকের কার্য্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সমস্ত পুঁথি আলোড়ন না করিলে ইহা হইতে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় জানার পথ নাই; ভক্তিরত্নাকর পাঠারম্ভ ও নীবিড় অরণ্যে প্রবেশ একইরূপ ব্যাপার।

এই বৈষ্ণব ইতিহাস-সাহিত্য সম্বন্ধে এস্থলে প্রাসঙ্গিক একটি কথা বলা আবশ্যক। যুরোপে ইতিহাস লিখিতে হইলে, স্বাধীনতার জন্য বড় রকমের যুদ্ধ বিগ্রহ, বক্তৃতামালা উত্তেজিত জনসাধারণের দ্বারা শাসনের কঠিন বেলাভূমি ভঙ্গ করা, নবদেশ আবিষ্কারচিন্তায় প্রাশান্তসাগরের শাস্তি ভাঙ্গিয়া বর্ষবরের পত্রাচ্ছন্ন কুটিরে লগুচাঘাত, তাহাকে গুলির শব্দে চমৎকৃত করিয়া টিকি ধরিয়া টানাইচরা করা, কতকগুলি ষটি, মুষ্টির শব্দ ও গুলি বাকৃদের ঘনীভূত ধূমপটলে দৃষ্টি গ্রহণ পত্র ছাইয়া কেলা—ইহাই লেখনীর বিষয় হয়।

কিন্তু বৈষ্ণবেতিহাসের লক্ষ্য অনারূপ ; শিরোবিমণ্ডিত, ভুলুঙিত, তুলসীমাল্যবিরাজিত বৈরাগী এইসব গ্রন্থের নায়ক ; খোলবাদ্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে লেখকগণের যেরূপ আগ্রহজনক বর্ণনা, বোধ হয় যুরোপীয় লেখকগণ বুঝার কি করটেকের যুদ্ধনীতির ও ততদূর প্রশংসা করিবেন না ; কীর্তনের কথা বলিতে গদগদভাবে লেখকগণ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়িয়া বর্ণনা দিয়াছেন—তাহা পাঠকের ধৈর্যের একরূপ অগ্নি পরীক্ষা। বর্ণিতগ্রন্থ সকলের নায়কগণ “অক্ষ কল্প বেদাদি ভূষিত” (ভক্তি রত্নাকর ৩য় অধ্যায়ে) হইলে তাঁহারা লেখকের চক্ষে দেবরূপী হইয়া দাঁড়ান। পাঠক অনুমান করিবেন না, আমি বিক্রম করিতেছি। ভক্তির রাজ্যের স্বাদ বাহিরের লোক পায় না, এই সম্বন্ধে কবির উক্তি “অরসিকেরু ব্রহ্ম নিবেদনঃ শিরসি না লিখ মা লিখ।” আমার বক্তব্য এই যে বৈষ্ণবগণের নিকট এইসব পুস্তক ও তাহাদের প্রশংসার লক্ষ্য বিষয়—অমূল্য দ্রব্য, বাহিরের লোক অন্ধকারী ও ততদূর স্বাদ পাইবেন না। কিন্তু ইতিহাস লেখক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ এইসব গ্রন্থের কীট কাড়িয়া, ম্যাগিফাইং গ্লাস দ্বারা ক্ষুদ্র অক্ষর বড় করিয়া—লুপ্ত কথা কল্পনার দ্বারা গাঁথিয়া অগ্রসর হইলে অনেক লাভজনক মাল মসলা পাইতে পারিবেন, নানাদিক হইতে নানাপ্রকার ঐতিহাসিক চিত্রপট পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়াইবে।

ভক্তি রত্নাকরে মোট পঞ্চদশ তরঙ্গ। প্রথম তরঙ্গে জীবগোস্বামীর পূর্ব পুরুষগণের বিষয়, গোস্বামীগণের গ্রন্থ বর্ণন, ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃত্তান্ত ; দ্বিতীয় তরঙ্গে শ্রীনিবাসের পিতা চৈতন্যদাসের কথা, ও তৃতীয় এবং চতুর্থ তরঙ্গে শ্রীনিবাসের শ্রীক্ষেত্রে গোড়ে, ও বৃন্দাবনে গমন বৃত্তান্ত, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তরঙ্গে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রাঘবপণ্ডিতের ব্রজবিহার, রাগরঙ্গিনী ও নায়িকাভেদ বর্ণন ও শ্রীনিবাস, শ্রামানন্দ প্রভৃতির গোস্বামীগণকৃত গ্রন্থ লইয়া গোড়াভিমুখে যাত্রা ; সপ্তম তরঙ্গে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাছির কর্তৃক গ্রন্থ চুরি ও পরিশেষে বীরহাছিরের বৈষ্ণবধর্ম গ্রন্থ ; অষ্টমে শ্রীনিবাস রামচন্দ্রকে শিষ্য করেন ; নবমে কাঁচাগড়িয়া ও কীথেরুরি গ্রামের মহোৎসবের কথা ; দশমে ও একাদশে জাহ্নবীদেবীর তীর্থাদি দর্শন বৃত্তান্ত ; দ্বাদশে শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ গমন ও কেশানকর্তৃক নবদ্বীপ বৃত্তান্ত বর্ণন ; ত্রয়োদশে আচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পরিণয় ও

চতুর্দশে বেরাকুলী গ্রামের সংকীৰ্ত্তন; পঞ্চদশতরঙ্গে শ্যামানন্দকর্তৃক উড়িয়ায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার লিখিত হইয়াছে। ৫ম অধ্যায়ে গ্রন্থকর্তা রাগরাগিণী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ শাস্ত্রীয় গবেষণা ও নায়কনায়িকাভেদ ত্রয় প্রেমের লক্ষণ বিচার দ্বারা যে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি চিরদিনই শিক্ষিত সমাজের পূজা পাইবেন। বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের তিনি যে সুবহু ও পরিষ্কার বর্ণের মানচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কালের পৃষ্ঠায় এই ছই স্থানের ভৌগলিক তথ্য চিরদিন অঙ্কিত করিয়া রাখিবে। ম্যাণ্ডিভাইলের হস্তে জেরুজেলেম ও হিউনসঙ্গএর হস্তে কুশীনগর হইতে ও নরহরির হস্তে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনবেশী উজ্জল হইয়াছে।

ভক্তিরস্নাকরে—বরাহ পুরাণ, পদ্মপুরাণ, আদিপুরাণ, ব্রহ্মাওপুরাণ, কৃষ্ণ-পুরাণ, সৌরপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত লঘুতোষিণী, গোবিন্দবিরূদাবলী, গৌর-গনোদেশ দীপিকা, সাধন দীপিকা, নবপদ্য, গোপালচন্দ্র, লঘুভাগবত, চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ব্রজবিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, মুরারিগুপ্তকৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিত, উজ্জলনীলমণি, গোবর্দ্ধনশ্রয়, হরিভক্তি বিলাস, স্তবমালা, সংগীতমাধব, বৈষ্ণবতোষিণী, শ্যামানন্দ শতক, মথুরাথও, প্রভৃতি বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; সংস্কৃত শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক কিন্তু উহা এদেশের প্রথাগুযায়ী; নরহরি শুধু প্রথাগুগামী নহেন, একটি নূতন প্রথার প্রবর্তক। ভক্তিরস্নাকরে চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত হইতে অনেক শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে—ইহা দ্বারা নরহরিই সর্বপ্রথম ভাষাগ্রন্থকে সংস্কৃতের ন্যায় সম্মানিত করিয়া পৌরহিত্যে বরণ করেন। ভক্তিরস্নাকরে গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস, রায় বসন্ত প্রভৃতি বহুবিধ পদকর্তার পদ সাময়িক প্রসঙ্গ সৌষ্ঠবার্থ উদ্ধৃত হইয়াছে—তিনি নিজেও অনেকগুলি স্বীয়পদ তন্মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কোনটির ভণিতায় স্বীয় অপর নাম ঘনশ্যাম ব্যবহার করিয়াছেন। এই পুস্তক ব্যতীত নরহরি প্রক্রিয়া পদ্ধতি গৌরচরিতচিন্তামণি, গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দঃসমুদ্র, শ্রীনিবাসচরিত, ও নরোত্তম-বিলাস রচনা করেন। এই অপরিসীম কর্মঠতা ও পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তি বৈষ্ণব সাহিত্যের বিরাটরাজ্য হইতে প্রেমের জয় চিহ্নাঙ্কিত কেতু দ্বারা স্থায়ী বশের স্বর্গ স্পর্শ করিতেছে; নরহরি ইতিহাসের দৃঢ়মন্দির পদাধীশ

কোমল লতিকা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া পাশ্চাৎ কুসুম সৌরভ প্রদান করিয়াছেন।

নরোত্তম বিলাস বোধ হয় তাঁহার শেষ গ্রন্থ; এই পুস্তক খানায় ১২ বিলাসে নরোত্তমদাসের চরিত বর্ণিত হইয়াছে; ভক্তিরত্নাকর হইতে ইহা অনেক ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে নরহরির পরিণত শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; ইহাতে শাস্ত্রজ্ঞান দেখাইবার ততদূর তীব্র আগ্রহ নাই কিন্তু আয়োজন পত্র গুছাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করার শক্তি ভক্তিরত্নাকর হইতে অধিক লক্ষিত হয়।

সন্তোষ দত্ত খেতুরিতে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে যে মহা সমারোহ-জনক উৎসব করেন তাহাতে তাৎকালিক সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী আহুত হন। এই ঘটনাটি বৈষ্ণবসাহিত্যের অনেক পুস্তকেই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে; এই উৎসব অতীত ইতিহাসের দুর্গীরক্ষা ও অচিহ্নিত রাজ্যের একটি পথ প্রদর্শক আলোচ্য স্বরূপ; ইহার প্রভাবে আমরা আশ্চর্যকর অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত বড় বড় কয়েক জন লেখককে অনুসরণ করিতে পারি; ইহারা ছায়ার ন্যায় ত্বরিতগতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে সরিয়া পড়িলেও সেই আভাষ মাত্র সাক্ষাতেই আমরা তাঁহাদের উত্তরীয়বস্ত্রে ১৫০৪শকঅঙ্কিত একটি ছাপ দিয়া লইয়াছি। এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণবলেখকের সময় ধরা পড়িয়াছে।

নরহরির ইতিহাস রচনা সাদাসিদা,—গদ্যের ন্যায়; গদ্য লেখার প্রথা প্রচলিত থাকিলে ইনি বোধ হয় পদ্যছন্দে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেন না। রচনার নমুনা এইরূপ,—

“আচার্য্য অধৈর্য্য বাছে ধৈর্য্য প্রকাশিয়া । নরোত্তমে কৈলা হির যত্নে প্রবেশিয়া ॥
প্রসাদী পাকায় সব লৈয়া ধরে ধরে । অতি শীঘ্র গেলেন সবার বাসা ঘরে ॥ সকল
মহাত্ম প্রতি কহে বারে বার । কালি এ খেতরি গ্রাম হবে অন্ধকার ॥ পদ্মাবতী পার
হৈয়া পদ্মাবতী ভীরে । করিবেন তান সবে প্রসন্ন অন্তরে ॥ তথা ভুলিবেন এই প্রসাদী
পাকায় । বুধরি গ্রামেতে গিয়া হইবে মধাহ্ন । আগে বাইবেন গোবিন্দাদি কথোজন ।
সেই সঙ্গে পাক কর্ত্তা করিবে গমন ॥ রামচন্দ্রাদি এসঙ্গে বাইবেন তথা । বুধরি হইতে তারা
আসিবেন এথা ॥” নরোত্তম বিলাস।

এই অনাড়ম্বর লেখক যখন পদ রচনা করিয়াছেন তখন তাঁহার লেখনী মুখ হইতে এক অতি মুগ্ধকর পুষ্পবাস নিঃসৃত হইয়াছে; তাঁহার পদ সমূহ সর্বত্র সুপরিচিত। “গৌরচরিত চিন্তামণি” খানা নানামধুরালাপ

সম্বলিত রাগিণীতে পরিব্যক্ত একটি গানের ন্যায়; নিম্নে একটি স্থল উদ্ধৃত হইল;—

“মিশি গড শশিদরপ দুরে। অতিশয় দুঃখে চকোর কিরে। পতিবিড়ম্বনলজিত মনে। লুকাইল তারা পগন বনে। নদীয়ার লোক জাগিল দুরা। ডেই বলি শেজ তেজহ গোরা। মোরে না প্রভায় করহ যদি। তবে পুছহ নরহরির প্রতি। * * * ময়ূর ময়ূরী পৃথক আছে। কেহো না আইসে কাহারো কাছে, বিরস হইয়া রৈয়াছে গাছে, তুমি না দেখিলে না নাচে তারা। জমর জমরী কচির কুঞ্জে, ভুলি না বৈসয়ে কুহব পুঞ্জে, কারে শুনাইব বলি না গুঞ্জে, কিরয়ে বিপিনে ব্যাকুলপারা।” ২য় কিরণ।

প্রেমবিলাসরচক নিত্যানন্দদাসের কথা ১৭১ পৃষ্ঠার একবার উল্লেখ করিয়াছি; ইঁহার অপর নাম বলরামদাস,—ইনি শ্রীধণ্ডনিবাসী আত্মারাম-দাসের পুত্র, বৈদ্যবংশ সঙ্কৃত ও ইঁহার মাতার নাম সৌদামিনী। ইনি পিতা মাতার একমাত্র সন্তান।

প্রেম বিলাস ২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে ত্রিনিবাস ও জ্ঞানানন্দের কথাই মূলতঃ বর্ণিত হইয়াছে; প্রায় ৩৫০ রূৎসর হয় নিত্যানন্দ দাস প্রেমবিলাস রচনা করেন; ভক্তিরসদ্রাক্ষর হইতে ইঁহার রচনা জটিল; একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রভুদত্ত শেষ নিদর্শন ।

“দুই মহাশয়ের গুণ যে লিখিত আছে। পশ্চাতে লিখিব তাহা থাকি তার পাছে। তবে লিখি যে হইল বিরূহ বেদনা। দেখিয়া কি প্রাণ ধরে দীন হীন জনা। সনাতনের দশা দেখি রূপে চমৎকার। তুমি এমন হৈলে মরণ হইব সবার। প্রভুর দ্বিতীয় স্নেহ তুমি মহাশয়। তোমারে ব্যাকুল দেখি কার বাহু হয়। নামা যত্ন করি রূপে চেতন করাইল। দারুণ বিরহকম্প দ্বিগুণ বাড়িল। সেদিন হইতে সনাতন অস্থির হইল। পৌরাণিকবিরহ ব্যাধি দ্বিগুণ বাড়িল। চিন্তিত হইলা পাছে দেখি সনাতন। শূন্য পাছে পৌরিল করেন বৃন্দাবন। সন্ধিত পাইয়া রূপ আসন লইয়া। ভট্টের নিকটে যান গৌরব করিয়া। দুই ভাই দুই অব্য যত্ন করি বৃকে। ভট্টের বাসাকে গেলা পাইয়া বড় দুখে। দিলেন আসন ডোর দণ্ডবৎ করি। পত্র পড়ি শুনাইলা পত্রের মাধুরী। পত্রের গৌরব শুনি মুর্ছিত হইলা। আসন বৃকে করি ভট্ট কান্দিতে লাগিলা। যত্নকরি শ্রীরাগ করেন কিছু দ্বিত। সনাতন দেখি ভট্ট হইলেন দীর। সনাতন কহে ভট্ট শুন গোলাকি। কথার কালে বসিবা আসনে লোব নাকি। প্রভুর আসনে আমি কেমনে বসিব। আজ্ঞা করিয়াছেন প্রভু কেমনে উপেক্ষিব। প্রভু আজ্ঞা বলবতী শ্রীরাগ কহিলা। গলে ডোর করি ভট্ট কান্দিতে লাগিলা।”

১৭২ খৃষ্টাব্দে যত্নমন্দনদাসের ‘কর্ণামৃত’ নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি,— ইহা আকারে চৈতন্যচরিতামৃতের অর্ধেক হইবে; কর্ণামৃত ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত; এই পুস্তকে শ্রীনিবাসআচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইরাছে। ইহার রচনা সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিজে এই লিখিয়াছেন;—

“বুধীপাড়াতে রহি শ্রীমতী * নিকটে। সদাই আমলে ভাসি জাহ্নবীর তটে।
খঞ্চনশত আর বৎসর উনত্রিশে।† বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে। নিজপ্রভু-
খাদপয় মন্তকে ধরিয়া। সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া।”

প্রেম দাসের (অপর নাম পুরুষোত্তম) বংশী-শিক্ষার নাম ও ১৭২ খৃষ্টাব্দে আমরা একবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছি; “বংশীশিক্ষা” আকারে যত্নমন্দন দাসের কর্ণানন্দের তুল্যই হইবে। মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস এবং গৌরাজ পার্শ্বদ বংশীদাস ঠাকুরের জন্মাদিও তাঁহার শিক্ষাপ্রসঙ্গ বর্ণনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। প্রেমদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন ও তাঁহার উপাধি “সিদ্ধান্ত-বাগীশ” ছিল। ইনি “বংশী-শিক্ষা” ও স্বকৃত “চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ” সম্বন্ধে এই পরিচয় দিয়াছেন;—

“শকাভিত্য বোলশত চৌত্রিশ শকতে।‡ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক লুপ্তে।
লৌকিক ভাষাতে মুদ্রি করিমু লিখনে। বোলশত অষ্টত্রিশ শকের গণনে।
শ্রীশ্রীবংশী-শিক্ষাপ্রস্থ করিমু বর্ণন। নিজ পরিচয় তবে শুন ভক্তগণ।” বংশীশিক্ষা।

প্রায় ২০০ শত বৎসর হইল মহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্রমিশ্র বংশোদ্ভব জগজীবনমিশ্র “মনঃসঙ্কোচিণী” নামক একখানা ক্ষুদ্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ইহাতে মহাপ্রভুর শ্রীহট্টভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিত হইরাছে। জগজীবন মিশ্রের বাড়ী শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণগ্রামে অর্থাৎ যেখানে উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী ছিল। জগজীবন মিশ্র মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমানন্দ মিশ্র হইতে ৮ম পর্ব্বায়ে উৎপন্ন; এইসব পুস্তক ছাড়া “মহাপ্রসাদ বৈভব”, “চৈতন্যগণোদ্দেশ”, “টৈবক্ষবাচার দর্পন” প্রভৃতি পুস্তক ও চরিত-শাখার অন্তর্গত। আরও রাশি রাশি পুস্তক রহিয়া গেল, তাহাদিগের নামোন্মেষ করিতে আমাদের শক্তি ও সময় নাই। এই নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ

* শ্রীনিবাসআচার্য্যের কস্তা হেমলতা ঠাকুরাণী।

† ১৫২০ শক অর্থাৎ ১৬০৭ খৃষ্টাব্দ।

‡ ১৬৩৪ শক অর্থাৎ ১৭১৩ খৃষ্টাব্দ।

§ ১৬৩৮ শক অর্থাৎ ১৭১৬ খৃষ্টাব্দ।

করিলে ধৈর্য্যাহারা ও পথহার হইতে হয়; যদিও এই পুস্তকসমূহের অনেকগুলিকেই কাল—কীট ও অগ্নির মুখে বৎসর বৎসর উপহার দিতেছেন এবং তাহাদের একঘেষে খোলার বাদ্য শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইয়া আমরাও কালের ধ্বংস ক্রীড়ায় কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি বোধ করি না—তথাপি বৈষ্ণবধর্ম্মের যে মহতী শক্তিতে এই স্রষ্টার সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, যে অধ্যবসায়-সিদ্ধ হইতে অবিরত এইরূপ সাহিত্যিক শক্তির প্রবল তরঙ্গ ও বৃদ্ধ উঠিয়াছে, সামাজিক জীবনে সেই বিরাট আন্দোলন ও কর্ম্মঠতার ব্যাপার দেখিলে মনে হয় না,—বঙ্গদেশীগণ শবের ন্যায় পড়িয়াছিল, বিদেশী শাসন কর্ত্তাগণের ভেরীধ্বনিতে এইমাত্র তাহারা হাই তুলিয়া জাগিয়া বসিয়াছে।

৭ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ।

৭ম অধ্যায়ে বৈষ্ণব-সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ সংক্রান্ত পুস্তকের আলোচনা করা হয় নাই,—স্থলে স্থলে উল্লেখ মাত্র করিয়াছি; অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিষয়ক পুস্তক ও বিস্তর; স্বতন্ত্র হেডিং করিয়া ব্যাখ্যাশাখা ও অনুবাদ-শাখার আলোচনা করিতে গেলে গ্রন্থের পরিসর বড় বাড়িয়া যাইবে; তাই অধ্যায়ভাগে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বসিয়া এখানে সংক্ষেপে তাহাদিগের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি।

আগরদাসের শিষ্য নাভাজীর আদত “ভক্তমাল” জীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাসবাবাজী অনুবাদ করেন; ভক্তমালা বহুসংখ্যক বৈষ্ণব মহাজনগণের জীবন বর্ণিত হইয়াছে। আদত হিন্দী ভক্তমালগ্রন্থ নাভাজীর শিষ্য প্রিয়দাস স্বকৃত টীকা দ্বারা বিস্তারিত করিয়াছেন; কৃষ্ণদাস তন্মধ্যে আরও বহু সংখ্যক বৈষ্ণবের জীবনী সংযুক্ত করিয়া ও প্রিয়দাসের টীকার বিস্তার করিয়া গ্রন্থকলেবর ত্রিগুণ পরিমাণে বাড়াইয়াছেন; তিনি নিজের ভাল হিন্দী জানিতেন না, সুতরাং এই গ্রন্থ রচনা করিতে তাহার বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে; তিনি নিজেই তাহা লিখিয়াছেন;—

“গ্রন্থ হয় ব্রজভাষা সব বুঝি নহি। যেহেতু গোড়ীর থাকে জ্ঞেয়মত কহি। রচনা পূর্ব্বক কহিবারে নাহি জানি। যথাসক্তি করবোড়ে মিলাইয়া তপি। উপহাস কেহ নাহি করিহ ইহাতে। বৈষ্ণবের জনগণ করি সে ভেদমতে। স্তম্ভএব টীকার অর্থ বুঝি লক্ষ্যমতে। রচিতা কহিবোক্ত নন বুঝাইতে। যথা যথা প্রিয়দাস সংক্ষেপেত ভক্তি। বর্ণিতা না

অবেশের সাধারণ মতি । সেই সেই কোন কোন স্থানে কিছু কিছু । বিস্তার করিয়া কহি তার পাছ পাছ ।” ভক্তমালগ্রন্থ ।

ভক্তমালের বঙ্গীয় অনুবাদের আকার চৈতন্যভাগবতের তুল্য ।

পূর্ব অধ্যায়ে গুণরাজ্যবিরচিত ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছি । ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে অপর একজন বেশ প্রতিভাবান কবি ভাগবতের অনুবাদ করেন । ইঁহার নাম মাধবাচার্য্য, ইনি কান্যকুজ হইতে সমাগত ভট্টনারায়ণ বংশীয় ও তাঁহার অষ্টাদশ পর্যায়ে জন্ম গ্রহণ করেন । মাধবাচার্য্যের বাড়ী ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনানদীর তীরস্থ নবীনপুর (ন্যানপুর) গ্রাম, এই স্থান এখন গৌসাইপুর বলিয়া পরিচিত । মাধবাচার্য্যের পিতামহের নাম ধরণীধরবিশারদ, পিতার নাম পরাশর ও একমাত্র পুত্রের নাম জয়রামচন্দ্র গোস্বামী । মাধবাচার্য্যের ‘শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল’ে লিখিত আছে মাধবাচার্য্যের পিতা মাতা বৃদ্ধাবস্থায় গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে বাস করেন, কিন্তু “চণ্ডীকাব্যে” মাধবাচার্য্য আত্ম-পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন ;—

“পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার । একাক্ষর নামে রাজা অর্জুন অবতার । অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি । কলিযুগে রামতুলা প্রজা পালে ক্ষতি । সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল । ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল । সেই মহানদী তটবাসী পরাশর । বাগ যজ্ঞে রূপে তপে, শ্রেষ্ঠ বিজয়র । মর্যাদার মহোদবি দানে কল্পতরু । আচারে বিচারে বুদ্ধ সম দেবগুরু । তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচাৰ্য্য । ভক্তিতরে বিরচিষু দেবীর মাহাত্ম্য । আমার আসরে বস অনুরূপ গায় গান । তার দোষ ক্রমাকর কর অবধান । প্রতিভালভঙ্গ অন্য দোষ না নিবা আমার । তোমার চরণে মাগি এই পরিহার । ইন্দু-বিন্দু বাণধাতা শক নিয়োজিত । বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত । সারদার চরণসম্বোধ শুধু লোভে । বিজ মাধবানন্দে অলি হয়ে শোভে ।”

সুতরাং পিতা মাতার ‘তীর্থবাস’ সম্বন্ধে কৃষ্ণমঙ্গলের আত্ম পরিচয় ও এই আত্মপরিচয়ে একটু অনৈক্য আছে । মহাপ্রসাদ বৈভব ও মাধববংশ-তত্ত্ব প্রভৃতি পুস্তকে জানা যায় মাধবাচার্য্য মহাপ্রভুর পড়ুয়া ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন ; তাহা হইলে “ইন্দু বিন্দু বাণধাতা” অর্থাৎ ১৫০১ শক (১৫৭৯ খৃঃ) একটু কঠয়ুক্তি দ্বারা খাপ খাওয়াইতে হয় ।

বিশেষ বৈকব হইয়া তিনি চণ্ডী মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে কেন গেলেন তাহাও একটি সমস্যা । সে সময়ে সাম্প্রদায়িক বিষয়ে সমাজ ছিল ভিন্ন ভিন্ন

হইতেছিল ও গোড়া বৈষ্ণবগণ চণ্ডীর মূর্তি দর্শন ও পাপ বলিয়া গণ্য করিতেন। “বিলুপ্ত জবার স্কল। দেখতে মারেন চক্ষের স্কল। কালী নাম শুনে কাণে হস্ত।” অপর স্থলে “হাট করেন না কালী গঙ্গের হাটে।” (দাশরথী)। মাধবাচার্য্য শুধু চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—সুন্দরবনসেবী, ব্যাঘ্রারোহী দেবতা দক্ষিণ রায়েয়ও একপালা গান রচনা করিয়াছিলেন, (৬০ পৃষ্ঠা দেখুন)। এই সমস্তা দুইটিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, প্রথমত মাধবাচার্য্য শেষোক্ত দুইখানা পুস্তক বোধ হয় পূর্ববঙ্গে রচনা করেন, তথায় সাম্প্রদায়িক বিবেচ্য একরূপ ছিল না বলা যাইতে পারে, দ্বিতীয়ত মাধবাচার্য্য কীর্তন ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন, সুতরাং লোক মনস্তত্ত্ব ও পসারের অনুরোধে তাঁহাকে সাময়িক কৃতির দ্বারা লেখনীর গতির দিকনির্ণয় করিতে হইত। চণ্ডীকাব্য হইতে উদ্ধৃতাংশে দেখা যায় মাধবাচার্য্যের গানের দল ছিল এবং ভক্তিরত্নাকরের নবম তরঙ্গে “শ্রীমাধবাচার্য্য কীর্তনিনী” উপাধিবৃক্ত নাম পাওয়া যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন “তিনি কীর্তন ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহার রচিত একখানা পুস্তকে তিনি সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যেন নানাজাতি হইতে আনীত তাঁহার গানের দলের বালকগণ উচ্চারণ শুদ্ধি লাভ করিতে পারে।”*

যাহা হউক মাধবাচার্য্য গৌরপ্রভু ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ধূয়ার পুষ্পমালা— দ্বারা তাঁহার চণ্ডীকাব্য খানা ও বেশ সাজাইয়াছেন; তাঁহার শক্তি উপাসনার ও অবকাশমতে বৈষ্ণবমহিমা জ্ঞাপিত হইয়াছে, চণ্ডীতে গৌর সম্বন্ধে পদ, যথা—“দেখনা গৌরান্ধ চাঁদের বাজার। শুভ তরিবার তরে, হরধূণিতীরে, প্রেমময় রত্ন পসার। যত ব্রজসখীগণ, দেখ গিয়ে কৃষ্ণদন, চাঁদমুখ হের একবার।”

মাধবাচার্য্যের ভাগবতের অনুবাদের কথাই এস্থলে বলা প্রয়োজন, কিন্তু মাধবাচার্য্য বঙ্গসাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক, তাঁহার পরিচয় হুজুরে সমাধা করা উচিত বোধ করি নাই, এইজন্ত এই বাহ্য।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের সারভাগ বেশ সুন্দরভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে; গৌরভূষণ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বলেন,

* “In one of his works he prays to Sarasvati that the boys of his party recruited from various castes, may acquire purity of pronunciation.”
Shastri's Old Bengali Literature.—P. 11.

“শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের পূর্বে নানা স্থানে গুণরাজ খাঁ প্রণীত কৃষ্ণবিজয় গীত হইত, মাধবের কৃষ্ণমঙ্গল অচিরেই সেই স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল ।”

কৃষ্ণমঙ্গল, চণ্ডীকাব্য ও দক্ষিণরাণের উপাখ্যাম ব্যতীত মাধবাচার্য্য সংস্কৃতে প্রেমরসাকর নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ।

মাধবাচার্য্য হইতে বহু প্রাচীন লেখক প্রসিদ্ধ “লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস” বিষ্ণুপুরীঠাকুররচিত রত্নাবলীর বঙ্গীয় অনুবাদ রচনা করেন । আমরা অনুবাদ পুস্তকের মুখবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি;—

“শ্রীবিষ্ণুপুরী ঠাকুর ভকত সন্ন্যাসী । জীষ নিস্তারিলা কৃষ্ণ ভকতি প্রকাশি । বিচারি বিচারি ভাগবত পদোনিধি । বিকৃত্তিরত্নাবলী প্রকাশিলা নিধি । প্রতি অখ্যায় বিচারিলা স্বাশ শব্দ । সার স্লোক উদ্ধারিয়া করিলা প্রবন্ধ । নানান প্রকার স্লোক ব্যাখ্যা করি সাধু । তাপিত জীবের তরে সিকিলেক মধু । অষ্টাদশ সহস্র স্লোক ভাগবত । তা হইতে উদ্ধার করিলা স্লোক চারিশত । বিষ্ণুপুরী ঠাকুর রচিল রত্নাবলী । কৃষ্ণদাস গাইলেক অল্পত পাচালী ॥”†

অনুবাদপুস্তকে কবিতার খেলা খেলিতে গেলে আদত বজায় থাকে না, আবার একবারে কবিতাবিহীন হইলেও অনুবাদ কিংবদন্তের ন্যায় পরিত্যক্ত হয় স্ততরাং ভাল একখানা অনুবাদ রচনা করা বড় বিষয় ব্যাপার; কৃষ্ণদাসের হাতে অনুবাদটি মন্দ হয় নাই, সেকেলে ভাষায় যতদূর সুলাইয়াছিল, কৃষ্ণদাস ততদূর মার্জিত রচনার আদর্শ দেখাইয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে যথা;—

“অমর রম্যর যেন কমলের মাল্যে । মোর মন তেন রম্যের তৌমা পলায়ুজে ।
যেই পুষ্প থাকে কটক অভ্যন্তরে । তাহাতে প্রবেশিয়া কি অমরা নাহি চরে । সহস্র-
বিপদ মোর থাকুক সর্বক্ষণ । তোমা পর কমল চিন্তায় যদি মন । অর্ঘ্য মুকুট দ্বায়ে
সেই বেশ ভাষ । যেইশিরে কৃষ্ণদ না কৈল নমস্কার । জগদ্রাধ হুঁত্রে যেই না কৈল
সিদ্ধীক্ষণ । ময়ূরের পুচ্ছ তার দুইটি নয়ন ॥”

এখন “লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস” কে, তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি । শ্রীহট্টে লাউড় নামে একটি স্থান আছে, ৪৫০ বৎসরের অধিক হইলে সেস্থানে শিবরসিংহ নামক একজন হিন্দু রাজা ছিলেন । অর্ধশতাব্দীর পিতা কুবের পণ্ডিত ইহারই মন্ত্রী; পরে কুবের গঙ্গাবাস হেতু সপরিবারে শান্তিপুরে

† এই কৃষ্ণের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি ত্রিপুরেশ্বরের সেক্রেটারী বৈকুণ্ঠ চৌধুরী শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারদাশ ঘোষ বি, এ মহাশয়ের নিকট আছে, তিনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন ।

আপনমন করেন, ইহার ও পরে যখন অদ্বৈত ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, দিব্যসিংহ তখন অতি বৃদ্ধ, তিনি পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া শান্তিপুরে বাস করেন। তাঁহারই বৈষ্ণবাবস্থার নাম কৃষ্ণদাস, পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি কৃষ্ণদাস অদ্বৈতের বাল্যলীলা বর্ণনা করেন, অদ্বৈত শিষ্য জ্ঞাননাগর স্বীয় “অদ্বৈত প্রকাশে” উক্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন যথা,— “লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা শ্রুত। যে গ্রন্থ পড়িলে হয় চুবন পবিত্র।”

যহ্ননন্দন দাস কৃত “গোবিন্দলীলামৃতের” অনুবাদ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে; কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীয় গোবিন্দলীলামৃত পরিণত পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে সাজাইয়াছেন—যহ্ননন্দনদাসের অনুবাদটিতে আদ্যত সৌন্দর্য্য বেশ ফুটিয়াছে; এই পুস্তকে শ্রীমতীরাম ও তাঁহার সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুর মধুরলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অনুবাদ পুস্তক আকারে চৈতন্য-মঙ্গলের তুল্য হইবে। ইহাছাড়া যহ্ননন্দন দাস রূপগোস্বামীর “বিদগ্ধমাধব” ও বিলম্বঙ্গল ঠাকুরের “কৃষ্ণকর্ণামৃতের” অনুবাদ করেন। প্রেমদাসকৃত চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ের অনুবাদ, সনাতন চক্রবর্তির ভাগবতের অনুবাদ, ও রসময়ের গীতগোবিন্দের অনুবাদ এইস্থলে উল্লেখ যোগ্য। গিরিধরের অনুবাদ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

ব্যাখ্যা-শাখায় ঠাকুর নরোত্তমদাসের “প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা”, “সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা”, “হাটপত্নন”, ও “প্রার্থনা” প্রভৃতি পুস্তকই সর্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। “বিবর্ত্ত-বিলাসের” গ্রন্থকার নিজকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জনৈক শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতে গোপীভাবে ভজন সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে—ইহা কোন শঠবৈষ্ণবের লেখা; বৈষ্ণব সমাজ বিবেচনা করেন, “কর্ত্তাভজাদলের” কোনও লেখক এই ঘৃণিত কীর্্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্ণবসমাজের স্বন্ধে কলঙ্ক চাপাইয়াছেন। কৃষ্ণদাস-বিরচিত “শ্যামগুদলন” ও রামচন্দ্র কবিরাজ প্রণীত “স্বরগদর্পণ” এই শাখার অন্তর্গত। এইস্থলে বৃন্দাবনদাসের “গোপিকামোহন” কাব্যের উল্লেখ করা আবশ্যিক; যে বৃন্দাবন “চৈতন্যভাগবত” রূপ অমর পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাঁহার লেখনী-প্রসূত “গোপিকামোহন” কাব্য ক্ষুদ্র হইলেও বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ আদরের সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিকাদের সম্বন্ধ এবং লীলাদি বর্ণিত হইয়াছে, ইহার বহু প্রাচীন, হস্তলিখিত একখানা পুঁথি আমার নিকট আছে।

আমরা আর পুস্তকের নাম করা আবশ্যক মনে করি না ; এখনও এক্ষেত্রে প্রবৃত্তির হ্রাস চলনা হয় নাই, ভবিষ্যতে আরও অনেক বড় গ্রন্থ আবিষ্কৃত হওয়া আশ্চর্য্য নহে । যে সমস্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি তদ্বারাই যথেষ্টরূপে সাহিত্যের ক্ষতি ও গতি নির্ণীত হইবে ; সমুদ্রে ভ্রমণকারী যেকোন প্রত্যহ লবনাধুর একইরূপ নীলবস্ত্র প্রত্যক্ষ করিয়া অগ্রসর হন, আমরাও সেইরূপ চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে যাছা কিছু ক্রমে পাইয়াছি, তাহাতে নানাদিক পরিমাণে একই আদর্শ ও একইভাবের বিকাশ দেখিয়া অগ্রসর হইয়াছি ; নরহরি সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া লেখকগণ যে গাথা গাহিয়াছেন, তাহার প্রতিক্রিয়া ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া কোন্ কীটভুক্ত পুঁথির শেষ পংক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে কে বলিবে ?

এই যুগের সাহিত্য হিন্দী উপকরণে বিশেষরূপ পৃষ্ঠ হইতে দেখিতে পাই। এখন যেকোন ইংরেজীভাষার রাজস্ব, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবকালে তখন ছিল—বৃন্দাবনী ভাষার রাজস্ব। বৃন্দাবন এখনও বড় তীর্থ বলিয়া গণ্য, কিন্তু তখন বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ ইঁহাকে ধরাতলে স্বর্গ বলিয়া গণ্য করিতেন,—শ্রামকুণ্ড কি রাধাকুণ্ড দর্শনার্থ তাঁহাদের যে উৎসাহ-পূর্ণ আগ্রহ ছিল এখন বিলাত বাইতে শিক্ষিতগণের তত আত্যন্তিক আগ্রহ নাই। এখন যেকোন আমরা বাঙ্গলা কথার মধ্যে চারি আনা ইংরেজী মিশাইয়া মুক্তা বর্জন করিয়া থাকি, তখন সেইরূপ বৈষ্ণবগণের বাঙ্গলা কথা চারি আনা বৃন্দাবনীর মিশ্রনে সিদ্ধ হইত। কোন কাব্য কি ইতিহাসে যে স্থলে কথাবার্তা বর্ণিত হয়, সেইস্থলে গ্রন্থকর্তা প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন ; চৈতন্যচরিতামৃত নরোত্তম বিলাস প্রভৃতি পুস্তকে দৃষ্ট হইবে, যেস্থলে কথাবার্তার উল্লেখ সেই খানেই বৃন্দাবনী ভাষার সমধিক ছড়াছড়ি হইয়াছে যথা—

“প্রয়াগ পর্ধ্যন্ত দুহেঁ তোমা সঙ্গে যাব। তোমার চরণ সঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব। রেজ্জেনশ কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত। ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত। “চৈ, চ, মধ্য ১৮ পঃ।

হইলুঁ উষ্মি বৃন্দাবিনিন দেখিতে। তাঁহা না হইল, গেলুঁ অশৈত স্নেহেতে। সবে মহাশয়ী হৈলো আমার সন্মানে। সভা প্রবোধিলুঁ রহি অশৈতের বাসে। সভা মনোবৃত্তি জামি নীলাচলে গেলুঁ। তাঁহা কখনো রহি দক্ষিণ ভ্রমিলুঁ। নরোত্তম বিলাস।

এরূপ অসংখ্যস্থল প্রদর্শিত হইতে পারে ; বৃন্দাবনীগুলি বাঙ্গালীর স্বভাববুলি না হইলেও ইহা তাহার স্বভাবে পরিণত করিয়া লইয়াছিল।

বিদ্যাপতির মৈথিলপদের অনুকরণে ঐহারী পদরচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে গোবিন্দদাস সর্বশ্রেষ্ঠ। সাহিত্যের প্রথম ক্ষুরেণ কবির লুপ্ত ভাষা প্রকাশ করাই চেষ্টা হয়, প্রথম যুগের কবিগণ ভাষার প্রতি লক্ষ্য করেন না, কোনও রূপে ভাষাটি প্রকাশিত হইলেই তাঁহাদের লক্ষ্য সার্থক হয়। ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে, পরবর্তী কবিগণ ভাষাটিকে সাজাইতে চেষ্টা করেন; ভাব-যুগের অবসানে সাহিত্যে ভাষা-যুগ প্রবর্তিত হয়; তখন মানুষের লক্ষ্য প্রকৃতির নথ শোভা হইতে অপসারিত হইয়া অলঙ্কার শাস্ত্রের কৃত্রিম ফুলপল্লবের পশ্চাতে ধাবিত হয়; গোবিন্দদাসের ভাষায় বঙ্গমৈথিল-গীতের চরম বিকাশ, এমন কি বিদ্যাপতির ভাবপ্রধানপদও গোবিন্দের পদের ন্যায় মন্থণ নহে। গোবিন্দ দাসের (১) “কেবল কান্ত কথা, কহি কাঁধে—কাম কলঙ্কিনী গোরা।” (২) “মুকুলিত মল্লী, মধুর মধু মাধুরী, মালতি মঞ্জুল মাল।” (৩) “ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ বীর বিজুরীতরঙ্গ। ওবর মরকত ঠাম। ইহ কাকন দশবাণ। ও তমু তরুণ তমাল। ইহ হেম যুধি রসাল। ও নব পদমুনী সাজ। ইহ মস্ত মধুকর রাজ। ও মুখ চাঁদ উজ্জোর। ইহ দিগ্গি লুবধ চকোর। অঙ্গণ নিবড়ে পুন চন্দ। গোবিন্দদাস রহ ধন্দ।” প্রভৃতি পদ পড়িয়া প্রথম কর্ণই মুগ্ধ হয়, ভাব ও অর্থের কথা পরে মনে উদয় হয়।

গোবিন্দদাস বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে রোপিত বিদেশী ব্রিজবুলীকে চরম শোভা দান করিয়াছেন; তৎপর শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে ও বঙ্গ-মৈথিলের প্রতিধ্বনি হইয়াছিল কিন্তু তাহা ক্ষীণতর;—

“কাঁহকো শোচ কর মন পামর। রামভজ, তুহঁ রহনা দিন। ইষ্ট কুটম্বক ছোড়নে আশ, এসংসার অসার, এক উহ নাম বিনা। যো কীট পতঙ্গক, আহার যোগাওত, পালক হয় উহি একজনা। কবি সত্য কহে, মন থির রহো। যিনি দিহাঁ দস্ত, সো দেগা চনা।” (সত্যরাম কবি।) একযুগ ব্যাপী চেষ্টার বিকাশের পর বঙ্গমৈথিল সাহিত্যের উপর পটক্ষেপ হইয়াছে।

কিন্তু পদাবলীতে মৈথিল অনুকরণ যত সুন্দর হইয়াছে, কাব্য কি ইতিহাসে বৃন্দাবনী ভাষা ততদূর মিষ্ট হয় নাই। চৈতন্যভাগবতকার বঙ্গদেশেই জীবন যাপন করিয়াছেন, ও তাঁহার সময়ে বৃন্দাবনী বাঙ্গলার সঙ্গে গাঢ়ভাবে মিশে নাই, তাঁহার রচনায় তাই অনেক পরিমাণে খাঁটি বাঙ্গলার আদর্শ পাওয়া যায়; তাঁহার রচনার মধ্যে মধ্যেও বৃন্দাবনীস্বরের আভাস একবারে

না পাওয়া যায় এমন নহে যথা—“সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবার পাও। তবে মুক্তি হুহু হই হাঁটিয়া বেড়াও।” চৈ, ভা, আদি।

বৈষ্ণব সমাজের কথিত বাঙ্গলা তখন মিশ্রিত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার। মুখে যাহা বলিতেন, লেখনীতে ও তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত এসম্বন্ধে দৃষ্টান্তস্থলীয়। দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে থাকাতে কবিরাজগোস্বামীর বাঙ্গলা বৃন্দাবনী দ্বারা একরূপ আবৃত হইয়াছিল, যে খাঁটি দেশী কথা অতি অল্প স্থলেই ক্ষুট হইয়াছে, ইহা ছাড়া তাহার সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যে ও সহজ বাঙ্গলা রচনার অস্তরায় হইয়াছিল। একদিগে “গুহ্যতিগুহ” “বাহ্যবতরণ” “মহদমুভব” প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ ও অন্যদিগে “যবহু”, “কবহু”, “যৈছে”, “তৈছে” “তিহ” প্রভৃতি বৃন্দাবনীগুলি তাঁহার কাব্যে জড়াইয়া বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহাদের দীর্ঘ ও ঘনসন্নিবিষ্ট বাহুর মধ্যে বঙ্গভাষার কোমল প্রাণ পীড়িত হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গলা, হিন্দী সংস্কৃত, এমন কি উর্দু কথা পর্য্যন্ত কৃষ্ণদাস অবাধে ব্যবহার করিয়াছেন, ভাষার এই সাধারণতন্ত্রের হট্টগোলে বাঙ্গালীর সুর চেনা সুরকঠিন ও চৈতন্যচরিতামৃতকে “বাঙ্গলাগ্রহ” উপাধি দিতে আমাদের বহুতর সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোক, অপ্ৰচলিত সংস্কৃত শব্দ, বৃন্দাবনী ‘যৈছে’, ‘তৈছে’ ও উর্দু ‘নানা’ ‘মামু’, ‘চাচা’, পথ হইতে পরিষ্কার করিয়া অতি কষ্টে বাঙ্গলা গ্রন্থটির জাতি রক্ষা করিতে হইয়াছে। নিম্নে কবিরাজ গোস্বামীর বহুরূপী রচনার কিছু কিছু নমুনা দিতেছি,—

(১) “বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি বহুত বিস্তার। সংক্ষেপে করিয়ে কিছু সাধনান্ন তার।
শুষ্ক পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। সধর্ম্ম শিক্ষা পৃচ্ছা সাধু মার্গানুগমন। কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ
ভাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস। যাবৎ নির্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশমাস। ধাত্রাধ্ব গোবিজ্ঞ
বৈষ্ণব পূজন। সেবানামপরাদধি দূরে পূজন।” চৈ, চ, মধ্য, ১২ পঃ।

(২) কহে তাঁহা কৈছে রহ রূপ সনাতন। কৈছে করে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন। কৈছে
অষ্ট প্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন। তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ। অনিকেতন
দুঃখ রহে বত বৃক্ষগণ। একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাজি শয়ন। করোয়া মাত্র কাঁধা
হিঁড়া বহির্বাস। কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম নর্ত্তন উল্লাস।” মধ্য, ১০ পঃ।

(৩) “ইবে তুমি শাস্ত হৈলে আসি মিলিলাম। ভাগ্য মোর তুমি হেন অতিথি পাইলাম।
প্রতিসম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় আমার চাচা। দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা। নীলাধর
চক্রবর্তী হয় ভোমার নানা। সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।” আদি ৭ পঃ।

বৃন্দাবনী ভাষার প্রভাব কালে লুপ্ত হইল; কৃত্রিম ভাষা ব্যবহার করিয়া কবি কতদূর কৃতি হইতে পারে, গোবিন্দদাস তাহা দেখাইয়াছেন,—কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও অমৃতর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তিরোধানের পর বৃন্দাবনী ভাষা কেহ ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু হিন্দীর অধিকার গতেও বঙ্গ সাহিত্য-ক্ষেত্রে অন্য ত্রিবিধ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিয়া গেল, তাহারা এই;—

(১) উর্দু,—আমরা প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যে ও কতকগুলি উর্দু শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি। উর্দু নবাবী আমলের ভাষা, ইহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে অবশ্যই কিছু আসিয়াছিল, কিন্তু রামেশ্বরী সত্যপীরোপাধ্যান ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবির কোন কোন রচনায় উর্দু প্রভাব অনেক পরিমাণে লক্ষিত হইলেও তাৎকালিক বঙ্গভাষায় সংস্কৃতের সাপক্ষে রুচির কোন ও মারাত্মক ক্ষতি হয় নাই। এখনও ইংরেজীর মূল্যে দু'একজন কবি “বুট পড়ি হট করি যাবে ভাই যাও। হোটলে কাটলেট মুখে খাবে যদি খাও। এলবার্ট কাসনে বেশ কিরাবে কিরাও। (‘দীনেশচন্দ্র বসু রচিত কবিকাহিনী।’) প্রভৃতি পদে বিদেশী ভাষার শরণ লইলেও মাইকেল প্রভৃতি কবিগণের গুরুগম্ভীর সংস্কৃতের ধ্বনিতে সেইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহস্বর ডুবিয়া গিয়াছে।

(২) খাঁটি বাঙ্গলা—ইহা কথিতভাষা, “মুখ রুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা” কি “ইন্দুবিন্দুতুষারসঙ্গাশা” প্রভৃতি কথা ঠিক কথিত ভাষা নহে। ইহাদিগকে বাঙ্গলা বলিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু একরূপ রচনা পোমাকী বাঙ্গলা। কথিত বাঙ্গলার প্রভাব মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবির রচনায় বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। যে চিত্রকর প্রকৃতি হইতে আলোকচিত্র উঠাইবেন, তিনি পৃথিবী ও স্বর্গ কেবল পুষ্প দিয়া ভরিয়া ফেলিতে পারেন না, তাঁহাকে শুষ্ক গুল্ম ও কুৎসিত গলিত পত্রেরও প্রতিচ্ছায়া উঠাইতে হইবে। খাঁটি বাঙ্গালী কবি এইজন্য কথিত অপভাষা খুঁটিয়া ফেলিয়া কেবল ললিত-লবঙ্গলতার মত মিষ্টমিষ্ট কথার খোঁজ করিবেন না। মুকুন্দরাম ভিন্ন প্রায় সমস্ত কবিই ন্যূনাধিক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ দ্বারা কাব্য পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা তাহা পরে দেখাইব।

(৩) সংস্কৃত। বৃন্দাবনদাসের সাদাসিদা রচনার মধ্যেও “স্বাহুভাবাননে”র ন্যায় দু'একটি বড় সংস্কৃত কথা দৃষ্ট হয়। ইতিপূর্বে বাঙ্গালী কবি মনের উক্তিসম্বলিত গান রচনা করিতেন, ভাষাগ্রন্থগুলি সাধারণ লোকের

মনোরঞ্জনার্থে গানের পালা রূপে রচিত হইত; সংস্কৃতে ও পার্শীতে বড় বড় লেখার কাজ চলিত। কিন্তু বৈষ্ণবগণ বঙ্গভাষাকে বড় বড় ভাষার উচ্চমঞ্চ ঘেঁষিয়া স্থান লইতে সাহসী করিলেন; বৈষ্ণব লেখকগণ বিষেবী পাবণ্ডীয় গর্ক খর্ক করিতে শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া বাঙ্গলায় দর্শন ও ন্যায়ের সমস্ত তত্ত্ব সুগম করিলেন; বিরুদ্ধ পক্ষীয়গণের পাণ্টা উদ্যম চলিল, তাঁহারা নানাবিধ তর্কাদি অনুবাদ করিয়া বৈষ্ণবদিগের প্রতিপক্ষতা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উভয় পক্ষের শাস্ত্রচর্চা হেতু বঙ্গভাষা সংস্কৃতির ভিত্তির উপর সুদৃঢ়ভাবে স্থিত হইয়া এক নব নাট্যশালার ন্যায় পাতঞ্জল দর্শনের কথা হইতে কালিদাস ও জয়দেবের সুন্দর শব্দ-লালিত্যের বিচিত্র শোভা দেখাইল। কিন্তু বাঙ্গলা রচনায় সংস্কৃত খাপ খাওয়াইতে যাইয়া প্রথম উদ্যমেই বঙ্গীয় লেখকগণ ক্রুতি হন নাই, চৈতন্যচরিতামৃতের “স্বধর্ম এলভাক পুমান প্রভু উত্তর দিল” অঙ্ক ২য় পঃ। “কর্তৃমু-কর্তৃবদ্যধা করিতে সমর্থ।” অঙ্ক ৯ পঃ। ও “দেহকাস্তা হয় তিহে অকুক্ষ বরণ” আদি, ১ পঃ। প্রভৃতি স্থল হ্রস্বোদ্য ও শ্রুতিকটু হইয়াছে, এমন কি অনেক পরে রামপ্রসাদ ও এ বিষয়ে অতি রূপাযোগ্য ও শোচনীয় অযোগ্যতা দেখাইয়াছেন, তাহা যথাকালে লিখিব।

উর্দু, কথিত বা খাঁটি বাঙ্গলা ও সংস্কৃতামুযায়ী বাঙ্গলা প্রভাবে বঙ্গসাহিত্য ত্রিবিধভাবে আন্দোলিত হইয়াছে; এই ত্রিশক্তির কোন না কোনটি বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কবিগণ কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা অতঃপর চুষ্টি হইবে।

আমরা ১৫ পৃষ্ঠায় একটি প্রাচীন কবির পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি বঙ্গভাষা পূর্বে প্রাকৃত সংজ্ঞায় অভিহিত হইত—এই যুগের সাহিত্যে অনেকস্থলেই বঙ্গভাষার ‘প্রাকৃত’ সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়; যথা,—“প্রাকৃত লিখিয়া বুঝি এই মোর লাব।” গোবিন্দলীলায়ুত (বহুবল্লভনামের অনুবাদ)। “ইহা বলি গীতার পড়িল এক লোকে। প্রাকৃত এবন্ধে কহি শুন সর্বলোকে।” লোচননামের চৈতন্যদল, যথার্থ। বঙ্গভাষা মাগধী প্রাকৃতির অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়, মাগধী বঙ্গীয় গীত পূর্বে বঙ্গদেশে আদৃত হইত ও উৎসবোপলক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল, (নরোত্তম বিলাস,—দ্বিতীয় বিলাস দেখুন)।

এই অধ্যায়ে বাঙ্গলা অপ্রচলিত শব্দগুলির অর্থসমেত তালিকা দিতেছি,

ইহাদের কতকগুলি ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছে, নানা পুস্তকেই এইসব শব্দ পাওয়া যায়, আমরা পাঠকের আলোচনার সুবিধার্থ পূর্বের ভিন্ন গ্রন্থ-বিশেষের নাম উল্লেখ করিলাম ।

চৈতন্যভাগবতে,—দৃঢ়—প্রমাণ (“আমার ভক্তের পুত্রা আমা হৈতে বড়, সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দৃঢ়” আদি) । ঠাকুরাল—প্রভাব ; ছিও—ছিঁড়ে ; সমুচ্চয়—সংখ্যা ; বহি—বাতীত ; বিরক্ত—উদাসীন ; এই শব্দ প্রাচীন সাহিত্যের কোথাও “ভাজ” অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাউ নাই—ইহার অর্থ সংসারঅনুরাগশূন্য ছিল, এখন ইহা অর্থহ্রষ্ট হইয়াছে । উপস্থান—উপস্থিতি ; পরিহার—প্রার্থনা ; উপহার—মার্জন, পরিহার ; সম্ভার—আয়োজন ; আর্ঘ্য—রাগী (“বিপ্র বলে মিশ্র ভূমি বড় দেখি আর্ঘ্য”) । কিন্তু স্থলে স্থলে ইহার অর্থ “পুত্রা” দেখা যায় । যথা—“বৈষ্ণবের গুরু তিনি জগতের আর্ঘ্য ।” চৈ, ম) উপসন্ন—উপভোগ বা উপসন্ন ; পরতক—প্রত্যক্ষ ; বাহু—বাহুজ্ঞান ; জুয়ায়—বোশা হয়, নিছনি মূল অর্থ, যাহা মুছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, এই শব্দ স্থলে “নির্মূল্য” শব্দ ও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়, যথা “যাবক রঞ্জিত চরণ তলে, জীউ নিরমল্যব পোবিন্দদাস । (প, ক, ত ১০৭১ পদ ।) “বিশ্বর নির্মূল্য করে আয়োগণ”, (লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, আদি) । চেষ্টা এই শব্দ অনেক স্থলেই “ভক্তির আবেগ” অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । ‘কদর্থন—ঠাট্টা করেন ; দৃঢ়—দৃঢ় (“লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী দৃঢ়কর ।” আদি) ; কৌন্তিতে কৌন্টিক ; রায়—রবে ; এনে—এখন ; সাধস—সার্থক ; ভাবক—ক্ষণস্থায়ীভাব যুক্ত (Emotional) “বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম । তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবকের কর্ম ।” চৈ, চ । কাকু—কাকুতি ; ব্যবসায় ব্যবহার—‘এইরূপ প্রভুর কোমল ব্যবসায়’, আদি । প্রকৃত এই শব্দ সংস্কৃতের জ্ঞান অনেক স্থলেই ‘ইতর’ ও ‘সাধারণ’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,—“প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর । লোক শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন অর ।” আদি ; অগ্রজ চৈতন্যমঙ্গলে “প্রাকৃত লোকের প্রায় হাসে বিশ্বস্তর” । চৈতন্যভাগবতে “প্রাকৃত শব্দে ও যোবা বলিবেক আই । আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই ।” (মধ্য) । প্রাকৃত শব্দের এইরূপ অর্থ সংস্কৃতের অম্লরূপ, যথা রামায়ণে “কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্ । ক্লকং প্রাবয়সে ধীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব ।” লঙ্কা ১১৮ ম সং । বিমরিব—বিমর্ষ ; উদার—চিন্তাবৃত্ত । প্রচণ্ড শব্দ এখন ভীতিজনক ক্রবোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে কিন্তু চৈতন্যভাগবতে “প্রচণ্ড অম্লগ্রহ” প্রভৃতি ভাবের ব্যবহার পাওয়া যায় । সম্পত্তি—সমৃদ্ধি (“নবদীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবার পারে ।” আদি) ; লঙ্ঘন—লঙ্ঘন, চালেন—ঠেকাইয়া দেন ; কতি—কোথা । ওবা শব্দ পৌরবর্জনক অর্থেই সর্বদা ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়,—ইহা উপাখ্যায় শব্দের অপভ্রংশ ও পূর্বের মূল শব্দের অর্থেই ব্যবহৃত হইত । আশ্বসাৎ—এই শব্দ এখন অর্থহ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে,—কিন্তু বৈকব সাহিত্যে সর্বদাই ইহা ভাল অর্থে ব্যবহৃত হইত যথা—“ভক্তি দিয়া জীবে অল্প কব আশ্বসাৎ ।” আখরিয়া—উৎকৃষ্ট হাতের লেখা বাহার । চৈতন্যচরিতামৃতে,—হাসিনানি—

হস্তসঙ্কেত, লঘু—কুহ (যথা “লঘু পদচিহ্ন”) ; পাতনা—ভূষ ; ওলাহন—ভর্ৎসনা ; ভ্রমকর—ভাল ব্যবহার কর (ভ্রমকর ছাড় এই মলিন বসন।) ; তরজা—কুটুমস্তা ; নরোত্তম বিলাসে,—উমড়রে—কষ্টপায়, সঙ্গোপন—মৃত্যু ; হাতসানে—হস্তসঙ্কেত, সমাধিয়া—বিবেচনা করিয়া; সমিহীত—ইচ্ছা; পদকল্প তরুতে,—রাতা—রক্তবর্ণ, “রাতা উৎপল, অপরযুগল” ২২ পদ) “নীরে নীরঞ্জন লোচন রাতা “২৮৯ পদ, “মেঘগণ দেখে রাতা “১৮০৪ পদ, কবিকঙ্কণে ও এই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, যথা “কার সঙ্গে বিবাদ করি চক্ষু কলি রাতা”)। বাউল উন্নত, বৈরাগী ; পিছলিতে—ফিরাইতে (“পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আশি”)। তিলাঞ্জলি এই শব্দ এখন “জলাঞ্জলি” যে স্থলে প্রযুক্ত হয়, সেইস্থলে ব্যবহৃত হইত। বুলে—ভ্রমণ করে, “সকল ফুলে ভ্রমর বুলে, কে তার আপন পর। চণ্ডীদাস কহে কানুর পীরিতি কেবল দুঃখের ঘর।” ২১৪ পদ)। চৈতন্যমঙ্গলে,—প্রেমা—প্রেম ; সিলেহ—স্নেহ, মহ—মধু ; উচাট—উষ্মিণ ; তোকানি মোকনি—জনরব। পীরিতি শব্দ পূর্বে ‘পীতি’ অর্থে ব্যবহৃত হইত, যথা “পিতৃশৃঙ্গ পুত্রে মোর পীরিতি করিবে।” উমতি—উন্নত ; সানাসানি—ইঙ্গিত ; নিবড়িল—সমাপ্ত করিল ; বহুগারী—বউ (“মোর ঘরে ছিল এই ঘরের ঈশ্বরী। আজি হৈতে তোর দাসী কোণের বহুগারী।”) ; সায়—সাক্ষ ; বেদিনী—ব্যাথিত (Spmpathisor) আর্ন্তি—কাতরতা ; আউটরা—আলোড়ন করিয়া।” ভক্তিরত্নাকরে,—তাড়ক—কর্ণভূষণ, দাঁদুর—ভেক ; টোটা—বাগান ; সঘাহন—সেবা ; না ভায়—ভাল লাগে না ; ওট—ওঠ, (“বাঁধুলী জিনিয়া রাঙ্গা ওট খানি হাস” এই “ওট” শব্দের অর্থে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিহারী মহাশয় লিখিয়াছেন, “অট অট হাস” ভক্তিরত্নাকর ৮৩৭ পৃঃ দেখুন)। ময়ক—মৃগাক।

বঙ্গভাষায় এই সময় নানা ছন্দঃ প্রবর্তিত হইয়াছিল। পদ-কল্পতরু প্রভৃতি পুস্তকে কবিতাকে একটি পুষ্পিতা লতার স্থায় নানাছন্দে প্রবাহিত হইয়া সৌন্দর্য-জাল বিস্তার করিতে দেখা যায় ; স্বয়ং ভারতচন্দ্র ও বঙ্গীয় ছন্দের মূলধন বেশী বাড়াইতে পারেন নাই ; নিম্নলিখিত পদের সুন্দর ছন্দটি দেখুন ;—“ধনি রঙ্গিণী রাই। বিলসহি হরি সঞ্চে রস অবগাহই। হরি হৃদয় মুখে। তাহুল দেই চুখই নিজ মুখে। ধনি রঙ্গিণী ভোর। ভুলল পোরবে কানু করি কোড়। দুহঁ দুহঁ গুণ গায়। একই মুরবীরকে দুজনে বাজায়। কেহ কেহ কহে মৃদুভাষ। নারী পরশে অবস পীতবাস। কেহ কাড়ি লয় বেণু। রাসে রসে আজ ভুলল কাণু। (পঃ কঃ ১৩১১ পদ।) ত্রিপদী ছন্দের প্রথম দুচরণ্যার্কে মিল রাখা সর্বদা আবশ্যক ছিল না, যথা ;—“আমার অজের, বরণ লাগিয়া পীতবাস পরে ভ্রাম। প্রাণের অধিক করের মুরলী, লইতে আমার দাম। আমার অজের বরণ সৌরভ, যখন বেদিয়ে পায়। বাহ পসারিয়া, বাউল হইয়া, তখন বেদিয়ে যায়। (অনিবাস।) পদগুলি সর্বদাই গীত হইত, সুতরাং কোন অঙ্কন-নিয়মের বশীভূত ছিল না। কোন কোন স্থলে পদ অপরিমিতরূপে

লক্ষ্য হইয়াছে, যথা ;—“জয় জয় দেব কবি-নৃপতি শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম । জয় জয় চণ্ডীদাস রস শেখর অখিল ভুবনে অমুপাম ॥” পং কঃ ১৫ পদ । ছন্দাদি সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব ।

বঙ্গভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে বিভক্তি, অনেকটা ইচ্ছাধীন ছিল ; পূর্ববর্তী অধ্যায় হইতে এই অধ্যায়ে সে বিষয়ে কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় না । এই অধ্যায়েও “কাশীরে গমন” “বৈকুণ্ঠকে গমন” “মাতাতে পাঠান” (মাতাকে পাঠান) “মোহর” (আমার), “তাত”—(তাহাতে), “ইথি” (ইহাতে), প্রভৃতি নানাবিধ অনিয়মিত বিভক্তি দেখা যায় । “চণ্ডালদিক” “পাককর্তাদিক”, প্রভৃতির বহুল ব্যবহার দৃষ্টে “দিগ’ ও “দিগের’ প্রাগ্লক্ষণ বিশেষ রূপে পাওয়া যাইতেছে ।

সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে এইযুগে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষিত হয় ; ব্রাহ্মণের পদরজসেবী, জাতিভেদের দৃঢ় দুর্গে আশ্রিত সমাজ অপরি-বর্তনীয় নিত্যকর্মের নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, নূতনভাবে তীব্র জ্বালাতে সেই শৃঙ্খল গলিয়া ব্রাহ্মণ ও শূদ্র একস্বপ্নে মিশিয়া গেল—নবযুগের কোলে ক্ষণকালের জন্য প্রাচীন সৃষ্টি মগ্ন হইল ; প্রাচীন সমাজ স্বীয় দুর্দান্ত শিঙাটির ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া কিছুকাল স্তম্ভিত হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে স্থলিত পদ পুনরপি স্থির করিয়া স্বীয় অদম্য বালকটিকে শাসন করিতে দাঁড়াইল । এইযুগে মৃদঙ্গের ধ্বনি ও হরিবোলের আনন্দ একদিগে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া উথিত হইতেছে, অপরদিগে এই আনন্দবিষেবী দল বিক্রপ করিয়া বেড়াইতেছে ;—

“কুনিলেই কীর্তন করয়ে পরিহাস । কেহ বলে যত পেট ভরিবার আশ । কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার । পরম উদ্ধতপনা কোন ব্যবহার । কেহ বলে কতরূপ পড়িল ভাগবত । নাচিব, কাঁদিব হেন না দেখিল পথ । ধীরে ধীরে বলিলে কি পুণ্য নহে । নাচিলে গাহিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে । ঠে, ভা, আদি ।

এই দলের কোন কোন অগ্রসর ব্যক্তি কালী-মন্দিরে যাইয়া স্বীয় দৃষ্ট অভিপ্রায়ের মঞ্জুরী চাহিতেছে ;—“এতকহি হাসি হাসি পাণ্ডুরগণ । চণ্ডীর মন্দিরে গিয়া করে আকালন । প্রণমিয়ে চণ্ডীরে কহয়ে বারবার । অদ্যরাত্রি এ গুলিরে করিবে সংহার ॥” ভক্তিরত্নাকর । বৈষ্ণবগণ ও ইহাদিগের ঞ্জ সঙ্গ সহিত পরিশোধ করিতে ক্রটি করেন নাই,—“লোচন বলে আমার নিভাই যেনা নাহি মানে । জ্বল জ্বলিয়া দিব তায় মাঝ মুখ পানে ॥” অমৃত “এত পরিহারে যে পানী নিশা করে ।

তবে লাগি যারি তার মাথার উপরে।” চৈ, ৩। বৈষ্ণবদের গোড়া হল দোণ্ডা-
তের কালীকে সে হাই, হাড়ীর কালীকে চুবা, ও জবা ফুলকে ওড় ফুল
বলিতেন। কালী পূজার মধ্যে কোমরূপে সংশ্লিষ্ট থাকা ইহারা নিতান্ত
পাপকর কার্য মনে করিতেন; শ্রীবাসের বাড়ীতে বিজয়হেতু গোপাল নামক
এক ব্রাহ্মণ রাত্রে “কলারপাতে উপরে খুইল ওড় ফুল। হরিদ্রা সিন্দূর রক্ত-চন্দন
ডঙল।” চৈ, ৮, ৯। কালী পূজার এই আয়োজন দেখিয়া শ্রীবাস বড় বড়
লোককে প্রোতে ডাকিয়া দেখাইলেন “সবারে কহে শ্রীনিবাস হাসিয়া হাসিয়া।
নিত্যরাত্রে করি আমি ভবানী পূজন। আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন। তবে সব
শিষ্ট লোক করে হাহাকার। এছে কর্ত্ত্ব হেথা কৈল কোন চুরাচার। চৈ, ৮, ৯। এই
অপরাধে সেই রসিক ব্রাহ্মণটির কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল বলিয়া চৈতন্য-
চরিতামৃতে বর্ণিত আছে।

এই কলহ বাপার প্রশংসনীয় না হইলে ও একটি সাস্তুনার কথা
এই যে ইহাতে দেখা যায়—জাতীয় জীবনের নিরঙ্ক শক্তি জড়তার বাঁধ
ভাঙ্গিয়া নূতনভাব গ্রহণে উন্মুখতা দেখাইতেছিল।

অবতারবাদ কেবল চৈতন্য সম্প্রদায়ে আবদ্ধ ছিল না; লৌকিক বিশ্বাসের
স্ববিধা পাইয়া চৈতন্যদেবের পশ্চাতে বঙ্গদেশে কয়েকটি নকল চৈতন্যদেব
দাঁড়াইয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস ক্রোধের সহিত জানাইতেছেন পূর্ববঙ্গে
এক চুরায়া আপনাকে রামের অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছিল; ভক্তি-
রত্নাকরে এই স্থলের ব্যাখ্যাস্থলে নরহরি চক্রবর্তী বলেন, এই ব্যক্তির নাম
কবীন্দ্র ছিল। কিন্তু বৃন্দাবন দাস রাঢ়দেশস্থ অপর একজন অবতারের
প্রসঙ্গ বলিতেই ক্রোধে বিশেষ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে প্রথম “ব্রহ্মদৈত্য”
প্রভৃতি নানারূপ অশিষ্ট সংজ্ঞায় বাচ্য করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছিলেন,—
“সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল। অতএব তারে তবে বলেন শিয়াল।” এই স্থলের
ব্যাখ্যায় নরহরি চক্রবর্তী উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে বিশ্রকুলজাত ও “মল্লিক”
খ্যাতি বিশিষ্ট বলিয়া জানাইয়াছেন এবং বৃন্দাবনদাসের স্বর অঙ্কুরণ
করিয়া তাঁহার প্রতি “রাক্ষস”, “পাপিষ্ঠ” প্রভৃতি অসংযতভাষা বর্ষণ
করিতেও ক্রটা করেন নাই।

চৈতন্যদেবের পরেও বৈষ্ণব সমাজে ভক্তিময় বৈরাগ্যের স্বাভাবিক
খেলা কতক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রমশঃ মহোৎসব ব্যাপারাদির
আধিক্যে তাঁহাদের নানারূপ বিলাসবৃত্তির উদ্রেক হয়; এস্থলে অবশ্য

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে হইবে, মাংসের স্বাদ ত্যাগ করিয়া ভৎসল
 পূরণ করিতে চেষ্টিত বৈষ্ণবগণ নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য ও উপাদেয় শাক শবজী
 দ্বারা বাঙ্গালীর আহারীয় সামগ্রীর তালিকা খুব প্রশংসনীয়ভাবে বাড়াইয়া
 ফেলেন। ইহাদিগের নাম সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করা দুঃস্বপ্ন; পাঠক চৈতন্য-
 চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ১ ও ১৫ পরিচ্ছেদে, অন্তঃখণ্ডের ১৬ পরিচ্ছেদে এবং
 পদকল্পতরুর ২৪২৮ সংখ্যক পদে প্রদত্ত খাদ্যতালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত
 করিবেন। এই বিষয়ে আমাদের এই একটি আক্ষেপ যে একদিন রঘুনাথদাস
 ভূনিক্শিপ্ত পচা প্রসাদান্ন কণার এক মুষ্টি খাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন
 এবং চৈতন্যপ্রভু তাহা “খাসাবস্ত” বলিয়া গ্রহণ করিতেন, বৈষ্ণব সমাজের
 সেই এক নিরুত্তির দিন ছিল—ক্রমে ক্রমে সেই গৌরবজনক ব্রাহ্মণ সমাজ
 হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব সমাজ যতই বড় হইতে লাগিল,
 ততই সাধারণ মনুষ্যসুলভ দুর্বলতা ও পাপ তাহাতে প্রবিষ্ট হইল;
 সামাজিক আয়তন বৃদ্ধির ইহা অবশ্যস্বীকার্য ফল বলিতে হইবে। কিন্তু
 চৈতন্যদেবের পরেও ইহাদের মধ্যে অনেক খাঁটি লোক জন্মিয়াছিলেন;
 নরোত্তমদাস দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় রাজবৈভব ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছিলেন,
 তাঁহার প্রভাবে হরিশ্চন্দ্র রায় ও চাঁদরায় প্রভৃতি দত্তাগণ পর্যন্ত সাধুবৈষ্ণব
 হইয়াছিল। শ্রীনিবাস আচার্যের প্রেম বিহ্বলতা, নৈসর্গিক শক্তি ও শাস্ত্রে
 পাণ্ডিত্য তাঁহার জীবনের প্রথমভাগকে কেমন উজ্জল শ্রী প্রদান করিয়াছে।
 একদিনের চিত্র ভুলিবার কথা নহে;—গোস্বামীগণ কৃত গ্রন্থগুলি হারাইয়া
 শ্রীনিবাস পাগলের ন্যায় বীরহাষিরের সভায় প্রবেশ করিয়াছেন, শোকে
 বিহ্বল শ্রীনিবাসের অন্য জ্ঞান নাই, বজ্রাহতের ন্যায় তিনি নিস্পন্দ; সভায়
 ঘাসাচাষ্য ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন,—দেবরূপী দর্শকের অপূর্ণ অবয়ব
 দর্শনে, ভক্তিভরে বীরহাষির প্রণত হইলেন—সভাস্থলীতে তড়িৎপ্রবাহের
 ন্যায় এক আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তারিত হইল; তাঁহার আগমনের কারণ কি
 প্রশ্ন হইল—কিন্তু অসম্ভব দুঃখ-কাতর শ্রীনিবাস উত্তর করিলেন “ভাগবত পাঠ
 সান্ত্র না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন বাঞ্ছনীয় নহে।” সেই
 ব্রহ্মের সময় ও ভক্তি-পূরিত চিত্তে দাঁড়াইয়া তিনি ভাগবতপাঠ করিতে
 লাগিলেন। যেন পাহাড়ের বকে অগ্নির স্রোত বহিতেছিল কিন্তু সহিষ্ণুতার
 অতিমুষ্টি ঋতু হিমাচ্ছন্ন শৃঙ্গ স্তম্ভবাহের কিছুমাত্র চিহ্ন প্রকাশ করিল না।

কি স্নানর ভাগবতে ভক্তি ! কি স্নানর সভা সৌষ্ঠবকারী উজ্জল বিনয় !
শ্রীনিবাসআচার্য্য অশ্রুজল হইয়া ভাগবত পড়িতে লাগিলেন, শোকাবল
স্বরে, ভক্তিমাধা কণ্ঠের আবেগে অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে শ্রীনিবাস
যখন ভাগবত ব্যাখ্যা করিলেন, তখন বীর-হাষির, ব্যাসাচার্য্য প্রভৃতি তাবতে
তাঁহার পদে লুপ্তিত হইয়া পড়িলেন। অশ্রুজলে সভা মণ্ডপ প্লাবিত হইল,
বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির আশাতীত উচ্ছ্বাসে বনবিষ্ণুপুর স্বর্ণপুর হইয়া উঠিল।

কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের এই উচ্চভাব পরে রক্ষিত হয় নাই, ক্রমে ধীরে
এই কীৰ্ত্তি স্বীয় উন্নত গৌরবচ্যুত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইল; পরে স্বয়ং
শ্রীনিবাসের দেবমূর্তিতে বিলাসপঙ্ক লগ্ন হইল; তিনি বীরহাষিরের প্রদত্ত
বহুসংখ্যক অর্থ রীতিমত গ্রহণ করিয়া ধনী হইলেন ও পরিণত বয়সে
শ্রীবর্তমানে শুধু অহুরোধ রক্ষার্থ দ্বিতীয়বার পরিণয় করিলেন। নরহরিচক্রবর্তীর
উৎসাহসূচক বর্ণনা সেইস্থলে আমাদের কর্ণে বাজিয়াছে, তিনি শ্রীনিবাসের
দ্বিতীয় পরিণয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন “গোষ্ঠীসহ রাজার উল্লাস অতিশয়। আচার্য্য
বিবাহে বহু অর্থ ঠেকল যায়। সর্বলোকে ধন্য ধন্য কহে বারেবার। ভঃ রঃ।

কিন্তু বৈষ্ণবসমাজে তখন ও ভক্ত ছিলেন, যাহারা তাঁহার এইসব ব্যবহার
অনুমোদন করেন নাই, যথা—প্রেমবিলাসে, গোপালভট্টের সঙ্গে মনোহর
দাসের কথোপকথন,—

“বিষ্ণুপুর মোর ঘরে হয় বার ক্রোশ। রাজার রাজ্যে বাস করি হইয়া সন্তোষ। আচার্য্যের
সেবক রাজা বীরহাষির। ব্যাসাচার্য্যাদি অমাত্য পরম সুধীর। সেই গ্রামে আচার্য্য প্রভু
বাস করিয়াছে। গ্রাম তুম বৃত্তি আদি রাজা বা দিয়াছে। এই ত কাক্তন মাসে বিবাহ
করিল। অত্যন্ত যোগ্যতা তার যতক কহিলা। মোন হয়ে ভট কিছু না বলিলা আর।
“অলংগাদ অলংগাদ” কহে বারেবার।

ইহার কিছু পূর্বে গোপাল ভট্ট, লোকনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ কৃষ্ণদাস-
কবিরাজকে তাঁহাদের জীবনচরিত লিখিতে নিবেদন করিয়াছিলেন, ইহাদের
সাংসারিকতা ও গৌরবস্পৃহা একবারেই ছিল না।

যাহারা ভক্তির রাজ্যে দেবতা ছিলেন, তাঁহাদিগের দেহে ও যেন বৃহৎ
সাংসারিক স্রবের বায়ু বহিতে লাগিল; নরোত্তমবিলাসে দেখা যায়,
জাহ্নবীদেবী ভোজনান্তে “উজ্জলে” স্নান করিতেন, এক ব্রাহ্মণী পরিচারিকা
“ভক্তি স্নানবস্ত্রে”। তাঁহার অঙ্গ সাবধানে মোছাইয়া দিত, অপর এক পরি-
চারিক বস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। (নগ্নম বিলাস।) মূল কথা

বৈষ্ণব সমাজের সেই প্রেমের কঠোর দেবত্বত পরে আর রক্ষিত হয় নাই। শেষে বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর সান্নিধ্যপাদদিককে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গিনীগণের নুতন অবতার কল্পনা করিয়া পুস্তক লিখিলেন, গদাধর রাধিকা, রূপ সনাতন—রূপমঞ্জরী ও লবঙ্গমঞ্জরী, কবিকর্ণপুর গুণচূড়া সখী-হইলেন; এইরূপে অন্যান্য প্রত্যেক ভক্তগণকেই পূর্বাভতারের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া পবিত্র করা হইল। মুরারি গুপ্ত হুম্মান ও পুরন্দর অঙ্গদের অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং এক লেখক চাক্ষুষ ঘটনা বলিয়া এই অঙ্গীকার করিয়াছেন যে “পুরন্দর পতিত বন্দো অঙ্গদ বিক্রম। সপরিবারে লাক্ষ্মী দ্বার দেখিল ব্রাহ্মণ।” বৈষ্ণব বন্দনা।

বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তির প্রভাব ক্রমে ক্রমে হ্রাস হওয়াতে, জীবনের আদর্শ ক্রমে শুষ্কিত হওয়াতে ভক্তগণ এইরূপে ক্রমে পৌরাণিক ভূত হইয়া পড়িলেন ও ধর্মটি শাস্ত্রের পত্রাবদ্ধ হইয়া পড়িল। চৈতন্যপ্রভুর এত নির্মল ও উন্মাদকর প্রেমধর্ম ধীরে ধীরে বিলাসপঙ্ক ও কুসংস্কারের কুক্ষীগত হইল।

সমাজের অপরদিকে নরহত্যা ইত্যাদি ব্যাভিচার চলিতেছিল, নরোত্তম-বিলাসের এই লোমহর্ষন অংশটি দেখুন—“করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে। ছাপ মেঘ মহিষ-শোণিত ঘর ঘারে। কেহ কেহ মানুষের কাটা মুণ্ড লৈয়া। খর্গ করে করয় নর্দন মত্ত হৈয়া। সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়। হইলেও বিপ্র তার হাত না এড়ায়। সতে দ্রী লম্পট জাতি বিচার রহিত। মদ্য মাংস বিনে না ভুঞ্জয়ে কদাচিত।” (সপ্তম বিলাস) পরন্তু জগাই মাধাই প্রভৃতির বৃত্তান্তে জানা যায়, তাহারা ব্রাহ্মণ হইয়া সর্বদা মদ্য এবং গোমাংস ভক্ষণ করিত * কিন্তু এরূপ বোধ হয় না যে তাহারা জাতি-চ্যুত অবস্থায় ছিল।

এইকালে বাদ্বালী খাইয়া পরিয়া বেশ সুখী ছিল; গৃহজাত ব্যবসাই দৈনিক অভাবগুলি একরূপ সুন্দরভাবে পূর্ণ হইত, বাজারের ব্যয় কিছুই ছিল না বলিলেই চলে। মাধবাচার্যের চণ্ডীতে কালকেতুর বিবাহের ব্যয়ের যে একটা রুদ্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে নিম্নশ্রেণীর বিবাহে যে ব্যয় হইত, তাহার একটা মোটামুটি ওজন পাওয়া যায়। ধর্মকেতু ১০ গণ্ডা কড়া (আড়াই পয়সার কিছু বেশী) লইয়া বাজারে গেল, ব্যয় এইরূপ,—

* “ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ

ডাকা চুরি গরুহ দ্বাঃ সর্বদা।”

চৈ, ডা, মধ্য, ১৭ অঃ।

দুইখানা ধরা (বোধ হয় নেংটা, ধরা বা খটা হইতে খুঁটি শব্দ আসিয়াছে)—

পান	১৫
খয়ের	১২
চুন	১২
মেটে সিম্পুর	১২
খুঞা (একরূপ বস্ত্র)	১৪
মোট ১২৭	

ইহা কবির কল্পিত হিসাব বলিয়া বোধ না। ভদ্রলোকের বিবাহের ব্যয়েরও আর একখানা ফর্দ দেখাইতেছি; চৈতন্যপ্রভুর প্রথম বিবাহ অতি সামান্যরূপে নির্বাহিত হইয়াছিল,—তাহাতে স্বস্ত্রাবল হইতে তিনি গন্ধহরিতকী মাত্র উপচোকন পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয়বারের বিবাহকে একটা প্রকাণ্ড উৎসব বলিয়া বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করিয়াছেন; কথিত আছে এই এক বিবাহের ব্যয়ে পাঁচ বিবাহ স্নানির্বাহ হইতে পারিত, চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা এইরূপ,—“বুদ্ধিমত্ত খান বলে শুন মরুভাই। বামনরা মত কিছু বিবাহে নাই। এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন। রাজকুমারের মত লোকে যেনে যেন।” বিবাহের আয়োজনের মধ্যে দেখা যায়, গৃহ “আলিপনা” দ্বারা সজ্জিত হইল, ও আঙ্গিনার মধ্যস্থলে বড় বড় কতকটি কদলী বৃক্ষ রোপিত হইল; এই বিবাহ উপলক্ষে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ মণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আহ্বান করার কথা ছিল না;—এ নিমন্ত্রণ “গুয়াপান” গ্রহণের। গুয়াপান ও মালা চন্দন সমাগত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইল, কিন্তু “ইতি মধ্যে লোভিষ্ট অনেকজন আছে। একবার লৈয়া পুনঃ আন বৈশ কাছে। আরবার আসি বহা লোকের গহলে। চন্দন গুবাক মালা নিয়া যায় ছলে। সবাই আনন্দে মত্ত কে কারারে চিনে। এতুও হাসিয়া আঁজা করিয়া আপনে। সবরে ভাষল মালা দেহ ভিনবার। চিন্তা নাহি ব্যর কর যে ইচ্ছা বাহার।” এই গুবাক মালাচন্দন বিতরণ উপলক্ষে বৃন্দাবনদাস আরও লিখিয়াছেন, যে সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ বাহা লইয়া গিয়াছিলেন তাহা দূরে থাকুক, ভূমিতলে যে পরিমাণে গুবাক ও মালা পড়িয়াছিল,—“সেই বহি প্রাকৃত লোকের ঘরে হয়। তাহাভেই ভাল পাঁচ বিবাহ নির্বাহ হয়।” উপসংহারে “ককন লোকের চিন্তে হইল উন্নত। সবো বলে ধন্ত ধন্ত ধন্ত অবিবাহ। লক্ষবহু আশিষ্ট এই অবধীশে। হেন অবিবাহ নাহি করে কার বাশে। একত চন্দন মালা দিয়া গুয়াপান। অকাতরে কেহ কিছু নাহি করে দান।” (উ, ভা, আদি)।

ভরসা করি এখনকার কৃপণ ধনীগণ এই প্রাচীন নজিরের বলে ব্যয় সংক্ৰেপ করিতে সক্ষম হইবেন।

সেকালে মানুষের নামের সঙ্গে প্রায়ই একটা অসঙ্গত উপাধি লগ্ন থাকিত, এখনও মধ্যে মধ্যে গ্রামদেশে তাহা না থাকে এমন নহে, কিন্তু সেকালে লেখকগণ প্রকাণ্ডভাবে তাহা পুস্তকে ব্যবহার করিতেন, “খোলাবেচা শ্রীধর”, “কাঠকাটা জগন্নাথ”, প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা “খন্ডভগবান”, “কাল কৃষ্ণদাস”, “ভূঁড়ে শ্রামদাস” “নির্লোম গঙ্গাদাস” প্রভৃতি সাটিকিকেট যুক্ত নামের উল্লেখ পাইয়াছি। শিশু এখন প্রথম পুস্তকেই এই ধারা মুখস্থ করিয়া থাকে “কাণাকে কাণা বলিও না।”। তখনকার গ্রন্থকারগণ বোধ হয় এই তত্ত্ব কথাটি জানিতেন না।

শাসনাদি সম্বন্ধে দৃষ্ট হয় সাধারণ বিচারের ভার কাজির উপর ছিল—কাজির নীচে শিকদার ও শিকদারের অধীন দেওয়ান ছিল; কোর্টালের উপর দায়ীত্বই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল, পুলিশ দারগার কার্য ভিন্ন রাজ্যের নূতন সমস্ত সংবাদের রিপোর্ট কোর্টালের দিতে হইত। হিন্দুরাজ্যগণের পুলিশ দারগার কাজ “নিশাপতি” দিগের দ্বারা করাইতেন; এই “নিশাপতি” ও “কোর্টাল” একইরূপ কর্মচারী বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধবিগ্রহাদির সময় একরাজ্য হইতে অপর রাজ্যে যোক যাতায়াত করিতে পারিত না; নিবিদ্ধ পথে ত্রিশূল পুতিয়া পথিকদিগকে মতর্ক করা হইত। রাজ্যদিগের আদেশ সম্বলিত “ডুরি” লইয়া পথিকগণ যাতায়াত করিতে পারিতেন। এই “ডুরি” একরূপ পাসপোর্টের ন্যায় ছিল। রাজ্যগণ অনেক সময় দস্যুবৃত্তি করিতেন, বীরহাতির এইরূপ একজন দস্যু দলপতি ছিলেন; আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও বহু সংখ্যক দস্যুপতির নাম পাইয়াছি। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ; হরিশ্চন্দ্ররায়, চাঁদরায়, নারোজী প্রভৃতি দস্যুগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রতিগ্রামে রাজা একজন “মণ্ডল” নিযুক্ত করিতেন, এই “মণ্ডল” গ্রামের একরূপ শাসনকর্তা ছিলেন।

আমরা মৈথিলবঙ্গ অধ্যায় শেষ করিবার পূর্বে মিস্রে বুরহ শব্দার্থ-রোদ্দক একটি জালিকা দিতেছি;—

অতএ—অতএব, অধর—অধির, অবক—এইক্ষণ, অমুসজ—ইচ্ছিত, অলঙ্কিত—অলঙ্কারে,
অল—রক্তসর্প, আম—অমৃত, আঁতর—অস্তর, উয়ল—উদিত হইল, উথি—অধি, উদার—ব্যক্ত,
উমড়ি—উপলিঙ্গ, উথল—উথল, কতি—কোথা, কবরক শীলা—কবরস্থান, কানড়—একরূপ ফুল,
কাধার—কুল, কোর—কোড়, খিবি—ক্ষীণ, খেদি—খেলা, পাসরি—ক্ষুদ্র কল, গাধি—গালি,

দ্বীপ—দ্বীপা, গোয়ান—জান, বোরা—সৌরী, হুন্দরী, গোড়ার—লম্পট, চোর ; (“হামি অবুখ নারী তুহঁত গোড়ার, বিদ্যাপতি) । ” — “অবুখা রতন সাধে, গোড়ায়ের ভর পথে, লাপি পাইলে লইবে কাড়িয়া” (প, ক, ১) চকেবা—চক্রবাক, চকুরী—চটক, চোরাবলি—চুরি করিলে, ছটাছটি—প্রকাশ, ছাতিরা—বন্ধ জম্বু—বেন, জয়তুর—জয় ঢাক, জীউ—জীবন, জীক—বাহার, তোড়ল—তাগ করিল, তোর—তোমাকে, ছুগুলি—ছুইবোড়া, দিঠি—দৃষ্টি, লউ—ছুই, খড়ে—দেহ, দোতিক—ছুতীর, ধম্মিল—খোপা নিঙারিতে—ঝাড়িতে, নিয়ড়—নিকট, মুকি—লুকারিত থাকা, পছমিনী—পদ্মিনী, পাতিয়ার—প্রত্যয় করে, পুরুধ—পুরুষ, পবারেল—বিস্তৃত করিল, ফুরন—উগ্ৰুজ, ফুলায়ল—প্রক্ষুট করিল, বরিধতিয়া সার—বর্ষণ করে, বাউর—বাউল, বালি—বালিকা, বিছুরি—বিম্বিত হওয়া, বিহি—বিধাতা, বেসালি—হুঙ্ক জাল দেওয়ার পাত্র, ভাঙ—ক্র, ভাব, ভাগি—ভাষা, ভাখী—ভাষা ভিয়াইল—হইল, ভোখিল—কুখার্ত, মরু—আমার, শিকার—বেশ ভুয়া, শুতিয়া—শুইয়া, শেজ—শয্যা, লামাইল—প্রবেশ করিল, সঞে—স্নেহ, সিহালা—শৈবাল, সিনান—স্নান ।

এখন দেখা যাউক বাঙ্গলা ভাষার উপর হিন্দী কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে কি না ; হিন্দী শব্দে মুচ্ছকটিকাদি নাটকের প্রাকৃতের মত অনেকটা সংপ্রসারণ ক্রিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যথা,—হর্ব—হরিব, মগ্ন—মগন, নির্মাণ—নিরমান, গর্জন—গয়জন, নির্মল—নিরমল, জন্ম—জনম, নির্দয়—নিরদয়, রত্ন—রতন, যত্ন—যতন, প্রকাশ—পরকাশ, দর্শন—দরশন, বধা—বরিষা, ইত্যাদি । এই কোমল শব্দগুলি বাঙ্গলা কথায় ব্যবহৃত হয় না, কেবল পদ্য রচনায় দৃষ্ট হয় । বৈষ্ণব যুগের কবিতায় এই ভাবের কোমল শব্দ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যে ক্রমশঃ তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিয়াছে ; বাঙ্গলাভাষা যে ভাবে রূপান্তরিত হইতেছে, এই সম্প্রসারণ ক্রিয়া সেই পরিবর্তনের অনুকূলে নহে, এজন্য এই প্রথা হিন্দীপ্রভাবের শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয় । দ্বিতীয়তঃ হিন্দী ভাষার অমুনাসিক শব্দের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, বাঁহা, তাঁহা, কবহঁ, যবহঁ প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের উপর চন্দ্রবিন্দু ঘিতে হয়, ঐসব শব্দ যেসব সংস্কৃত শব্দের রূপান্তর, তাহাতে এরূপ কিছুই নাই যদ্বারা এই চন্দ্রবিন্দু সমর্থিত হইতে পারে । চন্দ্রবিন্দু, ‘ঞ’ এবং ‘ঙ’ হিন্দীভাষা হইতে আসিয়া বৈষ্ণব যুগের রচনার প্রাচ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে । (২) এখন ও বঙ্গভাষার আঁধি, ঝুঁড়ে,

* “The same was the case in the Bengali four hundred years ago and the Chaitanya Charitamrita affords innumerable instances of its use in words like বাইকা, বাইকা for the modern বাইরা, বাইরা &c.”

কুঁজ, কাঁক, পুঁথি ইত্যাদি শব্দের অধুনাসিক উচ্চারণ রহিয়া গিয়াছে, অথচ অক্ষি কুটার কুজ, কক্ষ, পুস্তক ইত্যাদি শব্দের রূপান্তরে চক্রবাক্যে কল্পে সমাগত হইবে, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ইহাও হিন্দী-প্রভাবের শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়।

বৈষ্ণবগণ “শ্রী” শব্দের পক্ষপাতী ছিলেন, পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে (ভক্তি রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে) ‘শ্রীকেশ’, ‘শ্রীদর্শন’ ‘শ্রীহস্ত’, ‘শ্রীলালট’, ‘শ্রীপ্রসাদ’ প্রভৃতির অবধি নাই,—সেইসব পুস্তকে ক্ষুদ্র শ্রেণীবদ্ধ অক্ষর-গুলির মধ্যে মধ্যে প্রায়সই পতাকাধারী সেনাপতির ত্রায় “শ্রী” গুলি বড় সুন্দর দেখায়। বৈষ্ণবগণের দ্বারা “মহোৎসব”, “দশা” “লুট” (হরির লুট) প্রভৃতি শব্দের অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে। “বাকা” শব্দ বহুমুখ শব্দের অপভ্রংশ, ইহা এখন “উৎকৃষ্ট” অর্থে ব্যবহৃত হয়; শ্রীকৃষ্ণের বহুমুখ হেতু এই শব্দ গৌরবাস্তব হইয়াছে।

এইস্থলে বৈরাগীগণের শিরোমুণ্ডন সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি পুস্তকে দেখা যায়, মহাপ্রভুর শির-মুণ্ডনের সময় শিষ্যগণ নানারূপ বিলাপ করিতেছে, সামান্য কেশচ্ছেদ উপলক্ষে এত বেশী আক্ষেপ কোন কোন পাঠকের নিকট বিরক্তিকর বোধ হইতে পারে। এবিষয়টি আমরা প্রাচীনকালের মানদণ্ড দ্বারাই মাত্র বিচার করিতে পারি, সে সময় বঙ্গের বহু সংখ্যক শিক্ষিত যুবক সংসার ত্যাগী হইতেন; এখনকার শিক্ষা আমাদিগকে সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করে, তখনকার শিক্ষা সংসার ত্যাগ করিতে শিক্ষাইত; বহু সংখ্যক পিতা মাতার স্নেহের হৃদয় ছিন্ন করিয়া, গৃহস্থের প্রকুলতার বাতিটি চিরদিনের জন্ত নিবাইয়া যুবকগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, একবার শিরোমুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাস লইলে তিনি আর সমাজে প্রত্যাবর্তন করিতেন না। যুবকগণ সে সময় দীর্ঘকেশ রাখিয়া আমলকী দ্বারা তাহা ধৌত করিয়া পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিতেন। এহেন কেশচ্ছেদ অর্থে তখন চিরদিনের জন্য,—পিতা মাতা ও বন্ধু বান্ধবের আশা-
চ্ছেদ বুঝাইত—এইজন্য চৈতন্যপ্রভুর শিরোমুণ্ডনের উপলক্ষে এতদীর্ঘ আক্ষেপোক্তির কথা দৃষ্ট হয়। এই সন্ন্যাস গ্রহণ তখন গৃহস্থের একটি সাধারণ আভ্যন্তরীণ কারণ ছিল,—এখনও বালকগণ পিতা মাতা বর্তমানে কুশাসনে বাসিতে পায় না,—কিন্তু ইহা প্রাচীন ভয়ের শেষ চিহ্ন,—বস্তুতঃ

ভয়ের আর কোন কারণ নাই। রমণীগণ বিধবা হইলে তাঁহাদের কপালের সিন্দুর মোছা ও শাঁখা ভাঙ্গা যত কষ্টের কারণ হয়,—তখন যুবকগণের কেশচ্ছেদ ও সেইরূপ একটি শোকাবহ ব্যাপার ছিল।

বৌদ্ধবুগের কিছু কিছু চিহ্ন বৈষ্ণববুগের ভাষায় পাওয়া যায়, হরিদাসকে প্রলুব্ধ করার বর্ণনোপলক্ষে “মায়ামোহিত” শব্দ পাওয়া গিয়াছে, উহা বুদ্ধদেবের প্রলোভনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, “গোফা” শব্দ বৌদ্ধদিগের, উহাও চৈতন্যভাগবত, গোবিন্দদাসের করচা প্রভৃতি পুস্তকে অনেক স্থলে পাওয়া যায়। আর একটা শব্দ “পাষণ্ডী” ইহা বৌদ্ধগণ অন্য ধর্মাবলম্বীদিগের প্রতি ব্যবহার করিতেম,—হিন্দুর “ম্লেচ্ছ” মুসলমানের “কাফের” খ্রীষ্টানের “infidel” যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বৌদ্ধগণ ও “পাষণ্ডী” শব্দ সেই অর্থেই প্রয়োগ করিতেম, যথা—অশোকের আদেশ লিপিতে,—“দেবানম্ পিয়ো পিরদশি রাজা সবত ইচ্ছতি, সবে পাষণ্ড বংসেযু সবে তে সমমঞ্চ ভান্নম্বন্ধিন্চ ইচ্ছতি।” দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী (অশোকের মাঝান্তর) রাজা এই ইচ্ছা করেন যে পাষণ্ড (বৌদ্ধধর্মে আস্থা শূন্য ব্যক্তি) গণও যেম সর্বত্র নিরাপদে বাস করেন। বৈষ্ণবগণ এইশব্দ বৌদ্ধদিগের মিকট হইতে ধার করিয়া অন্য ধর্মাবলম্বীদিগের প্রতি প্রয়োগ করিতেম।

বৈষ্ণব অধ্যায়ে প্রসঙ্গত এখানে আমরা “সুবুদ্ধিরায়” সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। “সুবুদ্ধিরায়” “গৌড়ের অধিকারী” বলিয়া ছাপা চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ২৫ অধ্যায়ে উল্লিখিত দেখা যায়, এইজন্য ঐতিহাসিক স্বাক্ষরে এই অজ্ঞাত “গৌড়াধিপ” মহাশয়ের জন্য তদন্ত হয়, কিন্তু ঐতিহাসিকগণ ইহার কোনও খোঁজ পাম নাই; আমার নিকট দুইশত বৎসরের অধিক যে হস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামৃত আছে, তাহাতে “পূর্বে যবে সুবুদ্ধিরায় গৌড়অধিকারী” স্থলে “পূর্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিল অধিকারী” এই পাঠ দৃষ্ট হয়; কিন্তু বীরহাঙ্গীরের সত্যসদ ব্যাসাচার্য্যের হস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামৃত এমন কি কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজ হস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামৃত ও রক্ষিত আছে বলিয়া যখন জানা যায়, তখন এবিষয় সহজেই স্বীকাংসা হইতে পারে।

আমরা এখন “সংস্কারবুগের” সন্নিবর্তিত হইতেছি। কিন্তু এই বুগের অব্যতময় গীতি ভ্যাস করিয়া বাইতে কষ্ট বোধ হইতেছে; যে দেবদর্শী

মানুষ একযুগের জন্য স্থল মানবাত্মাকে জাগাইয়া অন্ধভাগ্যনির্দিষ্ট অধিকার গুলির ম্যায়ানুযায়ী ভাগ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, যিনি বর্তমানকে অতীতের কঠোর শাসন হইতে মুক্তি দিয়া ইতিহাসে উজ্জল করিয়াছেন, পদ্মশূ ও বনফুল ছাড়িয়া নয়নাশ্র ঘারা দেবার্চনা নিধাইয়াছেন—বাহার নির্মল অক্ষ বিম্বুতে একযুগের বঙ্গসাহিত্য মণির ন্যায় সুন্দর হইয়া রহিয়াছে, সেই চৈতন্যপ্রভুর পবিত্র নামাঙ্কিত যুগ আমরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে এই ধানে সমাপন করিতেছি।

কিন্তু গীতি কবিতার যুগ গতে পরবর্তী সময়ে বঙ্গসাহিত্যে দেশী পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণের কতকগুলি খাঁটি ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল—সেগুলি তিনশত বৎসর পূর্বের; তাহারা বড় উজ্জল, বড় সুন্দর; তাহা দর্শন করিলে প্রাচীন পর্ণকুটারকেও সুন্দর বলিতে হইবে ও কুটারনিবাসিনীগণের চরিত্রের সৌন্দর্য্যে পাঠক মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন। চলুন, আমরা কাব্যের পরি-
কার আয়নায় বিম্বিত প্রাচীন সামাজিক জীবনের প্রকৃত রূপ দেখিতে যাই।

অষ্টম অধ্যায়।

সংস্কার-যুগ।

১। লৌকিক ধর্ম্ম-শাখা।

২। অনুবাদ-শাখা।

“সংস্কার-যুগ” কেন বলি? সমাজের ইতিহাসে সর্বত্রই হইরূপ শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। যুগে যুগে প্রতিভাবিত পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রাচীন ভাবিয়া নুতনের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, কিন্তু প্রাচীন ভয় হওয়ার জিনিস নহে; প্রতিভাবানব্যক্তি অন্তর্হিত হইলে পুশ্চ প্রাচীন আসিয়া স্বীয় আধিপত্য স্থহির করে; নূতন ও পুরাতন কালের মধ্যে ভাবীসমাজ গঠিত হয়। নূতন সমাজদ্বারা অদ্য ডেজ থাকে, তাহাতে প্রাচীনের আবর্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায়; সেই সঙ্গে প্রাচীনকালের যগিয়ুক্ত ভাবিয়া না যায়, এইজন্য রক্ষণ-শীল-সম্প্রদায় স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। স্বাধীনতার চিহ্ন

সর্বত্রই বিশ্বয় ও আনন্দোৎপাদক, স্বাধীনতার অগ্নিতে অতীতের মৃতদেহের সংকার হয় ও বর্তমানের চিত্র উজ্জ্বল হয়; কিন্তু তথাপি উহার একটা গৃহস্থালী-বিরোধী উৎকলিতা আছে, যাহার সতেজ আবেগে ভাল মন্দ একসঙ্গে মিশিরা লুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে।

বৈষ্ণব-যুগে বঙ্গের চরম প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল; আমরা দেখাইয়াছি বঙ্গসাহিত্যের নিরুদ্ধ-শ্রোত চৈতন্যপ্রভুর চরণস্পর্শে নূতন হর্ষে সজীব হইয়া গমনশীলতা লাভ করে। বৈষ্ণবগদ্যে ও চরিতাখ্যানে আমরা স্বাধীনতার নবশোনার প্রভাব দেখিয়াছি।

কিন্তু প্রাচীন পদ্মপুরাণ, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি শত শত পুস্তক বাঙ্গলাসাহিত্যে পড়িয়াছিল, তাহাদের কোন কোনটির উপর বন্দাবন দাম প্রভৃতি লেখক রোমানল বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা দম্ব হয় নাই। কুন্নরার চরিত্রে, খুন্নার চরিত্রে যে স্থায়ী সৌন্দর্য্যের আভাস ছিল তাহা বাঙ্গালী পাঠক ভূমিতে পারে নাই। যে টুকু ভাল, জীবনে হউক, সমাজে হউক, ইতিহাসে হউক—তাহা দলিত হইয়াও লুপ্ত হয়না, তাহার পুনঃ পুনঃ অনুরোধের হয়,—তাহার মন্মথ মনুষ্য বারংবার ইতিহাসে দেখা দেয়; যাহারা তাহা লুপ্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাহারা তাহার সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া ফেলেন ও তাহাকে নবশক্তি লাভ করিতে সুবিধা দেন। এই যুগে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। কিন্তু রক্ষণ-শীল-সম্প্রদায় ও প্রাচীনকে কতকটা নূতন ছাঁচে ঢালিয়া রক্ষা করেন; আধুনিক চিন্তার নারায়ণতৈল সংযোগে প্রাচীনকে সজীব রাখিতে হয়। রামায়ণ, মহাভারতাদির অনুবাদ, চণ্ডীকাব্য, পদ্মপুরাণ, শিবসংকীৰ্ত্তন ইত্যাদি পুস্তক এই যুগে নবভাবে সংস্কৃত হইয়া পুনরায় লোকমনোরঞ্জন উপযোগী হয়। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, মনসার ভাসান প্রভৃতি তাবৎ পুস্তকেরই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই নূতন সংস্করণ-যুগকে আমরা “সংস্কার-যুগ” আখ্যা প্রদান করিয়াছি।

আমরা দেখাইব কুন্তিবাস, সঞ্জয়, কবীন্দ্রপরমেশ্বর, প্রভৃতি অনুবাদ লেখক বজ্রবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, কাশীলাস, রামমোহন, রঘুনন্দন প্রভৃতির হস্তে,— দ্বিজদানন্দিন, বলরামকবিকল্প প্রভৃতি লেখক মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম প্রভৃতির হস্তে,—ও কাণা হরিদাস, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব প্রভৃতি লেখক

কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ দাস প্রভৃতি একগোষ্ঠী নূতন মনসার ভাসান রচকের হস্তে এইরূপে নবজীবন লাভ করিলেন। কিন্তু প্রাচীন লেখকগণের কীর্তি নবভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন কবিগণ তাঁহাদিগের যশের সমস্ত অংশ অধিকার করিয়া লইলেন,—প্রাচীন কীটভুক্তকাগজের নজিরে আবৃত মহাজন-গণের ঋণের কথা জানা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা কে খোঁজ করে!

এই ঋণের পরিমাণ ও গুরুত্ব কত, তাহা দেখা যাক। মাধবাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ববর্তী চণ্ডীলেখকগণের নিকট মুকুন্দরাম নানা বিষয়ে ঋণী। মূল বিষয়ের ত কথাই নাই,—সমস্তই এককথা; তাহা ছাড়া পংক্তি গুলি পর্য্যন্ত অপছন্দ দেখা যায়। ভারতচন্দ্র স্বীয় নামক মুনীরের মত সিঁধকাটিয়া চুরি করিয়াছেন; তাঁহার গলে যে যশের মুক্তামালা, তাহা তিনি ইহলোকে নিজের বলিয়াই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন কিন্তু যেখানে ন্যায়ের উচিত তুল্যদণ্ডে প্রকৃত অধিকারের ভাগ হয়, সেখানে সেই বড় মুক্তার ছড়ার একগোটা ও তাঁহার থাকে কিনা সন্দেহ। বঙ্গসাহিত্য হইতে দূরে গেলে দেখা যায় কালিদাস পদ্মপুরাণ হইতে, সেক্ষপীরের হলিন্সিয়াড হইতে, মিটন ডাণ্টে হইতে চুরি করিয়াছেন। এই সব পরস্বাপহারক দম্ভা কাব্য-জগতে লক্ষণ ও শ্রেষ্ঠ কেন? ইহার এক উত্তর—ইহারা প্রতিভার রাজদণ্ড লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তছারা বাহা স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাতেই ইহাদের অধিকার বর্ধিত আছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণ সকলেই এক প্রকার দম্ভা। কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি লেখক নানা স্থান হইতে আহৃত রত্নের উৎকৃষ্ট সমন্বয় করিয়াছেন; পৃথিবী কয়তার পূজক,—এজন্য ইহারা অপহরণ করিয়াও লোকপূজার পূশচন্দন পাইতেছেন। কিন্তু বাহারা চুরি করিয়া ঢাকিতে পারেনা,—বাহাদের বিজ্ঞী সমন্বয়ে পল্লবের সঙ্গে শাখার, ত্বকের সঙ্গে হাড়ের মিল পড়েনা, সেই ছর্জাগ্য-গণের জন্যই লোকনিগ্রহের লৌহদ্বর্গ উদ্ভিত হয়। শক্তিমান স্বেচ্ছাচারীর দ্বারা পাপ পুণ্যের কৃত্রিমগণ্ডী নির্ধারিত হইতেছে,—কিন্তু এই সমস্ত সমাজিক উন্নতি ও অবনতির মূলে ভাগ্যদেবী লাড়াইয়া পাগলিনীর মত কাহারও মাথায় ছত্র ধরিতেছেন, কাহারও মাথায় ছত্র কাড়িয়া লইতেছেন।

প্রতিভাবিত কবি মস্তবলে প্রাচীন ও বর্তমান কালের সমস্ত লৌকিক্য অপহরণ করিয়া স্বীয় কাব্যপটে সন্নিবিষ্ট করেন; ইহাকে অপহরণ না

বলিয়া আহরণ বলা উচিত, কারণ অঙ্কনপটু চিত্রকরের জন্য গত যুগের কাব্য-চিত্র ও নব-যুগের নৃত্যাবলী তুল্যরূপই ব্যবহার্য ও তিনই এবিষয়ে একমাত্র সম্ভবান ।

১। লৌকিক ধর্মশাখা ।

মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য,
কেতকাদাস, কেমানন্দ প্রভৃতি ও ঘনরাম ।

মাধবাচার্য্য ।

চণ্ডীর উপাখ্যান বিজ্ঞানদর্শন রচনা করিয়াছিলেন, উহা একটি ছোট খাট ব্রতকথা । চণ্ডীর ভক্তগণ এই ব্রতকথাটি ক্রমে বড় কাব্যে পরিণত করিলেন ; কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরোহিত ঠাকুর যে ব্রতকথা সমাধা করিয়া বাইতেন, তাহা লইয়া বোল পালা গান রচিত হইল ।

“মুকুন্দরামের পূর্বে কতজন কবি এই উপাখ্যান লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না । বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল,* মাধবাচার্য্যের চণ্ডী ১৫৭৯ খৃঃ অব্দে প্রণীত হয় ।† এই চিত্রগুলি সংশোধন করিয়া মুকুন্দরাম নূতন কাব্য প্রণয়ন করেন ।

সংশোধিত চিত্রের পর প্রথম উদ্যমের নমুনা দেখিয়া কাব্যমোদীগণ কতদূর পরিতুষ্ট হইবেন বলা যায় না, তবে একরূপ ভাব-বিকাশের পর্য্যায় লক্ষ্য করিতে যাহারা ইচ্ছুক, তাঁহারা পূর্বে নমুনাগুলি পাইলে আদর করিবেন সন্দেহ নাই ।

বলরাম-রচিত চণ্ডী আমরা দেখি নাই, কিন্তু মাধবাচার্য্যের চণ্ডী মনোমোহনের সহিত পড়িয়াছি । মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের ক্ষমতা এক দরের নহে—মুকুন্দরামের প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর কবির, মাধবাচার্য্য দ্বিতীয়

* মুকুন্দরাম তাঁহার হস্ত লিখিত পুথির দীর্ঘ বন্দনাপত্রে লিখিয়াছেন “গীতের শুরু বজ্রিলাস শ্রীকবিকঙ্কণ” ইহা দ্বারা অনুমান হয় বলরামকবিকঙ্কণের চণ্ডী অবলম্বন করিয়া তিনি দ্বিতীয় কাব্য রচনা করেন । “মেদিনীপুরের লোকবিশেষের সংস্কার, এই বলরামকবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের দ্বিতীয় পুত্র ।” পরিব্রজের পত্রিকা, ১৯০২ আশ্বিন, ১১০ পৃঃ ।

† ইহার লিখক সম্বন্ধে বাহা জানা যায়নি, তাহা পূর্বে আমরা প্রদত্ত হইয়াছে ।

শ্রেণীর কবিগণের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারেন, কিন্তু উভয় কবির প্রতিভায় কতকটা এক পরিবারের লক্ষণ দৃষ্ট হয়; যেন প্রকৃতি সুন্দরী একই হস্তে দুইটি ফুল গড়িয়াছেন, দুইটিতেই স্বভাব-গত অনেক সাদৃশ্য, কিন্তু একটি অন্যটি হইতে বেশী উজ্জল, সুগন্ধি ও সুন্দর, তাই পথিকের চক্ষু সেইটির প্রতি মুগ্ধ হইয়া অপরটিকে উপেক্ষা করে। কিন্তু যেখানে গোলাপ নাই, সেইখানেই পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে মালতী ফুলটির রূপ উপভোগ করা সম্ভবপর; কবিকঙ্কণের সান্নিধ্যের ছায়া হইতে মাধুকবিকে নিরাপদ স্থলে লইয়া গুণের বিচার করা উচিত হইবে; আমরা উভয় কবিকে দেখিয়া ফেলিয়াছি সুতরাং বোধ হয় প্রকৃত বিচারের অধিকারী নহি। মাধুকবির ফুলের কবিকঙ্কণের ফুলের ন্যায় লজ্জা-নতা সুন্দরী গৃহস্থবধূ হয় নাই। এই ফুলের জিহ্বা অসংযত, তাহার চরিত্রে অপরটির ন্যায় সংযত শীলতা ও স্বাভাবিক সরমের বিকাশ পায় নাই। মাধুর লহনা ও খুলনা ততদূর পরিকার ছবি নহে—উহার মুকুলের লহনা ও খুলনার প্রস্থানবস্থা। গলাংশে উভয় কবিরই বেশ ঐক্য আছে— মধ্য মধ্য মুকুল স্থায় কল্পনার কোন রম্য দৃশ্য বা মামুল-চরিত্র-জ্ঞানের কোন বিচিত্র আদর্শ দেখাইতে পূর্বে গল্পের সরলবস্ত্রের পার্শ্বে একটু তীর্থগলীলা করিয়া লইয়াছেন। উষার সিন্দূরবর্ণে প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশের পূর্বে শেষতারার ক্ষীণালোকে আধমুদিত জগত-দৃশ্যের ন্যায়, মুকুলের চণ্ডীর পূর্বে মাধুর চণ্ডী কায়-বিকাশের পূর্বাভাস দেখাইতেছে। মাধুর তুলিতে চণ্ডীকাব্যের যে সব ছায়াপাত হইয়াছিল, মুকুলের বর্ণবিন্যাসক্রমে তাহারা সজীব সুন্দর পদার্থ হইয়াছে।

মুকুল স্বভাবের নিজ ঘরের কবি, মাধু ভ্রমপেক্ষা ক্ষমতায় অল্প কিন্তু তাঁহারও স্বভাবের প্রতি স্থির-লক্ষ্য। ক্ষুদ্র ঘটনা, ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ বিষয় লইয়া অনেক সময় বড় কবির কবিত্ব বিকাশ পায়; কবি ব্যাধের ক্ষুদ্র কুটার বর্ণনা করিবেন, এস্থলে লেখনীর ছেঁড়াকাঁথা, মাংসের পসারা ও ভেরাঙার ধামই বর্ণনীয় বিষয়। এখানে কবির 'নবনীত কোমল,' 'নখকচি কিংকাক জাল' প্রভৃতি কেতারতী উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করার একবারেই সন্নিহিত নাই। মাধু যে কাব্য হাতে লইয়াছিলেন, তাহার যোগ্য ক্ষমতা তাঁহার বেশ ছিল,—“হলি পেলী, খেলী এয়া আইল ব্যাঘ ঘরে। যুগ চর্য পরিখান,

দুর্গন্ধ নরীয়ে ।” প্রভৃতি বর্ণনায় দেখা যায়, মাধু ভেরাওয়ার খাম ধরিয়। ব্যাধের স্বরে উঁকি দিয়া নিজে দেখিয়াছেন ; সেখানে ব্যাধরূপসীগণের অর্দ্ধাবৃত অঙ্গের দুর্গন্ধ সহ্য করিয়াও ভক্তকবি তাহাদের গ্রাম্যরূপের ফটো তুলিয়া লইয়াছেন,—তন্মধ্যে গিন্টি করিতে যান নাই ; বাঙ্গলা প্রাচীন কবিগণের মধ্যে খগরাজ ও তিলফুলের হাত হইতে বাঁহার। নায়ক নায়িকার নগ্ন নিরাস্তরণ রূপটি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের নৈসর্গিক শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে। কোন কোন সময় মাধুববি বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিঃসহায় ভাবে প্রকৃতির হাতে যাইয়া পড়িয়াছেন, কাব্যের মর্যাদা তুলিয়া বালকের ন্যায় একটি বিড়ালের গতি পর্য্যন্ত অনুসরণ করার তৃপ্তি বোধ করিয়াছেন, তাহার এই অসংযত ক্রীড়ায় এমন একটি স্বাভাবিকত্ব আছে, বাহাতে শিশুর পোকা ধরার যত্ন মনে পড়ে,—নিম্নের অংশটি “আব পিজিয়ের” গল্পের মত,—

গুলনায় বলে দিদি মুড়া খাও তুমি। তবে এক লক্ষ টাকা পাইব যে আমি।
ঠেঁমাঠেলি কেনাকলি কেহ নাহি খায়। মাচার তলে থাকি বিড়াল আড় চোখে চায়।
ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাভের কাছে। মুড়া লৈয়া বিড়াল গেল বাড়ীর পাছে।
অনেক বতন করি পুথিলু বিড়াল। হেন বিড়াল মুড়া লৈয়া কার বাড়ী গেল। হাউ
হাউ চিই চিই করিতে করিতে। এ বাড়ী হইতে বিড়াল ও বাড়ী বহিতে। মুড়া গেল
পড়ি কোষাকার গায়েতে।”

কবির রূপ বর্ণনায় ও সর্বত্র সেই স্বভাবের খেলা—কলিকাতা ব্যাধের শৈশবের মুষ্টিটি এইরূপ—“তবে বাড়ে বীরবর। জিনি মস্ত করিব, গজত্ত জিনি কর বাড়ে।
রক্তক আখোট হুত, তারা সব পরাজিত খেলায় জিনিতে কেহ নারে। বাটল বাঁশ লয়ে করে,
পশু পক্ষী চাপি ধরে, কাহার ঘরেতে নাহি যায়। কুজিত করিয়া আঁশি, ঝাকিয়া দারদে
পানী, খুসিয়া খুসিয়া পড়ে যায়।” মুকুন্দরাম এই আভাস দৃষ্টান্তকে বড় করিয়া, উজ্জল করিয়া পরিকার বর্ণকেপে আঁকিয়াছেন, যথা,—

“দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু। বলে মস্ত গজপতি, রূপে সব রক্তি পতি, সবার
লোচন স্থব্ধ হেতু। নাক মুখ চকুকাণ, কুলে যেন নিয়মান, দুই বাহ লোহার সাবল।
রূপগুণ শীল বাড়ী, বাড়ে যেন হাতী কড়া, যেন জায় চামর কুতল। বিচিত্র কপালতটী,
গলার জালের কাঁটি, করবোড়া লোহার শিকলি। বুক শোভে ব্যাঘ্রনখে, জলে রাজা
ধুলি মাখে, কটকটে শোভয়ে ত্রিবলী। দুই চকু জিনি নাট, খেলে দাতা তলি তাঁটি
কানে শোভে স্তম্ভক কুতল। পরিধান রাজা ধূতি, বস্তকে জালের পটী, শিশুনাথে বেদন মতল।
সহিয়া শক্তক ঠেলা, বার সঙ্গে করে খেলা, তার হয় স্বীকন সংঘ। যে জন আকুতি

করে, আহাড়ে ধরনী ধরে, ডরে কেহ নিকটে না রয়। স্নেহ শিশুগণ করে, শশাঙ্ক তাকিয়ে ধরে, বুকে সেলে ধরায় কুকুরে। বিচক্ষণ বাঁচলে বিবে, লভায় জড়িয়ে বাঁচবে স্বকে তার বীর আইসে ঘরে।” ক, ক, চণ্ডী।

উভয় চণ্ডীতে অনেক ছত্র পাওয়া যায়, যুগ্ম ঠিক একরূপ; এক হয় মুকুন্দরাম সেগুলি মাধবের চণ্ডী হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা উভয় কবিই কোন লুপ্তকবির ভূপ্রোথিত ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছেন।

মুকুন্দের কাব্যের প্রায় সমস্ত অংশই মাধুর চণ্ডী হইতে উৎকৃষ্ট; গঠন-প্রণালী, কাব্যার্থ, ঘটনা বৈচিত্র্য প্রভৃতি সকল গুণেই মুকুন্দরামের চণ্ডীতে বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু মাধুর কালকেতু, মুকুন্দের কালকেতু হইতে বিক্রমশালী, মাধুর ভাকুন্নত, কবিকঙ্কণের ভাকুন্নত হইতে শঠতার প্রবীণ। এই দুই চরিত্র সমালোচনার সময় আমরা মাধুর চণ্ডী হইতে সাহায্য গ্রহণ করিব। মাধু প্রকৃত বাঙ্গালী কবির ন্যায় কঠোর বিষয় হইতে কোমল বিষয় রচনার পটু—উঁহার রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক ধূয়া গুলি বন-ফুলের সৌরভময়—নিম্নে কতকটি উদ্ধৃত করিতেছি;—

- (ক) “কানাই তুমি ভাল বিনোদিয়া। নবকোঙ্গি চাঁদ কেলাই ও মুখ বিহিয়া। বনে থাক বন-ফুল দিয়া গাঁথ হার। গোপঘরে ননী খাও গরিয়া তোমার। মাঠে থাক খেদু রাধ, বাঁশীতে বেণু শান। গোপালের ঘরের মণি, গোপালের পরাণ।”
- (খ) কাল জয়রা, বখা মধু তথা চলি যাও। আমার সংবাদ প্রাণনাথেরে জানাও। যে কথা কহিবে প্রভুর বনাইয়া কাছে। হৃদির সত্বসে কৈও লোকে শুনে পাকে। চরণ করলে শত জামাইও প্রণাম। অবশেষে শুনাইও রাধার নিজ নাম।
- (গ) আজু ঘোর মলিনে আসিত কাল। কি করিলে চাঁচ পবন অলি কোকিল।
- (ঘ) শিশু-পুত্র চলি যার অনেক মন্ডানে। কানাই কালী, বলাই দ্বাধা চাঁদের সমানে।

কবি মাধু যুদ্ধ বর্ণনার যে ছন্দ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহার ১৭৩ বৎসর পরে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে সেই ছন্দ অমূল্যরূপে করিয়া যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন; কালকেতুর সঙ্গে কলিগারিপের যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে “যুধে প্রচণ্ড ভাইয়া, কোপে প্রজ্বলিত হৈয়া, মার কুটী সযবে হুকারে। জনাঙ্কনের বত সেলা, শব্দেবত কম্পমানী, নানা অস্ত্র বহিষণ করে। পদাতি পরাতি রণে, অস্ত্রঘরে বন বনে, হুজুরে কুজুরে, চোপাচোপ। অস্ত্র বাহন করি, তুরগ উপরে চড়ি, রাহতে রাহতে কোলাহল। কোপে বলে, কাকবৎ, গুরুরে জাই প্রচণ্ড, মিছা কেন কর হটহট। লুটিন আর গুরির, কালকেতুরে ধরিল, বধর করিব ধূলাপাট।” প্রভৃতির পরে “যুধে প্রতাপ আধিক। ভাবিয়া অসার, ডাক মার মার, সাহায্যে সব আনিয়া” ইত্যাদি একটি প্রতি-ধ্বনির মত গুনায়।

মাথবাচার্যের চণ্ডী চট্টগ্রামের পার্শ্বত্যাগ করিয়া আসিয়া নিরাপদ ছিল, কিন্তু কবিকল্প এখন যুগ্মাশ্রয় প্রভাবে অবশ্যিক লাভ করিয়া তাঁহাকে সেই নিভৃত নিকেতন হইতে তাড়াইতেছেন।

কবিকল্প মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ।

হসেন সাহার রাজত্ব বঙ্গ-ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা ব্যাপক, কিন্তু সাধারণত মুসলমান অধিকারে হিন্দুর অন্ন সংস্থান ক্রমে নষ্ট হইতেছিল, ও উৎপীড়নে দেশ শুষ্ক আতঙ্ক অগ্নিয়াছিল; মুসলমান আইনের একটি ধারা এইরূপ ছিল, “ যদি কোন মুসলমান দেওয়ান হিন্দুর নিকট কর আদায় করিতে উপস্থিত হন, তবে সেই হিন্দুর সম্পূর্ণ অবনতিসহকারে তাহা দিতে হইবে; অপিচ যদি মুসলমান দেওয়ান ইচ্ছা করেন যে কাকেরের মুখে খুঁ প্রদান করিবেন, তবে তাহার তৎক্ষণাৎ মুখ স্বাধন করিয়া তাহা লইতে হইবে,—ইহাতে তাহাদের যুগ্মার বিন্দুমাত্র ও কারণ নাই; এই খুঁ প্রদানের কয়েকটি নিগূঢ় অর্থ স্বীকার করিতে হইবে, ইহা দ্বারা সরকারের আশ্রিত কাকেরের সম্পূর্ণ বস্ততার পরীক্ষা হইবে, এক একমাত্র সনাতন ইসলামধর্মের গোয়র ও মিথ্যাবাদের প্রতি যুগ্মা প্রদর্শিত হইবে।* আইনের দ্বারা পর্য্যাপ্ত এইরূপ মার্জিত ছিল। বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য খুঁজিলে মধ্যে মধ্যে মুসলমান অত্যাচারের কথা ঐসঙ্গক্রমে পাওয়া যায়। স্বর্ধা বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে— “ বাহার মন্তকে দেখে তুলসীর পাত । হাতে গলায় বাঁধি লয় কাজির সাক্ষাৎ । ককতলে মাথা খুঁইয়া বজ্র মারে কিল । পাথর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল । পরেরে মারিতে পরেরে কিবা লাগে বাধা । চড় চাপড় মারে আর বাড় গোতা । ভ্রাক্ষণ সজ্জন তথা বৈসে অভিশর । ধরতে গোয়র না দেয় দুজ্ঞানের ভয় । বাছিয়া ভ্রাক্ষণ পায় পৈন্ডার বার কাখে । পেরদাপণ নাম পাইলে হাতে গলায় কাখে ।” মুকুন্দরামের অনেক স্থলের বর্ণনায় ও এইরূপ অত্যাচারের আভাস পাওয়া যায়। মুসলমান-প্রভাবের ক্রমোন্নতির পশ্চাতে দূর ভাগ্যাকাশের সীমান্তে হিন্দুর স্বপ্ন স্বচ্ছব্দের তারা ডুবিয়া যাইতেছিল; বঙ্গদেশে হিন্দুর হৃদয়গা ও মুসলমানের

* When the Collector of the Dewan asks them (the Hindoos) to pay the tax, they should pay it with all humility and submission : and if the Collector wishes to spit into their mouths, they should open their mouths without the slightest fear of contamination so that the Collector may do so. The object of such humiliation and spitting into their mouths is to prove the obedience of the infidel subjects under protection and promote if possible the glory of the Islam the true religion and to show contempt to false religions (Von Neor's Akbor) আকবর এই আইন রদ করেন ।

সৌভাগ্যের ভাবাই প্রমাণ দিতেছে; হিন্দুর “কুঁড়ে” (কুটার)—মুসলমানের “দানাম”, “এমারত”; হিন্দুর গাঁ (গ্রাম) মুসলমানের “সহর”; হিন্দুর “শস্য” কণ্ঠিত হইয়া যখন মুসলমানের সেবার লাগে, তখন তাহা “ফসল” হিন্দুর “টাকা” (তঙ্কা) করগ্রাহী মুসলমানের হস্তে পৌছিলে “খাজানা”, হয়; স্বভাবের সমস্ত সামিগ্রীতে পল্লীবাসী হিন্দুর অধিকার, “চন্দ্র” “সূর্য্যের” হিন্দু নাম ঘোচে মাই। কিন্তু ক্ষুদ্র মেটে তৈলের “এদীপটি” দাত্র তাঁহার, “বাড়”, “ফামস” “দেওয়ালগিরি”—সমস্ত বিলাসের আলো মুসলমানের; হিন্দু অপরাধ করিলে “কাজি” “মেয়াদ” দেয়; ইহা ছাড়া “বানসাহ”, “ওমরাহ” হইতে “উজির”, “মাজির”, সামান্য “কোটাল” “পেরাদা”, “বরকলাজি” “নফর” পর্য্যন্ত সকলই মুসলমানীশক; “জমি”, “তালুক”, “মুগ্ধুক” প্রভৃতি মুসলমানী শব্দ; “জমিদার”, “তালুকদার” ও তাই; উপাধিগুলি ও তাবত মুসলমানী—“জমলদার” “মজুমদার”, “হাবিলদার” সম্মানসূচক “সাহেব”, প্রভৃতিসূচক “হজুর” এই সবভাষা যত্নের ধরে ধরে প্রবেশ করিয়া হিন্দুর ভাষাকে যখনাধিকারচিহ্নিত করিয়াছিল।

বঙ্গদেশের রাজনৈতিক বিপ্লব দ্বুপন্নীর ক্লষককবিকে ও গৃহ স্থপে বঞ্চিত করিল। মামুদ সরিফ মামক ডিহিদারকে কবি মুকুন্দরাম দুর্গপনের কালীর বর্ণে অঙ্কিত করিয়া তাঁহার অমর কাব্যের একপার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছেন। এই ব্যক্তির অত্যাচারে প্রজাগণের দুঃখ অসংখ্য হইয়া উঠিল, সরকারগণ খিল ভূমি আবাদী বলিয়া লিখিয়া লইল, তাহার খাজানা শোধ করিতে না পারিয়া ধাম, গরু বিক্রয় করিল, বাজারে জমিবের মূল্য হ্রাস হওয়াতে টাকার দ্রব্য দশ আনার বিক্রয় হইতে লাগিল। পোদারগণ প্রত্যেক টাকায় আড়াই আনা কম দিতে আরম্ভ করিল ও আমলাগণ এক কুড়ার মাপ খর্ব্ব করিয়া ১৫ কাঠায় বিক্রয় ধরিতে লাগিল। এদিকে প্রজাগণ স্বর্কস্বাস্ত হইয়া পাছে প্রাণটি লইয়া পলাইয়া যায়, এইজন্য কোটাল ও জমাদারগণ পথ অবরোধ করিয়া পাহাড়া দিতে লাগিল।

মরিচ মুকুন্দ সাত পুঙ্খ ধাবৎ চাবাবাদ করিয়া দামুনায় বাস করিতে- ছিলেন,—এই দামুনা পল্লীতে* তাঁহার কবিতায় প্রথম নমুনা “শিবকীর্তন”

* বর্ধমান সিলিগুড়ির নিকটবর্তী। এই গ্রাম রত্নামুনীর তীরবর্তী।

প্রসূত হয়, কিন্তু এবার এই রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি স্বীয় গ্রামে কোনরূপেই থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্ননিব গোপীনাথনন্দী ক্রমবদ্ধিষ্ণু খাজনার দাবী পূর্ণ করিতে না পারিয়া বন্দী হইলেন, কবি গভীর খাঁর সহিত যুক্তি করিয়া চণ্ডীগড়ের ত্রীমস্তখাঁর সাহায্যে, শিশু পুত্র, স্ত্রী ও জাতা রামানন্দের সহিত পলাইয়া দেশ ত্যাগী হইলেন। “তেল বিনা কৈয়ু স্নান” এবং “শিশুকাদে ওদনের তরে” প্রভৃতি দু'একটি ইঙ্গিতবাক্যে সেই বিপদাপন্ন ক্ষুদ্র পরিবারটির শোচনীয় ছরবস্থা চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। গভীর দুঃখে কোনও সময় গভীর ব্যাকুলতা জন্মে, তখন নির্ভর ও ভক্তিপূর্ণ অশ্রু চক্ষে উচ্ছলিত হয়, সংসারের অন্য অবলম্বন-রহিত হইলে যিনি শেষের আশ্রয়, তাঁহারই পদে মামুষের মনের স্বভাবপ্রবৃত্তি ধাবিত হইয়া থাকে। মুকুন্দ এই সময় জলপথে যাইতেছিলেন, জলের সাপলা কুড়াইয়া নয়নজল মিশাইয়া চণ্ডীদেবীর পদে উপহার দিলেন, স্বপ্নে চণ্ডী তাঁহাকে কাব্য লিখিতে আদেশ করিলেন; কবি এই স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার চণ্ডীকাব্য তাই এত সুন্দর হইয়াছে; দৈবশক্তিতে বিশ্বাস জন্মিলে মানুষী শক্তি বাড়িয়া যায়, ইহা কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কবি তেলি গাঁ, গোড়াই নদী, তেউটা, দাকুকেশ্বর, আমোদরনদ, গোথরা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া আরড়া ব্রাহ্মণভূমির রাজা রঘুনাথরায়ের শরণ লইলেন; রঘুনাথরায়ের পিতার নাম বাঁকুড়া রায়,—তাঁহার অন্তর্গৃহে কবি রাজপরিবারের শিশুগণের শিক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন, এই ব্রাহ্মণভূমিতে রঘুনাথ রায় তাঁহাকে দশআড়া ধান মাপিয়া প্রদান করেন, এই স্থানের অন্তর্জলে পুষ্ট হইয়া কবি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন।

যখন কবি আরড়াতে* আসিয়া চণ্ডীকাব্য সমাধা করিয়াছিলেন, তখন মানসিংহ “গোড়বঙ্গ উৎকলের” রাজা হইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দামুন্ডা হইতে পলাইয়া আসেন তখন “অধর্ম্মী রাজা”র (সম্ভবতঃ হুসেন কুলিখাঁ অথবা মজফরখাঁ) হস্তে বঙ্গের শাসনভার অর্পিত ছিল।

* এই আরড়া গ্রাম বর্তমান ঝাটাল খানার অধীন ও জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত। আরড়ার ব্রাহ্মণ রাজা রঘুনাথের বংশধরগণ এখনও ঐ স্থানের ২ ক্রোশ দূরে “সেনাপত” গ্রামে বাস করিতেছেন; তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি এখন বর্তমান রাজা দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। রঘুনাথ রায়ের বর্তমান বংশধর রামচন্দ্র দেবের অতি বংশসম্রাট সম্পত্তি আছে।

কবির স্বহস্ত-লিখিত চণ্ডীর পাঠ এইরূপ, “৫ম রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুদাসকে ভূম, গোড়বঙ্গ উৎকল অধিপ। অধর্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মামুদ সরিফ।” কবির ধন্যবাদপাত্র, প্রবল বিক্ষুব্ধক্তি পরায়ণ, রাজা মানসিংহ কখনই দ্বিতীয় ছত্রের “অধর্মী রাজা” হইতে পারেন না। বিশেষ যদি মানসিংহের সময়ই কবি পলাইয়া আসিতেন, তখন তাঁহার প্রবল বিক্ষুব্ধক্তি সত্যেও কবির তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া কখনই সম্ভবপর নহে; উক্ত ছত্র কয়েকটির অর্থ এইরূপ “এখনকার রাজা মানসিংহ ধন্য, তিনি গোড়বঙ্গ উৎকলের অধিপ, (প্রজাদিগকে সুখে রাখিয়াছেন)। কিন্তু অধর্মী (যবন) রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে মামুদ সরিফ খিলাৎ পাইয়া অনেক অত্যাচার করিয়াছিল”, ইত্যাদি। “শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। সেইকালে দিলা গীত হরের বনিতা” “অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে, দামুন্যা হইতে পলাইয়া আসিবার পথে চণ্ডীদেবী কবিকে পুস্তক রচনার আদেশ প্রদান করেন; এই আদেশের ১১১২ বৎসর পরে পুস্তক সমাধা করিয়া যখন কবি গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ লিখেন, তখন বঙ্গদেশের শাসনকর্তা রাজা মানসিংহ ছিলেন। গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ সমস্ত প্রাচীন কবিই গ্রন্থ সমাধা করিয়া লিখিতেন; বটতলার ছাপা পুস্তকে ইহা পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া ইহা পূর্বে রচিত হয় নাই, “এই গীতি হইল যেমনে” কথাটি দ্বারাও দৃষ্ট হয়, গীতি সমাপ্ত হওয়ার পরই মুখবন্ধটি রচিত হইয়াছিল। এখনও গ্রন্থ রচনা শেষ হইলে লেখকগণ ভূমিকা লিখিয়া থাকেন। ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে কবির দামুন্যা ত্যাগ স্বীকার করিয়া তখন তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর ধরিয়া লইলে অনুমান ১৫৪৭ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর ঠিক মধ্যভাগে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। *

কবিকঙ্কণের পিতামহের নাম জগন্নাথমিশ্র, পিতার নাম হৃদয়মিশ্র। এই হৃদয়মিশ্রের উপাধি ছিল “গুণরাজ্য”। হৃদয়মিশ্রের পুত্রগণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মত ভেদ আছে; কবি নিজে জানাইয়াছেন, তাহার স্ত্রীকান্ত কবিচন্দ্র ছিলেন, কনিষ্ঠ রামানন্দের কথাও আমরা তাঁহার নিকট হইতেই জানিতে পারিলাম। “কবিচন্দ্র” উপাধি কি আদ্যত নাম ইহা

* চণ্ডীকাব্য সমাধার সময় কবির বয়স ৪০ বৎসরের নূন ছিল বলিয়া বোধ হয় না, এই কাব্যে কবির পুত্রবধু, ভাসতার নাম ও পৌত্রের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

সম্পর্কে মতের বিভিন্নতা আছে। শিববোধকে যে “অবোধ্যারাম” রূত “দাতাকর্ণ” পাওয়া যায়, সেই অবোধ্যারামই কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। আমার ধারণা এই, কবিচন্দ্রের নাম ছিল “নিধিরাম”, চণ্ডীকাব্যের হস্তলিখিত একখানা প্রাচীন পুঁথি আমার নিকট আছে, তন্মধ্যে “বঙ্গ মাতা সুরধুনী” শীর্ষক গল্পাবল্যমাটি “নিধিরামের” ভণিতাব্যুক্ত পাইয়াছি। মুকুন্দরামের রচিত পুস্তকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূত গল্পাবল্যমাটি যোজন্য করিয়া দেওয়া স্বাভাবিক, যাহা হইক এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা সম্ভব নহে। নিধিরাম, মুকুন্দরাম ও রামানন্দ এই তিন নামে ‘রামের’ ঐক্য আছে। কবিচন্দ্র প্রণীত দাতাকর্ণ ও গোবিন্দ মঙ্গল আমরা পড়িয়াছি। চণ্ডীকাব্যে ও গোবিন্দমঙ্গলের উল্লেখ আছে। গোবিন্দ মঙ্গল হইতে পরে কিছু তুলিয়া দেখাইব; ইহাছাড়া ক্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে “অঙ্গদের রামবার” টিতে “কবিচন্দ্রের” ভণিতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু খাটি প্রমাণের অভাবে “কবিচন্দ্র” পাইলেই মুকুন্দরামের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে জড়িত করা আমাদের সাহসে কুলায় না।

মুকুন্দরামের পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র “মীন মাংস” ত্যাগ করিয়া গোপাল আরাধনা করিয়াছিলেন,—কবির মাতার নাম, ‘দৈবকী’, পুত্রের নাম, ‘শিবরাম’, পুত্রবধুর নাম ‘চিঞ্জলোখা’ কন্যার নাম ‘বশোদা’ ও জামতার নাম ‘মহেশ’ ছিল। এখন ও কবিকঙ্কণের বংশধরগণ বর্ধমানের রায়না ধানার অধীন ছোটবৈনান গ্রামে বাস করিতেছেন।*

* কবির হস্তলিখিত পুঁথি বামুন্ডার এখনও রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে এই কয়েকটি ছত্র দৃষ্ট হয়,—“করদিকুলের রাজা, হুকৃতি তপন ওকা, তন্ত্র হত উমাপতি নাম। তনয় মাধব শর্মা, হুকৃতি হুকৃতকর্ণা, তার নয় তনয় সোদর। উদ্ধরণ, পুরন্দর, নিত্যানন্দ ছুরেশ্বর, বাহুবল, মহেশ সাদর। মর্কণ্ডের অমূল্যাত, মহাবিক্রম জগন্নাথ। একভাবে পুজিল শঙ্কর। বিশেষ পুণের ধাম, হুহুত হনয় নাম। কবিচন্দ্র তাঁর বংশধর। অমূল্য মুকুন্দ শর্মা। হুকৃতি হুকৃতকর্ণা, নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান। শিবরাম বংশধর, তুপা কর মহেশ্বর, রক্ত পুত্র গোবিন্দ জিনয়ান।”—ঐহুকৃত মহেন্দ্রনাথ ঝিল্লিমিষি মহাশয় বলেন, কবিকঙ্কণের শিবরাম ক্রিয় অপর একপুত্র ছিল, তাঁহার নাম গঙ্গানন এবং কবির কণ এখন জিন হানে বাস করিতেছেন, ১ম দাদুজান, ২য় বীরসিংহ, ৩য় হুধলীর অন্তঃপাতী রাখাবল্লভপুরে। বিদ্যামিষি মহাশয় আরও বলেন “কবিকঙ্কণের অধস্তন বট, সপ্তম, নবম ও দশম পুরুষ অব্যাবধি জীবিত।” পরিষদের পত্রিকা, আবহ ১৩০২, ১১৯ পৃষ্ঠা। এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ঐহুকৃত অধিকাচরণ দত্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ এতদ হইয়াছে—অমূল্যনান, ১২৯৯ সাল দ্বাঃ ৩২ঃ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কবিকল্প সঙ্কে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। লহনা ও খুলনার বিবাদ উপলক্ষে একজন মহিলে কোমল হয় বর। বিশেষিরা জামেন চক্রবর্তী ঠাকুর।” কবি এইভাবে একটি স্পষ্ট ও দৃঢ় ইঙ্গিত দ্বারা যেন বুঝাইয়াছেন, তাঁহার দুই জী ছিল। কবি তাঁহার ভাষ্যসহ মাণিকচন্দ্র নামক এক অধ্যাপকের নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, একথা আমরা নিগদে জানাইয়াছেন। “পাথরকুচা”—নিবাসী গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ব্রাহ্মণভূমির রাজ সভার “চণ্ডীকাব্য” প্রথম গান করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বদত্তী আছে।

কবিকল্প প্রথম শ্রেণীর কবি, কিন্তু তিনি যে সমাজের কটো তুলিয়া-ছিলেন তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর। ষোড়শ শতাব্দীর জীবন্ত ইংরেজসমাজ আর সেই যুগের স্তিমিত সুখ দুঃখের আলয় বঙ্গীর কুটার একরূপ দৃশ্য নহে। কিন্তু আল্লাইনগীর্ষে দ্বিযামার শশীরঙ্গি ও পরীগ্রামের বর্ষা-প্রপাতসিক্ত তরুণ্য এই উভয় দৃশ্যে সৌন্দর্যের বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও উভয়কেই উৎকৃষ্টভাবে অঙ্কন করিতে প্রথম শ্রেণীর তুলির প্রয়োজন। সেক্ষণীয়রের হাতে যে তুলি ছিল, মুকুন্দরাম ও সেইরূপ এক তুলি লইয়া চিত্র করিয়াছিলেন, কিন্তু দৃশ্যগুলি একদরের নহে। এইদেশে ইতি-হাসের মধ্যঅধ্যায়ে রাম, ভীষ্ম, অর্জুন, নল প্রভৃতি আদর্শ পুরুষগণের শ্রেণী একবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে কিন্তু সীতা সারিতী দময়ন্তী প্রভৃতি রমণীগণের শ্রেণী কতকাংশে অবিকল রহিয়াছে। স্বামীর সঙ্গে বনগমন না করিলেও সেদিন পর্যন্ত বঙ্গীয় রমণীগণ হস্ত মুখে স্বামীর শ্রাণে পতঙ্গের ন্যায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। নিয়শ্রেণীর অশিক্ষিতা ফুলরা, খুলনা ও বেহলাকে চিনিতে বিলম্ব হইলেও তাহারা সেই পৌরাণিক রমণীগণেরই ভগ্নী এবং এক বংশের লক্ষণাক্রান্ত। মুকুন্দরামের চণ্ডীতে পুরুষের পৌরষ না থাকিলেও উৎকৃষ্ট রমণী চরিত্র বিরল নহে।

কাব্য লিখিতে লিখিতে যখন অল্পদূরীত নির্মল ও প্রতিভাবিত হইয়াছে তখন মুকুন্দরাম নিজের লেখনী ছাড়িয়া দিয়াছেন, চরিত্রগুলি হস্ত পরি-হাস ও কথা বার্তা বলিয়াছে, তিনি ভণিতার নিজের নাম নাই করিয়া প্রবৃত্ত ছিন্ন রাখিয়াছেন। এইভাবে বরনিকার পশ্চাতে যাইয়া সঙ্কেত কার্য্য করা কৃতকটা প্রকৃতির নিজের কার্য্য করার ভাষ। সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটকলেখকগণ যাত্রা এই গুণ দেখাইয়া থাকেন; যুরারি শিশুর সঙ্গে কালকেতুর সাংকাতের অংশটি দেখুন;—

“বনে বড় ছুটশীল, নামেতে সুরারি শীল, লেখা জোখা করে টাকা কড়ি। পাইয়া বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর পাড়া, মাংসের ধারয়ে দেড় বড়ি।—খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।—কোথা হে বণিকরাজ, বিশেষ আছয়ে কাজ, আমি আহিলাম সেই হেতু। বীরের বচন শুনি, আসিয়া বলে বেজাগী, আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার। প্রভাতে তোমার খুড়া, গিয়াছে খাতক পাড়া, কালি দিব মাংসের উধার। আজি কালকেতু বাহযর।—কাঠ আন একভার, হাল বাকী দিব ধার, মিষ্ট কিছু আনিহ বদর। শুনগো শুনগো খুড়ী, কিছু কার্য আছে দেড়ী, ভান্ধাইব একটি অঙ্গুরী। আমার জোহার খুড়ী, কালি দিব বাকী কড়ী, অন্য বণিকের ঘাই বাড়ী।—বাপা এক দণ্ড কর বিলম্বন। সহস্র বদনে বাণী, বলে বেণে-নিভাণী, দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন। ধনের পাইয়া আশ, আসিতে বীরের পাশ, ধার বেণে ষিড়কীর পথে। মনে বড় কুতূহলী, কাঁধেতে কড়ীর ধলী, হড়পী তড়াঙ্গু করি হাতে। করে বীর বেণেতে জোহার। বেণে বলে ভাই পো, এবে নাহি দেখি তো, এতোর কেমন ব্যবহার। খুড়া উঠিয়া প্রভাতকালে কাননে এড়িয়া জালে, হাতে শর চারি প্রহর জমি। ফুল্লরা পশার করে, সন্ধ্যাকালে ঘাই ঘরে, এই হেতু নাহি দেখ তুমি। খুড়া ভান্ধাইব একটি অঙ্গুরী।—হয়ে মোর অহুকুল, উচিত করিও মূল, তবে সে বিপদ আমি তরি। বীরের অঙ্গুরী, বাণিয়া প্রণাম করি, জোঁথে রত্ন চড়িয়ে পড়ান। কুঁচ দিয়া করে মান, বোল রতি দুই ধান, শ্রীকবি কঙ্কণ রস গান।

সোণা রূপা নহে বাপা এ বেসা পিতল, ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জল। রতি প্রতি হইল বীর নশগণ্ডা দর। দুধানের কড়ি আর পাঁচ গণ্ডা ধর। অষ্টপণ পঞ্চগণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি। মাংসের পিছিয়া বাকী ধরি দেড় বড়ি। একুনে হইল অষ্টপণ আড়াই বড়ি। কিছু চালু চালু খুদ কিছু লহ কড়ি। কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি পাই। যেজন অঙ্গুরী মিল দিব তার ঠাই। বনে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট। আমা সঙ্গে লওনা করি না পাবে কপট। ধর্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল নেনা নেনা। তাহা হইতে দেখি বাপা বড়ই সেয়ানা। কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া। অঙ্গুরী লইয়া আমি ঘাই অস্ত্র পাড়া। বেণে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বড়ি। চালু খুদ না লইও গণে লও কড়ি।”

লহনার সঙ্গে খুরনা বিবাদ করিতেছে, কবির ইহা বর্ণনীর বিষয়। কলহাকৃষ্ণা প্রতিবাসিনীগণ,—“চুলাচুলি দুসতিনে অঙ্গনেতে কিরে। চাহিয়া রহিল সবে নিবারিতে নারে। চাহিয়া রয়েছ কেন নাকে হাত দিয়া। উচিত কহনা কেন ভাতার পুত খেয়ে।” শেষ ছটি উক্তি লহনার, কিন্তু কবির তাহা বলিবার অবকাশ নাই। মূল কথা কবি বর্ণনা আরম্ভ করিয়াই ঠিক বর্ণিত ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করেন ও সম্পূর্ণরূপে তৎপর হইয়া পড়েন, তিনি তখন চক্ষে দেখিয়া লিখেন। ধনশক্তি চাঁদ বণিককে মালাচন্দন দেওয়াতে নিমন্ত্রিত বণিকগণ ক্রন্দ হইয়াছে। তাহাদের বাক্যবিতণ্ডা ও কলহ কবি যেন দেখিতে দেখিতে নোট করিয়া গিয়াছেন,—

“এমন বিচার সাধু করি মনে মনে। আগে জল দিল চাঁদ বেশের চরণে। কপালে চন্দন দিয়া মালা দিল গলে। এমন সময়ে শব্দ দন্ত কিছু বলে। বদিক সভায় আমি আগে পাই মান। সম্পদে মতিয়া নাহি কর অবধান। বেকালে বাপের কর্ত্ত কৈল খুসদন্ত। তাহার সভায় বেণে হৈল যোলশত। যোলশতের আগে শব্দদন্ত পাইল মান। খুসদন্ত জানে ইহা চন্দ্র মতিমান। ইহা শুনি ধনপতি করিল উত্তর। সেইকালে নাহি ছিল চাঁদ সদাগর। ধনে মানে কুলে শীলে চাঁদ নহে ঝাঁক। বাহির মহলে যার সাত ঘড়াই টাকা। ইহা শুনি হাসি কহে নীলাধর দাস। ধন হেতু হয় কিবা কুলের প্রকাশ। ছয়বধু যার ঘরে নিবসয়ে রাঁড়। ধনহেতু চাঁদবেণে সভা মধ্যে ঝাঁড়। চাঁদ বলে তোরে জানি নীলাধর দাস। তোমার বাপের কিছু শুন ইতিহাস। হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আমলা। বতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা। নিরন্তর হাতাহাতি বারবধুর সনে। নাহি মান করি বেটা বসিত ভোজনে। কড়ির পুটলী সে বাঁধিত তিন ঠাই। সভা মধ্যে কহ কথা কিছু মনে নাই। নীলাধর দাস কহে শুন রামরায়। পসরা করিলে তাহে জাতি নাহি যায়। কড়ির পুটলী বাঁধি জাতির ব্যভার। আঁটো ছোপড়া খাইলে নহে কুলের খাখার। নীলাধর দাস রামরায়ের স্বশুর। ধনপতি গল্পি কিছু বলিল প্রচুর। জাতিবাদ হয় যদি তবে হই বন্ধ। বনে জায়া ছাগ রাখে এবড় কলঙ্ক।”

আর একটি গুণ, মুকুন্দ কবি সংসারের খাঁটরূপভিন্ন অন্য কিছু কল্পনা করেন না; তিনি মিথ্যা কল্পনার প্রতিশ্রুত অর। যেখানে বাধ্য হইয়া কোন দীর্ঘ রূপকথার অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে ও প্রকৃত রাজ্যের কথা দ্বারা তাহা মথাসাধ্য সংযত ও সত্যের আভাযুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন,—স্বপ্নের মধ্যে জীবনের রেখা আঁকিয়াছেন। পশুর সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধের অংশটি পাঠ করুন। কবির স্পষ্ট অঙ্গুলী সঙ্কেতে এই যুদ্ধের বর্ণনাটি আমার নিকট একটি গূঢ় ও মহিমাযুক্ত রাজনৈতিক বিপ্লবের কথার ন্যায় বোধ হইয়াছে। পশুগণ যুদ্ধে হারিয়া ভগবতীর নিকট কাদিতেছে—তঁাহাদের সঙ্গে চণ্ডীর কথোপকথন এইরূপ—

চণ্ডী—সিংহ তুমি মহাভৈরব, পশু মধ্যে তুমি রাজা, তোর নখে পাবাণ বিদরে। শুনিয়া তোমার রা, কম্প হয় সর্ব গা, কি কারণে ভয় কর নরে।

সিংহ—বীর ক্ষত্রি অদ্ভুত, দ্বিতীয় যমের দুত, সমরে হানয়ে বীর রথ। দেখিয়া বীরের

ঠান, ভয়ে তহু কম্পমান, পলাইতে নাহি পাই পথ।

চণ্ডী—আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ, কে পার তোমার লাগ, পবন জ্বিনিতে পার জোরে। তব নখ হীরাধার, দশন বজ্রের সার, কি কারণে ভয় কর নরে।

বান্ধ—যদি গো নিকটে পাই, বাড় ভাদি রক্ত খাই, কি করিতে পারি আমি দুরে। স্বর্ঘ্য নহে তার বাণ, একে একে লয় প্রাণ, দেখি বীরে প্রাণ কাঁপে ডরে।

চণ্ডী—পণ্ডা যথো ভূমি পণ্ডা, উত্তর ভোমার খাড়া, বিরোধ না কর কার সনে।
ভূমি যদি সনে কর, প্রের করিতে পার, মরে ভয় কর কি কারণে।

পণ্ডা—কালকেতু মহাবীর, দুই হতে মারে তীর, খর্গে তার কি করিতে পারে।
যায়ের অন্তরে খেলে, বজ্রি দশন ভালে, পণ্ডগণে মহামারি করে।

চণ্ডী—ভূমি হস্তী মহাশর, ভোমার কিসের ভয়, বজ্রসম ভোমার দশন। তবে কোপে
যেই পড়ে, বধপথে সেই মড়ে, কেবা ইচ্ছে ভয় দশন।

হস্তী—ছই চারি কোশ যায়, তবে মোর লাগ পায়, উলটরা শুভে মোরে খেঁচে। মোর
পিঠে মারে বাড়ি, লগে যায় তাদাতাড়ি, হাসলের ধূলা লয়ে বেচে। ইত্যাদি।

বনে হয় যেন, পণ্ডবুদ্ধ উপলক্ষ্য করিয়া কবি মাহুঘীষ্মের কথাই
আভাস দিয়াছেন। উদ্ধৃত অংশ হইতে এবিধের আরও স্পষ্ট ইঙ্গিত
আছে; ভালুক কাদিয়া বলিতেছে “বনে থাকি” বনে থাই জাতিতে ভালুক।
নেউনী, চৌধুরী নহি, না রাখি ভালুক।” হস্তী বলিতেছে,—“বড় নাথ, বড় গ্রাম
বড় কলেবর। লুকাইতে হান নাই বীরের গোচর। পলাইয়া কোথা বাই, কোথা গেলে
তরি। আপনার রক্ত দুটা আপনার অরি।” ইত্যাদি।

এই কবির লেখনীর বড় চমৎকার গুণ এই যে উহার মস্তপুত স্পর্শে
পণ্ড জগতে মাহুঘী তথের বিকাশ পায়; কবি প্রকৃতির ফুল পল্লব
বর্ণনাগুলিও মাহুঘী উপমা দ্বারা সজীব ও উপভোগ যোগ্য করিয়া
তুলেন, এই উপমাটি দেখুন, “এক ফুলে মকরল, পান করি সন্ধানল, ধার অলি
অপর কুহসে, এক ঘরে পেয়ে যান, গ্রাম বাড়ি বিজ যান, অস্ত ঘরে আগুন সন্ধান।”
কবির চিত্তে মাহুঘসমাজ এত স্পষ্ট, উজ্জল ও গাঢ়বর্ণে মুদ্রিত ছিল
যে,—জলে, স্থলে, গুলু লতায় ও ইতর জীবে সতত মাহুঘীভাবই প্রত্যক্ষ
হইত।

কিন্তু কবিকল্প স্থখের কথায় বড় মহিম, দুঃখের কথায় বড়। বড়
বড় উজ্জল ঘটনার মধ্যে অবিরত ফল্গুনদীর ছায়া এক অন্তর্বাহী দুঃখ
সংগীতের মর্ম্ম স্পর্শী আর্তধ্বনি শুনা যায়। স্থশীলার বারমাসী হইতে
হুতুরার বারমাসী স্বপ্নকে গভীরতর স্পর্শ করে; নিঃশব্দ কক্ষণরস কাব্য-
খানাকে বিরোগান্ত নাটকের গূঢ়মহিমাপূর্ণ করিয়াছে, স্বধবলসুকাল
বর্ণনায়ও কবির প্রেমসঙ্গীতির মলয় বায়ু আবৃত করিয়া উদরচিন্তার
আক্ষেপবাণী উঠিয়াছে। নানাবিধ দুঃখের কথা তাঁহার প্রতিভার চরণ
সুপ্তর কাড়িয়া লইয়া যেন গতি মন্তর করিয়া দিয়াছে।

কবিকল্পণের পুরুষচরিত্রে দর্শন, কবিত্ব, কি কোন উচ্চদরের চিন্তার বিকাশ নাই। হামলেট, ওথেলো, করিওলেমাস প্রভৃতি নাট্যবীরগণের উন্নত আবেগের কথাগুলি অবস্থা বিশেষে পাঠকের যথমত্ৰ হইবার যোগ্য হয়, তাহা জীবনের এক এক পর্যায়ে পাঠক নিজ মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া সাধনা লাভ করিতে পারেন। সেক্সপীয়রের চরিত্রগুলির মধ্যে যে গুলি পাগল, তাহারাই কবির কণ্ঠে অমর যশোমালা অর্পণ করিয়াছে। কবিতায় হউক, সমাজে হউক, শাসনে হউক, ভাব যেখানে অপূর্ণ ক্ষুণ্ণিতে মাতিয়া পাগলের ন্যায় দৌড়ায় ও মানুষীলংকারের দীমা লঙ্ঘন করে, সেইখানে স্থায়ী যশঃ ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগমন করিয়া থাকে; সেক্সপীয়রের নাটকে ভাবের সেইরূপ উজ্জ্বল আছে, বাস্তবী কবিত্বের মধ্যে একমাত্র চণ্ডীদাসের গীতে তাহা দৃষ্ট হয়।

কবিকল্পণের বর্ণিত ঘটনার একটা মূলকেন্দ্র নাই; উৎকৃষ্ট নাটক বা কাব্যে ছোট বড় পুঞ্জ পুঞ্জ ঘটনার স্রোত দৌড়াইয়া একটি মূল কেন্দ্রে পড়িয়া মিশিয়া যায়,—সেই মূল দৃশ্যের চতুর্পার্শ্বে নানা ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশ পায়; বিশেষ একটি অঙ্ক নানাশৃঙ্গবেষ্টিত কাঞ্চন-জঙ্ঘার ছায় বহু অধ্যায়সম্বিত হইয়া সকলের উপরে স্বীয় অত্যাচ্ছ আবেগের শীর্ষ দেখাইয়া থাকে। কবিকল্পণের দু'একটি মূল ঘটনা ধরিতে পারা গেলেও তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য ঘটনার সেক্ষেপে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না। চণ্ডীকাব্যে বিশৃঙ্খল একটি প্রাকৃতিক অরণ্যমীর ন্যায় তরু, গুল্ম, পুষ্প, ওহা সমস্ত একত্র এক দৃশ্যপটে দেখাইতেছে, এই সৌন্দর্য্যের সাধারণ তত্ত্বে প্রত্যেক শোভাই মিরীক্ষণযোগ্য, কিন্তু বিশেষ কোন একটি অপূর্ণ সুদৃশ্য হয় নাই।

কবিকল্পণের অন্য একবিধ গৌরব আছে। সরলা মিরেঙা, মেহনতীলা কর্ডেলিয়া, পতিপ্রাণা দেস্‌দেমনা ইহারা সহস্রা ঘটনা বিশেষের মধ্যে পড়িয়া চরিত্রের বিকাশ দেখাইয়াছেন—ইহাদের মাম ইতিহাসের পক্ষে অঙ্কিত হইবার যোগ্য। কিন্তু বঙ্গীয় কবির ফুলরা ও খুলনার ন্যায় বিলাতি স্কন্দরীগণ সুগৃহিণী নহেন; বঙ্গের কুঁড়ে ঘরে দৈমন্দিন যে সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হয়, নিতা প্রাতে ঘুম ভাঙিলেই আত্মোৎসর্গের যে মন্ত্র যপ করিয়া বঙ্গনারীগণের গৃহ কর্ষে মনোনিবেশ করিতে হয়, সেই পরীক্ষার উত্তীর্ণ

হওয়া ও সেই মন্ত্র গুটসহিষ্ণুতার সহিত অভ্যাস করা সকলস্থলে সম্ভবপর নহে,—এই স্থানে মুকুন্দ কবির নির্বিরোধ রাজত্ব। আমরা এখানে চণ্ডীকাব্যের উপাখ্যানভাগ সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কালকেতুর গল্প ।

লোমশ মুনি সমুদ্রের তীরে বসিয়া তপস্তা করিতেছিলেন ; ইন্দ্রপুত্র নীলাশ্বর তাঁহার নিকটে বাইয়া কহিলেন “মুনি, আপনি শীতাতপ সহ্য করিয়া তপ করিতেছেন, একখানা কুটির প্রস্তুত করিলে ভাল হয় না !” লোমশ উত্তরে বলিলেন “কি হেতু বাধিব ঘর জীবন নশ্বর।” (মা, চ)। নীলাশ্বর প্রশ্ন করিলেন “মুনি আপনার আয়ু কত ?” উত্তরে, “লোমশ বলিল শুন, ইন্দ্রের তনয়। পরিচ্ছন্ন লোম মোর দেখ সর্বগায় ॥ এক ইন্দ্রপাতে এক লোম হয় ক্ষয়। সর্বলোম ক্ষয় হ'লে মরণ নিশ্চয় ॥” (মা, চ)। এই মহাপুরুষ তথাপি ঘর বাধিতে বিরত ছিলেন। ইঁহার কঠোর দার্শনিক উপেক্ষার নিকট আধুনিক সভ্যতার প্রকাণ্ডকাণ্ড কি একটা ঘোর পণ্ডশ্রম বলিয়া বোধ হইবে !

নীলাশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন “অমর কে ?” উত্তর—“একমাত্র শিব।” হুতরাং নীলাশ্বর শিব সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। নীলাশ্বরের আহুত পূজার কুলগুলির মধ্যে একটি কীট ছিল, তাহার দংশন জালায় মহাদেব অস্থির হইয়া নীলাশ্বরকে শাপ দিলেন—“পৃথিবীতে গিয়া জন্ম গ্রহণ কর।” তাঁহার স্ত্রী ছায়া ও তৎসহগমন করিল। মর্ত্যলোকে এই দুই ব্যক্তিই কালকেতু ও ফুলরা। কিন্তু এই অলৌকিক অংশ মূল গল্পের কোন হানি করে নাই ; পূর্ব জন্মের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া বৌদ্ধদিগের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছিল ; এখন আমরা মহুষ্যজীবনকে আদ্যন্তরহিত একটি বিচ্ছিন্ন প্রহেলিকার ন্যায় মনে করি, কিন্তু সেকালে কবিগণ জীবনের আরি অন্ত দেখাইয়া দিতেন।

কিন্তু স্নেহের বিষয়, নীলাশ্বর কালকেতু অবতারে তাঁহার স্বর্গীয় বৈভবের কোন চিহ্ন লইয়া আসেন নাই ; কালকেতুকে আমরা খাঁটি একটি ব্যাধ-রূপেই দেখিতেছি ; শৈশবে তাহার শরীরে হৃদ্যন্ত তেজ, সে শশাঙ্ক তাড়িয়া ধরিত, শিকার দূরে গেলে কুকুর দিয়া ধরাইত, পক্ষীগুলিকে বাটুল ছুঁড়িয়া মারিত ; কালকেতু পঞ্চবর্ষেই “শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল।” (ক, ক, চ,)। ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। সে কাব্যের প্রধান চরিত্র, কিন্তু মুকুন্দকবি

তাহাকে বর্ণনা করিতে গগন হইতে চন্দ্র ও জল এবং স্থল হইতে বাঁধুলি কি পদ্মফুল লইয়া নাড়াচাড়া করেন নাই। তাহার “হইবাহ লোহার সাবল (ক, চ)। সে যখন ভোজন করিতে বসে, তখন কবির উৎপ্রেক্ষা এইরূপ, “শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিকার। গ্রাসগুলি তোলে যেন তেজাটিয়া তাল।” নায়কের প্রতি এরূপ অবমাননাকর কথা বলিতে এখনকার কবি-গণ কখনই স্বীকৃত হইবেন না। যুকুন্দ—ব্যাধের রূপ স্বকীয় একবিন্দু বর্ণক্ষেপেও গিন্টি করিতে চেষ্টা করেন নাই—কবির উপর স্বভাবের বিশেষ অনুকম্পা, তিনি সততই স্বভাবকে অবলম্বন করিতে পারিয়াছেন।

কালকেতু একাদশবর্ষ বয়সে বিবাহ করিবেন, সোমাই ওঝা ঘটকরূপে যখন সঞ্জয়ব্যাধের বাড়ীতে যাইয়া তাহার কন্যাটি দেখিতে চাহিলেন, তখন পিতা স্বীয় কন্যার মেঘবরণ চুল ও চাঁদবরণ মুখের প্রশংসা করেন নাই, তিনি বলিলেন “এই কস্তা রূপে গুণে নাম যে ফুলয়া। কিনিতে বেচিতে ভার পারয়ে পসরা ॥ রঞ্জন করিতে ভাল এই কন্যা জানে। বন্ধুজন মেলিয়া ইহার গুণ গানে।” (ক, চ)। এই স্থলে আমরা ফুলরাকে প্রথম দেখি। শিশু কালকেতুর বর্ণনাটি আমরা একবার উদ্ধৃত করিয়াছি (২৪৬ পৃষ্ঠা); যৌবনে কালকেতু নিত্য নিত্য বনে যাইয়া শিকার করিত; ব্যাঘ্রগুলিকে লেজ মোচড়াইয়া মারিত,—“দেবীর বাহন” বলিয়া গিংহকে বধ করিত না, কিন্তু ধনুকের বাড়ি দিয়া তাহাকে এরূপ শিক্ষা দিত যে,—“তুয়ায় আকুল সিংহ পান করে নীর।”

সারাদিন শিকার করিয়া একভাঁড় মৃত পশুস্বক্রে কালকেতু সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিয়া আসিত; তাহার ভোজনটি খুব বিরাট রকমের ছিল, সে হাঁড়িতে হাঁড়িতে ভাত, নেউলপোড়া, পুইশাক, কাকড়া প্রভৃতি খাইয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিত—“রঞ্জন করেছ ভাল আর কিছু আছে?” ক, ক, চ। স্বীকার করিতে হইবে, তখন ক্ষুধা ও খাদ্য উভয়ই প্রচুর ছিল।

এদিগে পশুগণ বিষম বিপদে পড়িয়া চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হইল; তিনি বর দিলেন “কালকেতু আর তোমাদিগকে কিছু করিতে পারিবে না।”

সেদিন কালকেতু রীতিমত ধনু হস্তে বনে যাত্রা করিল; তাহার নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণে দেবীর কৃপার পূর্বাভাস নিঃশব্দ প্রফুল্লতার উজ্জেক করিতেছিল,—

“প্রভাতে পরিয়া ধড়া, শরাসনে দিয়া চড়া, ধর ধর কাছে তিনবাণ। শিল্পী

জাম-কড়ি, কর্ণ কটকের কড়ি, মহাবীর করিল প্রদান। দেখে কালকেতু স্তম্ভল—দক্ষিণে গৌ, যুগ, বিজ, বিকশিত সরসিঙ্গ, বামে শিবা যট পূর্ণজল। চৌদিকে সজল ধনি, কেহ জালে হোম বহ্নি, দধি দধি ডাকে গোয়ালিগী। দেখিল রুচির তনু, বৎসের সহিত ধেনু, পুরান্না দেয় জয়-ধনি। দ্বর্কা, খাত্ত, পুষ্পমালা, হীর নীলা মতিপলা, বামভাগে বারনিতম্বিণী। মৃদঙ্গ মন্দিরা রায়, কেহ নাচে, কেহ গায়, শুনে বীর হরি হরি ধনি।”

কিন্তু হঠাৎ পথে স্বর্ণবর্ণ গোসাপ দেখিতে পাইল। গোসাপ যাত্রার পক্ষে শুভ চিহ্ন নহে; কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে ধনুর্গুণে বাঁধিয়া লইল, “যদি অন্য শিকার জোটে, তবে ইহাকে ছাড়িয়া দিব, নতুবা ইহাকেই শিকপোড়া করিয়া খাইব।”

দেবীর চক্রে সেদিন ঘনঘোর কুজ্জটিকাতে বনপ্রদেশ আচ্ছন্ন হইল। কালকেতু সারাদিন ধনুঃশর হস্তে বনে বনে ঘুরিয়া কিছুই পাইল না—কংস-নদীর তীরে কতকটুকু জল খাইয়া অবসর দেহে বিশ্রাম করিতে বসিল, কিন্তু “বিষম সম্বল চিন্তা মহাবীর লাগে, এক চক্ষে নিদ্রা যায় এক চক্ষে জাগে।”

ফুল্লরা শিকারের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু কালকেতুর শূন্য হস্ত দেখিয়া কাদিতে লাগিল; কালকেতু আশাততঃ গোসাপটাকে “ছাল উতাড়িয়া শিকপোড়া” করিতে আদেশ করিল এবং সখীগৃহ হইতে ফুল্লরাকে কিছু ক্ষুদ্র ধার করিয়া আনিতে বলিল, তৎপর স্বয়ং ক্ষুদ্রমনে বাসি মাংসের পসার লইয়া গোলাঘাট অভিমুখে ধাবিত হইল।

ফুল্লরা বিয়লার মাতার নিকট দুই কাঠা ক্ষুদ্র ধার করিল, দুই সখী একখানে বসিয়া একদণ্ড গৃহের আলাপ করিল, শেষে ফুল্লরা স্তম্ভরী ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

এদিকে গোসাপরূপিণী চণ্ডী পঞ্চমা স্তম্ভরী যুবতী হইয়া কুটারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন তাঁহার রূপের প্রভায় “ভাঙ্গা কুড়াঘরখানা করে বলমল। কোটীজ্ঞ প্রকাশিত পঙ্গম স্বপ্ন।” বিস্মিতা ফুল্লরা প্রণাম করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চণ্ডী বলিলেন, তিনি যতিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া আসিয়াছেন। সেই ব্যাধের কুটারেই তিনি থাকা স্থির করিয়াছেন। ফুল্লরা সেই ভাঙ্গা কুটারে স্বামীর প্রেমের বড়াই করিয়া স্তম্ভী ছিল; তাহার উপবাস, দারিদ্র্য সকলই সহ্য হইয়াছিল কিন্তু অদ্য চণ্ডীর রূপ দেখিয়া আশঙ্কায় মুখ শুকাইয়া গেল;—“গেটে বিব মুখে যত্ন ছিজানে ফুল্লরা। স্থা ত্কা দুরে গেল রক্তনের ঘরা।”

যতবার জিজ্ঞাসা করিল, ততবারই এক উক্তর, চণ্ডী সেই স্থানেই থাকিবেন, তখন মনের আশঙ্কা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ফুল্লরা সুন্দরী,—সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি নানা পৌরাণিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—“স্বামী ছাড়িয়া স্ত্রীলোকের একদণ্ড ও পরগৃহে থাকা উচিত নয়, আপনার এস্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।” সে কত নৈতিক বক্তৃতা দ্বারা চণ্ডীদেবীকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিল—“সতিনী কোন্দল করে, দ্বিগুণ বলবে তারে, অতিমানে ঘর ছাড়বে কেনি।” “এ বিরহজ্বরে যদি স্বামী মরে, কোন্ ঘাটে ধাবে পানী।”

কিন্তু দেবীর নিঃশব্দ রহস্ত-প্রিয়তা একটি অটল অভিসন্ধির ভাগ ধরিয়া উপায়হীন ফুল্লরার সমস্ত অনুনয় বিনয় ব্যথা করিয়া দিল। ফুল্লরা নীতি-বাক্যে ফিরাইতে না পারিয়া দারিদ্র্যের ভয় দেখাইতে লাগিল,—“বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখবাণী। ভাস্কর কুড়ে ঘর তাল পাতের ছাউনি। ভেরাভার খাম তার আছে মধ্য ঘরে। প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।” প্রভৃতি বর্ণনা পড়িলে এই রহস্তের অভিনয়ের মধ্যে ও আমাদের কান্না পায়। জৈষ্ঠ্যে,—“বইচির ফল খেয়ে করি উপবাস।” “পসরা এড়িয়া স্নান খাইতে না পারি। দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধসারি।” শ্রাবণে,—“কত শত খায় জোক, নাহি খায় ফণী।” “দুঃখ কর অবধান। বুটী হৈলে কুড়ার ভাসিয়া যায় বাণ।” “মাংসের পনারা লয়ে কিরি ঘরে ঘরে। আচ্ছাদন নাহি আছে স্নান বুটী নীরে।” আশ্বিন মাসে,—“উত্তম বসনে বেশ করয়ে বর্ণিতা। অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা। কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে। দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে।” কার্তিক মাসে,—“নিমুক্ত করিলা বিধি সবার কাপড়। অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।” “ফুল্লরার আছে কত কর্মের বিপাক। মাঘমাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক।” “মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ। মালতীএ মধুকর পিয়ে মকরল। বনিতা পুরল ধৌহে পীড়িত মন্দন। ফুল্লরার অল্পপোড়ে উদ্ভদ্র দহনে।” এই বর্ণনাগুলির মধ্যে স্থলে স্থলে চণ্ডীদেবীকে ভয় দেখাইবার প্রকাশ্য চেষ্টা আছে,—“কোন্ হৃৎ ইচ্ছিলে হইতে ব্যাধের নারী।”

কাদালিনীর এই দৈনিক কষ্টসহ মূর্ত্তিখানা বঙ্গীর কুটীরে কিরূপ সুন্দর দেখাইতেছে। ফুল্লরা নিজের এই ষোর দারিদ্র্যদুঃখ লজ্জায় কাহাকেও বলিত না, কিন্তু এইরূপসী কামিনীকে উহা না জানাইলে সে ত গৃহ ছাড়ে না। ফুল্লরার নীরব পতিপ্রেমের এই সুন্দর বিকাশে আমরা প্রীত হই—কিন্তু তাহার অকারণ কাতরতায় ঈষদ্বাস্য সম্বরণ করিতে পারি না।

তথাপি দেবী যাইবেন না, তাঁহার প্রচুর ধন আছে—তিনি ব্যাধি-

কুটীরের দারিদ্র্য ঘুচাইবেন। আর তিনিত নিজে ইচ্ছা করিয়া আসেন নাই “এনেছে তোমার স্বামী বাঁধি নিজ গুণে।” “হৃদয় নরজিজ্ঞাসা করহ মহাবীরে।”

স্বামী ইহাকে নিজে লইয়া আসিয়াছেন, গুনিয়া উপায়হীন। অভিমানিনী ফুল্লরা স্বনের ভাব গোপন করিতে পারিল না।

“বিবাদ ভাবিয়া কাদে ফুল্লরা রূপসী। নয়নের জলেতে মলিন মুখ শশী। কাদিতে কাদিতে রাখা করিল গমন। শীঘ্রগতি গোলাঘাটে দিল দরশন। গদগদ বচনে চকুতে বহে নীর। সবিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসে মহাবীর। শাশুরী ননদী নাহি, নাহি তোর সত্য। কার সনে বন্দু করি চকু কলি রতা।”

ফুল্লরা—“সত্য সত্যই নাহি প্রভু তুমি মোর সত্য। ফুল্লরার এবে হৈল বিব্রূষ বিধাতা। কি দোষ দেখিলা মোর জাগ্রত স্বপনে। দোষ না দেখিয়া কর অভিমান কেনে। কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাণে দিলা মন। আজি হৈতে হৈলা তুমি লঙ্কার রাবণ। আজি হৈতে বিধাতা হইল মোরে বাম। তুমি হৈলা রাবণ, বিপক্ষ হৈল রাম। পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে। কাহার বোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে। শিয়রে কলিক রাজা বড় দুঃখাচার। তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার।” কালকেতু—“স্বপ্নান্ত করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা। মিথ্যা হৈলে চোয়াড়ে কাটিব তোর নাস।” ফুল্লরা—“সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম সাক্ষী। তিন দিবসের চন্দ্র স্বারে বসি দেখি।” একদিগে ফুল্লরার সরল প্রেমপূর্ণ ভয়, অপর দিগে কালকেতুর নির্মল অমার্জিত চরিত্রে বৃথাসন্দেহজনিত ফোঁস,—দুইটা বিপরীত ভাবের উদ্দাম অভিনয় চিত্রকরযোগ্য নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।

কালকেতু গৃহে আসিয়া দেখিল “ভাসা কুঁড়ে ঘর খান। করে ঝলমল। কোটি চন্দ্র বিরাজিত বদন মণ্ডল।” বিস্মিত হইয়া কালকেতু বলিল এই প্রশ্ন সম্মান ব্যাধগৃহে তুমি কে? ব্যাধ হিংসুক, চতুর্দিকে পশুর হাড় এই ঘরে “প্রবেশে উচিত হয় নান।” এখানে তুমি কেন? এখানে রাত্রি বাস করা উচিত নহে—লোকে মন্দ কথা বলিতে পারে। তুমি চল, আমি তোমাকে বাড়ী লইয়া যাইব। কিন্তু ব্যাধের স্বতঃপ্রসূত নৈতিক সাবধানতা ছিল, সে একাকী যাইবে না—“চল বন্ধু জনপথে, ফুল্লরা চলুক সাধে, পিছে লয়ে যাব ধনুঃশর।” দেবী উত্তর দিলেন না—চুপ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালকেতুর রাগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—“বন্ধু বহরি তুমি বড় লোকের ঝি। বুঝিয়া ব্যাধের ভাব তোর লাভ কি।” তথাপি চণ্ডী যান না, তখন ব্যাধ বলিল—“চরণে ধরিয়া মাগি ছাড়গো দিলয়” এবং অবশেষে—“এত বাক্যে চণ্ডী যদি না দিলা উত্তর। ভাঙ্গ সাক্ষী করি

বীর যুদ্ধিলেক শর।” কিন্তু সহসা অপূৰ্ণ গুলকে ব্যাধ মন্থয়ুগ্ম হইয়া গেল, তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল,—শরীর ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল—যে শর ছাড়িতে চাহিয়াছিল, তাহা ছাড়িতে পারিল না ; শর ধনু হস্তে আটকিয়া গেল। তখন স্বামীর বিপদে ফুল্লরা স্তম্ভরী আসিয়া সহায় হইল,—“নিত চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুঃশর। ছাড়াইতে নারে রামা হইল কাঞ্চর।” এই সময়ে দেবী কৃপা করিয়া বলিলেন “আমি চণ্ডী তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি।” এই স্বভাব-নির্ভীক সত্যবাদী ব্যাধ যেন প্রকৃতির স্বীয় করের গঠিত অকৃত্রিম বস্তু, সে চণ্ডীকে বলিতেছে, “হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি। কি কারণে মোর গৃহে আসিবে পার্কীতি।” তখন দেবী স্বীয় দশভূজা মূর্তি দেখাইয়া সম্মেহ ভঞ্জন করিলেন। সেই মূর্তির বর্ণনাটি এস্থলে বড় স্তম্ভর হইয়াছে।

চণ্ডীর অপূৰ্ণ রূপ দেখিয়া ব্যাধ ও ফুল্লরা কাঁদিয়া পায় পড়িল ; চণ্ডী কালকেতুকে একটি অঙ্গুরী উপহার দিলেন, কিন্তু—“লইতে নিবেধ করে ফুল্লরা স্তম্ভরী। এক অঙ্গুরীতে প্রভু হবে কোন কাম। সারিতে নারিবে প্রভু হইবে দুর্গম।” স্ততরাং চণ্ডীদেবীকে আরও সাত ঘড়া ধন দিতে হইল, এই সাত ঘড়া ধন ফুল্লরা ও কালকেতু সমস্ত বহিয়া লইতে পারিল না ; তখন কালকেতু তাহার অভ্যাস সরলতাসহকারে একটি অমুরোধ করিল “এক ঘড়া ধন মা আপনি কাকে কর।” ক্ষীণাক্ষী দেবী এক ঘড়া ধন নিজ কাঁখে তুলিয়া লইলেন ; কিন্তু কালকেতু মুখ, দরিত্র—তাহার মনে যে সমস্ত ভাব খেলা করিয়াছে, কবি তাহার কোনটিই গোপন করেন নাই—তাহার সরলতা, বর্করতা, মুখতা এবং চরিত্রবল এ সমস্ত ব্যাধ-নাগকেরই উপযোগী, অন্য কোন মানদণ্ডে তাহার তুলনা করিলে অন্যায় হইবে। যখন চণ্ডী ধন ঘড়া লইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন তখন—“মনে মনে মহাবীর করেন যুক্তি। ধন ঘড়া লৈয়ে পাছে পলায় পার্কীতি।” এই সব বর্ণনায় এরূপ একটি স্তম্ভর অকৃত্রিমতার বিকাশ আছে, যাহা প্রথম শ্রেণীর কবি ভিন্ন অন্য কেহ দেখাইতে পারেন না। মুরারীশীলের নিকট অঙ্গুরী ভাঙ্গাইবার স্থলটি স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে। একদিগে প্রবঞ্চক মুরারির কপট-ভদ্রতা সূচক প্রশ্ন, অপরদিগে কালকেতুর সরল বন্ধুত্বাবের উদ্ভব ও নির্ভীক সত্যপ্রিয়তা তাহার বর্করতাকে যেন প্রকৃত স্তম্ভরতার বর্ণে মার্জিত করিয়াছে।

ইহার পর কালকেতু চণ্ডীর আদেশে গুজরাট বম কাটাইয়া রাজধানী স্থাপন করিল। কিন্তু পরে মুকুন্দকবি তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারেন নাই। মুকুন্দের কাগকেতু ব্যাধ, তাহার কাগকেতু রাজা হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কাগকেতু কলিঙ্গাধিপতির সহিত যুদ্ধে হারিয়া, স্ত্রীর অনুরোধে শয়নপ্রকোষ্ঠে লুকাইয়া ছিল—এ দৃশ্য দেখিয়া হুঃখিত হইরাছি, কবি বাঙ্গালীবীরকে বোধ হয় যথা দৃষ্ট তথা অঙ্কণ করিয়াছেন, কিন্তু মাধবাচার্য্য কালকেতুর শেষ জীবন বেশ প্রশংসনীয় ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; ফুলরা যখন স্বামীকে যুদ্ধকরিতে নিষেধ করিতেছে, তখন কালকেতু বলিতেছে—“শুনিয়া বীরবর, কোপে কাপে ধর ধর, শুন রামা আমার উত্তর। করে লৈয়া শর পীতী, পুঞ্জি মঙ্গল চণ্ডী, বলি দিব কলিঙ্গ ঈশ্বর ॥ যতক দেখহ অব, সকল করিব ভঙ্গ, ফুলর করিব লও ভণ্ড। বলি দিব কলিঙ্গ রায়, তুঘি চণ্ডীকা মায়, আপনি ধরিব ছত্র দণ্ড।” মা, আ, চ। এবং যেখানে কালকেতু বন্দী অবস্থায় রাজসভায় প্রবেশ করিল, তখন—“রাজসভা দেখি বীর প্রণাম না করে।” মা, আ, চ।

কলিঙ্গাধিপতিকে চণ্ডীদেবী স্বপ্নে আদেশ দিলেম—“আমার ভৃত্য কালকেতু, তাহাকে আমি রাজগি দিয়াছি, তুই তাহাকে ছাড়িয়া দে।” কলিঙ্গাধিপতি ও তাহাই করিলেন এবং স্বয়ং তাহাকে গুজরাটের সিংহাসনে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত করিলেম।

ইহার পর সহসা এক দিন কালকেতু মীলাধর হইয়া ও ফুলরা ছায়া হইয়া স্বর্গে গমন করিল।

ভাড়া দত্ত।

উপাখ্যান ভাগে একটি আবশ্যকীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়া গিয়াছি। আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যাই মাই, ভাড়া দত্তকে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করিব, এইজন্ত পূর্বে তৎসম্বন্ধে কিছু লিখি নাই। ভাড়া শকুনি-শ্রেণীর ব্যক্তি, ধূর্ততার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এই চরিত্র বর্ণনায় কবিকঙ্কণ হইতে মাধবাচার্য্য বেশী ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, আমরা মাধবাচার্য্যের—কাব্যকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া ভাড়া চরিত্র বর্ণনা করিব।

ভাড়া দত্তের বাড়ী গুজরাটের নিকট, বাড়ীতে লক্ষীর কুপা আঁটে মা পরিবারের তাবতেরই মধ্যে মধ্যে উপবাসী থাকিতে হয়। ভাড়া দত্ত একদিন উপবাসে বঞ্চন করিয়া প্রাতে স্বীয় স্ত্রীর নিকট কিছু খাবার চাহিতেছে,—

“ভাড়ুদত্ত বলে শুণ তপনদত্তের মা। কুখ্যার কারণে মোর পোড়ে সর্ব্ব যা।”
তপনদত্ত ভাড়ুর পুত্র। ভাড়ুর গুণবতীভার্যা কুধার্ত স্বামীর প্রতি হাসিয়া বলিল,—
“যেন যতে কথা কহ লোকে বলে আউল। কালি গেল উপবাস আত্রি কোথা চাউলঃ।”

তখন ভাড়ু হুঃখিত চিত্তে “ভাস্ক কড়ি হয় বড়ি গামছা বাধিয়া। ছাওয়ালের মাখে
মোকা বিলেক তুলিয়া।” “ভাস্ক কড়ি” দিয়া কি হইবে, পাঠক সে প্রশ্ন
এখন করিবেন না।

বাজারে উপনীত হইয়া ভাড়ু প্রথমে ধনাপশারীর নিকট গেল, কয়েক
সের চাউল চাহিল এবং বলিল “তন্না ভাস্কইয়া কড়ি দিয়া যাব তারে।” কিন্তু
ধনা তাহাকে চিনিত, সে আগে কড়ি না পাইলে, চাউল দিবে না।
কিন্তু ভাড়ুদত্ত তাহাকে নানা রূপ উৎপীড়নের ভয় দেখাইল, রাজার
পাইকগণ তাহাকে মাত্ত করে, সে তাহাদিগের সাহায্যে ধনাকে উপযুক্ত
শিক্ষা দিবে। ধনা ভয় পাইয়া বলিল—“পরিহাস করিলাম করি বাড়াবাড়ি। চাউল
দিয়া যাও তুমি নাহি দিও কড়ি।” আনাজ বিক্রেতাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া
এক বোকা শাক শবজি লাভ করিল—“কানি দুই গুণি ভূমি ইনাম দিব ত্তেরে।”
এইরূপ নানা ধূর্ততা করিয়া সে লবণ ও তৈল আদায় করিয়া লইল,
কিন্তু শুবাক-বিক্রেতার সম্মুখে প্রথমে একটু জব্ব হইল, তাহাকেও টাকা
ভাস্কইয়া কড়ি দেওয়ার কথা বলাতে সে বলিল “তন্না ভাস্কইয়া মজুত আর
দিয়া কড়ি। মজুর পাঠইয়া গুয়া নিও তবে বাড়ী।” তখন ভাড়ুদত্ত রাজদরবারে
তাহার প্রতিপত্তির কথা বলিতে লাগিল;—স্বীয় গৌরবের নানা ধ্যান্তি
করিয়া বলিল—রাজা তাহাকে গাড়ু, কব্বল ও পাটের পাছড়া উপঢৌকন
দিরাছেন; বলা নিশ্চোরজন এ সকলই মিথ্যা। শুবাক-বিক্রেতাকে ভয়
দেখাইয়া বলিল,—“প্রাতঃকালে পাশা পাঠাইব ঘরে ঘরে। পতাকা তুলিয়া দিব
গাছের উপরে।” এইভাবে শুবাক, চিরা, মিঠা, সন্দেশ প্রভৃতি নানা দ্রব্য
সংগ্রহ করিয়া লইল। কিন্তু ঘোষের মা দধি বিক্রয় করিতেছিল,
তাহার দধি ধরিয়া টানাটানি করাতে রুদ্ধা তাহাকে কটুমুখে
গালি দিতে লাগিল, ভাড়ু নানা উপায় জানে, সে তাহার কানে কানে
বলিল,—“জোরা পর লয়ে বড়ি তোমার বসতি। বাড়ি হইয়াছে বত গ্রামের রাস্তি।”
তত্রে ঘোষের মার মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু মৎস্য-বিক্রেতার কট্টিন
হুঁক হইতে মৎস্য আদায় করিতে গিয়া ভাড়ু প্রকৃতই জব্ব হইল; সে

কোনরূপেই মৎস্য দিবে না । ভাড়ু যত বলিল, মৎস্য বিক্রেতা ক্রকুট-
কুটিল মুখে সব অগ্রাহ্য করিল, শেষে ভাড়ু টানাটানি আরম্ভ করাতে
দুইজনে মল্লযুদ্ধ লাগিল, এই যুদ্ধে “কচ্ছ হতে ভাড়ুদন্তের পড়ে কাণা কড়ি।”
“কাণা কড়ি পড়ে ভাড়ু বহ লজ্জা পায় । মৎস্য ছাড়িয়া তবে উঠিরা পলার ॥”

এই গেল বাজারের পালা ; তারপর ভাড়ু কালকেতুরাজাকে প্রতারণা
করিতে গিয়াছে,—

তেট লরে কাঁচ কলা, পশ্চাতে ভাড়ুর শালা, আগে ভাড়ুদন্তের প্রয়ান । কোটা কাটা
সহাস্ত, ছেঁড়া জোড় কোঁচা লম্ব, শ্রবণে কলম লম্বমান । প্রণাম করিয়া বীরে, ভাড়ু
নিবেদন করে, সম্বন্ধ পাতিয়া বুড়া বুড়া । ছেঁড়া কবলে বসি, মুখে মল মল হাসি,
ঘন ঘন দেয় বাহ নাড়া ॥ আইহু বড় প্রীত আশে, বসিতে তোমার দেশে, আগ্রহে
জাকিবে ভাড়ুদন্তে ॥ যতেক কায়ছে দেখ, ভাড়ুর পশ্চাতে লেখ, কুলশীল বিচার
মহে ॥ কহি আপনার তত্ত্ব, আমলহাড়ার দত্ত, তিনকুলে আমার মিলন । ঘোব ও
বহুর কথা, দুই নারী মোর ধন্য, মিত্রে কৈল কন্যার গ্রহণ । গঙ্গার দুহুল পাশে, যতেক
কায়ছ বৈসে, মোর ঘরে করয়ে ভোজন । ঋষি বত্ত্র অলঙ্কার, দিয়ে করে ব্যবহার, কেহ
নাহি ধরয়ে রতন ॥” ইত্যাদি ক, ক, চ । *

সে কালকেতুর পাত্রগরিচা চায় । কালকেতু তাহাতে সম্মত হইল না ;
তখন ভাড়ু বকিতে আরম্ভ করিল,—কালকেতুর লোকজন বাইয়া ভাড়ুকে
খুব প্রহার করিয়া দিল ; তখন ভাড়ু—“পুনর্বার হাটে মাংস বেচিবে কুলরা ।”
প্রতৃতি গালি দিতে দিতে বাড়ী গেল,—

“পথে পড়া ফুল পাইয়া মাখে তুলি দিল । হাসিতে হাসিতে ভাড়ু বাড়ীতে চলিল । বাড়ীর
দিকটে গিয়া ডাকয়ে রমণী । সহরে আনিয়া দেও এক ঘটি পাণি ॥ প্রভুর বচন শুনি রমণী
অস্থির । ভাস্মা ঘটতে পুরি বাহির করে নীর ॥ ভাড়ুর দেখিয়া তার রমণী চিস্তর ।
কেওয়ানেরে গেলা প্রভু ধূলি কেন গায় ॥ ভাড়ুএ বোলয় শ্রিয়া শুনহ করুণা ॥ মহাবীর সনে
আজি খেলিয়াছি পাশা ॥ ক্রমে ক্রমে মহাবীর ছয় পাটী হারি । রসে অবস হইয়া করে
হুড়াহুড়ি ॥ ধুলা ঝাড়ি বহনতে পাইয়াছি রস । বীরের গায়েতে দিছি তার দুই দশ ॥
কি বলিতে পারি শ্রিয়া বীরের মহাজ্ঞা । বাহার পীরিতে বস হৈল ভাড়ুদন্ত ॥

কিন্তু রমণীকে এই সুখকর প্রবোধ দিলেও ধূর্তের হৃদয় ক্রোধে
জ্বলিতেছিল ; ইহার পরে সে কলিঙ্গাধিপকে জানাইল যে তাঁহার রাজ্যের
নিরুপেক্ষ একজন নীচজাতি ব্যাধি রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছে এবং কৌশলে

* ভাড়ুদন্তের-এসঙ্গে এই হলটি-মাজ কবিকল্প চণ্ডী হইতে উদ্ধৃত হইল ; অত্যা-
জ্ঞান সাধবাচার্যের চণ্ডী হইতে গ্রহণ করিয়াছি ।

কলিঙ্গরাজকে উত্তেজিত করিয়া কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইল। এই যুদ্ধের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

যখন দুই রাজার পুনঃ সন্ধি হইল, তখন উভয়ের অনুমতি ক্রমে নাপিত ভাড়ুর মস্তক অশ্বমুত্রে ভিজাইয়া লইল ও মধ্যে মধ্যে ক্ষুর বাহু পদের তলাতে ঘষিয়া মাথাটি বেশ মুগুন করিয়া দিল। মস্তক মুগুনের পর নাগরিকগণ প্রত্যেকে এক এক ঘড়া ঘোল তাহার মাথায় ঢালিয়া দিয়া গেল; ছেলেরা গীত বাঁধিয়া তাহার পাছে পাছে গান গাহিয়া চলিল; “কাল হাঁড়ি কেল্য মারে কুলের বহুড়ী”—এতদবস্থায় ভাড়ুকে গঙ্গা পার করিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু শতবার ধৌত হইলে ও অঙ্গারের মলিনতা ঘোচে না; গঙ্গাপার হইয়া “লোকের সাক্ষাতে ভাড়ু কহে মিথ্যা কথা। গঙ্গা সাগরেতে গিয়া শুড়ারেছি মাথা। এ বলিয়া মাগি থাম নগরে নগরে ॥”

শ্রীমন্তের গল্প।

রত্নমালা অপ্সরী তালভঙ্গ দোবে লক্ষপতিবণিকের ঘরে খুলনা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

একদা উজ্জানিনগরের যুবক ধনপতি সদাগর শ্রামল প্রান্তরে ক্রীড়াচ্ছলে পায়রা উড়াইতেছিলেন; এই পায়রা খুলনার বস্তাকলে লুকাইল; ধনপতি পায়রা চাহিতে গেলেন, খুলনা জানিতে পারিল ধনপতি তাহার খুড়তত ভগ্নীর স্বামী, স্ততরাং সৎকৃষ্টিতে আমোদ করিবার সুযোগ ছিল; ঈষৎদ্বিম্ব-যৌবনা খুলনা এক পমলা হাসি বৃষ্টি করিয়া কৌতুক করিতে করিতে চলিয়া গেলেন, ধনপতির মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি দাঁড়াইয়া খুলনাকে বিবাহ করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ধনপতি কুলে ও ধনে শ্রেষ্ঠ, কাব্য নাটক পড়িয়া পণ্ডিত; স্ততরাং এ বিবাহে সম্মতি পাইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম স্ত্রী লহনাসুন্দরীকে প্রবেশ না দিলে হয় না—সে ত একথা শ্রবণমাত্র অভিমানে মাতিয়া বসিয়া আছে—কথা বলেনা;—

“লহনা লহনা বলি ডাকে সদাগর। অতিমানবৃত্ত রামা না দেয় উত্তর। ইচ্ছিতে যুঝিল লহনার অতিমান। কপট সম্ভাবে সাধু লহনা বুঝান। রূপনাশ কৈলে শিরে রক্তের শালে। চিত্তাসপি নাশ কৈলে কাঁচের বসলে।—মান করি আসি শিরে না লাগে চিকণী। রোহ না পার কেশ শিরে বিধে পানি। অবিরত এই চিন্তা স্তত নাহি পনি।

রক্তের শাল নাশ হইল গন্ধিনী । মাসী, গিনী, মাতুলানী, ভগিনী, সতিনী । কেহ নাহি থাকে ঘরে হইয়া রাত্তরী । যুক্তি যদি দেহ মনে করিয়া প্রকাশি । রক্তের ভরে তব করি বিব দাসী । বরিষা বাদলেতে উৎসে পার ফুক । কর্পূর তাবুল যিনে রসহীন মূখ ।”

এই কথা গুলির মোহিনীতে এবং একথানা পাটশাড়ী ও চুড়ি গড়িবার ও তোলা সোণা পাইয়া লহনা আর কোন আপত্তি করিল না ।

লহনা মোটের উপর মন্দ মেয়ে নহে, তবে যুক্তিটি বড় জুল ; তাহার প্রকৃতি সরল ও সুন্দর কিন্তু কোন ছুষ্ট চালাক লোকের হাতে পড়িলে নির্দোষ লহনা খেলার পুতুলের ন্যায় আয়ত্ত হইয়া যায়, প্ররোচনার সে নিতান্ত গর্হিত কর্ম ও করিতে পারে ।

বিবাহের পর ধনপতিকে রাজাজ্ঞায় প্রবাসে (গোঁড়ে) যাইতে হইল, তখন দ্বাদশবর্ষীয়া খুল্লনাকে সাধু লহনার হাতে হাতে সঁপিয়া গেল । লহনা স্বামীর কথা মাথায় লইয়া খুল্লনাকে ভালবাসিতে লাগিল ; ছুদিনের মধ্যে খুল্লনা সেই ভালবাসার আতিশয্যে অস্থির হইয়া উঠিল ;—

“সাধু গেল গোড় পথে, লহনার হাতে হাতে, খুল্লনা করিয়া সমর্পণ । পালয়ে স্বামীর সত্য, জননী সমান নিত্য খুল্লনারে করয়ে পালন । যবে ছয় দণ্ড বেলা, কুজুরে ডুলিয়া মলা, নারায়ণ ভৈল দিয়া পায় । বাহারা প্রাণের সম্বী, শিরে দেয় আমলকী, তোলা জলে মান করায় । আপনি লহনা নারী, শিরেতে ঢালয়ে বারি, পরিবার ঘোষার বসন । করেছে চিরুণী ধরি, কুন্তল মার্জন করি, অন্ন দেয় ভূষণ চন্দন । যবে বেলা দণ্ড দশ, ছয় খালে ছয় রস, সহিত যোগায় অন্ন পান । ভুঞ্জয়ে খুল্লনা নারী, কাছে ধোর ছয় কাড়ি, লহনার খুল্লনা পরাণ । ওজন পায়স পিঠা, পঞ্চাশ বাজান মিঠা, অবশেষে কীর খণ্ড কলা । পরশে লহনা নারী, গায় দেখি ঘর্ম বারি, পাখা ধরি বাজয়ে ছুর্বলা । অন্ন খায় লজ্জা করি, যদি বা খুল্লনা নারী, লহনা মাথায় দেয় কিরা । চুসতানে প্রেমবন্ধ, দেখিয়া লাগয়ে বন্ধ, হুবর্ণে জড়িত বেন হীরা । লহনার মত সরল চরিত্রে গরল প্রবেশ করিতে বেশী সময় লাগে না । ছুর্বলা দাসী নির্জনে বসিয়া খানিক এই চিন্তা করিল “যেই ঘরে চুসতানে না হয় কোন্সল । সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল ।” একের করিয়া নিশা বাব অস্ত্র হান । সে ধনী বাসিবে মোর প্রাণের সমান ।” এর পরে সে লহনাকে যাইয়া এই ভাবে উত্তেজিত করিল—“শুন শুন মোর বোল শুনে লহনা । এবে সে করিলে দাশ আশনি আপনা । বজ্রমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ । ছুড় দিয়া কি কারণে পোষ কাল সাপ । সাপিনী বাঘিনী সত্য পোষ নাহি দানে । অবশেষে এই তোমার বধিবে পরানে । কলাগী কলাপজিনি খুল্লনার বেশ । অর্দ্ধ পুষ্কা

কেশে তুমি কি করিবে বেশ । খুলনার বুধশশী করে চল চল । মাহিতার মঙ্গল তোমার গুণহল ।*** অগ্নিমধ্যা খুলনা যেমন মধুকরী । যৌবন বিহীনা তুমি হৈলা ঘটোঙ্গরী । আগ্নিস্নেহ সাধু সোড়ে থাকি কতদিন । খুলনার রূপ দেখি হবেন অধীন । অবিকারী হবে তুমি রক্তনের ধামে । মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে । নেউটরা আইসে খন হৃত বরুজন । না নেউটে পুন দেখে জীবন যৌবন ।”

এই উপদেশ লহনার উপর উদ্দিষ্ট কাজ করিল ; সে ক্ষেপিয়া গেল ;—খুলনাকে স্বামীর চক্ষের বিষ করিতে নানা তন্ত্র মন্ত্র ও ঔষধ খুজিতে লাগিল । অবশেষে এক জালপত্র লইয়া খুলনার নিকট উপস্থিত হইল, পত্রের মর্ম এই—তুমি অদ্য হইতে ছাগল রাখিবে, টেকি শালে শুইয়া থাকিবে, একবেলা আধপেটা ভাত খাইবে ও খুঁয়া বস্ত্র পরিবে ।

এই স্থল হইতে খুলনার চরিত্র পরিষ্কাররূপে বিকাশ পাইয়াছে । খুলনার যেরূপ পতিভক্তি, সেইরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ; তাহার ও একবারে রাগ না আছে এমন নহে, কিন্তু লহনা যেরূপ রাগে পাগল হইয়া যায়—নিতান্ত একটা দুঃস্বপ্নও করিয়া ফেলিতে পারে,—খুলনার চরিত্রে সেরূপ নির্কোষ রাগ দৃষ্ট হয় না । জালপত্র লইয়া লহনা উপস্থিত হইলে, সে তাহা একবারে অগ্রাহ্য করিল—ইহা তাহার স্বামীর লেখা নহে ; আর সে এমন কি পাপ করিয়াছে, যাহাতে তাহার উপর এই কঠিন দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে । লহনা বলিল—তুমি এসেছ পরেই তাঁহাকে দেশ ছাড়িয়া গোড়ে যাইতে হইয়াছে, বোধ হয় এইজন্ত তিনি রাগিয়াছেন : আর তিনি নিজ হাতে চিঠি না লিখিয়া হয়ত সুহরি দিয়া লিখাইয়াছেন । খুলনা বলিল—ও কথা কিছু নহে, এ পত্র জাল । তখন লহনা রাগিয়া তাহাকে মারিতে গেল, খুলনা রাগী ছিল না, তবে সে নিতান্ত আত্ম সমর্থন না জানিত, এমন নহে—“খুলনার অঙ্গুলী বিধির বিশাকে । দৈবাৎ লাগিল গিয়া লহনার বুক । লহনা হইল তাহে যেন অগ্নি কণা । খুলনার দুই পাশে মারে দুই ঠোনা ।” এইত ঘটনা ; তবে খুলনার “অঙ্গুলী” যে নিতান্তই “দৈবাৎ” লহনার বুক লাগিয়াছিল, তাহা মাও হইতে পারে । শেষে শুদ্ধ শারিরীক বলের প্রভাবে লহনারই জয় হইল, খুলনা ক্ষুদ্রী ভুলুপ্তি হইল—“কাতরে খুলনা সেম রাজার মোহাই ।”

এই অবস্থায় খুলনাকে বাধ্য হইয়া ছাগল চড়াইতে বনে বনে কাইতে হইল, টেকিশালে শুইতে হইল ও খুঁয়ার কাপড় পরিতে হইল । ছাগল রাখার সময় ক্ষুরক্কৌষনা খুলনা ক্ষুদ্রী গৃহের আড়াল হইতে বনের

শ্রামল প্রদেশে আসিলেন; যেখানে নানা বনফুল, সেখানে তাহাদেরই মত কামিনীর রূপ বিকাশ পাইল। তাহার ছেলি রক্ষনের কষ্ট পড়িতে আমাদের হতভাগিনী ফুল্লরার কথা মনে পড়িয়াছে; ইহার বারমাসীতে ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। এই দুঃখের সময় পিতা মাতা খুল্লনার কোন বিশেষ খবর লয়েন নাই—“ভনিয়া খুল্লনা দুঃখে ছাড়রে নিখাস। অবনী প্রবেশি যদি পাই অবকাশ।” সুন্দরীর এই দুঃখের মূর্ত্তিখানা দেখুন—

“ধীরে ধীরে যায় রামা লইয়া ছাগল। ছাট হাতে পাত মাখে যেমন পাগল। নানা শস্য দেখিয়া চৌরিকে ধায় ছেলি। দেখিয়া কুবান সব দেয় গালাগালি।। শিরীষ কুহুম তহু অতি অহুপাম। বদন ভিজিয়া তার গায় পড়ে ঘাম।।”

কিন্তু খুল্লনা এখন বিদ্যাপতি-বর্ণিত বয়ঃসন্ধির মনোহর অবস্থায়; নব বৌবনাগমে খুল্লনা এই দুঃখ ভুলিয়া বসন্তকালে বিরহে মাতিয়া গেল; বহিঃ প্রকৃতির উন্মাদকর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের আবেগ মিশিয়া গেল।

“মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন। অশোক কিংতুকে রামা করে আলিঙ্গন। কেতকী ধাতকী কোটে চম্পক কাঞ্চন। কুহুম পরাগে লগ্ন হৈল অলিঙ্গণ। লতায় বেষ্টিত রামা দেখিয়া অশোক। খুল্লনা বলেন সেই তুমি বড় লোক। আমা হৈতে তোমার জনম দেখি ভাল। তোমার সোহাগে সখি বন কৈলা আলো।।” খুল্লনা ভ্রমরের নিকট করঘোড়ে বলিল ‘চিত্ত চমকিত, যদি গাও গীত, যাও ভ্রমরীর মাথা।’ কিন্তু ভ্রমরের গুণ গুণ গুঞ্জরণ থামিল না, তখন খুল্লনা রাগিয়া ভ্রমরকে গালি দিতেছে “তুই মাতোয়াল, মোরে হৈলি কাল, না শুন বিনয়বাণী। ধূতুরার ফুলে, কিবা মধু পীলে, তাহা মনে নাহি গণি।” কোকিলের কুহুম্বরে চমকিত হইয়া খুল্লনা কাঁদিয়া বেড়াইল; প্রকৃতির তরু পল্লব, পাখী, অদ্য নিরাশ্রয়া খুল্লনা সকলেরই অধীনা, কোকিলকে বলিতেছে “সগগর আছে বথা, কেন নাহি যাও তথা, এই বনে ডাক অকারণ।”

বঙ্গীর গ্রাম্যসৌন্দর্য্য এইসব স্থলে উজ্জল ও উপভোগ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক এইসব বর্ণনা পড়িতে বসন্ত ঋতুর নূতন হিলোল ও বনফুল মত্ত হাওয়ার স্পর্শে সুখী হইবেন, খুল্লনাকে বড় ভাল ও সুন্দর বোধ হইবে।

পঞ্চশ্রান্ত খুল্লনা এইসব শোভা দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল। চণ্ডীদেবী এইখানে খুল্লনার মাতৃরূপে দেখা দিয়া স্বপ্নে বলিলেন—
“কত দুঃখ আছে বি তোমার কপালে। সর্ব্বদা ছাগল ভোর খাইল নৃপালে। জোর

হঃ দেখিয়া পাঁজরে বিধে খুন। আজিলো লহনা তোরে করিবেক খুন।” খুল্লনা জাগিয়া দেখিল সত্য সত্যই “সর্কশী” ছাগলটি নাই,—তখন লহনার শাস্তির ভয়ে কঁাদিতে কঁাদিতে বন প্রদেশ ঘুরিয়া বেড়াইল। এই সময়ে পঞ্চ কন্যা তাহাকে চণ্ডী পূজা শিখাইয়া গেল, চণ্ডী খুল্লনাকে দেখা দিলেন; অশ্রুনেত্রে চিরহুঃখিনী খুল্লনা চণ্ডীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—“জন্মে জন্মে ছেলি তুমি হও নিজজন। তোমা হতে দেখিলাম চণ্ডীর চরণ।” চণ্ডী তাহাকে স্বামী পুত্র লাভের বর দিয়া চলিয়া গেলেন।

এতদিনে চঃখের রাত্রি প্রভাত হইল, সে রাত্রি খুল্লনা বাড়ী যায় নাই; লহনার মনে অনুতাপ হইল, “স্বামী আমাকে হাত হাতে মঁপিয়া দিয়াছেন, খুল্লনাকে বনের কোন পশু খাইয়া ফেলিল নাকি?” প্রভাতে যখন খুল্লনা বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন লহনা তাহাকে পূর্বের ত্রায় আদর ও বহু করিতে লাগিল।

ধনপতির চরিত্র বল বেশী কিছু ছিল না; সে গোড়ে যাইয়া অসুস্থত স্থখে মগ্ন হইয়া বাড়ী ভুলিয়া ছিল; সেই রাত্রিতে খুল্লনাকে স্বপ্নে দেখিয়া বাড়ী যাওয়ার কথা মনে হইল। ধনপতি বাড়ী আসিলেন, তাহার আগমন সংবাদে লহনা স্বীয় শিথিল সৌন্দর্য্যকে যথা সাধ্য টানিয়া বুনিয়া নূতন বেশভূষায় সজ্জিত করিতে বসিল; “গুয়াটুটি” খোঁপা বড় স্নন্দর করিয়া বাঁধিল কিন্তু “মাছিতা বদনে দেখি দর্পনে চাপড়।” দর্পন ভাঙ্গিলে স্নন্দরীগণের মুখের মাছিতা ঘোচে কি? লহনা “মেঘ ডুঘুর” কাপড় পরিয়া পরী সাজিয়া স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে গেল। এদিকে সে দিন অনেক লোক সাধুর ঘরে নিমন্ত্রিত; দুর্কলা দাসী বিস্তর পরস্যা চুরি করিয়াও বাজার হইতে অনেক আয়োজন পত্র সংগ্রহ করিয়াছে; সাধু খুল্লনাকে রাঁধিতে বলিলেন; লহনা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল,—খুল্লনা কোন কাজের মেয়ে নহে, ওকে পাক করিতে দিলে সব নষ্ট করিয়া ফেলিবে, খুল্লনা কেবল পাশা খেলিতে জানে “নাহি রাঁধে, নাহি বাড়ে নাহি দেয় ছুক। পরের রাঁধন খেরে চাপপানা মুখ।” কিন্তু এই আপত্তিতে কোন ফল হইল না, খুল্লনাই রাঁধিতে গেল; দেবীর ক্রপায় পাক বড় উত্তম হইল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ধন্য ধন্য বলিল কিন্তু ‘বাসি পাঁজ তাত ছিল সন্ধ্যা দুই ডিন। তাহা খাইয়া লহনা কাটাইল দিদ।’ সকলটিকে খাওয়াইয়া দেবী-

রূপিনী লক্ষ্মীবউ খুলনা লহনার নিকটে গেল,—“সন্দেশে খুলনা আসি ধরিল চরণে। হুচিল কোন্দল মোহে বলিল ভোজনে।” খুলনা এইরূপ কমাশীলা ছিল।

তারপর খুলনা সাধুর শয্যা গৃহে যাইবে; লহনা তাহাকে নানা যুক্তি বলিয়া নিবারণ করিল; কিন্তু খুলনা সেইসব যুক্তিপ্ৰবর্তক অভিসন্ধি বেশ বুদ্ধিতে পারিল ও গল্পচ্ছলে যুক্তিগুলির অসারতা দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে পত্তিগৃহে গেল।

শয্যাগৃহে সুন্দর কোতুকের অভিনয় হইয়াছিল, খুলনা শয্যার নীচে পলাইয়া ছিল তখন ধনপতির মুখে অনাহত অনেক কবিত্বের কথা নিঃসৃত হইয়াছিল,—

‘কহ খটী কোথা মোর খুলনা হুল্লরী। কহনা প্রদীপ কোথা মোর সহচরী ॥ সত্য করি কহ কথা মধুকরবধু। খুলনার কবরীতে পান তৈলা মধু ॥ চিত্রের পুস্তনী বত আছে চারিত্রিতে। সবে ব্রিজাসনে সবাগর এক চিত্রে ॥ এতদিন একলা আছিহু পরবাসে। স্বপ্নেতে খুলনা নারী বেসে মোর পাশে ॥ প্রবাস ছাড়িয়া আসি আসি নিজঘর। কি দিয়া হুল্লরী মোরে করিলা পাগল ॥’

কৌড়াময়ী খুলনা ধরা দিল, স্বামীর বুক মুখ লুকাইয়া কাদিতে কাদিতে লহনা যত কষ্ট দিয়াছে, তাহা বলিতে লাগিল; শুনিয়া সাধু রাগে হঃখে জর্জরিত হইল, কিন্তু সে লহনার নিকট নিজে অপরাধী—খুলনাকে পাইয়া লহনার প্রতি তাহার ভালবাসার হ্রাস হইয়াছিল, আর এদিগে রাত্রিশেষে যখন সাধু খুলনার ঘর হইতে বাহির হইতেছিল তখন ঈর্ষা ও ক্রোধের প্রতিমূর্তি লহনা দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। “বাঁর হতে লহনার চক্ষে চক্ষে ভেট। লক্ষ্য লজ্জিত সাধু মাথা কেল হেট ॥” কি অপরাধহেতু রাগ করার পরিবর্তে সাধু লজ্জিত হইল, পাঠক বুদ্ধিতে পারিয়াছেন।

ইহার পরে পিতৃশ্রদ্ধ উপলক্ষে ধনপতি নানা স্থান হইতে স্বজাতিবর্গ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল। এই বণিক সমাজে মালা চন্দন দেওয়া লইয়া ঘোর কলহ বাঁধিয়া গেল, সে স্থলটি পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি; এই কলহের পরিণাম এই দাঁড়াইল, সভার প্রস্ত হইল, “ধনপতি খুলনাকে কিরূপে গৃহে রাখিয়াছেন, সে বনে বনে ছাগল চড়াইত।” “শুকজলে মৎস আর নারীর বোঝ। বনান্তরে পায় যদি রজত কাঁকন ॥ অথহু পাইলে তাহা ছাড়ি কোনজন ॥ দেখিলে জ্বলয়ে ইথে মূনি জনার মন ॥” খুলনা যদি সত্য হয়, তবে পরীক্ষা হউক, নতুবা আমরা আপনার বাড়ী খাইব না। ইহা শুনিয়া খুলনার পিতা

লক্ষপতি কাতর ভাবে রাজার দোহাই দিলেন। তাহা শুনিয়া “বলে বেগে শত্ৰুপক্ষ, রাজবলে হয়ে যন্ত, জাতিরে দেখাও রাজবল। জাতি যদি অতিরোবে, পক্ষদের পাখা খসে, ইহার উচিত পাবে কল।” খুলনা যদি পরীক্ষা না দেয়, তবে ধনপতিকে এক লক্ষ টাকা দিতে হইবে, তবেই ভোজন হইতে পারে।

জানী-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের যে অবস্থায় বুদ্ধি টলিয়াছিল, অন্য উপায়হীন ধনপতির সেই অবস্থা; দুর্বল বণিক গৃহে যাইয়া লহনাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। “তুই কেন খুলনাকে ছেলি রাখিতে বনে পাঠাইলি।” এবং খুলনাকে যাইয়া বলিল—“আমি লক্ষ টাকা দিব, তোমার পরীক্ষা দেওয়ার কাজ নাই।” কিন্তু খুলনা সেরূপ ঘেঁষে নহে, সে বলিল এই লক্ষ টাকা তুমি অধ্য দিবে, এর পরে আর এক নিমন্ত্রণে আমাকে উপলক্ষ করিয়া দ্বিগুণ চাহিবে, তুমি কত দিতে পারিবে। আর এই কলঙ্ক আমি সহ্য করিতে পারিব না—“পরীক্ষা লইতে নাথ যদি কর আন। পরল ভবিয়া আমি তাজিৰ পরাণ।”

এইরূপে খুলনা সতী নিজ চরিত্রের দৃঢ়তা দেখাইয়া প্রকৃত মুখে সভার পরীক্ষা দিতে দাঁড়াইলেন; তাঁহাকে জলে ডুবাইতে চেষ্টা হইল,—সর্প দ্বারা দংশন করা হইল,—প্রজ্বলিত লৌহদণ্ডে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে চেষ্টা করা হইল, অবশেষে যতুগৃহ নির্মাণ করিয়া খুলনাকে তন্মধ্যে রাখিয়া আগুন দেওয়া হইল; এইবার লক্ষপতি কাদিয়া উঠিল এবং ধনপতি শোকে বিহ্বল হইয়া আগুনে ঝাপ দিতে গেল।

কিন্তু শুদ্ধ স্বর্ণের জ্বায় এই যতুগৃহ হইতে খুলনাসতী আরও উজ্জল হইয়া বাহির হইলেন; এইবার শত্রুগণ পরাভব মানিয়া খুলনাকে প্রণাম করিল।

এই ঘটনার কিছু পরে রাজভাণ্ডারে চন্দনাদি দ্রব্যের অভাব হওয়াতে রাজাজ্ঞায় ধনপতিকে সিংহল যাইতে হইল। ধনপতি “সাতভিঙ্গা” বোঝাই করিয়া দীর্ঘ প্রবাসের জন্য প্রস্তুত হইল। যাত্রার যে সময় নির্ধারিত হইয়াছিল, তাহা লগ্নাচার্য্য অশুভ বলিয়া নিষিদ্ধ করাতো,—“এমন শুনিয়া সাধু মুখ কল্ল বাঁকা। নকরে হকুম দিয়া মারে তায়ে ধাকা।” খুলনা পতির শুভ কাৰ্য্যনা করিয়া চণ্ডীপূজা করিতে বসিয়াছিল, সদাগর “ভাকিনী দেবতা” বলিয়া চণ্ডীর ঘটে লাধি মারিল।

সদাগর ইল্লালী পরগণা, ললিতপুর, ভাওসিঙের ঘাট, মেটেরি, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া চলিল; সে সময় সপ্তগ্রাম খুব প্রসিদ্ধ ছিল, বোধ হয় হুগলীর ততদূর উন্নতি হয় নাই। কবি সমুদ্রের যে মানচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কল্পনা ও কিস্বদন্তীর রেখার অঙ্কিত, কিন্তু তন্মধ্যে দু'একটি ঐতিহাসিক তথ্য হ্রস্ব নহে,—“কিরিসীর দেশখান বাহে কর্ণধারে। রাত্রিদিন বহে যায় হারামদের ডরে।” এই বাক্য দ্বারা বোধ হয়, দক্ষিণ পূর্ষ উপকূলের পর্তুগিজ দল্লাদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে।

চণ্ডীর ঘটে সাধু লাখি দিয়াছিল, অকুল সমুদ্রে পাইয়া চণ্ডী তাহার শোধ তুলিলেন; তুফানে ৭ ডিঙ্গার মধ্যে ৬ ডিঙ্গা মারা গেল; একমাত্র “মধুকর ডিঙ্গা” লইয়া সাধু সিংহলে পৌঁছিলেন। কিন্তু পথে কালিদহে দেবী এক অপূর্ব দৃশ্য দেখাইয়া সাধুর চক্ষু প্রতারিত করিলেন। সমুদ্রে ঘন ঘন বড় ঢেউ উঠিতেছে, অনন্ত জলরাশির বহনুর ব্যাপিয়া এক সুন্দর পদ্মবন; তন্মধ্যে এক প্রফুল্ল পদ্মাকৃতা পরমসুন্দরী রমণী মুষ্টি; তিনি এক হস্তে হাতী ধরিয়া গিলিতেছেন। এই উজ্জল, আশ্চর্য্য ও অপ্রাকৃত দৃশ্য দেখিয়া সাধু স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল; হাতীশুদ্ধ সুন্দরীর ভরে প্রফুল্ল পদ্মের ক্ষীণাঙ্গ কাঁপিতেছিল; সদাগর বিষয়ে বলিল—“হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর।” যাহা হউক সদাগর ভিন্ন এদৃশ্য অপর কেহ দেখে নাই। সাধু সিংহলে গেলে সিংহলরাজ তাহাকে যথেষ্ট আদর ও প্রীতি দেখাইলেন। কিন্তু সদাগরেরমুখে কমলবনে কমলিনীর হস্তী গিলিবার কথা শুনিয়া কাহারও প্রত্যয় হইল না। রাজা ও সাধুর মধ্যে সন্ধা হইল, এই কমলবনের দৃশ্য দেখাইতে পারিলে রাজা তাহাকে অর্দ্ধরাজ্য দিবেন, নতুবা সাধু যাবজ্জীবনের জন্য বন্দী হইবে। সাধু রাজাকে লইয়া কালিদহে সেই দৃশ্য আর দেখিল না—এই উপলক্ষে সাধুর মৈরাশ্য সূচক সংগীত “এবে ছিল, কোথায় গেল, কমলদলবাসিনী। লোকালায় তরে বৃষ্টি লুকাল শুভ বদনী ॥” আমরা অঙ্গপূর্ণচক্ষে যাত্রায় শুনিরাছি; সাধুর যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম হইল। কারাগারে চণ্ডী স্বপ্ন দেখাইয়া জিজ্ঞিতে জানাইলেন—আমার পূজা করিলে জোর এ হুগতি যোচন হইবে। কিন্তু সাধু উত্তরে বলিল—“বসি কলীশালে ঘোর বাহিরায় প্রাণী, বহেশ ঠাকুর বিনে অভ নাহি জানি।”

এদিকে বাড়ীতে খুন্নার এক পুত্র জন্মিল; প্রসব সময়ে লহনা মিজের বাজারে বাইয়া ধাতু ডাকিয়া আনিল ও খুন্নার শুক্রবা করিতে কোন

রূপ ক্রটি করিল না। মালাধর নামক গন্ধর্ব্ব শিবের পাশে খুন্নার গর্ভে শ্রীমন্ত হইয়া জন্ম লইলেন। শিশুটি বড় সুন্দর—“সাত আট যায় সান, দুই দন্ত পরকাশ।” বালক সেই অক্টোলাত দন্ত দেখাইয়া নানা ভাবে হাসে ও ক্রীড়া করে; পঞ্চবর্ষ বয়সে শ্রীমন্ত ভাগবত শুনিয়া সহচরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-অমুষ্ঠিত খেলা গুলি খেলিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীমন্ত বড় চঞ্চল; সহচর শিশু গুলি খুন্নার নিকট নালিশ করিতেছে,—“করিয়া ক্লম্ব, বলে শিশুগণ, শুনগো শ্রীমন্তের মা। তোমার তনয়, মারয় সবার, দেখ দেখ মারনের মা। সব শিশু মিলি, এক সঙ্গে খেলি, শ্রীমন্ত বড় দুরন্ত। দারুণ চাপড়ে, সব দন্ত নড়ে, লাখের নাহি অন্ত। ভুবন কিরণা, দুই ভাই কাণা, চক্ষে দিল বালি গুঁড়া। বাঘ মাখব, ছুতাই নীরব, দানবেরে হৈল খোঁড়া। খুন্না ঝাড়িয়া ধুলা, দিল হাতে লাড়ু কলা, তৈল দিল সর্ব্বগায়।” ইত্যাদি। কবি জানিতেন ক্রীড়াশীল অশান্ত ছেলেগুলি শেষে ভাল হয়; শ্রীকৃষ্ণজীবনের অশান্তপনার মাধুর্য্য হইতে বস্ত্রের গৃহে গৃহে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। ইহার পর শ্রীমন্ত পড়িতে গেল; পিঙ্গল-কৃত ছন্দের ব্যাখ্যা, মাঘ, ভারবী, জৈমিনিভারত, প্রসঙ্গরাঘব প্রভৃতি পুস্তকে অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার হইল। একদিন তিনি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—পুতনা অজামিল ইহারা গর্হিত আচরণ করিয়াও মুক্তি পাইল কিন্তু শূর্ণনথার মুক্তি হইল না কেন, তাহার কেবল নাক কাণই কাটা গেল; “নবখা ভক্তির মধ্যে আত্মদান বড়।” সেত সেই আত্মদান করিতে চাহিয়াছিল। গুরু উত্তর দিলেন, সব শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা; কিন্তু শ্রীমন্ত এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া গুরুর প্রতি দ্বন্দ্ব পরিহাস-পূর্ব্বক বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

গুরু রাগে ক্ষেপিয়া গেলেন ও শ্রীমন্তকে নিতান্ত অসন্ত বাণী গালি দিতে লাগিলেন; শ্রীমন্ত গুরুর কুব্যবহারে উচিত উত্তর দিতে বিরত হন নাই, কিন্তু তাঁহার মাতাকে লইয়া রহস্ত করাত্রে শ্রীমন্ত কোথায় ছুঃখে বাড়ীতে বাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন; সেই দিন তরুণ-বয়স্ক শ্রীমন্ত পিতার খোঁজে সিংহল বাওয়ার দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাজার অস্বরোধ, মাতার কাতরতা কিছুতেই তাঁহাকে বিরত করিতে পারিল না। পুনরায় ৭ ডিগ্রা শ্রীমন্তকে লইয়া সিংহলাভিমুখে বাজা করিল।

আবার সেই নীল জলরাশির মধ্যে সেই সেই কথা, কালীদেহে আত্মর্য্য

কমলবন, সিংহলারিপের নিকটে যাইয়া সেই কথা বলিতে সভাসদগণ ও রাজার অপ্রত্যয়; এবার এই সত্য হইল—যদি শ্রীমন্ত কমলবন দেখাইতে পারেন, তবে রাজা তাহাকে অর্দ্ধরাজ্য ও নিজ কন্যা দিবেন, নতুবা দক্ষিণ মশানে তাঁহার শির কর্ত্তিত হইবে। শ্রীমন্ত রাজাকে লইয়া যাইয়া কমলবন দেখাইতে পারিলেন না, সুতরাং দক্ষিণ মশানে তাঁহার শির কর্ত্তিত হওয়ার উদ্যোগ হইল। স্নান করিয়া কাদিতে কাদিতে শ্রীমন্ত জীবনের শেষ পিতা ও মাতা প্রভৃতির উদ্দেশে তর্পণ করিতে লাগিলেন; চক্ষের জলের সঙ্গে—তর্পণের জল মিশিয়া গেল—

“তর্পণের জল লহ পিতা জনপতি। মশানে রহিল প্রাণ বিড়ম্বে পার্শ্বীতি। তর্পণের জল লহ পুত্রমা জননী। এ জনমের মত ছিরা নাগিল মেলানী। তর্পণের জল লহ খেলাবার তাই। উজানী নগরে আর দেখা হবে বাই। তর্পণের জল লহ হুর্দলা পুখিনী। ভব হস্তে সমর্পণ করিষু জননী। তর্পণের জল লহ জননীর মা। উজানী নগরে আদি আর বাব না। তর্পণের জল লহ লহনা বিমাতা। তব আশীর্ব্বাদে মোর কাটা বাবে রাখা। সবাকারে সমর্পণ আপন জননী। এ জনমের মত ছিরা নাগিল মেলানী।

ইহার পরে নিবিষ্টমনে শ্রীমন্ত ভগবতীর চৌত্রিশঅক্ষরী স্তব করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে শ্রীমন্তের নৌকার বাজাল মাঝিগণের চক্ষুধা বর্ণনার কবি বেশ পরিহাস শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—“বাজাল কাদেরে হুড়ুর বাপই বাপই। কুঞ্জে আদিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই। * * * * আর বাজাল বলে বাই হইল অনাথ। হুর্দধন গেল মোর হুকুতার পাত। আর বাজাল বলে বাই কইতে বড় লাজ। অলদি শুড়ি বাসা গেল জীবনে কি কাজ। যুবজী যৌবনবজী জ্যাজিলাম রোবে। আর বাজাল বলে হুঃখ পাই গৃহ দোবে। ইষ্ট মিত্র কুটুম্বের লাগে মারা মো। আর বাজাল বলে না দেখিষু মাগু পো।” *

বাজালগণ লইয়া ঠাটা এই প্রথম নহে; চৈতন্তপ্রভু এবিষয়ে ওস্তাদ ছিলেন।

ইহার পরে চণ্ডীদেবী আসিয়া শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন; রাজার লৈলুগণ চণ্ডীর ভূত প্রেতের হাতে মার খাইয়া পলাইল; রাজা সর্বসঙ্গে পরাস্ত হইলেন। চণ্ডীর রূপার তিনি আশ্চর্য্য কমলবন দেখিলেন; পিতা পুত্র মিলন হইল; শ্রীমন্ত রাজকন্যা সুলীলার পাণিগ্রহণ

তর্পণের অংশ ও এই অংশ হস্তনিধিত পুস্তকে ঠিক এই ভাবে নাই। বঙ্গভাষায় পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।

করিলেন। যখন পিতা পুত্র বাড়ীতে কিরিতে ইচ্ছুক, তখন সুশীলা স্বামীকে সিংহলে আর একটি বৎসর থাকিতে প্রার্থনা করিল; এই উপলক্ষে সিংহলের বার মাসের সুখ বর্ণিত হইয়াছে, রাজকন্যা স্বামীকে সিংহলী সুখের চিত্র দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন,—বৈশাখে “চন্দনাদি তৈল দিব হুশীতল বারি। সাঙলি গামছা দিব জুবা কস্তুরি।” জৈষ্ঠে—“পুষ্পশয্যা করি দিব চাঁদোয়া টানারে। হাস্য পরিহাসে বাবে রজনী বহিরে।—“আবাড়ে দেখহ যন নাচরে সরুদ। নবজলধর দৃষ্ট ডাকরে দাহুর। শুন প্রাণনাথ তুমি শুন প্রাণনাথ। নিধাবে নীতল বড় তরুণীর হাত।” আশ্বিনে,—“বিদেশ ত্যাজিয়া লোক আইসে নারী পাশে। কেমনে কামিনী ছাড়ি বাবে পরবাসে। তাদ্রে—“সদা নিধারিতে দিব পাটের মসারি। চামর বাতাস দিব হরর সহচরী। মধুঘরে প্রাণনাথ করাইব বাস। আর না করিহ প্রভু উজানীর আশ।” কার্ত্তিকে—“দুটিবে পুষ্প মোর উপবনে, তখি দোলমঞ্চ আমি করিব রচনে। সখী মিলি গাব সবে বসন্তের গীত। আনন্দিত হরে গাব কুঙ্কর চরিত।” চৈত্রমাসে—“মালতী মল্লিকা ঠাণা বিছাইব খাটে। মধুপানে গোড়াইব সদা গীত নাটে।” কিন্তু এই সব সুখের চিত্র মাতৃদর্শন-ব্যাকুল পুত্রকে বিরত করিতে পারিল না। পিতা পুত্র বাড়ী গেলেন, পথে ধনপতি জলমগ্ন ডিস্কাগুলি চণ্ডীর কুপায় ফিরিয়া পাইলেন; তিনি চণ্ডী পূজা করিতে সন্মত হইলেন।

বাড়ী আসিয়া কমলবনে আশ্চর্য্য রমণীমূর্ত্তি দেখাইয়া শ্রীমন্ত দেশী-রাজাকে ও মুগ্ধ করিলেন ও তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন।

বধাকালে শাপলষ্ট ব্যক্তিগণ স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন। পৃথিবীতে চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হইল।

চণ্ডীকাব্যের পূর্ব্বভাগে শিব-বিবাহাদি বর্ণিত হইয়াছে; এই অংশ নানা কবি নুতন করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন—ভারতচন্দ্রের অমূল্য-করখণ্ড তন্মধ্যে বিশেষ প্রাশংসা-যোগ্য হইয়াছে; কিন্তু এক শ্রেণীর কবির কথার লালিত্যে কণ্ঠ মুগ্ধ হইয়া যায়, অপর একশ্রেণীর ভাবের উচ্ছ্বাসে কবির ভ্রষ্ট হয়; শেষের মাধুর্য্যে যে পাঠকের সদলপর্জাব আকৃত হইবে না, তাঁহার নিকট মুকুন্দরামের “কামতরু,” “শিব বিবাহ” প্রভৃতি অংশ গাঢ় রসের আকর্ষণ বলিয়া দোষ হইবে; তিনি ভারতচন্দ্রের “প্রতি পোকে ছলি ঝাঁকে, কিম্বইয়া কনা হাঁসে ভালো চন্দ্ৰ জন্মে-ভরক!” প্রভৃতি উচ্ছলিত কাব্য কলায় পদ বিন্যাস ফেলিয়া সেই প্রসঙ্গে মুকুন্দরামের রচিত “সেই পরমারু বনে, চিরকাল থাক ধীরে, আমি যদি কোয়ার বঞ্চন” প্রভৃতি

মধ্যে প্রকৃত শোকের তীব্রতা বেশী অনুভব করিবেন। বাঁহারা শুধু ভাবার মিষ্টতালাস করেন, তাঁহারা জন্মদেব ও ভারতচন্দ্র পাঠ করুন, চণ্ডীদাস ও কবিকঙ্কণের কবিতা শ্রাব্য করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

শিবের গীত বঙ্গসাহিত্যে অতি প্রাচীন বিষয়; আমরা রতিদেব ও রঘুরামরায়কৃত “মৃগলক্কের” কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কালে শিববিবাহাদি ব্যাপার স্বতন্ত্র কাব্যের বিষয় না হইয়া প্রাচীন অনেকগুলি কাব্যের অংশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল; পদ্মপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যগুলিতে “শিবের বিবাহ,” “হরগৌরী কোন্দল” প্রভৃতি গ্রন্থারম্ভে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। এই শিব প্রসঙ্গও কবিগণের উপযুক্ত পরিচেষ্টায় সুন্দররূপে বিকাশ পাইয়াছে। বুদ্ধ ও তরুণীকে এক গৃহস্থালীর হলে জুড়িয়া দিলে যে সব দুর্গতি ঘটে, তাহা একটি নিম্নলিখিত হাস্যের সহিত দর্শন করিয়া রামেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ শিবপ্রসঙ্গ উপলক্ষে কয়েকখানা কোঁতুককর চিত্র আঁকিয়াছেন।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ভট্টনারায়ণ বংশোদ্ভূত। ইহার প্রপিতামহের নাম নারায়ণ, পিতামহের নাম গোবর্দ্ধন, পিতার নাম লক্ষণ ও মাতার নাম রূপবতী। বরদা পরগণার অন্তর্গত বহুপুর গ্রামে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পূর্ব নিবাস ছিল; তিনি এই বহুপুরে বাস করার সময় “সত্যপীরের কথা” রচনা করেন; “পরে সত্যপীর বলি কহে কবি রাম। সাকীন বরদাবাটী বহু পুর গ্রাম।” শেষে কবি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা বশমন্ত সিংহের সভাসদ হইয়া উক্ত পরগণাস্থিত অযোধ্যাবাড় গ্রামে বাস স্থাপন করেন; বশমন্ত সিংহের উৎসাহে তিনি “শিব সংকীর্তন” কাব্য রচনা করেন; গ্রন্থের অনেক স্থলেই বশমন্তসিংহের বংশ প্রচারিত হইয়াছে; সেই সব পদে জানা যায়, বশমন্তসিংহের পিতামহের নাম রঘুবীর, পিতার নাম রামসিংহ ও পুত্রের নাম অজিতসিংহ; বশমন্ত সিংহ ১৮৩৫ খৃঃাব্দে ঢাকার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন, ইহার ২২ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮১২ খৃঃ অব্দে “শিব সংকীর্তন” শেষ হয়। কবির দুই ছাত্র হইল, এক জমের নাম সুমিত্রা, ও অপরটির নাম পরমেশ্বরী। প্রত্যক্ষভাৱে তাঁহার দুই ভ্রাতা শঙ্করাম ও সনাতন,—পার্বতী, গৌরী ও

সরস্বতী এই তিন ভগ্নী ও দুর্গাচরণাদি ছয় ভাগিনেয়ের কথাও তিনি আশ্চর্য্যগকে জানাইয়াছেন।

অন্যান্য পৌরাণিক কাব্যের ন্যায় শিবসংকীৰ্ত্তনেও দেব দেবীর কন্দনা, সৃষ্টিপ্রকরণ, দক্ষবজ্র প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, তন্মিত্ত ইহাতে কল্পিণীত্রয়, বাণরাজার উপাখ্যান, প্রভৃতি বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা আছে; বাগ্দিবীরূপে গৌরীর শিবকে প্রতারণার স্থলটি রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় কবির স্বকপোলকল্পিত মনে করেন; কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বহু পূর্ববর্তী বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে ভগবতীর ডোমিনীরূপে শিবকে প্রতারণা করার বিষয় পাঠ করিয়াছি। পূৰ্ব্বকালে পৌরাণিক বিষয়গুলি লইয়া অক্ষরজ্ঞ অনেক ব্যক্তিই কবিতা রচনা করিতেন, উপাখ্যানভাগের কোন অংশগুলি কোন কবির দ্বারা প্রথম কল্পিত হয়, তাহা খুঁজিতে যাওয়া ও আঁধারে ঢিল ফেলা একইরূপ কাজ।

রামেশ্বরের রচনা অনুপ্রাসদোষ দৃষ্ট, কিন্তু অনেক স্থলে নিবিড় অনুপ্রাস ভেদ করিয়া বেশ একটু স্বাভাবিক হাস্যরসের খেলা দৃষ্ট হয়। রামেশ্বর কোন গভীর ভাব উদ্বেক করিতে চেষ্টা করেন নাই, এজন্য তিনি কখনই খুব বড় কবি বলিয়া পরিচিত হইবেন না। কিন্তু “শিব সংকীৰ্ত্তনের” আদ্যস্ত কবির মার্জিত মৃদুহাস্যের রশ্মিতে স্নানর। কার্ত্তিক গণেশ লইয়া শিব আহাৰ করিতে বসিয়াছেন—এই উপলক্ষে কবি রহস্যের কুটিল আলোতে একটি অন্নপূর্ণা গৃহিণীর স্নানর মূর্ত্তি দেখাইয়া লইয়াছেন—“তিন বাক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী। দুটি হাতে সপ্ত মুখ পক্ষমুখ পতি। তিন জনে একুনে বদন হ'ল বার। গুটি গুটি দুটি হাতে বত দিতে পার। তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়। এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়। শুভ্রা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া নাকে। অন্নপূর্ণা অন্ন আন রত্নমূর্ত্তি ভাকে। গুহ গণপতি ভাকে অন্ন আন মা। হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হয়ে খা। সুবিকী মায়ের বাক্যে সৌন্দর্য্য হয়ে রর। শঙ্কর শিখারে সেন শিখিবজ কর। রাবস উরসে জন্ম রাবসীর পেটে। বত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে। হাসিয়া অন্নর অন্ন বিতরণ করে। ইবদ্রু হৃণ রিষ বেনারীর পরে। লম্বোদর বলে গুন নগেন্দ্রের স্বী। হৃণ হল সাক আন আর আছে কি? দড়বড় দেবী এনে দিলা ভাজাদশ। খেতে খেতে গিরীশ গৌরীর পান বশ। সিদ্ধিকল কোমল গুড়ুরা কল ভাজা। মুখে কলে মাখা নাড়োদেবতার রাখা। * * * * * দিতে নিতে গত্যন্তে নাহি অবসর। প্রবে হলো সজল কোবল কলবর। ইন্দু মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ষবিন্দু সাজে। সৌভিকের শ্রেণী যেন বিদ্যাতের সাজে। অন্নদানে

গৃহিণীর এ আনন্দের ছবি এখন শেলাই ও উচ্চশিক্ষার হজুগের সময় ভাল বোধ হইবে কিনা জানি না। বৃদ্ধ স্বামীর লাহুনা শাঁখা পরার প্রসঙ্গে বেশ বর্ণিত হইয়াছে; দেবী দুগাছি শাঁখা চাহিয়াছিলেন; শিব তাহা দিতে অপারগ, নিজের বাড়ীর অবস্থা সন্দেহে দেবীকে অনেক কথা বলিয়া শিব কিছু স্নেহ সহকারে বলিলেন—“বাগ বটে বড় লোক বল গিয়া তাহা। জ্ঞানাল যুচক বাও জনকের ঘরে।” এই কথা দ্বারা শিব দেবীকে ভয় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দেবী তাহার শোধ কুলিলেন—, “বগবৎ হইয়া দেবের ছুটি পায়। কান্তননে জ্রোধ করি কাভাধনী যায়। কোলে করি কাঙ্ক্ষিকেরে, হস্তে গজানন। চকল চরণে হৈল চতীর চলন। গোড়াইল গিরীশ গৌরীর পিছু পিছু। শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু। নিদান দারুণ দিবা দিলা দেবরায়। আর সেলে অধিকা আমার মাথা খাও। করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী। ভাবিল ভাইএর কিরা ভবানীর প্রতি। খাইয়া ধূজুটি গিয়া ধরে ছুটি হাতে। আড় হইয়া পণ্ডপতি পড়িলেন পথে। যাও যাও বত ভাব জানা পেল বলি। ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেলা চলি। চমৎকার চলচুড় চারিদিকে যায়। নিবারিত নারিয়া নারদপাশে ধায়। ‘রামেশ্বর ভাবে ধবি দেখ বসে কি। পাখারে ফেলিয়া গেলা পর্বতের বি।’”

বহুদিন একত্রবাস নিবন্ধন হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে কতকটা উদারভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। সত্যপীর নামক বিশ্রমেবতার পূজা সেই উদারতার ফল। হরিঠাকুর এই উপলক্ষে ফকিরী আলখান্না গায় পরিয়াছেন ও উদ্দু জবানে বক্তৃতা দিতেছেন;— “বিবন্ধ বিবন্ধ বুঝারে বলে বাছা। ছুনিয়াবে এসাতি আদমি রহে সাঁচা। জালা বাস্তরা কাহে তেরা মুতাকাল কাহে। রাত দিন বৈসা তৈসা স্থখ দুঃখ হোয়ে। জানা বেগ বাত বাস্তরা জানা বেগ বাত। কাপরাতে লেও আও মেয়া সাথ। জওত সত্যপীর দেয়া জওত সত্যপীর। তেরা দুঃখ দূর করতও হাম ফকীর।”

কেতকাদাস, কেমানন্দ প্রভৃতি ।

মনসার গল্পেরও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল; বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেব প্রভৃতি আদিলেখকগণের দলে একদল নূতন কবি ভর্তি হইলেন। এপর্যন্ত আমরা মনসার ভাসানরচক ৩১ জন কবির নাম জানিয়াছি ও সেই সব নাম ৫২ পৃষ্ঠার ছুটনোট দিয়াছি। এই পরবর্তী মনসার ভাসান-রচক-কবিদিগের মধ্যে কেতকাদাস ও কেমানন্দদাসের কুহ পুস্তকখানা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহারা বোম্বেট ও ফেচারের ন্যায় দুইজন

একত্র হইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন; পুস্তকখানা ২৬০০ শ্লোকে পূর্ণ, ও ইহার পদ সংখ্যা ৬৬; তন্মধ্যে ২৬টি পদ কেতকাদাসের ভণিতায়ুক্ত অবশিষ্ট ৪০টি ক্ষেমানন্দাসের রচিত। যদিও পুস্তকের সর্বত্রই ছুই কবির ভণিতায়ুক্ত পদ পাওয়া যায়, তথাপি মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে পুস্তকের প্রথমার্ধের অর্থাৎ লখিন্দরের বিবাহপালা পর্য্যন্ত অধিকাংশ স্থল কেতকাদাসের রচনা ও শেষার্ধের অধিকাংশ স্থল ক্ষেমানন্দ-বিরচিত। ক্ষেমানন্দ ককণরসে ও কেতকাদাস হাস্যরসে পটু। এই ছুই কবির রচনার কতকাংশ ১০১-১০২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিষ্ট দেখাইয়া পাঠকবর্গকে খুসী করা যায়, একপ অংশ মনসার ভাসানে বড় বিরল; কিন্তু গল্পের আঁগা গোড়া পড়িলে পাঠকের চক্ষু মধ্যে মধ্যে অশ্রুপূর্ণ হইতে পারে, ও বেহলা সতীর সুন্দর রূপে চিত্র মুগ্ধ হইয়া যাইতে পারে। আমরা যখন এই পুথি প্রথম পড়িয়াছিলাম, তখন মানবী বেহলাকে দেবী বলিয়া বোধ হইয়াছিল; বেহলার পতিব্রতার কথা পড়িতে পড়িতে ভাবিয়াছিলাম—বাধুলী, তিল ফুল ও চতুর্দশীর চাঁদ দিয়া কবিগণ সচরাচর যে সব সুন্দরী সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাদের অনেকে বেহলার বাদী হইবার যোগ্য নহে। শ্রাবণ মাসে বস্ত্রের পল্লীতে পল্লীতে সর্বত্র ভাসান গান উপলক্ষে নৌকা লইয়া জীড়া হইত; সেই সব গানের মূল লক্ষ্য ছিল বেহলা; সেই গীত নানা রাগ রাগিনীতে উচ্ছল হইয়া পল্লী বধুগণের হৃদয়ে হৃদয়ে বেহলা সতীর মূর্তি অঙ্কিত করিত; আমরা এখন রেবেকা ও কসেটির মায়া ফাঁসে ঘরের খাঁটি সোনার মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি।

পূর্ববর্তী মনসার উপাখ্যানগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে, কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের পুথিতে চাঁদ সদাগরের উন্নত চরিত্র কতকটা ধর্ম হইয়াছে, কিন্তু বেহলার চরিত্র আরও বিকাশ পাইয়াছে।

কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ সম্ভবতঃ কারহু ছিলেন, একস্থলে কেতকাদাসের ভণিতায় “কেতকার বাণী, রক্ষ ঠাকুরাণী, কারহু যতেক আছে।” পাওয়া গিয়াছে, অপর একস্থলে “ব্রাহ্মণ চরণে, ক্ষেমানন্দ কণে, দেবী ঘারে কুলা কৈল।” দৃষ্ট হয়, ইহা দ্বারা তাঁহাদিগকে কারহু বলিয়া অনুমান করা যায়।

অন্য একটি পদ দৃষ্টে বোধ হয়, ফেরমানন্দ দাসের রাজীব নামক পুত্র ছিল—
“ফেরমানন্দ কহে কবি। রাজীবের রাখিবে দেবী।” বেহুলার জলপথে ভ্রমণ উপলক্ষে
বর্দ্ধমান অঞ্চলের স্থান নির্দেশ ঠিক ঠিক হইয়াছে, অন্য দেশের তুচ্ছপ
হয় নাই, সুতরাং কবিদ্বয়কে বর্দ্ধমানবাসী বলিয়া অনুমান করা যাইতে
পারে।

অপরূপের মনসার ভাসান-রচকদিগের রচনা ও অনেকস্থলে বেশ
সুন্দর হইয়াছে; আমাদের উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে স্থানাভাব। মনসা
গোয়ালিনী বেশে ধনুস্তরীর নিকট বিযাক্ত দধি বিক্রয় করিতে গিয়াছেন;
উঁহার শিষ্যগণের সঙ্গে গোয়ালিনী-রূপিনী দেবীর কৌতুককর কলহটি
বর্দ্ধমানদাস কবির হস্তে বেশ সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে
তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম;—

“কেমনে তোমার স্বামী, পাঠায় তোমার একাকিনী, গোয়ালী রহিল তোমার ঘরে।
দরিসের মত নয়, ধন আছে জ্ঞান হয়, নানাবিধ আছে অলঙ্কার। এতখন বার আছে,
সে কেন বা দধি বেচে, হাটে বাটে মাখার পসার। দুই জনে লাগ পায়, দধি হোল
করে দেয়, কথা কহিতে মুখে মারে। তোমার নাহিক ভয়, দুই জন যদি হয়, কাড়ি
লয় লণ্ড ডঙ করে। * * * বলিয়া এসব বোল, মূল্য করে দধি হোল, শিষ্য সব
বড়ই চতুর। বর্দ্ধমান দাসে কর, খেয়ে দেখ কেমন হয়, দধি মোর টক না মধুর।
শিবোর বচন শুনি বলে গোয়ালিনী। এদেশে এমন বিচার আমি নাহি জানি। রাজা
চন্দ্রধর হয় দেশে অধিকার। এই দেশে নাহি জানি এমন বিচার। তিন্ন দেশী আসি-
য়াছি দধি বেচিবার। পথে একা পেয়ে কেন পরিহাস কর। আমার জাতির ধর্ম মাথার
পসার। বাহার এমানে মোর ভুলে পরিবার। বিনা দুঃখে কাহার কড়ি হয় উৎপত্তি।
আমার সকল এই ঘরের সম্পত্তি। খাইয়া বেড়াও তুমি কহিতে না দেও কুক।
পরেরে বলিতে কি পরের লাগে দুঃখ। * * * বর্দ্ধমানদাস কহে কীর্ত্তি মনসার।
হাস্য করে শিষ্যগণ বলে আর বার। তোমার জাতির বুঝি পুরাতন কড়ি। দুনা
কড়ি লাগে দিব বেচ দধি হাঁড়ি। বত হাঁড়ি আছে তোমার সকল কিনিব। আগে
দধি খেয়ে দেখি পাছে কড়ি দিব। * * * পসার ভাঙ্গিয়া তোমার হাঁড়ি করি চুর।
মোর ঠাঁই দেখাও তোমার হার কেউর। বর্দ্ধমান দাসে কর কীর্ত্তি মনসার। ঘনাইয়া
গোয়ালিনী বলে আরবার। * * * যে জন আমার ধন দেখিতে না পারে। বিকাউক
মোর ঠাঁই কিনিব তাহারে। শিষ্যগণ বলে মোরা যেই ধন চাই। সেই ধন পাই যদি
কোন্সময়ে কিনাই। বর্দ্ধমান দাসে কর কীর্ত্তি মনসার। ঘনাইয়া গোয়ালিনী বলে আরবার।”

ধোণবধুর প্রসঙ্গে বৈকবকবিগণের দানলীলার পদ মনে হয়, বস্তুতঃ

কবিগণ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্বত্রই স্থানে অস্থানে বৈষ্ণবপ্রসঙ্গের মাদকতা বৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। হস্তলিখিত পুঁথিগুলি ও রচনা দৃষ্টে বোধ হয় কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি পরবর্তী মনসার ভাসান-রচকগণ ৩০০ হইতে ২০০ বৎসর পূর্বে এই উপাখ্যান গুলি রচনা করিয়াছিলেন।

ঘনরাম ।

হাকন্দপুরাণে শ্রীধর্মমঙ্গলকাব্যের বিষয় প্রথম লিপিবদ্ধ হয়; কিন্তু হাকন্দ পুরাণ এখন লুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় শ্রীধর্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূরভট্ট; তৎপর ১৫২৭ খৃঃ অঙ্গে খেলারাম এই বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করেন, আমরা ১২৬ পৃষ্ঠায় খেলারামের ধর্মমঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছি; ইহার পরে রূপরামের শ্রীধর্মমঙ্গল প্রচারিত হয়—এই সব কাব্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ১৭১৩ খৃঃ অঙ্গে ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁহার শ্রীধর্ম-মঙ্গলকাব্য সমাধা করেন। ঘনরাম ময়ূরভট্টের কথা স্বীয় কাব্যে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন—“ময়ূর ভট্ট বল্লিৎ সংগীতের আদ্যকবি।” শ্রীধর্মমঙ্গল ১ম সর্গ। রূপরাম ঘনরামের সহপাঠী ছিলেন, তাঁহার কাব্য বড় বড় শব্দপূর্ণ ও রচনা জটিল, কথিত আছে ঘনরাম উহা পড়িয়া বলিয়াছিলেন—“শব্দ শুনে স্তব্ধ হবে গান শুনে কি?”

ঘনরামের বাড়ী জেলা বর্দ্ধমানে স্থিত কইয়ড় পরগণাস্থগত কৃষ্ণপুর গ্রাম; তাঁহার প্রপিতামহের নাম পরমানন্দ, পিতামহের নাম ধনঞ্জয়,—ধনঞ্জয়ের দুই পুত্র, শঙ্কর ও গৌরীকান্ত; গৌরীকান্ত ঘনরামের পিতা, কবির মাতার নাম সীতা দেবী; সীতাদেবীর পিতা গঙ্গাহরি কৌতুলাবীর রাজকুলোদ্ভূত ছিলেন। ঘনরাম ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন—বাল্যকাল হইতে কবি খুব শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন; তৎকৃত শ্রীধর্মমঙ্গলকাব্যে মল্লদিগের লড়াই ও অশ্বাদির চালনার বেক্রপ জীবন্ত বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে কবির ব্যায়ামক্রীড়ার বিশেষ দখল ছিল বলিয়া বোধ হয়। ঘনরাম শৈশবে বড় কলহ-প্রিয় ছিলেন; তাঁহার পিতা গৌরীকান্ত চক্রবর্তী তাঁহাকে বর্দ্ধমানের তাত্‌কালিক প্রসিদ্ধ শাস্ত্র-চর্চার স্থান—রামপুরের টোলে পাঠাইয়া দেন; তথাকার হিতকর সংসর্গে

কবির কলহ-প্রিয়তার অনেকটা মনন হয় ও পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়া যায়। শৈশবেই কবিতাদেবীর কৃপা কটাক্ষ তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল; ওক তাঁহার ভাবীকণ: অঙ্গীকার করিয়া ডব্বণ বয়সেই তাঁহাকে “কবিরত্ন” উপাধি প্রদান করেন।

কৃষ্ণপুরাধিপতি মহারাজ কীর্তিচন্দ্র রায়ের আদেশে ঘনরাম শ্রীধর্ম-মঙ্গলকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন—“অখিল বিখ্যাত কীর্তি, মহারাজ চক্রবর্তী,—কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান। চিত্তি তার রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি, দ্বিজঘনরাম রসগান।” শ্রীধর্মমঙ্গল ব্যতীত ঘনরাম-রচিত সত্যনারায়ণের একখানা পাঁচালী দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাঁহার ৪ পুত্র রামপ্রিয়, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত আছে; কয়েক বৎসর হয় কবির বৃদ্ধ প্রাপৌত্র মহেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার একমাত্র পুত্র বর্তমান আছেন।

ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল ২৪ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত, মোট শ্লোক-সংখ্যা ৯১৪৭। ১ম সর্গ স্থাপনপালা, শ্লোক সংখ্যা ২৬৭; ২য় সর্গ চেকুরপালা, ২৩৮ শ্লোক; ৩য় সর্গ রজাবতীর বিবাহ পালা, ২৫৬ শ্লোক; ৪র্থ সর্গ, হরিশ্চন্দ্র পালা, ২৬০ শ্লোক; ৫ম সর্গ পালভরা পালা, ২২৭ শ্লোক; ৬ষ্ঠ সর্গ, লাউসেনের জয়পালা, ৩১৫ শ্লোক; ৭ম সর্গ আখড়া পালা, ৩৫৪ শ্লোক; ৮ম সর্গ ফলকনির্দ্দারণপালা, ৩১৭ শ্লোক; ৯ম সর্গ, গোড় খাত্তার পালা, ৪০৭ শ্লোক; ১০ম কামবল বধ, ৩৫০ শ্লোক; ১১শ সর্গ, জামাতি খালা ৩২৭ শ্লোক; ১২শ সর্গ গোলাহাটপালা, ৪৯৪ শ্লোক; ১৩শ সর্গ হস্তিবধপালা, ৪১৮ শ্লোক; ১৪শ সর্গ, কাঙুরবাতা পালা, ৩৫২ শ্লোক; ১৫শ সর্গ, কামরূপ যুদ্ধপালা ৪১৪ শ্লোক; ১৬শ সর্গ, কানড়ার স্বয়ম্বর, ৩০৭ শ্লোক; ১৭শ সর্গ, কানড়ার বিবাহ, ৪৮৫ শ্লোক; ১৮শ সর্গ, মারামুণ্ড পালা ৫৬৫ শ্লোক; ১৯শ সর্গ ইচ্ছাইবধ পালা ৪৩৫ শ্লোক ২০শ সর্গ, বাবল পালা, ২৮১ শ্লোক; ২১শ শ্লোক পশ্চিম উদয় আরম্ভ, ১৭৬ শ্লোক; ২২শ সর্গ আগরণ পালা, ১০৩১ শ্লোক; ২৩শ সর্গ পশ্চিম উদয় ৩৩০ শ্লোক; ২৪শ সর্গ স্বর্গা-রোহণ পালা, ৩৬৫ শ্লোক।

সুতরাং এই কাব্য কবির অধ্যবসায়ের এক বিরাট দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে। ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের অপূর্ণ কীর্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে; লাউসেন কুলটাগণের হস্তে পড়িয়া ইন্দ্রিয়জরী; ব্যাধ, হতী ও ফিল্ম অশ্বের সম্মুখে বুদ্ধ করিয়া তিনি বুকাইয়াছেন—তাঁহার রাজবল অস্তিত; খীর ভাতুল মহারাজের চুরভিলকি নানাভাবে বিফল করিয়া বুকাইয়াছেন, তিনি রেবতীগ্রহীত; অজের ইচ্ছাই ঘোষকে জয় করিয়া বুকাইয়াছেন, বিক্রমে তাঁহার পদকক নাই; খীর অশ্বগুলির এক একটি ছেদ করিয়া

দেবীর আরাধনা করিয়া বুঝাইয়াছেন—তিনি কঠোর ভগবতী ; এতদ্ব্যতীত মৃত শিশুর মুখে কথা বলাইয়াছেন, স্বীয় বিনষ্ট সৈন্যদলের প্রাণদান করিয়াছেন, নানা অন্তত কীর্তি প্রকাশ করিয়া কলিঙ্গা ও কানড়াকে বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু এই রাশি রাশি ঘটনা বর্ণনা করিয়াও কবি তাঁহার নায়ককে বড় করিতে পারেন নাই ; বিচ্ছিন্ন উপকরণ রাশি পড়িয়া আছে,—যে বিধি-দত্ত শক্তিগুণে সেগুলি একত্র করিয়া এক মহাবীরের চরিত্র গঠিত হইতে পারে, কবির সে শক্তি ও নৈপুণ্যের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়। লাউসেনের বিপদের সময় হুয়ান আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া দিতেছেন ; চণ্ডী আসিয়া তাহার শরীরের মশক খেদাই-তেছেন, সুতরাং তাঁহার বিপদে পাঠকের শান্তিভঙ্গের কোন আশঙ্কা নাই এবং তাঁহার জয়লাভেও পাঠক তাঁহাকে কোনরূপ প্রশংসা করিতে ইচ্ছা বোধ করিবেন না। পাঠক এই কাব্যের আদ্যস্ত ঘূমের ঘোরে অন্ধ নিম্নলিখিত চক্ষে পড়িয়া যাইবেন, কোন স্থলে তাঁহার চক্ষুকোণে অশ্রুবিन्दু নির্গত হওয়ার সম্ভব নাই। বর্ষাকালে জানেলা খুলিয়া অলস চক্ষে বৃষ্টিপাত দেখিতে একরূপ সুখ আছে, অবিরত জলের টুব টাব শব্দ, পত্রকম্পন ও বায়ু বেগে তরুরাজির মাথা নাড়া লক্ষ্য করিতে করিতে চক্ষুস্থল মুদিত হইয়া আসে এবং শূন্য নিজস্ব মনে পুরাতন কথা ও পুরাতন ছবির স্মৃতি অনাহত জাগিয়া উঠে ; ধনরামের শ্রীধর্ম-মঙ্গলের একঘোঁসে বর্ণনা সেই বৃষ্টির টুব টাব শব্দের স্তায়, তানপুরার মত তাহা হইতে অবিরত একরূপ ধ্বনি উঠিতেছে কিন্তু উহা পড়িতে একরূপ অলস স্নেহের উৎপত্তি হয়—স্থলে স্থলে কি কথা পড়িতে দূর দূরান্তরের কি কথা স্মৃতিপথে উদয় হয় ও ঘূমঘোরে চক্ষু মুদিত হইয়া আসে। মধ্যে মধ্যে যুদ্ধের দামামা বাদ্য এই নিদ্রাপ্রবণতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখন হাই তুলিয়া মন একটু বীররসে মাতিয়া যায় ; কিন্তু একটু নমুনা দিতেছি—“মার মার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী। সেনাপণ লানপণ, সময়ের নিয়ন্ত্রণ, হুসলে করে হানাহানি ॥ রক্তিনী রণজরী, হুলস্থলি বাজাই, ধনঘোর বাজাইয়া দান ॥ রাজপুত্র বজ্রবৃত্ত, রেছেন বনবৃত্ত, সমস্ত কুরে খানসামা ॥ দায়াদিগের দলবল, মহীমাঝে মাতল, মানব মহিমে দানাদেশ ॥ ধর ধর বলি দম, ধাইল দানবগণ, ধমকে ধরাধর কল্ল ॥ ঝাঁকে ঝাকে হরিবে, শরগুলি বরিবে, আকাশে একাকার ধুম ॥ দিশাহারা দিবসে, হত কত হত্যাশে, গোলা বাজে দুড়ুস দুড়ুস ॥ কাকতা ঝাঁকে

কাঁকে, কিকিছে হাঁকে হাঁকে, লাখে লাখে বরষে তীর। সামালিয়া হানিতে, গজবালী সহিতে, সমরে শিকারের শির।। করিয়া তর্জ্জন, ঘোরতর গর্জ্জন দুর্জ্জন দানাপণ মর্পে। সমরে সেনাগণ, সংহারে বৈহন, ক্ষুণ্ডিত মর্পে। ১৭শ সর্গ। বীরের পর বীভৎস রস—
 “পাতিল প্রেতের হাট পিশাচ পসারী। নরমাংস রুধিরে পসরা সারি সারি। ফড়া ফড়া মড়া করে ডাকিনী যোগিনী। কেহ কাটে কেহ কুটে বাটে খানি খানি। কেহ কিনে, কেহ বেচে, কেহ ধরে তুল। কেহ চাকে, কেহ ভকে, কেহ করে মূল।। রচিয়া নাড়ীর ফুল কেহ গাঁথে মালা। বয়ে লয়ে কেহ কারে যোগাইছে ডালা।। মনোরম মানুষের মাখার লয়ে থি। বাচিয়া যোগায় বত যোগিনীর থি।। খর্পর পুরিয়া কেহ নিষারিছে ক্ষুধা। চুমুকে রুধির পিয়ে সম তার স্থধা। কাঁচা বাস পায়ে কেহ ভাজা খোলে খালে। মানুষের গোটা মাথা কেহ ভরে গালে। দশমে চিবার কেহ কুঞ্জেরে শুড়। বুয়া বলে মুখে ভরে মানুষের মুড়।। হাতী লরে হাতে কেহ উড়ায় আকাশে। লাক দিয়ে লুফে কেহ অমনি গরাশে। পরিয়া নাড়ীর মালা কেহ করে নাট। মরা মাঝে মিহা শব্দ শুনি হান কাট। ভুত প্রেত ডাকিনী যোগিনী চওদানা। হাটে করে কেবল মাংসের বেচা কেনা।। হেন হাটে হাকিম হৈল হৈমবতী। করপটে সমুখে ধুমশী করে স্ততি।।” ১৭শ সর্গ।
 করুণরসের বড় অভাব, তবে মধ্যে মধ্যে পাঠকের অশ্রুপাত না হইলেও দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে পারে—
 “শিক্ষাদার ওরে ভাই এই ছিল আমার কপালে। নিশায় নিধন রণে, পিতা মাতা বহুগণে, দেখিতে না পেহু শেষকালে।। গলার কবচ মোর, শিক্ষাদার ধর ধর, দিহ মোর বেখানে জননী। নিশান অঙ্গুরী লরে, মরুর হাতে দিয়ে, ক’রো তুমি হ’লে জনাধিনি। তারে মোর মায়ের হাতে হাতে।। মর্পে সমাচার মলো, অকালে অভাগা মলো, অভাগিনী রাখে সাংখ সাংখ।। শুকায় স্তবর্ণ ছড়া, বাপেরে ও ঢাল খাড়া, সমর্পিয়ে সমাচার মলো। রণে অকাতর হয়ে, শত্রু শির সংহারিবে, সমুখ সংগ্রামে শাকা মলো।। কাণের কুণ্ডল ধর, শিক্ষাদার তুরি পর। ছুরী তীরে তুব বীরগণে।। শুনি শোকে শিক্ষাদার, চক্ষে বহে জলধার, বহে লোহ শাকার মরনে।। কেঁদে কহে পুনর্বীর, অপরায় অভাগার, খড়াইতে বা বাপের পায়। প্রণতি অসংখ্যার, দেখা নাহি হলো আর, অন্নকালে অভাগা বিদায়। মরমে রহিল শেল, হেন জন্ম বুধা গেল, মুখে না বলিহু রাম দাম। ব্রাহ্মণ বৈকব দেখা, জননী জনক সেবা, না করিহু বিধি হৈল বাম।”
 ২২শ অধ্যায়।*

এই পুস্তকের সর্বত্র কেবল শাস্ত্রের উদাহরণ, রামায়ণ ও মহাভারতাদির সুও চর্কণ করিয়া কবি এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; শাস্ত্রজ্ঞানের পুণীকৃত ধ্রু পটল কবির নির্মল আত্মাকে এক্রপ ঘেরিয়া

শিক্ষাদার ও শাকা দুই ভাই, মরুরা শিক্ষাদারের স্ত্রী।

ফেলিয়াছিল যে স্বাধুভূত জ্ঞানের কথা তিনি একটি ও বলিতে পারেন নাই। একমাত্র কপূরের চরিত্র বাঙ্গালীর খাট নকসা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কপূর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লাউসেনকে খুব ভালবাসে; ব্রাহ্ম, কুস্তীর প্রভৃতির সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধের পূর্বে এবং অপরাপর অনেক বিপদের পূর্বে সে দাদাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে অনেক নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু সে দাদাকে যত ভাল বাসে, নিজকে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভালবাসে; “আত্মার্থঃ পৃথিবীং ত্যজ্যেৎ” চাণক্যের এই সুবর্ণ নীতি সে সর্বত্র অনুষ্ঠান করিতে ক্রটি করে নাই। বিপদের সময় সে দাদাকে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে, ও যখন উঁকি দিয়া দেখিয়াছে আর ভয় নাই, তখন নিকটে আসিয়া অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছে, লাউসেন যখন জামতিনগরে বন্দী, তখন কপূর পলাতক, লাউসেন মুক্ত হইলে কপূর নির্ভয়ে আসিয়া দাদার গলা জড়াইয়া মিথ্যা কথা বলিতে লাগিল—“কাদিয়া কপূর সেনে করেন গিজাসা। কালি কোথা ছিলে ভাই হার কিবা দশা॥ কপূর বলেন যবে বন্দী হ'লে ভাই। রাত-রাতি গোড় ছিন্ ধাওয়া ধাই॥ রাজার আদাশ করি জামতি লুণ্ঠিতে। লগে আসি লক্ষ সেনা পথে, আচরিতে। পথে শুনি বিজয়, বিদায় দিহু ভাই। লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই॥”

উপসংহারে বক্তব্য ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল এত বিরাট ও এত একঘেঁষে যে সমস্ত কাব্য যিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন, তাহার ধৈর্যের শত মুখে প্রশংসা করা উচিত হইবে।

অনুবাদ শাখা।

ক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানাদি।

খ। রামায়ণ ও মহাভারতাদি।

ষোড়শ শতাব্দী অনুবাদের যুগ; এদেশে কবিতার প্রতিভা কবিকঙ্কণের পর শতাব্দী কাল নিমিত্ত হইয়া পড়িয়াছিল; যে পাখীটি নিজে মুক্তকণ্ঠের সুধার আকাশ প্রাবিত করিতেছিল, তাহাকে খাঁচায় পুরিয়া পরের বলি শিখাইতে চেষ্টা আরম্ভ হইল। খণ্ডার বচনেও গোলাচাঁদের

গানে আমরা সংস্কৃতির কোন চিহ্ন পাই নাই; বৈষ্ণবকবিগণের মধ্যে যিনি সকলের বড়, তিনি নিজের গান নিজের ভাষায় গাইয়াছেন; চণ্ডীদাস পকবিশ্ব ও ক্ষুরিত কদম্বের বড় ধার ধারেন নাই। অপরপক্ষ বৈষ্ণবকবিগণের পদে মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতির প্রভা পতিত হইয়াছে, দু'এক স্থলে বঙ্গীয় কবিতার গলে সংস্কৃতির ঋণ সোণার হারের ন্যায় খাঁটয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা উহার পদে শূন্যল স্বরূপ হইয়াছে। কবিকঙ্কণ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ছ এক স্থলে সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু কিছু রস আনিয়া নিজের কবিতায় লাগাইয়াছেন, যথা—
 “অঙ্গ বদি লেপি চন্দন পঙ্ক। দহে দেহ যেন দংশে ভুজঙ্গ।” ইহা জয়দেবের—
 “সরসবৎসমখি মনমলপঙ্ক। পশুতি বিধিবি বপুধি সপঙ্ক।” পদের তর্জমা,
 কিন্তু মুকুন্দরাম পথের বাহিরের ছ একটি ফুলের লোভে হাত বাড়াইলেও প্রকৃতির পাছে পাছে অনুগত তৃত্যের ন্যায়ই চলিয়াছেন।

কবিকঙ্কণের পর প্রকৃতি বাঙ্গালীর পর হইলেন—শাস্ত্র আপন হইল; ভাবা ভাবের অধিকার ছাড়িয়া স্বীয় স্বাভাব্য স্থাপন করিল এবং কবিগণ প্রকৃত মানুষ না দেখিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ছবিগুলি দেখিয়া পাগল হইলেন। সংস্কৃতির নানারূপ অদ্ভুত উপমা ও ভাব দ্বারা লেখনীগুলি ভূতাপ্রিত হইল, তাহারা সত্যযুগ হইতে আসিয়া কলিযুগের মানুষগুলির উপর জ্বরদন্তি আরম্ভ করিল; এখন এদেশে “আজামুলম্বিত বাহু” অদৃশ্য;—নয়না আবরণের চেষ্টায় বস্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি পাওয়াতে এখন “নখোদর” ও “নাভী স্নগভীর” আর লোক লোচনের আনন্দদায়ক হয় না; এই জনাকীর্ণ প্রদেশ এক সময় অরণ্যময় ছিল, তখন কুরঙ্গ মাতঙ্গের নৈসর্গিক ক্রীড়া সর্বদা মানুষের প্রত্যক্ষ হইত,—তাহা ভাল বোধ হইত,—মানুষ নিজ গতিবিধি ও কটাক্ষের সঙ্গে তাহাদের হাবভাব মিলাইয়া মনে মনে খুসী হইত, এখন স্বভাবের বড় বনে আমরা কুরঙ্গীর বিলোল কটাক্ষ দেখি না; নীর্ণকায় হস্তীগুলি মাছের লালিচর ভরে তাহাদিগের স্বভাবগতি ভুলিয়া গিয়াছে;—ইহা ছাড়া কচির ও অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে, রামরসায় উপমার মন তৃপ্ত হয় না,—সুতরাং সত্যযুগের উপমাগুলি এখন রহিত হইলে ভাল হয়। কিন্তু অতিরিক্ত বই পড়ার দোষে কবিগণ স্বভাবের অধিকারের বাহিরে বাইয়া পড়িলেন;

উপমাগুলি স্থল হইতে স্থল হইয়া মানুষীকরণকে ঘোর বিপদাপন্ন করিয়া কেলিল ; এই সময় কবিগণ যে সব স্থলর ও স্থলরীণ আঁকিয়াছেন, তাঁহারা অতিরিক্ত মাত্রায় শাস্ত্রীয় উপমার চাতুরীর কান্দে পড়িয়া একরূপ জীয়াস্ত মারা গিয়াছেন ; বিদ্যাঠাকুরাণীর রূপ পড়িয়া তাঁহাকে রূপসী জ্ঞান করা দূরে থাকুক, বীভৎস রসের উদয় না হইলেই যথেষ্ট। বঙ্গ সাহিত্যের এই রুচি নষ্ট করার পক্ষে পার্শ্বরও কতকটা হাত আছে, আমরা পরে তাহা সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

যাহাহউক ভাবের ছুগতি হইলেও ভাষা ক্রমশঃ মার্জিত হইতে চলিল, বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অলঙ্কার ও ছন্দগুলি আয়ত্ত করিয়া লইল—কিন্তু প্রথমে এই বিষয়ে অনেক কবির চেষ্টা বড় হাস্যাম্পদ হইয়াছে,—আমরা সে সবকে পরে লিখিব।

এই সংস্কৃতের আত্মগত্য বঙ্গ সাহিত্যের বিরাট অমুবাদ চেষ্টায় বিশেষরূপে দৃষ্ট হইবে। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক অমুবাদিত হইয়াছিল—তাহারা একরূপ নগণ্য ; আমরা বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছি, কিন্তু তাহাদের সবগুলি উল্লেখ করিতে পারিব না, সবগুলিই উল্লেখযোগ্য নহে—প্রথমতঃ আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকখানা উপাখ্যান ও পুরাণের অমুবাদের উল্লেখ করিয়া পরে রামায়ণ ও মহাভারত প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য এই অনুবাদগুলির অধিকাংশই খাঁটি অমুবাদ নহে, পুরাণ কি কাব্যাদি মূলতঃ অবলম্বন করিয়া মধ্যে মধ্যে কবিগণ নিজের কল্পনার ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে ক্রটি করেন নাই।

১। প্রহ্লাদ চরিত্র,—ষিদ্ধকংসারি প্রণীত ; মোক সংখ্যা ২২৪ ; হস্তলিপি (১৭০২ শক) ১৭৮০ খৃঃ অব্দ।

২। পরীক্ষিত সংবাদ—এই পুস্তকের অধিকাংশই রামায়ণের গল্পে পূর্ণ ; শুকদেব পরীক্ষিতকে রামায়ণ শুনাইতেছেন ও প্রসঙ্গক্রমে ধর্মব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রহকারের নাম পাওয়া গেল না। মোক সংখ্যা ৮০০ ; শ্রীরামধন দেবশর্মা হস্তাক্ষর, (১৭৩৮ শক) ১৮১৬ খৃঃ অব্দ।

৩। নৈবধ—লোকনাথদত্ত প্রণীত। ইহাতে নলোপাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণের বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে ও সর্বশেষ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে

স্টেট স্লোক সংখ্যা ২০৪৪ ; লেখক শ্রীরাধি কাইত, হস্তলিপি (১১৭৪ সন) ১৭৬৮ খৃঃ।

৪। ইন্দ্রদ্যম উপাখ্যান—বিজয়মুক্তপ্রণীত ; স্লোক সংখ্যা ৬২০ ; হস্তলিপি (১১৮৪ সন) ১৭৭৮ খৃঃ অব্দ।

৫। দণ্ডীপর্ব—রাজারামদত্ত প্রণীত ; স্লোক সংখ্যা ১৫০০ ; লেখক শ্রীরামপ্রসাদ দেব, হস্তলিপি (১৭০৭ শক) ১৭৮৮ খৃঃ।

৬। নল দময়ন্তী—মধুসূদননাথিত-প্রণীত, স্লোক সংখ্যা ২১২৪ ; লেখক শ্রীগৌর-কিশোর ধর, হস্তলিপি (১৭৩১ শক) ১৮০২ খৃঃ।

৭। হরিশংশ—বিজয়বানন্দ কর্তৃক অনুবাদিত স্লোক সংখ্যা ৩১৬৮ ; লেখক শ্রীভাসদত্ত ধূপী, হস্তলিপি (বাং ১১২০ সন) ১৭৮৩ খৃঃ অব্দ।

৮। ক্রিয়াযোগসার—পদ্মপুরাণের একাংশের অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীঅনন্তরাম শর্মা, স্লোক সংখ্যা ১০৫০। লেখক শ্রীরাঘবেন্দ্র রাজা ; হস্তলিপি (১৬৫৩ শক) ১৭৩১ খৃঃ অব্দ।

এই পুস্তকগুলি আমার নিকট আছে ; ইহা ছাড়া রঘুবংশের অনুবাদ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বায়ুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি প্রায় সবগুলি পুরাণের অনুবাদ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি আমরা দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু অক্কেরচন্দ্র সেন মহাশয় রামনারায়ণ ঘোষের অতি সুন্দর নৈষধ উপাখ্যান, সুধন্যা বধ, ক্রব-উপাখ্যান, প্রভৃতি কতকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইহাদের প্রায় তাবতের রচনাই একরূপ ; রচনা সরল, মধ্যে মধ্যে কোমল কবিতাবর্ণিতার লীলা খেলাও একটু একটু দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, এই সব পুস্তক বঙ্গভাষায় সংস্কৃত শব্দ ও উপমাশি বহুল পরিমাণে আমদানী করিয়াছে। এই যুগের শ্রেষ্ঠ অনুবাদলেখক কালীদাসের রচনায় যে যে গুণ দৃষ্ট হয়, পূর্বোক্ত অনুবাদ পুস্তকগুলিতে ন্যূনাধিক পরিমাণে সেই সব গুণ লক্ষিত হইবে। এই নগণ্য পুস্তক-রাশির অশূঙ্খল খদ্যোত দীপ্তি নিবিড় সাহিত্য ইতিহাসে তাৎকালিক রুচি ও ভাবের পরিষ্কার পথ দেখাইতেছে, তাহা অনুসরণ করিতে করিতে আমরা কালীদাসের প্রতিভার সম্মিহিত হইয়া পড়ি। পুঁথিগুলি হইতে কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা উচিত, নিয়ে আমরা কিছু কিছু অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি ;—

(১) প্রহ্লাদের স্তব—“খান করিয়া প্রহ্লাদ বলে উচ্চসরে। চন্দ্র হুঁবা জিনিয়া যে স্থায়রূপ ধরে। কিসীট কুণ্ডল হার বসন সুন্দর। বিজুলি মণ্ডিত বেন নব জলধর। পীতবাস পরিধান চরণে নুপুর। পদনখদীপ্তি কোটি চন্দ্র করে দুঃখ। চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপদ্ম

করে। অদ্বৈত কোত্তমণি মহাদীপ্তি করে।” এছাড়া চরিত্র, বে, গ, পুষ্টি ৯ পত্র।

(২) পরশুরামের বর্ণনা—“হেন কালে আসিলেন পরশুরাম বীর। মৈত্রেয় দানব জিনি নির্ভর শরীর। বাস হস্তে ধরে ধনু দক্ষিণ হস্তে তোমর। পৃষ্ঠেতে বিচিত্র টোপ অতি মনোহর। টোপের ভিতরে বাণ জলদগ্নি বেন। এক এক শর মুখে বেন কালবশ। সুবর্ণ বর্ণ তনু লোচন লোহিত। অঙ্গ হৈতে অদ্ভুত তেজ করিত। লম্বিত পিঙ্গল জটা পরশিছে কটী। রঘুনাথে দেখি করে হাস্য খটখট।” পরীক্ষিত সংবাদ, বে, গ, পুষ্টি, ২৩ পত্র।

(৩) শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—“আমি ব্যাধি রূপ হৈয়া দেই দুঃখ ভোগ। আমি ঔষধ হৈয়া ধুই দেই রোগ। আমি গয়া আমি গঙ্গা আমি বারাণসী। কীট পতঙ্গ আমি, আমি দিব্যানিধি। আমি পণ্ডিতরূপ আমি মুর্থসম। আমি সে সকল করি উত্তম অধম। আমার নাম নাই আমি করি নাশ। কাম ক্রোধ মোহ আমারই প্রকাশ।” পরীক্ষিত সংবাদ ১৪ পত্র। এইরূপ ভাব বাঙ্গলার পল্লীকবির রচনায় পাওয়া যায়—ইহা উচ্চ অদ্বৈত তত্ত্বের কথা; যে স্ত্র, কু, ব্যাধা করিতে অন্যান্য ধর্ম্মে শয়তান করিত, সেই স্ত্র, কু, বৈধি আমাদের ভ্রান্তির উৎপত্তি; স্ত্র, কু, আবার করিয়া অমৃত পুরুষের ব্যাপক মহিমার প্রসার; মুর্থ ও পণ্ডিত, রোগ ও ঔষধ ইত্যাদি একে অন্যকে দেখাইতেছে। ইহারা একই সত্ত্বের দুই ভিন্নদিক্ মাত্র, কিন্তু ইহাদের কোনটি তাঁহা ছাড়া নহে। হিন্দুধর্ম্মের পল্লীর লোকগণ পুতুল পূজা করেন, আবার এইরূপ দু'একটি কথা ও বলিতে জানেন।

কাশীদাসকে ছাড়িয়া স্থলে স্থলে ভারতচন্দ্রের উপমাগুলির পূর্ববধর ও পাওয়া যায়; সাহিত্যের রুচি অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত উপমার প্রতি প্রবর্তিত হইতেছিল; লোকনাথ দত্তের নৈবধ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ববর্তী কাব্য; কিন্তু মনোনিবেশ পূর্বক লোকনাথ দত্তের রচনা পাঠ করিলে ইঁহাকে ‘সুদ্র ভারতচন্দ্র’ উপাধি দেওয়া বাইতে পারে; দময়ন্তীর রূপ বর্ণনা হইতে—

“দেখিয়া হরঙ্গ তার ওষ্ঠাধর। অরুণ আকৃতি সূর্য্য হৈতে সমসর। দুরে থাকি কুহুস বাধুলি বিকল। অপনানে বলে মোর হরঙ্গ বিকল। দেখিয়া চিহ্নিত তার লগনের কান্দি। সমুদ্রে এবেশ কৈল মুকুতার পাতি। তার প্রতি বিকল দেখিয়া মনোহর। আকাশে উড়িল লাজে গৃধিনী সকল। দেখিয়া হুচাক তান দিবা বেশ পাশ। চাকরী কন্যেতে খেল হইয়া নৈরাশ। সীমন্ত বিচিত্র তার দেখি অদ্ভুত। ঘন ঘন পদক্ষেপে লুকাই দিলুত। দেখিয়া বিচিত্র গ্রীবা অতি শোভাযিত। সমুদ্রেতে বেগ হরণ হইয়া লজ্জিত। তনু কটিন তার পীন পরোধর। দুরে থাকি হেরিলেক হৃদয়বধর।”

সৈবধ, বে, গ, পুঁথি ৪০ পত্র। কিন্তু ইহাদের সকলের পূর্বে বিদ্যাপতি কবি গাহিয়া রাখিয়াছিলেন—“কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে, মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশ। হরিণ নরন ভয়ে, খর ভয়ে কোকিল, গভিতরে গজ বনবাস। তুল ভয়ে কমল মুনাল পক্ষে রহ। কর ভয়ে কিশলয় কাপে।”

কল্পনার এই বাড়াবাড়ি বঙ্গসাহিত্যে কাশীদাসের পরে ক্রমেই বেশী হইতে লাগিল, এই সময়ের অন্যান্য কবির লেখায় ইতস্ততঃ উল্লুপ নানা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; নলদময়ন্তীলেখক মধুসূদন নাপিত দময়ন্তীর কপালে নিবিড় কেশ রেখায় ঈষদ্ আবৃত সিন্দূর বিন্দুর উপমা দিয়াছেন—“রাহ জিহা নাড়ে যেন চক্রে গিলিবারে।”

মধুসূদন নাপিতরচিত ‘নলদময়ন্তী’ কাব্যের নাম উল্লেখ করিয়াছি; এই নরসুন্দর কবি স্বীয় পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন—“ব্রাহ্মণের দাস নাপিত কুলেতে উদ্ভব। বাহার কবির কীৰ্ত্তি লোকেতে সম্ভব। তাহান তনয় বাণীনাথ মহাশয়। পৃথিবী ভরিয়া যার কীৰ্ত্তির বিজয়। তাহান তনয় শিষ্য শ্রীমধুসূদন। শুনিয়া প্রভুর কীৰ্ত্তি উন্নত মন।” স্মরণ্যং দেখা যাইতেছে কবির পিতামহ ও কাব্য লিখিয়া লক্ষ্যশঃ হইয়াছিলেন; মধুসূদনের রচনা সরল ও হৃদয়গ্রাহী; শীলকবি বড় একখানা কাব্য লিখিতে লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কৃতকার্যতায় কেহ বিক্রপ করিতে সুবিধা পাইবেন না; স্বভাব বর্ণনা এইরূপ—“কতদূর গিয়ে দেখে রম্য একস্থান। মিষা সরোবর তথা পুষ্পের উদ্যান। তীরে, নীরে, ন,না পুষ্প লতায় শোভিত। দক্ষিণা পবন তথা অতি সুললিত। কোকিলের ধনি তথা ময়ূরের নৃত্য। অমরা নাচয়ে তথা অমরী গাহে গীত। পাইয়া শীতল বারি আনন্দ হৃদয়। হান তর্পণ কৈল সৈন্ধ্য সমুচয়। ছায়া, বারি, শীতল পবন মনোহর। নদী তীরে অমে রাজা সরস অন্তর। আনন্দে করয়ে কেলি যত জলচর। চক্রবাক কমলে শোভিত সরোবর। হংসে মুনাল তুলি যাচে হংসিনীকে। উড়ে পড়ে চকোরী চকোর ডাকে। এই কবির পুঁথিতে দু একটি স্থলে আমরা লোকনাথ দত্তের ভণিতা পাইয়াছি।

দণ্ডীকাব্যের বিষয় এই—হর্কশাশর শাপে উর্কশীঅঙ্গরা পৃথিবীতে ঘোটকী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। একদা অরবিন্দীর রাজা দণ্ডী শিকার করিতে বাইরা এই অপূর্ণ সুন্দরী ঘোটকীটি দেখিয়া সৈন্য সামন্ত ত্যাগ করিয়া তাহার পাছে পাছে ধাবিত হন; কতকদূরে গেলে নির্জনে ঘোটকী অপূর্ণ রমণীয়ুষ্টি ধারণ করে, রাজা তাহাকে বাড়ীতে লইয়া

আসেন; ঘোটকী কামরূপিনী, লোকের সম্মুখে ঘোটকী হইয়া থাকিত, কিন্তু রাজার নিকট সুন্দরী রমণীমূর্তি পরিগ্রহ করিত। নারদ ঋষি শ্রীকৃষ্ণকে যাইয়া জানান, তাঁহার অধীনস্থ অবন্তীরাজ বড় সুন্দরী ঘোটকী পাইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ঘোটকী চাহিয়া বসেন, উত্তরে দণ্ডী বলিয়া পাঠান, তিনি সিংহাসন ও রাজ্য ছাড়িয়া দিতে পারেন, ঘোটকী ছাড়িতে পারিবেন না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দণ্ডীর যুদ্ধের উদ্যোগ হইল; দণ্ডী সহায় খুঁজিয়া স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভ্রমণ করিল। বিভীষণ, বাসুকী, ইন্দ্র, যুধিষ্ঠির, হর্ষোদন প্রভৃতি কেহই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষে যুদ্ধে সহায়তা দিতে স্বীকৃত হইল না। স্তবরাং ক্ষুদ্রমনে ঘোটকীপৃষ্ঠে দণ্ডী গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতে গেলেন; এই গঙ্গারবাটে স্তবদ্রাবদী নান করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি রাজার উদ্দেশ্য জানিয়া ভীমসেনের নিকট রাজার বিষয় সুপারিস করেন; ভীমসেন সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হন; তখন বড় একটা গোল বাঁধিয়া গেল; জনে জনে আসিয়া ভীমসেনকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল;—কিন্তু ভীম পাঁহাড়ের ছায় অটল; প্রদ্যুম্ন আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করিয়া ভীমকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিল, দশ অবতারের এক এক অবতারের লীলা বর্ণন করিয়া প্রদ্যুম্ন বলিতে লাগিল “সেই প্রভু ঈশ্বর যে দেব ভগবান। হেন গোবিন্দেই ভীম কর অঙ্গজান।”—কিন্তু ভীম যে ভ্রুকুটি করিয়া ছিল, সে ভ্রুকুটিব্রত ভঙ্গ হইল না। বিষম যুদ্ধ বাঁধিল। ভীমসেনকে রক্ষা করিতে অগত্যা পাণ্ডব কোঁরব একত্র হইল,—এই সুহৃদ-চমুপরিবৃত, অটল প্রতিজ্ঞাপরায়ণ, শরণাগত-আশ্রয়কারী ভীমসেনকে শ্রীকৃষ্ণ হইতেও পূজ্য দেবের ছায় বোধ হয়—কাব্যের সহজ সুন্দর বর্ণনা রাশি এই বৃহৎ চরিত্রের চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া ফুলপল্লব-যুক্ত লতার ন্যায় দেখাইতেছে। কতকদূর যুদ্ধ হইয়া আর যুদ্ধ হইল না; যুদ্ধের কারণ ফুরাইয়া গেল—ইতিমধ্যে বিবাদের জিনিষ ঘোটকী অম্পরা হইয়া স্বর্গে নাচিতে গিয়াছে। ‘আর কেন?’ ভাবিয়া দণ্ডী শ্রীকৃষ্ণের বশ্বতা স্বীকার করিয়াছেন।

যুকুম্ভরামের ভাই রামানন্দ প্রণীত-গোবিন্দমঙ্গলের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে;—ইহার রচনার বিশেষ কিছু প্রশংসনীয় নাই; এক আধটু সৌন্দর্য্যের কথা কুড়াইয়া পাওয়া যাইতে পারে, যথা—

“রাধিকার প্রেমসদী রসেব পাখার। রসিক নাথর ভায়ে যেন যে সাতার। কাকলে মিশিল যেন নব গোঁরোচনা। নীলমণি মাঝে যেন পশিল কাঁচসোণা ॥ কুবলয় মাঝে যেন চম্পকের নাম। কালো মেঘ মাঝেতে বিজুলী অশুপাম। পালঙ্ক উপরে কৃষ্ণ রাধিকা কোলে। কালিন্দীর জলে যেন শশধর হেলে ॥”

আমরা পূর্বোক্ত কবিগণের মধ্যে কাহারও বিশেষ পরিচয় পাই নাই। সম্ভবতঃ ইঁহারা সকলেই পূর্ববঙ্গের লেখক। উঁহাদের মধ্যে এক মাত্র অনন্ত রামশর্মা (ক্রিয়াযোগসার প্রণেতা) নিজের এক দীর্ঘ পারিবারিক ইতিহাস দিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত অংশ উঠাইতে স্থান দেখিতেছি না, উহাতে জানা যায় কবির নিবাস ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্তী মেঘনা নদের পশ্চিম পার্শ্বস্থিত সাহাপুর গ্রাম, কবির পিতামহের নাম কবিদুর্লভ, কবিদুর্লভের তিন পুত্র, রামচন্দ্র, রামবেন্দ্র ও রঘুনাথ। অনন্তরাম এই রঘুনাথের পুত্র, ইঁহার মাতামহের নাম রামদাস। কবি বিশারদ উপাধি বিশিষ্ট কোন লোকের শরণ লইয়া ক্রিয়াযোগ সার লিখিয়াছেন। এই আত্ম বিবরণের পর ক্রিয়াযোগসার পাঠ করিলে কি কি ফল হয়, তাহার এক লম্বা তালিকা আছে, তাহাতে বিশ্বাস করিলে ইন্দের তত্ত্ব হইতে কুবেরের ভাণ্ডার ও মৃত্যুর পরে অক্ষয় মুক্তির উপর পাঠকের দাখিলী সন্দ জন্মিবে।

এস্থলে আমরা প্রসিদ্ধ একজন অনুবাদ লেখকের বিষয় উল্লেখ করিব। অনুবাদকারক রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল; কালীতে ইঁহার স্মৃতি-জ্ঞাপক জয়নারায়ণ কলেজ এখনও বিদ্যমান। ১০০ বৎসরের অধিক হইল ইনি কালীবাস কালে কালীখণ্ডের তর্জমা করিয়াছিলেন, ইহা মূলের ঠিক অনুযায়ী ও নানাবিচিত্র ছন্দোবদ্ধে সুপাঠ্য; পুস্তকের শেষে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই—“কালীবাস করি পঞ্চ গঙ্গার উপর। কালীখণ্ড গান হেতু ভাবিত অন্তর। মনে করি কালীখণ্ড ভাষা করি লিখি। ইঁহার সহায় হয় কাহারে না দেখি। সজ্ঞপত্ৰোক্ত শক পৌষ মাস হবে। আমার মানসমত যোগ হৈল তবে। হস্তধরি কুলে জন্ম পাটুলি নিবাসী। শ্রীমুক্ত নৃসিংহদেব রায়গত কালী। তার সঙ্গে জগন্নাথ মুখ্যা আইলা। প্রথম কাহ্নে এই আরম্ভ করিলা। শ্রীরামপ্রসাদ বিদ্যাবাসীপ জন্মল। ভাস্করি বসেন কালীখণ্ড অনুব্রণ। মুখ্যা করেন সখা কবিতা পাভড়া। জাহারে করেন রায় কর্কস। ধনড়া। রায় পুন্সকীর সেই পাভড়া লইয়া। পুস্তকে লিখেন তাহা সমস্ত শুবিয়া। এইমতে চলিল লাটাক্তি হৈল হবে। বিদ্যাবাসীশের কালী প্রাপ্তি হৈল

তবে। ভাস্কর্য্যে সুখ্যা। গেলেন নিজবাটী। বৎসর স্থগিত ছিল এই পরিশ্রমী। পরন্তু বাঙ্গালীটোলা গেলা যবে রায়। বলরাম বাচস্পতি* মিলিলা তথায়। পটভরী অস্তার পর্য্যন্ত তার সীমা। বক্রেশ্বর পঞ্চাননে সমাপ্ত সরিষা। কাশী পঞ্চক্রোশী আর বঙ্গরাজ্যবধ। এ দুই অধ্যায় পঞ্চাননে সমাপণ। পরে সত্বৎসরাবধি স্থগিত হইলা। শ্রীউমা-পঙ্কর তর্কালঙ্কার মিলিলা। যদ্যপি নয়ন দুটি দৈববোণে অন্ধ। তথাপি তাঁহার গুণে লোকে লাগে ধন্য। ইষ্ট নিষ্ট বাক্‌নিষ্ট কাশীপুরে জন্ম। পরানিষ্ট পরাধুখ বিজয়মর্দী মর্দ। লোক উপকারে সদা ব্যাকুল অন্তর। গ্রন্থের সমাপ্তি হেতু হৈলেন তৎপর। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার আখ্যান। তর্কালঙ্কারের পিতা সুধীর বিদ্যান। নিজে তার সহিত করিয়া পর্য্যটন। ছদ্মমাসে বহুগ্রন্থ করি সঙ্কলন। ষড় মাস তিথি বার বর্ষযাত্রা বত। পদোত্তে আনিয়া সংস্কৃত অভিমত। তর্কালঙ্কারের বহু বিজ্ঞান নাম। সিদ্ধান্ত আখ্যান অঙ্কি ধীর গুণধান। পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার। রায় করিলেন নরক গ্রন্থের পুচার। যোবাল বংশের রাজা জয়নারায়ণ। এই খানে সমাপ্ত করিলা বিবরণ। তাঁহার আদেশক্রমে কিতাব করিয়া। রামতনু মুখোপাধ্যায় লইল লিখিয়া। সেই বহি দৃষ্টি করি সঙ্কলনবিসী। কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাতরা নিবাসী।”

এই অনুবাদ সংকলন করিতে অনেকগুলি পণ্ডিত খাটিয়াছিলেন, ইহা এখনকার পণ্ডিত মণ্ডলীর উপেক্ষণীয় না হইতে পারে। কাশীধর্ম্মের অনুবাদ ১১২০০ শ্লোকে পূর্ণ। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ে কত শ্লোক আছে, তাহা অধ্যায় শেষে প্রাচীনরীতি অনুসারে একটি গ্রন্থলিখকের সঙ্কেতে জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

কিন্তু পুস্তকের মূলভাগ হইতে পুস্তক শেষে যে কাশীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মূল্য বেশী। রাজা বাহাদুরের লিপিকৌশল—তাঁহার সত্য প্রিয়তা; তাৎকালিক কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহা একশত বৎসরে যবনিকা তুলিয়া অবিকল কাশীর মূর্ত্তিটি আমাদের চক্ষে অঙ্কিত করিয়া দিতেছে; কাল-গতে এই চিত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ক্রমে আরও বৃদ্ধি হইবে; তখন ম্যাণ্ডিভাইলের জেক্সজিলাম, ব্যাসের ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের প্রাচীন কাশী, হিউনসাঙের কুশীনগর ও নরহরি চক্রবর্ত্তীর বুদ্ধাবন ও নবদ্বিপের চিত্রপটের সঙ্গে কাশীর এই মানচিত্র খানা এক স্থানে রক্ষা করার উপযুক্ত হইবে।

কবি গঙ্গার অর্দ্ধ গোলাকৃতি ভীরের উপর বক্রভাবে স্থিত কাশীকে শিব ঠাকুরের কপালের অর্দ্ধচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমে অসিঘাট, পরসনাথের ঘাট, সাজাদার ঘাট, বৈদ্যনাথের ঘাট,

নারদপাড়ের ষাট প্রভৃতি ৩০টি ঘাটের এক ক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়া লইয়াছেন, তন্মধ্যে তাহাদের আয়তন, গঠন প্রণালী ও তৎসম্বন্ধে চলিত জনশ্রুতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দপূর্ণ উল্লেখ আছে। তৎপর পোস্তাগুলি তাহাদের সংখ্যাও কম নহে; স্মৃতিপত্রের সঙ্গে ছুএকটি কোঁতুলোদীপক কথা থাকিলে তাহাদের নীরসতা ঘোচে, রাজাবাহাদুরের রচনার ও ইহাই গুণ; পোস্তাগুলির মধ্যে—“মীরের পোস্তাকে সর্ব পুধান গণিব। উর্কে বষ্ট হাত দীর্ঘে ত্রিশত প্রমাণ। যে মত পর্কত মধ্যে হসের প্রধান।” পোস্তাগুলির পরে “ঘাটিয়া” ব্রাহ্মণদিগের কথা; স্বানন্তে লোক সমুহের কপালে তিলক কাটিয়া দেওয়া ইত্যাদি ইহাদের কাজ। কলিকাতা গঙ্গার ঘাটে উড়িয়া মহাশয়গণ এই কাজ করিয়া থাকেন, অর্দ্ধ পয়সার তৈল খরিদ করিয়াই স্বানকারী ইহাদের “বজমানঅ” হইয়া বসেন। তৎপর দালানগুলির বর্ণনা; দ্বিতল, ত্রিতল ও চৌতলের সংখ্যাই বেশী কিন্তু “কদাচিত ছয়তলা সাত তলা সাজে” শ্রীমাধব রায়ের ধারার কাশীর সর্বোচ্চ মন্দির-চুড়, ইহা ১১০. হস্ত উচ্চ, ৯০ হস্তের পর বসিবার স্থান আছে,—“হনেরর দুই শৃঙ্গ যেমত প্রকাশ। মনে হয় তার চুড়া ভেদিল আকাশ। তাহার উপর বদি কোনজন যায়। সেই সে কাশীর শোভা দেখিবার পায়।” এই ধারার দুঃখী ও নিরাশাগ্রস্তের শেব উপায় ছিল, তাহারা ইহার উপর হইতে পড়িয়া মরিত। রাজা বাহাদুরের থাকা কালে যে হতভাগ্যগণ ইহার উপর হইতে প্রাণ দিয়াছে, তাহাদের উল্লেখ আছে; একব্যক্তি কোন সুন্দরীর প্রেমে মজিয়া তাহার সহিত সেই ধারার উপর উঠে, তিন দিন প্রণয়ীযুগ্ম সেই স্থানে বন্ধন করিয়া শেষে উভয়ে পড়িয়া মরে। কিন্তু মৃত্যু ইচ্ছা করিলেই সর্বদা মরা যায় না, “অন্ত একজন সেই ধারারাতে চড়ি। দৈবক্রমে তথা হৈতে তরুণের পড়ি। তরুণাল সহ পূর্ণ হইয়া ভুমিষ্ট। অনায়াসে নিজ গৃহে হইল অবিষ্ট।” এখন মিউনিসিপালিটি যে কার্য করেন, পূর্বে ধর্ম্মভীরু গৃহস্থগণ তাহা সম্পন্ন করিতেন—“মহাজনটোলী মধ্যে রাস্তাতে সর্বথা। দিনকর হিমকর করহীন তথা। একারণ নিশাযোগে পথিকের প্রীতে। দীপ শিবা করে সবে নিজ খিড়কীতে।”

কবি অসংশ্লিষ্ট, অথচ সর্বত্র উৎসুকনেত্র পথিকের জায় সরলভাবে ভালবাসনের উল্লেখ করিয়া বাস্তব্রূপে চিত্রের কোন কোন অংশ বেশ হাস-রস মিষ্ট হইয়াছে—“লালা সন্ন্যাসীর কত শত মঠ। বাহে উদাসীন মাত্র গৃহী অসংগঠ। সন্ন্যাসী মহাজনী ব্যবসা সবার। এক এক জনার বাড়ী পর্কত আকার।”

ভণ্ডপাণ্ডাদের "কাহার ঠাকুর মঠে কার ঠাকুরাণী। বাণী পরিপাটী হেরি কেন রাজধানী।" এবং উৎকৃষ্ট দধিহুগুপুঠ "শ্রীবিগ্রহমূর্তী যেন রাজরাজেশ্বর।" তৎপরে নানাজাতির বর্ণনা আছে; ব্রাহ্মণদের বেদাধ্যয়ন, সামবেদ পাঠ, লোকবৃন্দের গঙ্গাতীরে আমোদ প্রমোদ—এ সব তুলিতে আঁকার মত। এবং আখ্যায়িকার সর্বত্র অতিশয় শ্রদ্ধা, বিনয় ও ধর্ম্মে প্রণতির উৎকৃষ্ট পরিচয় আছে। কাশীর কুচা-গলিতে সেই সময়ে সর্বদা হত্যাকাণ্ড হইত—“এইমত প্রতি মাসে প্রায় হয় দশ। কণমাঝে গড়াগড়ি বার কত স্বপ্ন।” শিল্পকারগণ কি কি বস্তু প্রস্তুত করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহার একটি পূর্ণ তালিকা আছে; জোলাগণ কিংখাপ, একপাটা, জামদানী, সাড়ী, শামলা, গুদড়, তাসের উপর ধুকপাটা ও জরীমণ্ডিত বস্ত্র প্রস্তুত করিত ও “দ্বিশত পঞ্চাশ খান মূল্যের নির্ণয়।” কিন্তু “সাদাতে রেশম পাড়ি কতরঙ্গ করে। শুক সাদা অতুলন করিতে না পারে।” নদীয়ার কারিকরগণ অতি সুন্দর শিবলিঙ্গ পাষাণ দ্বারা প্রস্তুত করিত। তৎপর দেবমন্দিরগুলির বর্ণনা,—এ বর্ণনা উজ্জ্বল, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নাট্যশালায় ন্যায় বিচিত্র শোভা-উদ্ঘাটক; তখন অহল্যাবাইএর মন্দির নূতন প্রস্তুত হইয়াছে; পাষাণের খোদগারি ফুল ফলা লতা ও দক্ষিণ দেশস্থ মর্ম্মরের বিশাল বৃষের কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহারে “কনক কলস শোভে মন্দির উপর। তিন লক্ষ বায়ে বেই না হৈল কাতর।” ইহার পরে বিষ্ণুমহাদেব মহারাট্টার মন্দির ও অপরাপর মন্দিরের বিস্তৃত উল্লেখ—বর্ণনা একরূপ সরল, জীবন্ত ও সুন্দর—পাঠক যেন পথে দেখিতে দেখিতে যাইবেন। কাশীবাসিনী ধর্ম্মপ্রাণা রমণীগণের বর্ণনা আছে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মব্রতাদি, অহুষ্ঠান ও গঙ্গা স্নানাদির পরে রূপবর্ণনা—“গণ্ডারের চুড়ি কার কনকে রচিত। ঘোর ঘন মাঝে যেন তড়িত জড়িত। কি উপমা দিব যেই পিটে দোলে বেণী। অথও কদলী দলে বিহরে নাগিনী।” তাহাদের নোলকে—“বড় ছই মুক্তা মাঝে চুনি শোভা করে। যেমত দাড়িষ বীজ শুক চকু ধরে।” কিন্তু এই বিষয় কবিকে হটাৎ প্রলুব্ধ করিতে পারে। কবির অলঙ্কিতে উপমার উজ্জ্বলতা আসিয়া পড়িয়াছিল—“কার উরঃ দেশে মুক্তা মালায় দোলানী। হিমাচলে আশ্বলিত যেন মল্লকিনী।” কিন্তু সতর্ক লেখক লেখনীকে সংযত করিতে জানিতেন—“এসব দর্শনে ভক্তি মনেতে হইবে। কদাচিত্ত অসম্ভব মনেতে নহিবে।” ইহার পরে কাশীবাসী নানা জাতির অহুষ্ঠিত ধর্ম্মোৎসব, বার মাসের নানারূপ ব্যাপারাদি

বর্ণিত আছে। “তুলসী বিবাহ” সেই সময়ে কাশীর একটি বৃহৎ উৎসব ব্যাপার ছিল—রামলীলা, দুর্গালীলা প্রভৃতি যাত্রা সর্বদা অনুষ্ঠিত হইত।

কাশীধণ্ডের পুঁথি প্রেমানন্দ দাসের হস্তের লেখা। এই প্রেমানন্দ দাস “মনোনিষ্কা” নামক কুজ বৈষ্ণব পুস্তক রচনা করেন, তাহা বৈষ্ণবগণের আখড়ার একখানা নিত্য পাঠ্য পুঁথি। প্রেমানন্দ দাসের হাতের লেখা মুক্তার ন্যায় গোট গোট ও পুষ্পিত লতার ছায়া নানা ভঙ্গীতে ক্রীড়াশালী ; এই লেখার সর্বত্রই ‘ব’ ‘র’ মত লিখিত হইয়াছে—ইহা মিথিলার ধরণে ; প্রেমানন্দের হস্তের নকল আরও কতকগুলি পুঁথি আমার নিকট আছে—কাশীধণ্ডের হস্তলিপি ১৮০৮ খৃঃ অব্দের। সর্বশেষ কবি প্রেমানন্দ নিজ রচিত দুইটা গান দিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবী মাধুর্য্য মাখা দুর্গা-বন্দনা।

(খ) রামায়ণ ও মহাভারতাদির অনুবাদ।

(রামায়ণ।)

আমরা কৃষ্ণিবাসকে বঙ্গের আদি রামায়ণ-রচক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি ; কবিকঙ্কণ ইঁহাকে বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন—“করজোড়ে বলি-লাম ঠাকুর কৃষ্ণিবাস। বাঁহা হৈতে রামায়ণ হইল প্রকাশ ॥” (অণুসন্ধান, ১৩০২। ২৯৫ পৃঃ) এবং পরবর্তী বহুবিধ মহাজন ইঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া অনুবাদ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা কৃষ্ণিবাস সম্বন্ধে লিখিয়াছি, তাঁহার রামায়ণ সম্ভবতঃ অনেকটা মূলের অনুরূপ ছিল ; আমরা হস্ত-লিখিত পুঁথিগুলিতে তরঙ্গী-সেন বধ, বীরবাহুবধ, শ্রীরামের দুর্গাপূজা প্রভৃতি মূল বিষয় বহির্ভূত বিষয় পাই নাই। রামগতি ন্যায়-রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—“শ্রীরামের তথ্যবতী পূজা ও রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন প্রভৃতি প্রস্তাব শ্রীরামপুর মুদ্রিত পুস্তকে কিছুমান নাই ॥” (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৮৪ পৃঃ।) সুতরাং আমাদের বিশ্বাস ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে,—কৃষ্ণিবাস-রচিত সংক্ষিপ্ত মূলানুযায়ী রামায়ণের বাঁতার সঙ্গে পরবর্তী কবিগণ নানা পুরাণসঙ্কলিত প্রস্তাবাংশ ক্রমশঃ একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন ;—সর্বশেষ যিনি এই সংশোধন ও যোজনাদি কার্য্য করিয়াছেন, তাহাকে নিকটে পাইয়া আমরা ধরিতে পারিয়াছি—তিনি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ; কিন্তু পূর্ববর্তী জয়গোপালগণকে ইতিহাস প্রকৃতত্বের কিপ্রাপক আশ্রয়ে ধরিতে পারিবে কিনা সন্দেহ ; সম্ভবতঃ কৃষ্ণিবাসের রাক্ষসগণ শ্রীরামের বন্দনাগীত গান নাই। কিছু

পরে ভক্তির বজ্রায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল; সেই ভক্তির কয়েকট লহরী কৃতিবাসী রামায়ণের অম্বরগুলির *প্রস্তরকঠিনহৃদয় বিধৃত করিয়া তাহাদিগের রূপ সাঙ্কিকভাবে স্বিধ্মমহিমা-সংশ্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং জাতীয় প্রতিভার হস্তে কৃতিবাসের প্রতিভা নূতনরূপ গঠিত হইয়াছিল। কোন্ কোন্ কবি কৃতিবাসের ছদ্মবেশে আদিকবির অক্ষরের সঙ্গে স্বীয় অক্ষর মিলাইয়া ছিলেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন; আমরা কাহাঁর প্রাপ্য বশোমালা কাহাঁর কণ্ঠে দোলাইতেছি কে বলিবে? যখন শিশু ছিলাম, তখন বীরবাহুর স্ততির এই অংশ সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি;—

‘গজ বন্ধ হৈতে বীর নেহালে প্রীরাম। কপটে মনুষ্য দেহ দুর্বাদল আস। চাচর চিকুর শোভে চৌরশ কপাল। প্রসন্ন শরীর রাম পরম নয়াল ॥ ধ্বজ ব্রজাঙ্কুশ চিহ্ন অতি মনোহর। ভুবন মোহন রূপ আমল ফুলর ॥ রামের হাতের বিচিত্র ধনু বিচিত্র গঠন। সকল শরীরে দেখে বিকুর লক্ষণ ॥ নারায়ণ রূপ দেখি রাবণ কুমার। নিশ্চয় জানিল রাম বিকুর অবতার ॥ হাতের ধনুকবাণ তুলে ফেলায়ে। গজ হৈতে নামি কহে বিনয় করিয়া ॥ ধরণী লোটায়ে রহে জুড়ি দুই কর। অকিঞ্চনে কয় দয়া রাম রঘুবর ॥ প্রণম্য রামচন্দ্র সংসারের সার। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিকুর অবতার ॥’ ইত্যাদি। কিন্তু এই বিষ্ণুভক্তির গন্ধ চন্দনমাখা কবিতা-সেফালিকা কাহাঁর? ইহার লেখক খুব সম্ভব কৃতিবাস নছেন। অঙ্গদের রায়বায়ের উৎকৃষ্ট বিক্র-পাত্রক পংক্তিগুলি খুব সম্ভব কৃতিবাসের নহে,—উহা কবিচন্দ্র নামধেয় কোন অজ্ঞাত মহাজনের ভণিতায়ুক্ত; বটতলা হইতে রামচন্দ্র সীতার জন্ত চন্দ্র সূর্য্যকে ডাকিয়া ডাকিয়া যে সুললিত পদ্যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহা খুব সম্ভব কৃতিবাস সে ভাবে লিখিয়া যান নাই। ইহা শুনিয়া কোন কোন কৃতিবাস-ভক্ত পাঠকের হৃৎক হইতে পারে—কিন্তু কঠিন সত্যের আঘাতে জীবনের কত প্রাণ-প্রিয় ধারণা বিসর্জন দিতে হয়,— এই জীবন স্বপ্ন ভাসিবার পূর্বে স্বপ্ন রাজ্যের অন্তর্গত কত ছোট ছোট স্বপ্ন নিত্য নিত্য ভাসিয়া যায়;—দুরন্ত নেংটা শিশুটির ন্যায় সত্য জীড়া-চ্ছলে আমাদের সুকুমার বৃত্তির ফুল গুলি লইয়া টানাহেঁচড়া করিতে ভালবাসে।

এখন দেখা যাইতেছে বহুসংখ্যক পরবর্তী কবি যুগে যুগে যুগোচিত নবরস পরাইয়া কৃতিবাসকে বঙ্গদেশে প্রচলিত রাখিয়াছেন, তবে কৃতিবাসকে ঠাণ্ডা একবারে ঢাকিয়া ফেলিতে পারেন নাই। আদিকবির

সারল্যা ও কবিতার অনারম্ভে মাধুর্য্য বর্তমানাকারগ্রন্থ রামায়ণের ও সর্বত্র লীলা করিতেছে, যাহারা তাঁহার পুস্তকে যোজনা করিয়াছেন, তাঁহারাও নিজ লেখা কৃতিবাসী সারল্যের হাঁচে গড়িয়া তবে জোড়া দিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কৃতিবাসের পর অনেক কবি রামায়ণ রচনা করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই সমকক্ষতা-ইচ্ছু কবিগণের কেহই আদি কবির যশঃ হরণ করিতে পারেন নাই। কেবল যাহারা তাঁহার কাব্যে বিন্দু বিন্দু অনুরূপ রচনা মিশাইয়া নিজেরা গা ঢাকা দিয়াছেন, তাঁহারা নাম গোত্র শূন্য হইয়া আদি কবির বিরাট কাব্যে আশ্রয় পাইয়াছেন।

আমরা এস্থলে সংক্ষেপে অপরাপর রামায়ণ রচকদিগের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি;—

১. এবং ২। যতীন্দ্র ও গঙ্গাদাস সেন—ইহারা পিতা পুত্র। ইহাদের বাসস্থান “দীনার দ্বীপ” বলিয়া পুঁথিতে পাওয়া যায়; শ্রীযুক্ত অক্ষরচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন, এই দীনার দ্বীপ ও মহেশ্বরদিগের গঙ্গার অন্তর্গত সোণার গাঁর নিকটবর্তী বর্তমান ‘খিনার দি’ একই স্থান। যতীন্দ্র ৩০০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ২০০ বৎসর পূর্বের হস্তলিখিতপুঁথি গুলিতেও ইহাদের উভয়ের রচনা পাওয়া যাইতেছে। ইহারা উভয়েই সাহিত্যত্রে আজীবন বিবৃত ছিলেন; পদ্মপুরাণ রামায়ণ, মহাভারত এসমস্ত গ্রন্থেই ইহাদের প্রতিভা খেলিয়াছে। পূর্ববঙ্গের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিগুলির অধিকাংশই এই উদ্যোগী কবিদ্বয়ের লেখার নমুনা আছে। এক খানা প্রাচীন পদ্মপুরাণ দেখা গেল—যতীন্দ্রের উপাধি ছিল ‘গুণরাজ’। মালাধর বহু, হৃদয়-মিশ্র ও যতীন্দ্র—বঙ্গসাহিত্যে এই তিন ব্যক্তির উপাধি “গুণরাজ” পাওয়া যাইতেছে। যতীন্দ্র জগদানন্দ নামক কোন ব্যক্তির আশ্রয়ে কাব্য লিখিয়াছিলেন, সেই পরিচয়ের অংশ ৬৬ পৃষ্ঠার নোটে উদ্ধৃত হইয়াছে। রামায়ণের অনেক উপাখ্যান যতীন্দ্রের রচিত পাইয়াছি। যতীন্দ্রের রচনা সংক্ষিপ্ত, সরল ও পরিপক্ব, কিন্তু তৎপুত্র গঙ্গাদাসের রচিত পদ্মা চঞ্চল ও হৃদয়, তাহা বেশ চিত্তাকর্ষক; তত সংক্ষিপ্ত নহে কিন্তু বিস্তার হইয়া ও মনোরম—কোম অংশই বিরক্তিকর হয় নাই। গঙ্গাদাসের রচিত উত্তরাকাণ্ড রামায়ণ হইতে নমুনা দেখাইতেছি;—সীতার অযোধ্যা প্রবেশের পর শ্রীরাম বলিলেন “অগ্নি শুদ্ধা হইয়া সীদ্ধা পুরীমধ্যে বাউক। পাশিষ্ঠ অযোধ্যার লোক চক্ষু ভরি চাউক।” কিন্তু সীতার “মুগ্ধা জিনি বিনু বিনু চক্ষে পড়ে পাশি। রাম সম্বোধিয়া বোলে স্বদগদ বাধী। সংসারের সার তুমি অগতির গতি। আপনি জানবে আমি সত্যি কি অসত্যি। পুণ্ডরীক রসিনী আমি তোমার ধরণী। বিধাতা সৃজিল মোরে কল্পি অলক্ষণী। বারংবার

আনি আমা দোষ পুনি পুনি। নগরে চহরে যেন কুলটা রমণী। অপমান মহাদুঃখ না সঞ পরাণে। মেলানি মগিল সীতা তোমার চরণে॥ তবে তুমি পরে আর নাহি মোর গতি। জন্মে জন্মে আমি হউ তুমি রঘুপতি॥ এই বলিয়া সীতা দেবী অতি মনোদুঃখে। মা মা বলিয়া সীতা ঘন ঘন ডাকে। সাগর জঙ্গম তার সহিবার পার। আমার ভার মা কেন সহিতে না পার॥” কবি গঙ্গাদাস সেন প্রায় প্রত্যেক পত্রেরই পিতা ও পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন “পিতামহ কুলপতি, পিতা যষ্টীবর। যার যশঃ ঘোষে লোক পৃথিবী তিতর॥” যষ্টীবর খুব বিখ্যাত ছিলেন এরূপ অনুমান করিবার আরও অনেক কারণ আছে। আমরা মহাভারত আলোচনা করার সময় এই দুই কবির পুস্ক পুনশ্চ উত্থাপন করিব।

৩। ভবানী-দাস বিরচিত লক্ষ্মণ-দিব্বিজয়। ভবানীদাস জরুলে নামক কোন রাজার আদেশে এই পুস্তক রচনা করেন। তিনি কে এবং কোন সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন অনুষ্ঠিত নানা দেশ-বিজয়ের বৃত্তান্ত এই কাব্যে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থকারকেও পূর্ববঙ্গের লোক বলিয়া বোধ হয়। লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়ে প্রায় ৫০০০ লোক আছে, হতরাং ইহা আকারে বড়; কিন্তু স্থানে বড় বলিয়া বোধ হয় না, রচনা শুষ্ক ও একঘেঁয়ে। এই কাব্যের কয়েকটি স্থলে রামচরণ নামক কবির ভণিতা আছে।

৪। দ্বিজ দুর্গারাম প্রণীত রামায়ণ—ইহা শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সেন মহাশয় পাইয়াছেন; ইহা কুস্তিবাসের পরে লিখিত, কবি নিজে তাহা অনেক স্থলে স্বীকার করিয়াছেন। কবির কোনও আত্মবিবরণ পাওয়া যায় নাই; আমি এই পুস্তক পড়ি নাই; অরুণ বাবু লিখিয়াছেন—ইহার রচনা বড় মধুর। আমরা দ্বিজ দুর্গারাম প্রণীত কালিকা-পুরাণের একখানা অনুবাদ পাইয়াছি।

৫। অমৃতচাঁদোর রামায়ণ—পূর্বে বিক্রমপুরাকালে এই পুস্তক অনেক স্থলে প্রচলিত ছিল,—ইহাতে সীতাকে কালীর অবতার কল্পনা করিয়া বাল্মীকীর সীতার উপরে এক নূতন সীতা খাড়া করা হইয়াছে।

৬। জগৎরাম রায়ের রামায়ণ—কিঞ্চিৎ অধিক ২৫০ বৎসর হইল, বাঁকুড়া জেলার তুলুই গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জগৎরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম রাণীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, ও বাঁকুড়ার ২০ মাইল উত্তরে। সাবেক তুলুইগ্রাম নদীদর্ভে,—এখনকার তুলুইগ্রামে জগৎরাম রায়ের বংশধরগণ বাস করিতেছেন; তুলুই ও তৎসম্বন্ধিত স্থানগুলির দৃশ্য বেশ রমণীয়, কবির উপভোগ্য ও বাসস্থানের উপযুক্ত—“তুলুই স্থানটি এখনও অতি রমণীয়। দক্ষিণে অঙ্গদুরে বিহারীনাথ শৈল, পশ্চিমে কিছু দূরে পঞ্চকোট শৈলশ্রেণী ও অরণ্য, উত্তরে অতি নিকটে শীর্ণ দাবোদর দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ বালুকাস্তরের মধ্য দিয়া তরল রজত রেখার ভাষা বীরে বহিয়া বাইতেছে।” (সাপ্তিক-সম্মেলন, ১৯০১-বাং ভাদ্র)। কবির সীতার নাম রঘুনাথ রায় ও সীতার

নার শোভাবতী । পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথ সিংহ জুগের আদেশে ইনি রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেন, ১৭১২ সন্থতে (১৬৫৫ খৃঃ অব্দ) এই পুস্তক শেষ হয় । রামায়ণের পর এই কবি “দুর্গাপঞ্চরাত্রি” নামক একখানা কাব্য রচনা করেন, ইহাতে রামচন্দ্র কর্তৃক কিঙ্কিয়ার অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসব বর্ণিত হইয়াছে । ১৬০২ শকে (১৬৮০ খৃঃ অব্দ) ইহা সম্পূর্ণ হয় । এই কাব্যের বটী, সপ্তমী ও অষ্টমীর পালা জগৎরাম রায়ের রচিত; অবশিষ্ট দুই পালা তৎপুত্র রামপ্রসাদ রচনা করেন । জগৎরাম রায়ের রামায়ণে মধ্যে মধ্যে বেশ হুল্লার বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহা ততদূর প্রোঞ্জল নহে । মিষ্ট শব্দ ব্যবহারে কবি সর্বত্র গঠু নছেন; “দুর্গাপঞ্চরাত্রি” কবির পরবর্তী কাব্য, ইহার রচনা পরিপক্ব ও বেশ উপাদেয় । শিব ও গৌরীর কথা বার্তা লইয়া মধুর ও তীব্র একটি দাম্পত্য-কোন্দল লিখিত হইয়াছে; গোপীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের ‘রাখালী’ ‘পীতখটা’ ও ‘তিন ঠাই বাঁকার’ খোঁটা ও শিবঠাকুরের সিদ্ধিযুতরাশিরতা উপলক্ষে গৌরী মিষ্ট ভৎসন—সোহাগে ও গালিতে মিশ্রিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে রোম্মমিশ্র বৃষ্টির স্তমি কৌতুহলকর হয় । জগৎরাম রায়ের কবিত্বের নমুনা;—

“তুমিহে বেরন বলিলে ত্বেদন, এসতি তোমার কাষ । তব দোষ নয়, ধুতুরাতে কয়, তেজিলে এমন সাজ । এই করিয়া সব খোয়াইয়া, হয়েছে লিগধর । তোমার স্তম্বে, বিধিল যুগে আমার অন্তর ॥ বিভূতি গায়, দেবের সভার, যে যায় নেংটা বেশে । এসত কথা, বলিতে হেথা লাজ কি স্থণে এসে ॥ ভালের ঘোরে, নয়ন কিরে, চলিতে তাঁহর নাই । জটার ঘটা, বিভূতি কোঁটা, দেখিলে ভয় পাই ॥” রামপ্রসাদ ও পিতার অযোগ্য পুত্র নছেন,—দুর্গাপঞ্চরাত্রিতে তিনি এই ভাবে মুখবন্ধ করিয়াছেন,—“নবমী দশমী দুই দিবসের গান । বর্ণনা করিতে মোরে দিলা আজ্ঞা দান ॥ আজ্ঞা পেয়ে হর্ব হয়ে কৈশু অঙ্গীকার । বেরন যশকে লয় সাক্ষীরের ভার ॥ বামন বাসনা যেন বিধু ধরিবারে । পঙ্কু লজ্জিবারে চায় হুসের শিখরে । তেন অঙ্গীকার কৈশু পিতার বচনে । আঙ পাছু কিছুমাত্র না ভাবিলাম বনে ॥” রামপ্রসাদেরচিত অপর একখানা বড় কাব্য আছে, তাহার নাম—“কুক লীলামৃত রস” ।

৭ । রামমোহনের রামায়ণ—এই অনুবাদ একরূপ আধুনিক, ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে এই পুস্তক সন্মাদ হয় । রামমোহনের পিতার নাম বলরাম কল্যাপাধ্যায়; বাড়ী নদে জেলার বন্দার পূর্বভীরাহ মেটেরী গ্রাম । গ্রন্থকার পিতার আদেশে নিজ বাড়ীতে সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করেন । এই বিগ্রহের দিকট ঘূষ ভক্তির উৎসব চলিত বলিয়া কবি বর্ণনা করিয়াছেন—“লে রাকের ঘায়েতে সন্তত হড়াহড়ি । কেহ মাচে, কেহ গায়, দেব গড়াহড়ি ॥” পিতার আদেশে কবি সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন ও “কৃপা করি আদেশ করিলা—ব্রহ্মসান—রামায়ণরচি কর জীবের কল্যাণ ॥” তদনুসারে—“রচিলাম তাঁহর আজ্ঞা—ধরিয়া মস্তকে । লাজ হইল সপ্তদশ শতবর্ষী শকে ॥” এই রামায়ণ সর্বত্র কৃত্তিকমণী রামায়ণের নাম প্রোঞ্জল না হইলেও মধ্যে মধ্যে একপু অংশ আছে, অর্থাৎ আমি কবির প্রতিভার কর্ণকপাতে দিক উদ্ভাস্য সঞ্চিত হইয়াছে, কথা—“আমার

নবীন মেঘ দিল দরশন। যেমত সুললিত শ্যাম রামের দরশন। ঘন ঘন ঘন গর্জি অতি
 অসম্ভব। যেমন রামের ধনু টঙ্কারের রব। রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে। যেমন
 রামের রূপ সাধকের মনে। ময়ূর করয়ে নৃত্য নব মেঘ দেখি। রাম দেখি সঙ্কম
 যেমত হয় সুখি। সখী জঁলধারা পড়ে ধরণী উপরে। সীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু
 ঝোরে। সরসিজ শোভাকর হৈল সরোবরে। যেমত শোভিত রাম সেবক অন্তরে।
 মধু আসে পদ্ম অলি বাস করে মোদে। যেমত মূনির মন রাখবের পদে। জনগানে
 চাতকের তুচ্ছ করে যায়। রাম পেলে যেমত বাসনা ক্ষয় পায়। পুলকিত হয়ে মেঘ
 ডাকে ঘনে ঘন। যেমত রামের ডাকে নামপরায়ণ। নদ নদী অতি দ্রুত মনুষ্যে
 নিশায়। যেমত রামের অঙ্গে জীব লয় পায়। অবিরত বৃষ্টিতে পৃথীর তাপ যায়।
 যেমত তাপিত রাম নামেতে জুড়ায়।” (কিঙ্কিণী কাণ্ড)। কবির বিদ্রূপ শক্তি বেশ ছিল।
 ভরত ও শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় ক্রিরিলে পরে কুঞ্জা সকলের নিকট বড়াই করিয়া বলিয়াছিল,
 সে রাজপুত্রদের নিকট অনেক ভ্রমণ উপঢোকন পাইবে। তৎপরিবর্তে শত্রুঘ্নের প্রহাসে
 কুঞ্জ দেহ মুঞ্জ হইয়া পড়িল ও লজ্জায় কুঞ্জা পালাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল তখন—
 “নারীগণ কহে ভূবা দেখাইয়া যা। কুঞ্জা কহে ভাতার পুত্রের মাথা ধা।” হনুমান
 লঙ্কাদেবের পর বন্ধী অবস্থায় ঢাক ঢোল বাদ্য সম্বিষ্ট হইয়া লঙ্কার পথে পথে নীত
 হইতেছেন—“হনুমান কন মোর বিবাহ না হয়। কন্যাদান করিবে রাবণ মহাশয়।
 রাবণের কন্যা মোর পলে দিবে মালা। রাবণ যশুর মোর ইন্দ্রজিত শালা। চারিদিকে
 হাসয়ে যতেক নিশাচর। কেহ বা ইষ্টক মারে কেহ বা পাথর। হনুমান কন বিবাহের
 কাজ নাই। এমন মারণ খায় কাহার জামাই।” সুললিতকাণ্ড। ইহা আধুনিক সংঘত
 রংসের গুণচাপা হাস্য নহে—ইহা ধূলি ও কাঁদা হস্তে উচ্চ হো হো শব্দকর সেকেলে
 হাস্যরস; রামমোহন কবির ত্রাতৃপৌত্র ত্রিযুক্ত কালিদাস বাল্যোপাখ্যায়ের নিকট এই
 পুস্তকের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে।

৮। রঘুনন্দন গোবিন্দী-রচিত রামরসায়ণ। রঘুনন্দন ও বেশী প্রাচীন লেখক নহেন;
 ১০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল গত হইল তিনি বঙ্গদান জেলাস্থিত মাড় গ্রামে
 জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনন্দন নিতামঙ্গবংশ-সত্ত্বত বংশতালিকা এইরূপ—১। নিতামঙ্গ,
 ২। বীরভক্ত, ৩। বসন্ত, ৪। রামগোবিন্দ, ৫। বিশ্বভর, ৬। বলদেব, ৭। কিশোরীমোহন,
 ৮। রঘুনন্দন; কিশোরীমোহনের আর তিনপুত্র ছিল, বিশ্বরূপ, সত্বর্ণ ও বহুবল্লভ;
 রঘুনন্দন তাঁহার সর্বকর্মিষ্ঠ পুত্র। কিশোরীমোহন স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ ভাদ্রবত ছিলেন—
 ও তিনি নিজে কহিব বৈকবগ্রহ গ্রন্থন করিয়াছিলেন। রঘুনন্দনের জন্ম রাধ পূর্ণিমা
 বিম্বালঙ্কার। ‘সেবাল আর একাল’ পুস্তকে লিখিত আছে, রঘুনন্দন আরম্ভে প্রসিদ্ধ
 রামকমল সেন মহাপণ্ডিতের সঙ্গে দেখা লাভ করিতে করিকাতা আসিছেন; রামকমল সেন
 মহাপণ্ডিত ৭০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন।

রঘুনন্দনের মাতার নাম উষা ও বিম্বতার নাম মধুযতী ছিল; রামরসায়ণ বাতীত রঘুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার লীলা বিধরক একথানা বড়গ্রন্থ আছে। রঘুনন্দনের অপরা নাম ভাগবত।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পর, অপরাপর যে সব রামায়ণের অমুবাদ আমরা পাইরাছি, তদ্বন্দে রামরসায়ণ খানাই ভাল বলিয়া বোধ হয়। কবি অনেকাংশে বাস্তবিকের অনুসরণ করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তুলসীদাসের হিন্দীরামায়ণ হইতেও কোন কোন অংশ গ্রহীত হইয়াছে। রামরসায়ণের অধ্যায় বিভাগ ঠিক বাস্তবিকের পথে করা হয় নাই, তবে পূর্ববর্তী রামায়ণগুলি হইতে এখানা বেশী হৃৎখল, সন্দেহ-নাই। অধ্যায়গুলি এই ভাবে বিভক্ত হইয়াছে;—আদ্যাকাণ্ড ১১, অযোধ্যা অরণ্য ৮, কিষ্কিন্ধ্যা ১০, সুন্দরা ১২, লঙ্কা ৩৬ ও উত্তরাকাণ্ড ১৬ অধ্যায়। কবির রচনার সংস্কৃত শব্দ অতিরিক্তমাত্রায় পড়িয়াছে, মধ্যে মধ্যে তাহা অতিকটু হইয়াছে কিন্তু এরূপ রচনা ও বিরল নহে—
“এখা রঘুবর, করিতে লমর, হুখেতে মগন হইয়া। অতি হুকোমন, তরুণ বাকল, পরিলা কটিতে আঁটিয়া ॥ শিরে অবিকল, জটায় পটল, বাঁধিলা বেড়িয়া বেড়িয়া। পরিলা বিকচ, কঠিন কবচ, শরীরে হৃদুচ করিয়া ॥” রঘুনন্দনের পরারে ১৪ অঙ্কের নিয়ম কচিং লম্বিত হইয়াছে, এই কারো নানা ছন্দের লীলা খেলা দৃষ্ট হয়, তাহা পরে আলোচনা করিব। কিন্তু কবির সংস্কৃতপরায়ণতা সত্যেও হিন্দীভাষার ছিটা কোটা তাঁহার কাব্যের প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। কহিতু কৈলু, তিহ, তবহ প্রভৃতি ক্ষুদ্র শব্দগুলি সংস্কৃতের হৃৎখল ও পরিশুদ্ধ প্রণালীর মধ্যে হিন্দী প্রভাবের পতনোন্মুখ ধ্বজা উড়াইতেছে।

কবি রামরসায়ণের উত্তরাকাণ্ডে করুণরসের অংশগুলি ছাড়িয়া দিয়াছেন। সীতাবর্জন লক্ষ্মণ বর্জন, সীতার পাতাল প্রবেশ রামরসায়ণে স্থান পায় নাই। যে ঘটনা মনকে দুঃখের তরঙ্গে কেলিয়া যায়, যাঁহাতে প্রাকৃতিক বিধানের উৎকর্ষের উপর সন্দেহ জন্মে, যেখানে সত্য ও সত্যের অসমর্থতা প্রমাণিত হয়—তাহাদের প্রশানের উদ্দেশ্যে করুণার অজবিলু শুকাইয়া যায়, বৈকল্যগণ সেসকল ঘটনা বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন না। চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে পৌরাণ প্রভুর তিরোধান বর্ণিত হয় নাই।

বিরোপান্ত দৃষ্ট অক্ষন করিতে হিন্দুকবিগণ সততই অনিচ্ছুক, এইজন্য নায়ক নায়িকার দুঃখের জীবন সমাপ্ত হইলে তাঁহার প্রশানের উপরে পটক্ষেপ করিয়া পাঠকের মনে ব্যাথা-দেন না, করুণার স্বর্গরাজ্য পড়িয়া নায়ক নায়িকাকে তথায় পৌঁছাইয়া কাঙ্ক্ষা হন; বিরোপান্ত দৃষ্ট করির লিপি কোশলে হৃৎখল দৃষ্টের আভা ধারণ করিয়া পাঠকের দুঃখ ভুগাইয়া কেলে।

রঘুনন্দন তাঁহার রামরসায়ণ গৃহ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধামাধব বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করিয়া ছিলেন—“করিলাম যেই রাম বিলাস বর্ণন। শ্রীরাধামাধবে ইহা করিল অর্পণ ॥”

মহাভারত ।

রামায়ণকাব্যে আদত উপাখ্যান ভিন্ন বাজে প্রসঙ্গ বেশী নাই; কিন্তু মহাভারতের মূলগল্পের সহিত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগল্প জড়িত হইয়া রহিয়াছে। ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, ও দ্রুপদ্যোথনাদির সঙ্গে যযাতি, নল ও দ্রুপদ্য দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে উপমহা আকর্ণি ও উত্তর প্রকৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তিগুলি দাঁড়াইয়াছেন; মূল ঘটনা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সঙ্গে ইহাদের কোল স্পর্শ নাই—ইহারা বড় বড় ছবির ফ্রেমের উক্কে ও অধে ছোট ছোট আবাস্তর চিত্রের ভাষা মহাভারতের মলাট শোভিত করিতেছেন নান্ন। মহাভারতের উপগল্পের ঐক্য নাই, পাঠক পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন—দ্রৌপদীর বস্ত্রের ন্যায় তাহারা একরূপ অকুরন্ত। জন্মেজয়ের ন্যায় অহুসন্ধিৎসু শ্রোতা ও বৈশাম্পয়ণের ন্যায় দৈর্ঘ্যশীল বক্তা পরস্পরের গুণের পরিচয় দিতে ইচ্ছুক হইয়াই যেন পুঁথি এত লম্বা করিয়া তুলিয়াছেন; কুরু গল্পের অঙ্গভাগ শেষ না হইতেই সর্পযজ্ঞের গল্প, এই গল্পের আধখানা শেষ না হইতেই আবার সমুদ্রমন্থনের প্রসঙ্গ আরম্ভ, সমুদ্রমন্থনের কথা শেষ না হইতেই ইন্দ্রের লক্ষ্মীভট্ট হওয়ার বিবরণ,—এই গল্পের অকূল সমুদ্রে পড়িয়া পাঠকের দিশাহারা হইয়া যাওয়ার কথা।

এরূপ কাব্যে গল্পজোড়া দেওয়ার বড় সুবিধা। জন্মেজয়কে দিয়া একটা প্রশ্ন করিলেই লেখক স্বীয় কল্পিত গল্পটি জুড়িয়া দিতে পারেন। বাংলা মহাভারতগুলি এই ভাবে ক্রমে ক্রমে বড় হইয়াছে;—মূল-বহির্ভূত শ্রীবৎস ও চিন্তার উপাখ্যানের ন্যায় অনেক বাজে গল্প মহাভারতরূপ মহাবন্ধের তলে আশ্রয় পাইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

আমরা কাশীদাসের পূর্বে সঞ্জয় মহাভারত, ও কবিক্স রচিত (পরাগলী) মহাভারত সমগ্র পাইয়াছি, এবং নসরত সাহার আদেশে রচিত মহাভারতের খবর পাইয়াছি, এই মহাভারত পরাগলী মহাভারতের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া যজ্ঞবল্ক্যের রচিত স্বর্গারোহণ পর্বের শেষপত্রে জানিতে পাই, তিনিও সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। কাশীদাসের পূর্বে এইগুলি ও সম্ভবতঃ আরও অনেকগুলি সমগ্র মহাভারত

বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল; কিন্তু ইহা ছাড়াও উক্ত খ্যাতনামা কবি তৎপূর্ববর্তী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতোক্ত উপাখ্যান ও পর্কবিশেষের অনুবাদ-হাতে পাইয়াছিলেন, ছুটিবার আদেশে শ্রীকরনন্দী অশ্বমেধপর্কের অনুবাদ করেন, রাজেন্দ্রদাস প্রণীত আদিপর্ক, গোপীনাথদত্তপ্রণীত দ্রোণপর্ক, গঙ্গাদাসসেনপ্রণীত আদিও অশ্বমেধ পর্ক এতদ্ব্যতীত নানা কবির রচিত নলোপাখ্যান, প্রহ্লাদ চরিত্র ও ইন্দ্রদাম উপাখ্যান প্রভৃতি মহাভারতের অংশগুলিও কাশীদাসের পূর্ক ইহাতে বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। কবিকঙ্কণ ধেরূপ বলরাম ও মাধবাচার্যের চণ্ডীর উপর তুলি ধরিয়া তাহা সুন্দর করিয়াছেন, কাশীদাস তাহার পূর্ববর্তী কবিগণের রচনার উপর ঠিক সেই ভাবে তুলিক্লেপ করিতে পারেন নাই। কবিকঙ্কণ পূর্ববর্তী চণ্ডীগুলির ভাষামার্জিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু কাব্যোক্ত চরিত্র গুলি জীবন্ত করিয়াছেন, তিনি মনুষ্য-প্রকৃতি গভীর অন্তদৃষ্টির সহিত পাঠ করিয়া প্রাপ্ত উপকরণ রাশিতে হস্ত দিয়াছেন; যাহারা উপকরণ-রাশি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহারা মুকুন্দরামের মুজুরি করিয়াছেন মাত্র; কবি মহাপুরোহিতের ন্যায় স্বীয় প্রতিভার শম্ম ঘণ্টা বাজাইয়া সেই উপকরণ রাশিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু কাশীদাসের সেরূপ গৌরব কিছুই নাই; তিনি অনেক স্থলেই পূর্ববর্তী রচনাগুলির ভাষা একটু মার্জিত করিয়া পত্রশেবে “কৃষ্ণদাসানুজ” কি “গদাধরাগ্রজ” ভণিতা দ্বারা সত্য সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছেন। কাশীদাসের মহাভারত যে অবস্থায় আমরা পাইতেছি, সে অবস্থায় অংশবিশেষের তুলনা না করিয়া ধারাবাহিকরূপে ইহাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলোপাখ্যানের সঙ্গে তুলনা করিলে কাশীদাস-রচিত সেই উপাখ্যান অতি হীন বলিয়া বোধ হইবে; গঙ্গাদাসের অশ্বমেধপর্ক কাশীরাম দাসের অশ্বমেধপর্কের সঙ্গে তুলিত হইলে যশঃসম্পর্কে কতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা নাই। পরাগলী মহাভারতে ও সঞ্জয় মহাভারতে একরূপ অনেক অংশ আছে যাহা কাশীদাসী মহাভারতের সেই সব অংশ হইতে সুন্দর;—তথাপি ধারাবাহিকভাবে কাশীদাসের পুস্তকখানাই বোধ হয় উৎকৃষ্ট,—কিন্তু বটতলার কুপায় কাশীদাসের রচনা পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত না হইলে তাহার স্থান কিরূপ হইত বলা যায় না।

সঞ্জয় ও কবীন্দ্র-রচিত ভারত ও ছুটিখার আদেশ-রচিত অশ্বমেধপর্ব-সম্বন্ধে আমরা ইতি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অপরপর যে সব মহাভারতের উপাখ্যান আমরা কাশীদাসের পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করি, তৎসম্বন্ধে এস্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

রাজেন্দ্রদাস, গোপীনাথ দত্ত, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস-বিরচিত মহাভারতের কতকগুলি অংশের অনুবাদ আমরা পাইয়াছি, সে গুলির হস্তলিপি কিষ্কিন্ধ্যা দ্বইশত বৎসর পূর্বের; রচনা দেখিয়া বোধ হয় এই সব কবি অনূন ৩০০ বৎসর পূর্বে পুস্তক লিখিয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রদাসকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করি; ইহার রচিত আদিপর্বের প্রায় সমস্ত অংশ পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে শকুন্তলা উপাখ্যানটি বড় সুন্দর হইয়াছে—ইহা কালিদাসের শকুন্তলার প্রতিচ্ছায়া ও মধ্যে মধ্যে মাধ প্রভৃতি কবির উৎপ্রেক্ষা-মণ্ডিত। ভাষাটি পূর্ববঙ্গের, অতি জটিল তাহাতে আবার এত প্রাচীন; কিন্তু কবির তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য্যবোধ এই জটিল অপ্ৰচলিতশব্দবহুল রচনার মধ্যে মধ্যেও দৃষ্টিগোচর হয়,—পুরাতন বন্ধুরগাত্র বনফ্রমের নিবিড় পত্র ভেদ করিয়া যেরূপ মধ্যে মধ্যে সুগন্ধি সুন্দর ফুল দেখিতে পাওয়া যায়, এই দ্বিশত বৎসর জীর্ণ পুঁথির অঙ্কুত ভাষার মধ্যে মধ্যেও সেইরূপ প্রকৃতকবির উপযুক্ত সুন্দর ভাবের কথা সন্নিবিষ্ট আছে।

এইকাব্যে অননুয়া, প্রিয়ম্বদা, বিদূষক প্রভৃতি কালিদাসের তাবত চরিত্রেই গৃহীত হইয়াছে। দুঃস্বপ্ন মৃগয়ায় চলিতেছেন, তাঁহার অহুচর গোষ্ঠী সঙ্গে সঙ্গে; রাজধানীর সুন্দরীগণ গবাক্ষ হইতে,—“যার যার প্রিয়জন এই বাস্ত বলি। প্রিয়জন সম্বোধিয়া দেখায় অঙ্গুলী।” দুঃস্বপ্ন মুনির তপোবনে পৌঁছিলেন, শকুন্তলা তখন ও আসেন নাই, কিন্তু আসিবেন, বহিঃপ্রকৃতি যেন আশুতক ভালবাসার সাহায্যার্থ দাঁড়াইল, প্রকৃতির বর্ণনাটি বেশ সুন্দর—
 “শীতল পবন বহে, সুগন্ধি বহে বাস। ফল ফুলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ। মন্দ মন্দ বায়ু বৃক্ষসব নড়ে। ভ্রমরের পদ-ভরে পুষ্প সব পড়ে। নব নব শাখা গাছি অতি মনোহর। ধোপা ধোপা পুষ্প নড়ে গুল্লরে ভ্রমর। নির্মল বৃক্ষের তলে পুষ্প পড়ি আছে। লক্ষে লক্ষে বানর বেড়ায় গাছে গাছে। হেনজল না দেখিলুম নাহিক কমল। হেনশব্দ না দেখিলুম নাহিক ভ্রমর। হেন ভঙ্গ নাহি যে না ডাকে মত্ত হৈয়া। কেবা কোহ না বায়ন্ত সে বন দেখিয়া।” শেষের চারি পংক্তির কবিত্ব প্রশংসনীয়, কিন্তু

কৈরা অটিকাষ্যের একস্থলের পুনরাবৃত্তি মাত্র। বর্ণিত সুন্দর প্রকৃতিটি ছবি পশ্চাত্ত্বৈর জায়, শকুন্তলা এই প্রকৃতির উপযোগী ছবি; তিনি বধন অনসুয়া ও প্রিয়দর্শার সঙ্গে আসিলেন, তখন কবি "চিত্রের পুতলী ঘনপটেতে লিখিল" বলিয়া পটপূর্ণ করিলেন। রাজা শকুন্তলাকে বনমধ্যে ভাবিয়া ফার্ডিনেণ্ডের ন্যায় কথা বলিতে লাগিলেন; শকুন্তলা ব্রীড়াবনতা, আবেশ-ময়ী, সে সব গুনিয়া—“হইয়া লজ্জিত। বসনে ঢাকিয়া মুখ হাদিলা কিঞ্চিৎ।” বসনত ছাই বাকল! তৎপর গজদ্বর্জ বিবাহ শেষ। বিবাহের বার্তা যুনি কন্যাগণ জানেন না, বিবাহের পর শকুন্তলাকে তাঁহার দেখিলেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য দ্রব্য পরিত্রিষ্ট কিন্তু বড় মধুর হইয়াছে, তাঁহাদের সরল বাক্চাতুরী পড়িতে পড়িতে বাল্লীকির “প্রভাত কালেই ইব কামিনীনাং” শ্লোকটি মনে হইয়াছে। হৃদয় শকুন্তলাকে তাগ করিয়া গেলেন। শকুন্তলার প্রতি হর্ষাশার শাপ, কব্ধমূনির ব্লেহ, পরে কাদিতে কাদিতে শকুন্তলা এক দিন তাঁহার আজন্মসঙ্গিনী সখীগণ, উদ্যানের তবলতা ও কুরঙ্গ শাবেকের গলা জড়াইয়া শেষ বিদায় লইলেন। রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের পর অপমানিতা সুন্দরীর অভিমান-পূর্ণ তীব্র বাক্যগুলি,—রাজসভা হইতে তাড়িতা শকুন্তলা একাকিনী “হুহরি হুহরি কাঁবে তাপিত হইয়া।”—এই সব বেশ সৌন্দর্য্য-জ্ঞান-বিশিষ্ট তুলিকরের হস্তের কর্ণের ন্যায় সুন্দর হইয়াছে। শকুন্তলা অপমানিতা হইরাও পতিতে অধুরক্তা, যিনি নিষ্ঠুর হইতেও নিষ্ঠুরের ন্যায় তাঁহার প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাকে কাঁহারও সতীর নিকট নিষ্ঠুর বলিবার যো নাট, শকুন্তলা হৃদয় দেবের পূজক; হৃদয়ের মুখে অমুশোচনা শুনিলে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়—“শকুন্তলা বোলেন শুন, নিষ্ঠুর না বোল পুনঃ প্রাণ হৈতে পতি ভিন্ন নহে। বাইব জোয়ার সনে, কোন ছুঃখ নাহি মনে, তুমি বিনে কেবা মোর হয়ে। ভাবি চাহ মনে মনে, চক্রেয়ঙ্গিণান বিনে, বুটজলে না জীয়ে চকোর। মীন যেন জল বিনে, পকজ মধু বিহনে, পতি বিনে নারীর কঠোর।”

এই উপাখ্যান লইয়া পাপ পুণ্য সম্বন্ধে দীর্ঘ গবেষণা ও অন্য নানারূপ প্রসঙ্গ উদ্ভাষিত হইয়াছে; কাশীমাসের শকুন্তলার শ্লোক সংখ্যা ১৭৮, রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলার ১৫০০ শ্লোক। ইহা প্যারাডাইস লর্ডের হইট বড় অধ্যায়ের ভূম্য। আশ্চর্য্য একপ বলিল। যে, রাজেন্দ্রদাসের কবিতা সম্বন্ধেই সমস্ত ও সুন্দর, ইহা যে সময়ের রচনা তখনকার ভাষা আধুনিক ভাষা

হইতে বত স্তম্ভাৎ, সেই সময়ের কথা বার্তা, হাস্য পরিহাস এবং ক্রটি ও এখন হইতে সেইরূপ স্বতন্ত্র ছিল, স্থলে স্থলে পাঠকের বিরক্তি জন্মিতে পারে।

রামায়ণের অনুবাদ প্রসঙ্গে আমরা যজ্ঞবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাসের বিষয় জানাইরাছি; যজ্ঞবরের রচিত স্বর্গারোহণ পর্ক আমার নিকট আছে। এবং উহার শেষ পত্রে এই কবির রচিত সমগ্র মহাভারতের বিষয় উল্লেখ দেখিয়াছি। যজ্ঞবরের রচনা অনাড়ম্বর, বক্তব্য বিষয় বেশ সুন্দর ভাবে বলা হইয়াছে, তাহাতে কল্পনার জাকজমক নাই, মধ্যে মধ্যে দু'একটি মিষ্ট শব্দ ও সুন্দর উপমা বেশ ছুটিয়াছে, যথা—“স্বর্গ হৈতে নামিয়াছে দেবী মন্দাকিনী। পাতালে বহন্তি গঙ্গা ত্রিপথগামিনী। উত্তরে দক্ষিণে বহে সুরেশ্বরী-ধার। পৃথিবী পড়েছে যেন মালতীর হার।” এই লেখা পড়িয়া আমাদের কালিদাসের। “মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে। মুক্তামালা কণ্ঠগঠৈব ভূমেঃ।” মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু কবি বোধ হয় তাহা মনে করিয়া লিখেন নাই।

আমরা গঙ্গাদাস সেনের আদিপর্ক ও অশ্বমেধপর্ক পাইরাছি; আদিপর্কে তাঁহার রচিত দেবযানী-উপখ্যান বেশ সুন্দর; ইনি পিতা হইতে অধিক ক্ষমতাশালী; কাশীদাসের রচনার বটতলার পালিশ না পড়িলে গঙ্গাদাস সেন প্রায় তাঁহার সমকক্ষ হইতেন,—অনেক স্থলে বেশ আড়াআড়ি চলিতে পারিত; গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধপর্ক কাশীদাসের অশ্বমেধপর্ক হইতে আকারে বড়। রচনার কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে :—“যৌবনাথ পুরী ভীম দেখিলেক দূরে। স্বর্ষপুণ্ডিতবট প্রতি ঘরে ঘরে। বিচিত্র পতাকা উড়ে দেখিতে সুন্দর। দীপ্তমান শোভে যেন চন্দ্র দিবাকর। অতি বিলক্ষণ পুরী দেখিতে শোভিত। সহস্র কিরণ বেড়ি থাকে চারিভিত। যুগ আরোপিত পথে আছে সারি সারি। বজ্র ধুবে অস্ত্রকার গগন আবারি। নানা বাদ্য নৃত্য গীত জয় জয় ধনি। বেদধ্বনি নুপুরধ্বনি এই সারি শুনি। মন্দির প্রাঙ্গণ ঘট বিচিত্র নগর। পুরী দেখি হরিষ হইল বুদ্ধোদর। কলিত কমলীকর দেখিতে শোভিত। ভাল মনে পুষ্পভরে হয়েছে নমিত। গন্ধে আনোদিত সব স্থললিত ভ্রাণ। নানা বৃক্ষ লতাতে বিচিত্র শিখাণ। ধর্ম্মর পাকৈলা বত কলিত মদন। দেখিতে জুড়ায় আঁখি দুঃখ বিমোচন। বিদারিত দাড়িবে বেষ্টিত পুরীধান। পূণ্যবন্ত দেবি যেন দেবতার হান। লেখু জাযীর আর নারায়ণ কুল। অশোক চম্পক লজ্জ কেশর বকুল। স্বর্ণ কেতকী আদি জাতি জন লতা। হালতি চম্পক কুল লতিকা পুষ্পিতা। পশুপতী বেড়ি জীড়া করয়ে সকলে। কোকিলের ধ্বনি আর ভ্রমরের বোলে।”

উক্ত তাম্র ও এইরূপ নানা অংশের সঙ্গে কাশীদাসকবির সেই সেই স্থলের বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিলে গঙ্গাদাস তাঁহার নিকট ধর্ম হইয়া পড়িবেন বলিয়া বোধ হয় না ।

গোপীনাথদত্তের ছোণপর্ক আমরা পাইয়াছি । ইহাতে উক্ত পর্কের অন্যান্য বিষয়ের সহিত বহুপত্র জুড়িয়া দ্রোপদী-যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে ; অভিমত্যা বধে ক্রুদ্ধা রমণীদল কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন—দ্রোপদী, সেনাপতি । ঘনরামের কাব্যে আমরা কানেড়ার যুদ্ধ বিবরণ পড়িয়াছি ; ইতিহাসে দুর্গাবাই ও লক্ষ্মীবাইএর নাম পাঠক মণ্ডলীর নিকট অবিস্মিত নহে, আমরা কাশীদেবীর যুদ্ধ মূর্তি গড়িয়া আজও পূজা করিয়া থাকি সুতরাং মহাভারতে দ্রোপদী-যুদ্ধে অসম্ভব কল্পনা কিছুই নাই ; কিন্তু যে দেশের পুরুষই ললনা, সে দেশের ললনা আগ্রিনার রৌদ্রে ও বাতাসে উনাইয়া পড়িবার কথা, —যুদ্ধক্ষেত্রেরত কথাই নাই । বোধ হয় কাশীদাস বাঙ্গালীর নাড়ী টের পাইয়াই দ্রোপদী যুদ্ধের পালা জানিয়া থাকিলেও ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন । গোপীনাথ দত্তের দ্রোপদীযুদ্ধে আশ্চর্য্য কবিত্বের চিহ্ন নাই, তবে তাঁহার বর্ণিত পত্রগুলির শেষে কাশীদাসের ভণিতা দিয়া তাহা কাশীদাসী মহাভারতের যুদ্ধ বর্ণনাগুলির সঙ্গে আঁটিয়া দিলে কোন সমালোচক তাহা অন্য কবির লেখা বলিয়া ধরিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ, মধ্যে মধ্যে পূর্ববঙ্গের দু একটি শব্দ পরিবর্তন করিলেই গোপীনাথ কাশীদাসে মিশিয়া যাইতে পারেন ।

আমরা পূর্বে লিখিয়াছি, কাশীদাসই ধারাবাহিকভাবে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক ; এই কবির জীবন সম্বন্ধে আমরা অতি যৎসামান্য বিবরণ জানিতে পারিয়াছি । কাশীরাম বদ্ধমান জেলার উত্তরে ইজ্রানী পরগণাস্থিত সিঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এইগ্রাম ব্রাহ্মী নদীর তীরস্থ ; কাশীরামকবির প্রপিতামহের নাম প্রিয়স্কর, পিতামহের নাম সুধাকর ও পিতার নাম কমলাকান্ত দেব ; কমলাকান্তের ৩ পুত্র ছিল, কৃষ্ণদাস, কাশীদাস ও গদাধর । এই গদাধরের হস্তলিখিত সমগ্র মহাভারত রাইপুর রাজবাড়ীতে এখনও আছে, তাহা ১০৩৯ সালের লেখা, সে আঙ্ক ২৬৩ বৎসরের কথা । গদাধর কাশীদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; সুতরাং কাশীদাস ন্যূনাধিক ৩০০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন ; এবং সম্ভবতঃ ২৭০ বৎসর পূর্বে

মহাভারতের অনুবাদ সাঙ্গ করেন। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, কাশীরাম দাসের পুত্র আপন পুরোহিতদিগকে যে ষাণ্ডভিটা দান করেন, সেই দান পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১০৮৫ সালের লিখিত; বলা বাহুল্য এই দান পত্রোক্ত সন আমাদের মতের অনুকূল। সিদ্ধিগ্রামে “কেশে পুকুর” নামক একটি পুকুর আছে ও তথাকার লোকসকল “কাশীর ভিটা” বলিয়া একটি স্থান এখনও দেখাইয়া থাকেন।

কথিত আছে, কাশীরামদাস মেদিনীপুর আন্তঃসাগড়ের রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া পাঠশালা করিতেন; রাজবাড়ীতে যে সমস্ত কথক ও পুরাণ পাঠকারী পণ্ডিত আসিতেন, তাঁহাদের মুখে তিনি মহাভারত-প্রসঙ্গ শুনিয়া ইহাতে অমুরক্ত হন, এই অমুরাগের ফল—মহাভারতের অনুবাদ। সে সময়ের অনুবাদ মূল কাব্যের ছায়া লইয়া লিখিত হইত, কাশীদাসী মহাভারত ঠিক সংস্কৃতের অনুযায়ী নহে, এই জন্য কবি সংস্কৃত জানিতেন না, এরূপ মত প্রচার করা বোধ হয় উচিত নহে। নানা পুরাণ হইতে তিনি উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন, এইজন্য পুরাণ শুন্যর কথা লিখিয়া থাকিবেন। কৃত্তিবাসের ভণিতার সঙ্গে সঙ্গেও পুরাণ শুন্যর গীতরচনার কথা লিখিত আছে, অথচ কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণে জানা যায়, তিনি সংস্কৃতে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। ভণিতার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে পুঁথি-লেখকগণ ও অনেক কথা যোজনা করিয়া থাকেন।

“আদি সভা বন বিরাটের কতদূর। ইহা লিখি কাশীদাস গেলা বর্গপুর।”—এই একটি চলিত বাক্য আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন বর্গপুর অর্থ কাশীধাম; কিন্তু যে ভাবে কবিতাটি লিখিত, তাহাতে উক্ত মুন্সীরাম অর্থ গ্রহণ করিলেও তিনি যে বাকী অংশ সমাধা করেন, এরূপ বোধ হয় না। এই প্রবাদ বাক্য সত্ত্বেও, কাশীরাম দাসই সমস্ত মহাভারত অনুবাদ করেন এইমত সমর্থন-অভিপ্রায়ে কেহ কেহ বলেন, মহাভারতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রচনার কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু গঙ্গাদাস সেন, রাজেন্দ্রদাস, গোপীনাথ দত্ত প্রভৃতি কবির ভণিতা কাটরা যদি কাশীদাসী মহাভারতে আঁটিয়া দেওয়া হয়, তবেও বোধ হয় কোন পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। বর্ণনাগুলি অনেক স্থলেই একরূপ; অসংখ্য গোপালগণের প্রসাদে কাশীরাম দাসের কিছু কাণ্ডি-বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ

নাই, এই নববুগের গালিস চলিয়া গেলে কাশী, গঙ্গা, গোপী, রাজেন্দ্র প্রভৃতি অনেক স্থলে একদরে বিকাইবেন। কাশীদাসী মহাভারতের সর্বত্র তাঁহার ভণিতা দৃষ্ট হয়;—যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন প্রাচীন পুঁথি ভুলিতে একাধিক ভণিতা থাকিলে পরবর্তী পুঁথি-লেখকগণ সর্বাপেক্ষা বড় কবির ভণিতা বজায় রাখিয়া অপরাপর কবির নাম ক্রমে বাদ দিয়া যান; এই ভাবে কুড়ি-বাসী রামায়ণে, নারায়ণদেব ও বিজয়-গুপ্তের পদ্মাপুরাণে এবং অপরাপর গ্রন্থে বড় কবির নামের ছায়ার ছোট ছোট অনেক কবি লীন হইয়া গিয়াছেন। ১৫৮৩ খৃঃ অব্দের লিখিত একখান কাশীদাসী মহাভারতের শৈল ও নারীপর্বে ভৃগুরাম দাসের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। গঙ্গাধর-লিখিত পুঁথি আমরা দেখি নাই—তাহাতে যদি সর্বত্র কাশীরাম দাসের ভণিতা থাকে, তবে উহা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তাহাইহলে “বাদি সভা বনবিরাটের কতদূর” ইত্যাদি শ্লোকের মুন্সীরানা অর্থ গ্রহণ করিতে কিবা উহা অমূলক প্রবাদ-বাক্য বলিতে আমাদের কোন আপত্তি থাকিবে না।

কাশীরামদাসের মহাভারতের সঙ্গে পূর্ববর্তী মহাভারতগুলির রচনা তুলনা করিলে অনেকস্থলে বিশেষরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে, আমরা না বাছিরা যথেষ্ট। কয়েকটি স্থল তুলিয়া দেখাইতেছি।

যযাতির পতন।

“অষ্টক বোলন্ত তুমি কোন মহাজন।
পরিচর দিয়া কহ জানাইয়া আপন॥
অগ্নি আর ভেজ: পুত্র দেখিতে সাক্ষাৎ।
কোন পাপে অধর্মে হইল বর্গপাত।
* * * * *
অখাতি আবার দায় করি যদি ভোক।
নহস দুশতি হুত পুত্র জনক।
করিলে হুকৃতি নর বেবা নরে কহে।
নরকেটে রান হয় পুণ্য হয় ক্ষর।
কহিলুম ইন্দের ঠাই কথা সজল।
পুণ্য কর হইল দুই পড়িল কুহিল।”

সঙ্গত ভারত, আদি।

“অষ্টক বগিল তুমি কোন মহাজন।
কোন নাম ধর তুমি কাহার সন্ধান॥
পুঁথি অগ্নি আর ভেজ দেখি বে তোমার।
বর্গ হৈতে পড় কেন না বৃদ্ধি বিচার॥
রাজা বলে দায় আমি ধরি যে অখাতি।
পুত্র জনক আমি সহসে উৎপত্তি।
পুণ্যবান জনের করিলাম অমান্য।
সেই হেতু আবার হইল ক্ষীণ পুণ্য॥”

কাশীদাস, আদিলক

কৃষ্ণের ক্রোধ ।

ই বলিয়া সাতাকিরে করি সম্বোধন ।
 হস্তেত লইল চক্র দেব জনাৰ্দ্দন ॥
 শূর্বোয় সমান জ্যোতি সহস্র বজ্রসম ।
 চারিপাশে ক্ষুর তেজ যেন কালধম ॥
 রথ হৈতে কাল দিয়া চক্র লৈয়া হাতে ।
 ভীষ্মক মারিতে যার দেব জগন্নাথ ॥
 পৃথিবী বিসার হএ চরণের ভারে ।
 ক্রোধ দৃষ্টএ যেন জগত সংহারে ॥
 কুরুক্ষেলে উঠিল তুমুল কোলাহল ।
 ভীষ্ম পড়িল হেন বলে কুরুবল ॥
 পদভরে কৃষ্ণের কম্পিত বসুমতী ।
 গজেন্দ্র ধরিতে যেন ধাএ মুগপতি ॥
 সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর ।
 নির্ভরে বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥
 আইস আইস কৃষ্ণ মোরে করহ সংহার ।
 তোমার প্রসাদে মুক্তি তরিমু সংসার ॥
 তোমার চক্রতে মুক্তি যদি সংগ্রামেতে মরি ।
 ত্রিভুবনে রহিবে কীৰ্ত্তি পরলোকে তরি ॥”

* কবীন্দ্র (পরাগলী)—ভারত । ভীষ্মপর্ব ।

“অস্থির হইলা হরি কমল লোচন ।
 লাক দিয়া রথ হৈতে পড়েন তখন ॥
 ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ ।
 ভীষ্মের আরিতে যান ত্রিলোকের নাথ ॥
 গজেন্দ্র মারিতে যেন ধাএ মুগপতি ।
 কৃষ্ণের চরণভারে কাঁপে বসুমতী ॥
 চমৎকৃত হয়ে চাহি দেখে সৰ্বজন ।
 ভীষ্মের মারিতে যান দেব নারায়ণ ॥
 সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর ॥
 নির্ভরে বসিয়া ভাবে রথের উপর ॥
 আসিছে ভীষ্মপতি মারিতে আমাকে ।
 মারুক আমারে যেন দেখে সৰ্বলোকে ॥
 শীঘ্র এস কৃষ্ণ মোরে করহ সংহার ।
 তোমার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার ॥
 তোমার বাণেতে যদি সমর মরিব ।
 নিবা বিমানতে চড়ি বৈকুণ্ঠ বাইর ॥”

কালীদাস, ভীষ্মপর্ব ।

বৃষকেতুর পরিচয় ।

“আকর্ণ পুরিয়া ধনু টঙ্কার করিল ।
 উচ্চস্বরে রাজা বৃষকেতুরে বলিল ॥
 অতি শিশু দেখি তুলি বীর অবতার ।
 মোকে পরিচয় দেও শিশু আশ্চর্য ॥
 কাহার পুত্র তুলি কিবা তোমার নাম ।
 কোনদেশে বসতি কিবা মনস্কাম ॥
 কি লাগিয়া নেও ঘোড়া কারন কিবা তার ।
 কি নিমিত্ত কর মোর সৈন্তের সংহার ॥
 * * * * *

রাজার বচন শুনি হাসে কুমার ।
 পরিচয় লও অহে নৃপতি আকার ॥
 বাহ্যর উলসে হএ তিমির নাশ ।
 বাহ্যর উলসে হএ জগত প্রকাশ ॥
 মোর পিতামহ সেই জেন দিবাকর ।
 তার পুত্র উপজিল কর্ণ ধনুর্ধর ॥
 ত্রিভুবনে বিখ্যাত বীর দাতার অগ্রণী ।

যাঁর বলে ছুৰ্ণোধন ভুলিল মেদিনী ॥
 তার পুত্র বৃষকেতু হেন জান মোক ।
 কটাক্ষ নরপতি নাহি গণি ভোক ॥”

শ্রীকরনন্দীর (ছুটিখার আদেশে রচিত) ভারত ।
 অশ্বমেধপর্ব ।

“বৃষকেতু দেখিয়া বলিছে নৃপবর ।
 কাহার তনয় তুমি মহা ধনুর্ধর ॥
 কি নাম তোমার হে আসিলে কি কারণ ।
 পরিচয় দেও আগে তোমরা দুজন ॥
 বুঝনাথ বচনেতে বৃষকেতু বীর ।
 পরিচয় দিল নৃপে প্রহুদ্র শরীর ॥
 রবির তনয় কর্ণ জান এ জগতে ।
 জনম হইল বার কুন্তীর গর্ভেতে ॥
 কর্ণের তনয় আমি নাম বৃষকেতু ।
 তুরঙ্গ লইল যুধিষ্ঠির-বজ্রহস্ত ॥”

কালীদাসী মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব ।

এইরূপ সাদৃশ্য সর্বত্রই দেখাইতে পারা যায়, মোটের উপর কাশী-দাসই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অংশবিশেষ তুলনা করিলে সর্বত্র তাঁহার এই পদ সঙ্গিত হয় না।

বাঙ্গলা ভাষা পূর্ব্বে শিক্ষিতগণের দৃষ্টির বাহিরে অঙ্কুরিত হইয়া বিকাশ পাইতেছিল, তখন শক্তিশালী কবিগণ নয়নজল ও প্রাণের উষ্ণতা দিয়া ইহাকে পুষ্ট করিতেছিলেন। কিন্তু শিক্ষিতগণের হাতে পড়িয়া মুগ্ধীয়মানের প্রতি ক্রটিপ্রবলতাহেতু বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রেমের নয়নজল শুকাইয়া গেল; সংস্কৃত পুঁথির অলঙ্কার ও উপমাশি দ্বারা ভাষা সুন্দরী সজ্জিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের গুরুভারে ডাব চাপা পড়িয়া নির্জীব হইয়া হইয়া পড়িল। কাশীদাস এই দুই যুগের মধ্যে; তাঁহার কাব্যে পূর্ব্ববর্তী কবিগণের উদ্দীপনা আছে এবং নবযুগের লিপিপ্রাণালী এবং মার্জিত ভাষাও দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত দুই গুণে তিনি পূর্ব্ববর্তী কবিগণ অপেক্ষা বিশেষ পটু ও ভাবী যুগের বেশী সন্নিহিত।—
‘চলৎ চপলা রূপে কিবা বরকায়।’ “দ্বিকর কমল, কমলাংজিতল,” “নিঙ্কলঙ্ক ইলুজ্যোতি পীন ঘনতনী,” প্রভৃতি সংস্কৃতের টুকরা তাঁহার কাব্যের মধ্যে মধ্যে মুক্তার ন্যায় পড়িয়া আছে, ও ‘মুখচি, কত শুচি’ ‘সিংহগ্রীব, বজ্রজীব,’ ‘অগ্নিআংগু, যেন পাংগু’ প্রভৃতি পদে ভাবী অনুপ্রাস-প্রধান যুগের ছায়াপাত হইয়াছে। অনেক স্থলে সংস্কৃত উপমার অজস্র বর্ষণ হইয়াছে, কিন্তু উদ্দীপনার কোন হানি হয় নাই, যথা;—

‘মুখ তুলি বুকোদর যেই তিতে যায়। পলায় সকল সৈন্য তুলা যেন যায়।
সিকুল্ল মধো যেন পর্ব্বত মন্দর। পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর। যুগল বিহরে
যেন গজেন্দ্র মণ্ডলে। দানবের মধো যেন দেব আখণ্ডলে ॥ দণ্ড হাতে যম যেন বজ্র
হাতে ইন্দ্র। খোদাডিয়া লৈয়া যায় সব নৃপবন্দ ॥ যেই দিকে বুকোদর সৈন্য যায় খেদি।
ছুই দিকে তট যেন মধো বহে নদী’ আদিপর্ব্ব।

লক্ষ্যভেদের উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণের চিত্র বঙ্গদেশীয় ভীক অর্থলোভী ব্রাহ্মণগণ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে,—উহা বেশ খাঁটি অন্ধন। কাশীরাম দাসের বর্ণনাগুলি সুন্দর ও স্বাভাবিক; বুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নপর সৈন্য বর্ণনা—বঙ্গীয় কবির লেখনীর উপযুক্ত বিষয়, স্মৃতাং কবি ইহাতে আশাতীতরূপে কৃতকার্য;—“যে দিকে গারিল বেতে সে গেলে সেদিকে। পলায়
পশ্চিমবাণী রাজা পূর্ব্বদিকে ॥ উত্তরের রাজাগণ দক্ষিণেতে গেল। পথাপথ নাহি জান

যে দিক পাইল ॥ হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি না পাইয়া পছ। একে চাপি আর যায় বেই
বলবন্ত। রথের উপর বেগবন্ত আসোয়ার। অবস্থা হইল বত কি কব তাহার। ঠেলা-
ঠেলি চাপাচাপি অর্দ্ধ সৈন্ত মৈল। স্থানে স্থানে পর্বত আকার শব হৈল। এক পদ
কাটা কারু, কাটা দুই ভুজ। বৃকের প্রহারে কেহ হইয়াছে কুজ ॥ সর্কান্দ্রে যহিয়া
পড়ে শোণিতের ধার। মুক্ত কেশ নগ্ন দেহ কাণ কাটা কার ॥ আড়ে ওড়ে ঝাড়ে
ঝোড়ে অরণো পশিয়া। জলেতে পড়িয়া কেহ যায় সাঁতারিয়া ॥ ক্ষত্রি দেখি ব্রাহ্মণ
পলায় উত্তরড়ে। দ্বিজ দেখি ক্ষত্রিয় লুকাই ঝাড়ে ঝোড়ে ॥ দ্বিজের ক্ষত্রিয় ভয়, ক্ষত্র
দ্বিজ ভয়। দ্বিজ ক্ষত্র বেশ ধরে ক্ষত্র দ্বিজ হয় ॥ ধর্ম্মবান ফেলিল হাতের গদা শূল।
মাথার মুকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল ॥ তুলিয়া হইল চক্রগণ কমণ্ডল। ধর্ম্মবান তুলি
নিল ব্রাহ্মণ সকল ॥ প্রাণভয়ে কেহ গিয়া ডুবি রও জলে। কেহ কাঁটাবনে পৈশে
কেহ বৃক্ষ ডালে ॥ মরার ভিতরে কেহ মরা হৈয়া রহে। দূর দূরান্তরে কেহ ভয়ে
হির নহে ॥" কাশীদাস, আদিপর্ব।

মহাভারতের আদ্যস্ত এইরূপ সুন্দর ও জীবন্ত। এক এক খানা
পত্র এক একটি পরিষ্কার চিত্র পটের স্থায়; পড়িতে পড়িতে বড় বড়
বুদ্ধবীর, ধর্ম্মবীর ও প্রেমিকের মূর্তি মনশ্চক্ষের নিকট উদ্ঘাটিত হয়;
ঔঁহাদের সরল বিবেক, দৃঢ় কামনা ও চরিত্রের সাহস, কবিগণের সতেজ
লেখনীর গুণে, কণকালের জন্ত আমাদের হইয়া পড়ে, ও এই নিম্নলিখিত,
অর্দ্ধভুক্ত, পররোষকটাক্ষমাত্র পাণ্ডুরতাপন্ন বাঙ্গালী জাতি ও কণ-
কালের জন্ত পৃথিবীজয়ী, আকাঙ্ক্ষাশালী, অভিমানক্ষীত পূর্ব পুরুষগণের
কাহিনী পড়িয়া স্বীয় ক্ষুদ্র ভুলিয়া উত্তেজিত হয়। কয়েক শতাব্দী
পূর্বে এই মহাভারত প্রসঙ্গ শুনিয়া দাক্ষিণাত্যে এক দেশহিতৈষী স্বধর্ম্ম-
নিষ্ঠ বীরচরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তিনি অর্জুন তুল্য কীর্তি লাভ করিয়া
গিয়াছেন, মহাভারতের সঙ্গে তাঁহার নাম এখন ইতিহাসে অবিচ্ছিন্নভাবে
জড়িত। বঙ্গদেশে এই মহাভারত সমৃদ্ধ হইতে এখনও ত্রীকক্ষ-
চরিত্র, বৈরতক, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি বৃহদ উখিত হইয়া প্রাচীনভাবের
অক্ষুরন্ত আবেগের কথা জ্ঞাপন করিতেছে। এই কাব্য লইয়া হিন্দু-
স্থানের ভাবী অধ্যাক্ষে আর ও কত কবি, বীর ও চিত্রকর যশস্বী হইবেন,
কে বলিতে পারে?

কাশীদাস মহাভারত ছাড়া আরও তিন খানা ছোট কাব্য রচনা
করেন। ১। স্বপ্নপর্ব, ২। জলপর্ব, ৩। নলোপাখ্যান। কাশীরাম দাসের
কনিষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাধর ও একজন কবি ছিলেন, তাঁহার রচিত কাব্যোক্ত

নাম, ‘সারন বিরাট’, ইহাতে রাজা বিরাট ও তাঁহার বহু উত্তর গো-
গৃহের অধিপতি রাজা অশ্বরী ও গোহরগাদির বৃত্তান্ত লেখা আছে।

রামেশ্বরনন্দী নামক কবি সম্ভবতঃ কাশীদাসের পরে মহাভারত
অনুবাদ করেন; যে হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছি, তাহা ১০০ বৎসরের
প্রাচীন; এই কবির রূপবর্ণনাতে ভারতচন্দ্রের মত আকাশ পাতাল লইয়া ক্রীড়া
ও যথেষ্ট বাক্যপল্লব আছে, ভাষাটি অনেক পরিমাণে বিগত—এই জন্য
রামেশ্বরকে কাশীদাসের পরবর্তী কবি বলিয়া মনে হয়,—
শকুন্তলার রূপ বর্ণনা—“চামরে চিকুর কেশ হেন মনে লয়। চাঁচর তাহাতে নাই এইত
বিস্ময় ॥ চাঁদ কুল দিয়া মুখ কলিল নির্মিত। তাহাতে কলক হেতু নহে পরতীত ॥
অরুণ তিলক ভালে হেন লঞা চিত। সর্বকণ রক্তবর্ণ না থাকে তাহাতে ॥ ভুরুযুগ
নিরমিল কাম শরাসনে। কঠিন দেখিয়া তারে নাহি লয় মনে ॥ কুবলয় দলে কৈল
আধি নিরমাণ। চক্সতা নাহি তাহে কটাক্স সন্ধান ॥ বিপুল স্নিনিয়া অধর হেন
দেখি। ঈধৎ মধুর হাস তাতে নাহি লক্ষি ॥” একবার উপমা দিয়া আবার
কিরাইয়া লওয়া—অলঙ্কার শাস্ত্রের পাতা লইয়া এইভাবে উলটপালট
করা,—কাশীদাসের পরবর্তী যুগের বিশেষত্ব।

রামেশ্বর কবির স্বভাব-বর্ণনা প্রাচীন কবিগণের স্বভাব বর্ণনার
পুনরাবৃত্তি, কিন্তু ভাষা অনেকটা বিগত। যথা,—

“সমুখে দেখিয়া রাজা মূনির আশ্রম। নানা বৃক্ষলতা তথা অতি মনোরম ॥ স্থলপদ্ম
মল্লিকা মালতী বিরাজিত। লবঙ্গ কাঞ্চন নাগকেশর শোভিত। নানাজাতি বৃক্ষলতা
সব প্লবিত ॥ রক্তবর্ণে শ্বেতবর্ণে হৈছে বিকশিত ॥ পুষ্পমধু পানে মত্ত মধুকরগণ।
নানাহানে উড়ে গড়ে অস্থির সঘন ॥ অস্ত্রে অস্ত্রে বাদ করি সতত ঝঞ্ঝারে। বাহারে
তুলিলে কামে মূনি মন হরে ॥ নানা জাতি পক্ষী মাদ করে স্থললিত। বৃক্ষমূলে থাকিয়া
ধ্বজন করে নৃত্য। কোকিল মধুরধ্বনি সঘনে কুহরে। তুফান চাতক পক্ষী পিউ পিউ
বোলে ॥ সুদূর দেখন ধরি নৃত্য করে তথি। আশ্রম দেখিয়া ভুট্ট হইল নৃপতি ॥”

রামেশ্বর নন্দীর ভারত, বে, প, পৃষ্ঠ ৮৫। ৮৬ পত্র।

ইহা শকুন্তলা উপাখ্যানের পূর্বভাগ। রাজেন্দ্রদাসের ন্যায় রামেশ্বরও
কলিদাস ইহাতে শকুন্তলা উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন; ‘কটক লাগয়ে পথে
আপনা আচলে। থনাইতে রাজারে কিরিয়া চাহে হলে ॥’ প্রভৃতি শকুন্তলার চেষ্টা
কামিনীদাসের জগদ্বিখ্যাত চিত্রের স্পষ্ট অঙ্করণে চিত্রিত হইয়াছে।

ক্রিলোচন চক্রবর্তী নামক অপর এক কবি মহাভারত অনুবাদ
করিতা হইলেন, ১৩০৩ সালের মৈশাখ মাসের নব্যভারতে প্রবৃত্ত বাবু

রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় ইহার বিষয় জানাইয়াছেন, উক্ত প্রবন্ধলেখকের মতে ত্রিলোচন চক্রবর্তী ২০০ বৎসর পূর্বের কবি। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সনাতন চক্রবর্তী ভাগবতের অনুবাদ করেন, লেখক আরঙ্গজীবের সঙ্গে হুজার যুদ্ধের সময় উল্লেখ করিয়া পুস্তকরচনার সময় নির্দেশ করিয়াছেন। শিশুরামদাস নামক এক লেখক এই সময় প্রভাসখণ্ডের অনুবাদ করেন, তাহার পরে ঈশ্বরচন্দ্র সরকার প্রভাসখণ্ডের আর একখানা অনুবাদ সঙ্কলণ করিয়া ছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত কাব্যগুলিতে বাঙ্গলা দেশের আচার ব্যবহার সূচিত্রিত আছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডী সেই সমাজের এক খানা সুনির্মল দর্পণের স্তার পুষ্পাভূষণরূপে বঙ্গীয় গার্হস্থ্য-জীবন প্রতিকলিত করিতেছে। সে সময়ে যুদ্ধবিগ্রহাদি সর্বদাই সংঘটিত হইত; এখন কবিগণ বীররসে মাতিয়া তোপের শব্দে আম্রবন কম্পিত ও মাতৃকোড়স্থ শিশুর শাস্তিভঙ্গ করেন, ইহা সর্বৈব কালনিক, বস্তুতঃ যুদ্ধের কথা ইতিহাসও কাব্য গড়িয়া আমরা জানিতে পাই, কোন বাঙ্গলা লেখকের সেইরূপ দৃষ্ট দেখার কোন আশঙ্কা নাই; কিন্তু ৩০০ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে যুদ্ধাদি সর্বদাই ঘটিত ও এই কৃষাস্ত্র ভীক বঙ্গবাসীগণের মধ্যেও সৈনিক পুরুষের অভাব ছিল না; মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে আমরা ব্রাহ্মণ পাইক, কর্মকার পাইক, চামার পাইক, নট পাইক, বিশ্বাস পাইক ও বাঙ্গাল-পাইকগণের বিবরণ দেখিতে পাই; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্রপ্রয়োগ-নিপুণ ও বলিষ্ঠ ছিলেন, কালকেতুর বল ও সাহস একজন উচ্চদের সৈনিকের উপযুক্ত; কিন্তু বঙ্গীয় কাব্য সমূহে অতি মাত্রায় যুদ্ধাদির বর্ণনা পাঠ করিয়াও আমরা প্রকৃত বীররস দেখিতে পাইনা; কৃষ্ণিবাসী রামায়ণে দৃষ্ট হয়, শ্রীরামচন্দ্র টাপা নাগেশ্বর জটায় বাঁধিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে আছে, চণ্ডীদেবী তয়ানক যুদ্ধে মঙ্গলদৈত্যকে বধ করিয়া মহচরীগণের নিকট বিশ্রামের জন্য একটি পান ও পাখা চাহিতেছেন ও কলিঙ্গরাজ স্বপ্ন দেখিয়া আকুল হইয়া পড়াতে—
“রাজার প্রকৃতি দেখি রাণী সব কাদে। কর্ণে লগ করে কেহ শিরে শিলা ঝাড়ে।”
কবিকঙ্কণের কালকেতু এত বড় বীর হইয়াও যুদ্ধে পরাস্ত হইবে পর

দ্বীপ প্রবর্তনায় ধ্যানাগারে লুক্কায়িত হইয়া রহিল, কলিঙ্গাধিপের কোটাল এই বলিষ্ঠ কাপুরুষটিকে তথা হইতে টানিয়া বাহির করিলে ছুররা কাদিয়া বলিতে লাগিল, “না মার না মার বীরে শুনহে কোটাল। গলার ছিঁড়িয়া দিব শতেশ্বরী হার।” (ক, ক, চ)। পরন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনায় একরূপ বর্ণনা বিরল নহে, “ব্রাহ্মণে না মার, ব্রাহ্মণে না মার, পৈতা দেখাইয়া কাদে।” (ক, ক, চ)। “বতেক ব্রাহ্মণ পাইক পৈতা ধরি করে। দস্তে তুণ করি তারা সন্ধ্যামন্ত্র পড়ে।” (মা, চ)।

এই বঙ্গদেশে তখন সীতারামের ছায় ছুএকজন প্রকৃত বীর ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাধারণ নিয়মের বাদ। লাউসেনের ভ্রাতা কপূরের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, লাউসেনের যুদ্ধাদি বর্ণনা হইতে কপূরের প্রাণরক্ষার চেষ্টায় বাঙ্গালী-চরিত্র বেশী সুন্দর ভাবে দর্শিত হইয়াছে। প্রকৃত বীরত্বের অভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের বীরগণের শরের শণ্ শণ্ ও বাঁশের লাঠির ঠন্ ঠন্ একরূপ ভ্রমরগুঞ্জনের ছায় বোধ হয়।

হিন্দুরাজাগণ সকালে বৈকালে পূরণ-পাঠ শুনিতেন, ভাগবতই তখন শ্রেষ্ঠ পূরণ বলিয়া আদৃত হইত। বড় বড় রাজাগণের অধীনস্থ রাজাগণ “ভূঞা রাজা” নামে আখ্যাত হইতেন; কোন বড় রাজার অভিষেকের সময় “ভূঞা রাজাগণ” তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিতেন, রাজাগণ অনেক সময় গ্রামনগরাদি সংস্থাপনের সময় বহুসংখ্যক দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিতেন ও অনেক সময় কৃষকদিগকে লাঙ্গল ও চাষের বলদ প্রভৃতি দান করিয়া বাড়ী খানাইয়া দিতেন। রাজাদিগের দৌরাত্ম্য ও প্রসাদের তুল্য ছিল; বাজারে পণ্যজীবগণ রাজকর্মচারীদিগের ভয়ে অস্থির থাকিত, আমরা ভাড়াদস্তের প্রসঙ্গে তাহা দেখাইয়াছি। অনেক রাজার ধর্মবিশ্বাস ও বিনয় ইতিহাসে দৃষ্টান্ত স্থলীয়, সচরাচর ব্রহ্মোত্তর দানপত্রে এইরূপ বিনীত প্রার্থনা পাওয়া যায়,—“যদি আমার বংশের অধিকার লুপ্ত করিয়া অন্ত কেহ এই রাজ্য লাভ করেন, তবে তাঁহার নিকট আমার এই প্রার্থনা আমি তাঁহার দাসদাস হইয়া থাকিব, তিনি যেন ব্রহ্মযজ্ঞি হরণ না করেন।” সাধারণ তন্ত্র রাজশাসনে মোটের উপর অপেক্ষাকৃত ন্যায়-বিচার অধিক লাভ করা যায়, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী রাজা উৎকৃষ্ট হইলে তাঁহার শাসনে পৃথিবী স্বর্গের ন্যায় হয়। কষিকল্প চণ্ডীতে তুর্কসার বাজার করার যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে সে সময়ে জিনিষ পত্র সমস্তই অতি সস্তা হইয়াছিল; মাধবাচার্যের চণ্ডীতে প্রদত্ত কল্পে

তদপেক্ষাও স্থূলত মূল্য দৃষ্ট হয়, পূর্ববঙ্গের বাজারে জিনিষের মূল্য আরও সস্তা ছিল বলিয়া বোধ হয়। ভদ্রলোকগণ তখন সাধারণতঃ পাছকা ব্যবহার করিতেন না, ভদ্রলোক গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে প্রথমেই তাঁহাকে পাঁ শোয়ার জল দিয়া সস্তাষা করিতে হইত; বহুকর্তে এক পূর্ণ গাড়ুর সাহায্যে কাঁদা ধুইয়া ফেলিয়া ভদ্রলোকগণ “গাঙ্গীরানীড়া” চাপিয়া বসিতেন, এবং কখনও আত্মরাস্তে একটি অথও শুবাক চর্কণ করিয়া মুখ শুচি করিতেন। খুব ভাল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ রাত্রিতে শয়ন প্রকোষ্ঠে যাইবার পূর্বে ভাল করিয়া পা ধুইয়া পাছকা পরিয়া শযায় যাইতেন; ধনপতি লক্ষেশ্বর ব্যক্তি, তিনি শুইবার পূর্বে “চরণে পাছকা দিয়া করিল গমন। পয়নাভ স্মরি সাধু করিল শয়ন ॥” স্ত্রীলোকগণ অঙ্গদ ককণ, কর্ণপূর প্রভৃতি নানারূপ সোণার অলঙ্কার পরিতেন, নানা ছন্দে থোপা বাঁধিতেন, ও “মেঘ ডুবুর” কাপড় এবং কাঁচুলি পরিতেন; নিকৃষ্ট শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ “ক্ষুণ্ডা” বা ক্ষোমবাস পরিত, ইহা একরূপ অল্পমূল্য পটবস্ত্র; মানিকচাঁদের গানে দেখিয়াছি গোপীচাঁদের রাজহু কালে বাঁদিগণ ও “পাটের পাছড়া” পরিত না; এই “পাটের পাছড়া” ও “ক্ষুণ্ডাবাস” একই কাপড় বলিয়া বোধ হয়, ভারতচন্দ্র ‘খুয়ে তাঁতি হয়ে দেখে তসরতে হাত’ কথায় এই “খুণ্ডা” বস্ত্রের প্রতি নিগ্রহ দেখাইয়াছেন। স্ত্রীলোকগণের অঙ্গ মার্জনার জন্ত আমলকাই ছোপের কার্য্য করিত; স্বর্ণাদির সঙ্গে ফুলও অঙ্গরাগের একটি বিশেষ উপকরণ ছিল, বাজারে নানারূপ ফুল বিক্রয় হইত, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে গোপিনীগণের বেশ করার প্রসঙ্গে “কিনিয়া চাঁপার ফুল কেহ দেহি কাণে” পাইয়াছি। কিন্তু একজন বড় ইংরেজ লেখক “Rude nations delight in flowers.” এই উক্তি করিয়া উৎকৃষ্ট নাগকেশর, কুরুবক, চম্পক, পুন্নাগ ও মালতীর জাতি মারিয়াছেন; সুন্দরীগণ এখন এইসব দেশীয় ফুল ছুঁইতে ভীত হইতে পারেন। পুরুষগণ বালী পরিতে লজ্জা বোধ করিতেন না, ও গরীব লোকও কর্ণে একটু সোণা পরিয়া কৃতার্থ হইত, গুজরাটপুত্রীর সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া কোটাল বলিতেছে—“নগরে নাগরজনা, কাণে লগ্ঘমান শোণা, বসনে শুবাক হাতে পান। চন্দনে চর্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভাষু, তসরঙ্গন পরিধান ॥” (ক, ক, চ, ১)। নিম্নশ্রেণীর লোকগণ “খোসালা” নামক একরূপ শীতবস্ত্র গায় দিত। বাজারে জিনিষ খরিদ করিতে গেলে প্রথমেই কড়ী প্রত্যাসী দুই ব্যক্তির

সাক্ষাৎকার হইত; একজন লগ্নাচার্য্য ইনি পঞ্জিকা শুনাইয়া কিছু যাচক্ষা করিতেন, অপর কুশারী উপাধি বিশিষ্ট ওয়া, ইহার কাঁধে একটা বড় কুশের বোঝা থাকিত ও ইনি বেদ পাঠ করিয়া অভ্যাগতকে আশীর্বাদ করিয়া কিছু যাচক্ষা করিতেন।

তিনশত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে শিক্ষার চর্চা খুব বেশী ছিল, শ্রামানন্দ সলোপ হইয়াও অতি অল্প বয়সে ব্যাকরণ শাস্ত্রে কৃতি হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের পূর্বে; চণ্ডীকাব্যে ত্রীপতি বণিকের শাস্ত্রে অধিকারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার পিতা ধনপতি বণিকও “নাটক নাটিকা কাব্যে ঐহার উল্লাস” বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। সংস্কৃত টোলে বাঙ্গালা অক্ষরের সঙ্গে দেবনাগর অক্ষরেও পুস্তক লিখিত হইত, ধনপতি বণিক সিংহলে “নাগরী বাঙ্গলা রায় পড়িবার জানি।” বলিয়া স্থায়ী বিদ্যায় পরিচয় দিতেছেন, টোলে লুপ্ত হইতে কি ভাবে অধ্যাপনা চলিত আখ্যাচার্য্য তাহার বিবরণ দিয়াছেন—“চ বর্গাদি বর্গ যত, পড়িলেক শ্রীমন্ত, কাগলায়ে প্রবেশিল মন। কের কর কন আদি, কল কোব অবধি, রেফ যুক্ত পড়ে যত ফলা। কিরি কিলি আর্ক আঙ্ক, একাবধি যত অঙ্ক, কাগলায়ে পারগ হ'ল বাল।। পুজা করি সরস্বতী, আরস্তিলা পাঠ্য পুঁথি, জানিবার সন্ধির প্রকার। স্বরসন্ধি পড়িয়া, সুসম পল্কেতে গিয়া, শব্দ সন্ধি জানিলা অপার। চণ্ডীকার বর হেতু, পড়িলা সকল খাত, ত্রিবিধায় জানিতে কারণ। বয়ণত্ব জ্ঞান হয়, সংস্কৃতে কথা কয়, পারগ হইলা ব্যাকরণ।” কিন্তু ভক্তি রত্নাকরে দেখা যায় টোলার উদ্ধৃতন ছাত্রগণ ব্যাকরণকে ‘শিশু শাস্ত্র’ বলিয়া উপেক্ষা করিতেন। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অনেক সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইতেন, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গলার অমুশীলন বেশী করিতেন। ২০০—১০০ বৎসর পূর্বের যতগুলি বাঙ্গলা পুঁথি পাইয়াছি, তাহাদের অনেকগুলি ইতর জাতির হাতের লেখা; কয়েকটির কথা উল্লেখ করিতেছি;—হরিবংশ (১১২০ সন) লেখক শ্রীভাগ্যমন্ত ধূপি, নৈষধ (১১৭৪ সন) লেখক, শ্রীমাঝি কাইত, গঙ্গাদাস সেনের দেবধানী উপাখ্যান (১১৮৪ সন) লেখক শ্রীরাঘনরায়ণ গোপ, ক্রিয়াযোগসার (সনের নির্দেশ নাই, ১৫০ বৎসর পূর্বের হস্তলিপি বলিয়া বোধ হয়) লেখক শ্রীকালীচরণ গোপ, রাজা রামদত্তের দণ্ডীপর্ক (১৭০৭শক) লেখক শ্রীরামপ্রসাদ দেএ। এইরূপ আরও অনেক পুঁথি আমাদের নিকট আছে, জিপুরা জেলার রাজপাড়া গ্রামে ১০০ বৎসরের প্রাচীন এক খানা নলদময়ন্তী এক ধোপা বাড়ীতে আছে, উহা সেই ধোপা

পিতামহের লেখা, লেখাটি মুক্তার ন্যায়, গোট গোট, বড় ছন্দর। আমরা মধুসূদন নাপিত রচিত নলদময়ন্তীর কথা উল্লেখ করিয়াছি এবং এই নাপিত কবি যে তাঁহার পিতামহের কবিত্ব-বশের বড়াই করিয়াছেন সে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি; গোবিন্দকর্ণকার রচিত করচা অতি প্রশংসিত গ্রন্থ। আমি জেলায় জেলায় প্রাচীন পুঁথি খুঁজিয়া দেখিয়াছি, ভক্তলোক-গণের ঘরে বাঙ্গলা পুঁথি বড় বেশী নাই কিন্তু ইতর লোকের ঘরে উহা রাশি রাশি পাওয়া যায়; ইহাদের দ্বারা প্রাচীন পুঁথি গুলি বেরূপ যত্ন সহকারে রক্ষিত, তাহাতে বঙ্গীয়সাহিত্যসেবকগণ তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

এখন লেখা পড়া শিখিলেই পৈত্রিক ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবার প্রবৃত্তি জন্মে; মধুসূদন নাপিত সংস্কৃত জানিতেন ও সে আমলের একজন কবি এবং কবির পৌত্র ছিলেন, কিন্তু তিনি বোধ হয় স্বীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন নাই। সে সময় ধর্ম, আমোদ ও আত্মার উন্নতি কামনার জ্ঞানের চর্চা হইত; জ্ঞানানুশীলন যে জাতি নির্বিশেষে অর্থকরী, একথা তখন তাঁহারা জানিতেন না।

খ্রীলোকদিগের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চা ছিল, পর-অধ্যায়ে আমরা একজন শ্রেষ্ঠ খ্রীলোক কবির বিষয় আলোচনা করিব; কবিকল্প-চণ্ডীতে দৃষ্ট হয়, খুলনা স্বামীর অক্ষর চিনিতেন ও তাহা লইয়া সন্তিনীর সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা করিতেছেন,—খুলনা বণিকরমণী; বৈষ্ণব-সাহিত্যে জানা যায়, মহাপ্রভু যে ৩২ জন শ্রেষ্ঠ কৃপাপাত্রেয় কথা উল্লেখ করিতেন, তন্মধ্যে শিখিমাহিতীর ভগ্নী মাধবী ২; এই মাধবী অতি শুদ্ধাচারিণী বৈষ্ণবী ছিলেন, পদকল্পতরুতে ইহার রচিত অনেকগুলি সুন্দর পদ আছে (৭৮৮, ১৮০৪, ২১২২ এবং ২১২৩ পদ দেখুন)। খ্রীলোক-গণের মধ্যে ঔষধ করিবার প্রথা বড় বেশী ছিল, আমাদের খোষ্টা-ভ্রাতাদের গালি নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না, জগন্নাথজীর্থে এখন ও পাণ্ডুরা গাহিয়া থাকে,—“ভাল বিরাজহ, উড়িয়া জগরাখ। উড়িয়া মারি কীর বিচুরী, বাঙ্গালী মারি ভাল ভাত, সাধু মারি দর্শন পর্ণন মহা পরসাদ। বাঙ্গালিনী রমণী, পরমাসুন্দরী, দেখ নয়নকতারি, তজন সাধন নাহি জানেত, জানে

বাঙ্গালিনী চৌনা।" এই "চৌনা" অর্থাৎ ঔষধ করার বৃত্তান্ত মুকুন্দকবি বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি উপসংহারে নিজকে বৃদ্ধ বলিয়া বাঁচাইয়াছেন, "ঔষধ প্রবন্ধে কহে মুকুন্দ বিশারদ। বৃদ্ধাকে না করে বশ দানশ ঔষধ।" এই ঔষধ দ্বারা রসীকরণ প্রথা বিলাতেও চলিত ছিল, সেক্ষত্রীয়র ম্যাকবেথ নাটকে বাহুর উপকরণের এক লম্বা লিষ্ট দিয়াছেন, মুকুন্দের তালিকা তাহার অনুরূপ; adders fork, eye of newt, scale of dragon, maw of shark, wool of bat, gall of goat, lizard's leg, wings of owl প্রভৃতি বিলাতী বাহুর পার্শ্বে, 'কচ্ছপের নখ, কাকের রক্ত, ভূজঙ্গের ছাল, কুত্তারের দাঁত, বাহুরের পাখা, কাল কুকুরের শিত, গোখিকার আঁত, কোটারের পোঁচ,"—ইত্যাদি কবিকঙ্কণোক্ত উপকরণ গুলি স্থান পাইতে পারে, এই ছাই ভস্মের উল্লেখ দ্বারা প্রতীয়মান হইবে, মনুষ্যকরনা বীভৎস হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই ভাবে কার্য করে, একই জব্য খুঁজিয়া বেড়ার ও নরপ্রকৃতি সর্বত্র যে এক সাধারণ নিয়মাবলী তাহা প্রমাণ করে।

বঙ্গীয় সমাজ এই সময় বৈষ্ণবভাব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়া ছিল, চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্তের সহচরগণ ও বিবাহোপলক্ষে আগত এয়োগণের নাম পড়িয়া দেখুন; তাঁহাদের অধিকাংশ নাম আমাদের চির-পরিচিত গোপবালক ও গোপিনীগণের; শ্রীমন্ত বাল্যকালে শকট ভঞ্জন, পুতনা-তুণাবর্জক প্রভৃতি খেলার অভিনয় করিতেছেন, নিরক্ষর কালকেতু ব্যাধ পর্য্যন্ত কংস নদীর তীরে "হেথাই নরক বর্গ গুনি ভাপবতে" (ক, চ), বলিয়া ভাগবতের দোহাই দিতেছে।

পূর্ববঙ্গের রাজেন্দ্রদাস কবি শকুন্তলোপাখ্যান গ্রন্থে সমাজে পাপ পুণ্যের যে আদর্শ আঁকিয়াছেন, বঙ্গের দুঃপরী গুলিতে বোধ হয় এখনও ধর্ম্মাধর্ম্মের সেই শাসন কতক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, "ভক্তি করি ব্রাহ্মণ সেবা করে সেই জন। তার পুণ্য ত্রকা কৈতে না পারে আপন। সোথন জলেতে বসি জল পান করে। তার ফলে সেই জন বার বর্গ পুরে।" কিন্তু পুষ্করিণী রিজার্ভ করার এই ধুমের সময় গোপ-নের জলপান করার কোন পুষ্করিণীর মালিক পুণ্য সঞ্চয় ভাবিয়া সুখী হবেন কিনা সন্দেহ। মহাপাপগুলির ভয়ও ইহানীঃ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, পুণ্যোক্ত কাব্যে এই সব ব্যক্তি মহাপাপী বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন,—

নিবেশ দিবে। যে মৎস মাংস খায়। মাংস মূল্য খায় যে নির্ভীক্য পুছে পায়। কুলচাঁর ছাডি যেবা অন্যচাঁর করে। কুলবিদ্যা ছাডি যেবা অন্ত বিদ্যা ধরে। ভোজবাস্তে কোঁর করে না করে বিচার। উত্তর অধমে অন্ন একত্র আহার।" এই শতাব্দীতে ইহার অনেকগুলি কারা রদ হইয়া গিয়াছে।

আমরা পূর্ববৎ শকার্থের তালিকা দিয়া যাইতেছি, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে:—

জাফাল—সেতু, মায়ক—ঐহ লেখক, হৃপ—বাজ্র, উতাড়িয়া—উত্তোলন করিয়া, উত্তরিল—পৌছিল, উষার—ধার, পিছিয়া—পূর্ববর্তী (“মাংসের পিছিয়া বাকী থাকি সেড় বুদ্ধি”)। জট—চুল, (“জটে ধরি মাংস মোরে করিয়া নিশ্চর”, “জটে ধরি বৈধ মহাবীরে”)। এখন জট অর্থ, “জটা” হইয়াছে, পিছে—প্রতি, (“হাল পিছে এক তকা”)। নাবদ্ভা—ঠক, ক্রন্দনা—কান্না, নাটুয়া—রসভূমির অভিনেতা (“শ্রানকরি নোলাধর, ধরে পূরু কলেবর, নাটুয়া কিরায় বেন বেশ।”)। উত্তরায়—উচ্চরবে, জেটি (জোতা)—টিক্‌টিকী, চিরাইয়া—চেতন হইয়া, ভাঞ্জি—ভাজন, বাঁঝি—বাঁদি, আহড়ে—আড়ে (লুকাই গগনবাসী মেঘের আহড়ে)। বালা—বালক (“চারি বছরের হলুকারিয়ার বালা” চণ্ডীকাব্য ব্যতীত অপরাপর অনেক পুঁথিতেই বালা শব্দ বালক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে)। বাজে,—ছল (যৌবন করিয়া ডালি গো চাহিয়া বাজে। কুলবতী জলাঞ্জলী দিল কুললাজে।), এই বাজ শব্দের অর্থ অনেক হলে গেল। দানা—দানব, জরাধি—জরাগ্রস্ত, পুরোধা—পুরবাসী, মো—মমতা, লো—অশ্রু, কাতি—কাইন্তে, রোচা—দস্তান, খণ্ড—গুড়, টাবা—নেবু, রায়বার—দোতা, কচা—কাঁচা (“বাড়ে যেন হাতী কচা”)। দিয়ড়ি (দেউটী)—দীপ, তোক—অপতা, শশা (শশার)—খরগোশ, ববিয়াতি—বরযাত্রী। বেসাতি—বাজারের সদায়, শাড়া (বা শাটী)—“শটক, বৃত, জল ও পিঠালী মিশ্রিত ছানা।” (অক্ষর বাবুর চণ্ডী, ১৫৫ পৃঃ)। অপরাপর পুঁথিতে—দড়বড়—তাড়াতাড়ি, অনুবন্ধ—অবতারণা, পোড়াইল—সাথে সাথে চলিল, কাপি—ছেঁড়াবস্ত্র, হটে ছলনায় (“মনসায় হটে সাধু ভিক্ষা মাগি খায়।” মনসার ভাসান)। ইটল—ইট, নেউটয়া—কিরিয়, পদ্—প্রণাম, টোণ—তুণ, সমাধান—শেষ (“নিমিত্তকে ভীষন যৌবন সমাধান,” (মা, চ) সমসর—ভুলা, কুকাইল—বুঝাইল, পাড়ে—কেলে, (“অর্জুন কাটয়া পড়ে, মুহুর্ন্ত ভূমিতে পড়ে।” কাশী), বাট—পদ্ম, আঙমারি,—অগ্রসর হইয়া, সাবহিত—সাবধান, সহজে—স্বভাবতঃ (এই শব্দ পূর্বে মূল অর্থেই ব্যবহৃত হইত, এখন অর্থচ্যুতি হইয়াছে)। আচরণ—অন্ন, বিচরণ (“প্রেত কাক কুকুরাদি করে আচরণ।” (রায় রসারণ), চোরস—প্রসারিত (চাঁচর চিকুর রাসের চোরস কপাল,” রাসারণ), গদা—ঠাট্টা (“হেন বুঝি গদা মোরে করিল যুবতী” মা, চ)। পাধর—পাপক্তি, নাট—নৃত্য, উলি—অবতরণ করা উড়ণ—পরিধান করা, খণ্ড—এই শব্দ পূর্বে মানারণ শব্দের সহিতই যুক্ত হইত, যথা চিরাপক, স্থানি, চোরখণ্ড, ইত্যাদি, খণ্ড কোন কোন সময় ‘তথ’ অর্থে প্রযুক্ত হইত বস্তু।

“মুগ্ধ কণাসিনী” ; টকা—সোনা, মেঘ—প্রতিমা পঙ্কজ, আশাস—আশঙ্কা (“উপায় করিয়া গেলে আশার মুক্তিরে” রূপকসরাসরের রাসারঙ্গঃ) , শারি—নিম্নাবাদ ।

বিভক্তিশুলি পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ; সে সম্বন্ধে আমরা পূর্বে বাহা বলিয়াছি, তাহা এ অধ্যায়েও অনেকাংশে খাটিবে, পূর্ববঙ্গের পুঁথিতে “সংক্ষেপে কহিল”—(অর্থ “সংক্ষেপে কহিলাম”) “একই দেবিল আমি তোরা কোয়া রস।” ইত্যাদি ভাবের প্রয়োগ অনেক দৃষ্ট হয় ; জগৎ-রাসের রাসারঙ্গণে—“সীতা কেউ দিয়া শিব রাগিষ রাবণে।” ভাবের ব্যবহার দৃষ্ট হয় ; এইরূপ ব্যবহার পশ্চিম বঙ্গ হইতে এখন উঠিয়া গেলেও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত আছে ; কর্তৃকারকের পর ক্রিয়ার মানা অঙ্কুত আকার উভয় স্থলের প্রাচীন পুঁথিতেই বিস্তর পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে প্রাচীন পুঁথি হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে ।

- প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কয়েকটি বাঁধা বিষয় ছিল, এ সম্বন্ধে ৬১-৬২ পৃষ্ঠায় একবার উল্লেখ করা হইয়াছে ; সেই বাঁধা বিষয়গুলি সংক্ষেপে এই ভাবে বিভাগ করা যাইতে পারে :—১। বারমাসী,—বাড়াল মূলুক বড়-খড়ুর প্রিয়লীলাক্ষেত্র ; বারমাসের বারটি রূপ প্রকৃতির পটে পরিষ্কার রেখায় অঙ্কিত হয়, কবিগণ বৎসরের বারখানি সুখ দুঃখের চিত্র সুন্দর রূপে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন । ২। অবরোধক্লিষ্টা বঙ্গীয় নীমন্তিনীগণ যখন একটু মুক্তি পান, তখন তাঁহাদের কতকটা অসতর্ক ও চকল হইয়া পড়া স্বাভাবিক, কবিগণ ছায়ের কানীর তান ক্রি বিবাহ বাসর উপলক্ষ করিয়া ঘরের দউগুলির অবভাষ্য স্বাধীনতার মুক্তি দেখাইয়াছেন, কাহারও কররী অর্দ্ধমুক্ত, কাহারও সমস্ত অলঙ্কার পরা হয় নাই, অর্দ্ধ অঙ্গে অলঙ্কার পরা, অপরাধি এলোথেলো, যেম কোন চিত্রকরের কুলির অসম্পূর্ণ দৃষ্টি ; ইহাদের তাঁকি কতকটা অস্বাভাবিক ও সংবাদভী এক ভাবে ভেদে আনো পাক্য’ (ক.ক.৫.) প্রভৃতি অসংবত কৃতির অভিনয় বর্ণনার কবিগণ সুন্দরীমিথের মোহীনশক্তি দেখিতে ছবিখা দেন নাই ; ভাগবতের একাংশে এই চিত্রের প্রাধান ছায়া পাত হইয়াছিল । ৩। পুতুর ঘাটে রমণী। বঙ্গের রমণীগণ পল্লি-প্রায়ে বাহিরের লোককে স্বীয়রূপ দেখিবার একবার ছবিখা দেন, পুতুরের জন্মে যখন পঞ্চমুর জন্মিয়া উঠেও দিক্‌কাঙ্ক্ষি হুটিয়া উঠে, তখন সেইরূপ কবির ‘বেঁধুদীর’ দ্বির হইতে পারে । বিদ্যাপতি হইতে আলোকাল পর্যন্ত বহু কবি

আজীবনে কুন্তকক্ষে রমণীগণের গৃহপ্রত্যাগমনের মুগ্ধকর আলোক চিত্র উঠাই-
 যাচ্ছেন। ৪। দাম্পত্য কলহ—বিদেশ-বিদ্বেষী বাঙ্গালীগণের ঘরে বসিয়া
 জ্বর গালি খাওয়া নিত্যকর্ম, এই গালির স্বাদ সর্বদা তিক্ত নহে, একটু মধুরও
 আছে; তারপর বৃদ্ধ স্বামীর ঘাড়ে যুবতীভাষ্যার ক্রোধ বৃষ্টি, কুলীন দিগের কুণায়
 কুলললনার বিড়ম্বনা—দাম্পত্য প্রেমে অগ্নরোগ,—কবিগণ শিবপার্বত্যী প্রসঙ্গ
 উপলক্ষ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ৫। পতি-নিন্দা, ইহা লইয়া অনেক
 অশ্লীলকথা বঙ্গসাহিত্যে কলুষিত করিয়াছে, অশ্লীল বিষয়ের সঙ্গে আমাদের
 কোন সহানুভূতি নাই, কিন্তু এই পতি-নিন্দা এতগুলি কবি বর্ণনা
 করিয়াছেন, যে সমাজ ব্যাপিয়া ইহার কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয়,
 ইহা নেহাৎ করুনা নহে; “কটন ব্যঞ্জন আমি যেই দিন রাখি, মায়ে পিড়ার
 বাড়ি কোনে বসি কাঁদি।” (ক, চ) প্রভৃতি উক্তি মর্মের; পিতা মাতা অর্থাতির লোভে
 প্রাণ প্রিয় কন্যাগুলিকে জলে ভাসাইতেন, তাহারা সেই জলে পড়িয়া আজীবন
 ভাসিতে থাকিত, কিছু বলিতে পারিত না—তাহাদের অবস্থা চণ্ডীদাসের কথায়
 বলা যাইতে পারে—“বদন থাকিতে, না পারি বলিতে, তেজি সে অবলা নাম।”
 ৬। হুম্মান—এই সমুদ্র লঙ্ঘন-সেতুবন্ধন-পটু বীরচূড়ামণি বঙ্গসাহিত্যের দেব-
 দেবীগণের দক্ষিণহস্ত; সমুদ্রে ঝড় উঠাইতে হইবে, বড় প্রাচীর উঠাইতে হইবে,
 এ সমস্ত ব্যাপারেই দেব দেবীগণ হুম্মানের শরণাগত কিন্তু বান্ধিকীর এই মহা-
 চরিত্র বঙ্গীয় সাহিত্যে শুধু একটি বানরে পরিণত হইয়াছে। ৭। শিশু-
 কন্যাকে স্বামীর ঘরে প্রেরণ সময় পিতৃগৃহ যে ককণার তরঙ্গে প্লাবিত
 হইত, তাহা লইয়া কবিগণ উনাও মেনকা সংবাদ বর্ণন করিয়াছেন।

এই নির্দারিত বিষয়গুলি লইয়া বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা খেলিয়াছে,
 এই বিষয়গুলি প্রাচীন কবিগণের লেখনীর সাধারণ সম্পত্তি; দেবদেবীর
 ভাণ করিয়া কাব্যপটে বঙ্গীয় গৃহস্থালীর দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাচীন
 পুঁথির অনেকগুলি যখন মুদ্রিত হইবে, তখন পাঠক এই বাঁধা বিষয়
 গুলি কোন্ কবির হস্তে কিরূপ ফলিয়াছে, তাহা নিরূপণ করার সুবিধা
 পাইবেন।

আমরা যে অধ্যায়ের সম্বন্ধিত হইতেছি, তাহার আভাস এই অধ্যায়-
 বর্ণিত নানা পুস্তকেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে; চণ্ডীর চৌজিল
 অফরা স্ততি (চৌতিল) অনেকগুলি প্রাচীন পুঁথিতে দেখা যায়;

এই “চৌতিশা” শুধু শব্দ লইয়া খেলা,—উহা অনেক স্থলে শ্রুতিকটু হইয়াছে, যথা—“টিটকারী টকারে হইত পদ্মজয়ী। টকারিয়া রক্ষা কর মোরে কুপারী ॥” এই কোমল গীতি-কবিতার দেশে শ্রুতি কটুতার অপরাধে কবির কঁাসি হইতে পারে,—জয়দেব এই আস্থা দিতেন। বাহাউক শ্রুতিকটুতা সত্ত্বেও এইরূপ শব্দলইয়া খেলা হইতে ভাষা সাজাইবার চেষ্টা আরম্ভ হয়, মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে “ঘুচাও মনের রোষ, করপতি পরিতোষ, বিয়াত বিয়াটহুত দান।” পাওরা যায়, এই মুসলীগিরি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই চেষ্টার বিকাশ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ভালবাসার অভাবে হীরামালিনীগিরি আরম্ভ হয়, কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতেই লিপিচাতুর্য্যের হস্তে ভালবাসার ব্রহ্মীর পূর্বাভাস পাওরা যায়, নিম্নলিখিত অংশটি দেখুন—“অশোক কিংকর ফুল, হইল যেন চক্ষু শূল, কতকী কুসুম কামকুন্ত। বৈরি কুসুমবাণ, অহির করয় প্রাণ, ঝাট নাশ যাওরে বসন্ত ॥ শুইলে নলিনীদলে, কলেবর মোর জলে, জল দিলে নহে প্রতিকার। মল্লের সমীরণ, অগ্নি কথা বরিষন, পতি বিনে জীবন অসার ॥” কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেই আমরা ভারতচন্দ্রী উপমার প্রথমোদ্যম দেখিতে পাই—“গৌরীবদন শোভা, লিখিতে না পারি কিবা, দিনে চল নাহি দেয় দেখা। স্নানচন্দ্র এই শোকে, না কিছুদি সর্বলোকে, মিছে বলে কংকণের রেখা ॥ গৌরীর দশন রুচি, দেখি দাড়িঘ বিচি, মলিন হইল লজ্জাতরে, হেন বুঝি অমুখানে এই শোক করিমনে, পককালে দাড়িঘ বিদরে ॥” পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই বাক্য-কলা ও লিপিচাতুরীর জাঁকালো বিকাশ দেখিতে পাইব।

নবম অধ্যায়।



কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ

অথবা

নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ।

- ১। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র।
- ২। সাহিত্যে নূতন আদর্শ।
- ৩। কাব্যশাখা।
- ৪। গীত-শাখা।
- ১। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র।

নবদ্বীপ হইতে লক্ষণসেন স্বাধীনতার পতাকা ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন, নবদ্বীপের কোলে বসিয়া জয়দেবকবি সুধাময় গান গাহিয়াছিলেন; তারপর নবদ্বীপ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতচর্চার স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, মহাপ্রভুর পদধূলি দ্বারা ইহা বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হইয়াছে, —নবদ্বীপের ধুলিরেণুতে হৃদয়বান বাঙ্গালী অশ্রুপাত করিষেন।

কিন্তু বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা কিরিয়াছিল; যুগে যুগে স্বর্গের শাসন লইয়া প্রতিভাবান ব্যক্তি পতিত সমাজকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু দৈববরে দিখিজয়ী রাজা যেরূপ সমস্ত বল প্রয়োগ দ্বারাও কৈলাস পর্বতকে কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়াই অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই গিরিতুল্য অনড় সমাজের নিকট ধর্মবীরের প্রাণান্ত চেষ্টাও সেইরূপ বিফল হইয়া পড়ে। যে নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণ এক সময়ে মেঘদর্শনে কৃষ্ণভ্রম করিয়া পাগল হইতেন, সেই স্থানে ভারতচন্দ্রের শিষ্যগণ ক্ষুণ্ণিত কদম্ব কি দাড়িম্ব দর্শনে কুভাবনায় কণ্টকিত হইয়া রাতি জাগরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গদেশের যুগাবতার। বঙ্গদেশ তখন বর্গীর হাঙ্গামে অস্থির ছিল; ইহার কিছু পরে নবদ্বীপে যে সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হয়, তাহাতে ৬ অংশ লোক নষ্ট হইয়া যায়, “১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ডাকাতির দল বঙ্গদেশে ৫০০০ গৃহ ও ২০০ লোক অগ্নিতে দগ্ধকরে।” (হাট্টার, এনালস্ অব রূরাল বেঙ্গল ১০ পৃঃ)। এই সময় ভারত-

চন্দ্র, স্বীয় প্রভু—“সদাজ্ঞোঃস্বাম্যং হুই পক্ষ”-সৈন্যী নৃপনন্দনের জন্য কামোদ্দীপক বাটিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন; জাতীয় চরিত্রের এই হীনতায় ভাবী রাষ্ট্রবিপ্লবের পথ স্বপ্নময় হইয়াছিল; এই বিপ্লববজ্রায় “তুমে মরে স্বপ্নী স্বপ্ন বৃক্ষে করি। কালোয়াত মরিল বীণার লাউ ধরি।”—দশাটি হইয়াছিল, অযোধ্যার ওরাজেন্দ্র আলি তাহার সাক্ষী।

কিন্তু দোষে গুণে সৃষ্টি; পৌরষের ভয়কাণ্ড বেটন করিয়া “ললিত লবঙ্গ লতার” ছায় সুরুমার বিদ্যাগুলি লতাইয়া উঠিল। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বিশ্রাম থা। গানের ওস্তাদি গানের মূর্ছনা, গদ্যাদির স্বকী-লঙ্কারের পুরাণ পাঠ ও ভারতচন্দ্রের কবিতা হইতে যে মধু করিত হইতে লাগিল, তাহা এই রাজ-নৈতিক বাদলের মধ্যে মনোরম রৌদ্রের মত মুহূর্ত্তাস্বাদ করিতেছিল; নবদ্বীপ হইতে একদা নিম্বার্থ ও নির্মল প্রেমের রশ্মি হইত, এখন নবদ্বীপাধিকার হইতে ভারতচন্দ্রের কবিতা, শাস্ত্রপুরে ধূতি ও কৃষ্ণনগরের পুতুল বস্ত্র বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য দেশে দেশে প্রেরিত হইতে লাগিল। ধূর্ত্তগণা ও প্রতারণা—চরিত্র-হীনতার সঙ্গী, নবদ্বীপের রাজসভায় এই সব শিক্ষার জন্য টোল প্রতিষ্ঠিত হইল। আশ্রয় এখানে সুগাবতার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র সংক্ষেপে আলোচনা করিক।

কৃষ্ণচন্দ্র ।

১৭১০ খৃঃঅঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতৃব্য রাম-গোপালেরই রাজ্য হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি পথে তাম্রকূট-প্রিয় পিতৃব্য মহাশয়ের বিলম্ব ঘটনা করিয়া নবাব দরবারে অগ্রে উপস্থিত হন ও বাক্চাতুরী দ্বারা রাজ্য দখল করেন। আলিবর্দি থা। তাঁহাকে এতদূর ভাবিবাশিতেন যে, তাঁহাকে রাজসভায় না দেখিলে তালাস করিতেন এবং তাঁহাকে ‘ধর্মচন্দ্র’ উপাধি দিয়াছিলেন, কিন্তু এই ‘ধর্মচন্দ্র’ মহাশয়ের প্রতারণা পূর্বক আলিবর্দি তাঁকে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভূমিগুলি দেওয়াইয়া ২০ লক্ষ টাকা মাপ পান। যখন মীরকাশেমের হস্তে বন্দী, সুতরাং রাজ্য তাঁহার হস্তের উপর, তখন পুত্র শিবরামকে লইয়া এক বিরাট পুজার কান পাতিয়া উদ্ধার হইয়া আসেন। কনিষ্ঠ পুত্র শঙ্করচন্দ্র দেওয়ান পদাধিকারকে হাত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রবঞ্চনা করিতে

চেষ্ঠা করিলে কৃষ্ণচন্দ্র হেষ্টিংস্ রমণীকে একছড়া মুক্তার হার দুখ দিয়া পুত্রের উদ্দেশ্য বিফল করেন। ইংরেজ আমিতে বে বড়বত্ত হর, কৃষ্ণচন্দ্র তাহার গুরু। রাজবরভের হাতে “রাখি” বাঁধিয়া তিনি চাকার নবাব-সরকারে কয়েক লক্ষ টাকা মাপ লইয়া আসেন, অথচ রাজবরভের বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্ঠা চক্র করিয়া বিফল করেন। তাঁহার অনুচরগণের কেহ কেহ উপস্থিত ধৃতপনায় তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন; নবাব বখন অগ্রদ্বীপে লোকজন বিনষ্ট হওয়ার সংবাদে জুঁক হইয়া প্রাণ করেন, “অগ্রদ্বীপ কাহার?” তখন অগ্রদ্বীপের খালিকের মোক্তার বিপদ আশঙ্কা করিয়া চুপ হইয়া রহিল, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের মোক্তার উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “এস্থল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের”, তৎপর উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা লোকহত্যার একটা কৈফিয়ৎ দিয়া উক্ত স্থান কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যান্তর্গত করিয়া লইলেন। বীরোচিত সংসাহসের অভাব থাকিলেও কুট রাজনীতিতে কৃষ্ণচন্দ্র অতি প্রাজ্ঞ ছিলেন। পরবর্তী সময়ে মুসলমান শাসন এই কুট রাজনীতি-আশ্রিত হইয়াছিল। মুসলমান দরবারের হুর্নীতিগুলি রাজাকৃষ্ণচন্দ্র অনেকাংশে অনুসরণ করিয়াছিলেন; এক সময় মোগল সম্রাট পুত্রের ব্যাধি নিজে গ্রহণ করিয়া নিজের প্রাণ দিয়া পুত্রকে বাচাইয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে; কিন্তু শেষ সময়ে মুসলমান সম্রাটগণের রাজপ্রাসাদ অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল,— পিতার বিফল পুত্রের বড়বত্ত, পুত্রের হস্তে পিতা বন্দী, ভাতৃহনন প্রভৃতি পাতক মুসলমান ইতিহাস কলুষিত করিয়াছে; হিন্দুর চক্ষে এই সব পাপ অতি অস্বাভাবিক; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের যোগ্য পুত্র শত্ৰুচন্দ্র পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু রটাইয়া নিজে রাজগী লইয়াছিলেন; কৃষ্ণচন্দ্র এই ব্যবহারে মর্শ্মপীড়িত হইয়া গঙ্গাগোবিন্দের নিকট হু হুয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন—“পুত্র অবাধ্য, দয়বায় অসাধ্য। বা করেন গঙ্গাগোবিন্দ।” বস্তত পুত্রের বিশেষ দোষ নাই, তাঁহারও পড়া শুনা রাজসভার টোলেই হইয়াছিল।

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্য শাসনে ও সংরক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহা অতি দুর্লভ; সিংহাসনারোহণের সময় তাঁহার ঋণ ১০ লক্ষ টাকা ছিল, ইহা ছাড়া ১২ লক্ষ টাকা নজরানার জন্ত মহাবন্দ অঙ্গ তাঁহাকে

কলী করিয়াছিলেন, তিনি এই সমস্ত বণ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার রাজ্য অনেক পরিমাণে বাড়াইয়াছিলেন; তিনি “শিব-নিবাসকে” ইন্দ্রপুরী মত বাড়াইয়াছিলেন, তাঁহার উৎসাহে স্থপতি বিদ্যার উন্নতি হইয়াছিল; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোন কোন দেবমন্দির এখনও বঙ্গদেশের গৌরব একটি সঙ্কেত :—“এখন হুন্সর হুন্সসাত ও হুন্স পুন্সর প্রসাদ এবং একপ উন্নত ও দুইতর মন্দির বঙ্গদেশের অন্য কোম স্থানে দৃষ্ট হয় না”—(কিতীশ কশাবলী ৩১ পৃঃ)। তাঁহার পূর্বপুরুষগণের—বিশেষ তাঁহার—যত্নে কৃষ্ণনগরের কুমারগণ একপ হুন্সর মুক্তি পড়া শিখিয়াছিল, তাঁহার উৎসাহে শান্তিপুরের ধুতির বশঃ দেশ বিখ্যাত।

কৃষ্ণচন্দ্র নিজে সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাঁহার সভায় কেবল কবিগণের আদর ছিল এমন নহে; দর্শন, ন্যায়, স্মৃতিধর্ম এ সমস্ত বিষয়েরই সেখানে চর্চা হইত। তিনি এই সর্বশাস্ত্র চর্চায়ই নিজে যোগ দিতেন, ও বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতগণের গুণের আদর করিতে জানিতেন; তিনি হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি ও রামগোপাল সার্কভোষের সঙ্গে জ্ঞানের কুটবিচার করিতে পারিতেন; প্রাণনাথ জ্ঞানপঞ্চানন, গোপাল জ্ঞানালঙ্কার ও রামানন্দ বাচস্পতির সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে এবং শিবরায় বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ও বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চাননের সঙ্গে বড়দর্শন সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লক্ষম ছিলেন; বাণেশ্বর তাঁহার সভার রাজকবি ছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে সংস্কৃত কবিতা প্রণয়ন করিতেন। এই উচ্চ-শিক্ষিত কুটরাজনীতিপ্রাজ্ঞ, মহামাঘিষ্ঠ রাজচক্রবর্তী একটি পল্লীগ্রামের বোধেটের জায় কোতুকজিৎ ছিলেন; তাঁহার কোতুকরাশিতে স্মরণ কি সংঘত ভক্ততা ছিল না, কিন্তু সে গুলি চার্লস দি সেকেন্ডের পরিহাস হইতে বেশী দৃষ্ণীয় বলিয়া গণ্য হইবে না। কোতুকার্ণ রাজসভায় তিনটা লোক নিয়োজিত ছিলেন; ১ম—গোপালভাট্ট, এই ব্যক্তির নাম এখন দেশবিখ্যাত, গোপাল মর-সুন্দরকুমারের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ২য়—হাম্যার্ণব, ইহার বাড়ী বিশ্বপুকুরিণী, ইনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ইহার মকল করিবার শক্তি ছিল। ৩য়—মুকুতারাম মুখোপাধ্যায়, ইহার বাড়ী বীরনগর, রাজার সঙ্গে ইহার মকল ছিল না, সুরসিক দেখিয়া রাজা ইহাকে দৈবাহিক বলিয়া

ছাকিতেন। এই ব্যক্তিত্বের কৌতুকাভিনয়ে রাজসভায় হাস্য ও বীভৎস রসের প্রাক হইত, নমুনা এইরূপ—গোপালভাঁড়ের অন্ধর ছেলেটি দেখিয়া একদিন রাজা বলিলেন “এ যে রাজপুত্র দেখছি।” গোপালের উত্তর—“ধন্য তুমি ছেলে, 'তোমার কল্যাণে আমি রাজপুত্রের কাপ হইলাম।’” মুক্তারামের বাড়ী বীরনগরের কোন ছুই লোক কৌশলে অস্ত্র এক ব্যক্তির দ্বী বিক্রম করিতে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মুখুয্যো, তোমাদের ওখানে কি বউ বিক্রীত হয়?” তিনি উত্তর করিলেন, “হাঁ মহারাজ যত মাজেই”; রাজা একদিন প্রাতে মুক্তারামকে বলিলেন—“মুখুয্যো— গতরাতে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন তুমি বিষ্ঠার হুদে ও আমি পারেনের হুদে পড়িয়াছি। তিনি উত্তর করিলেন, “ধর্ম্মাকতার আমিও এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, কেবল বিশেষ এই যে হুদ হইতে উত্থান করিয়া আমরা পরস্পরের গাত্র লেহন করিতেছি।” রাজসভায় এইরূপ রহস্যের ধূলি খেলা হইত, রাজা এই তিনটি ভাঁড় প্রতিপালন করিয়া তাঁহাদের নিকৃষ্ট মুষ্টি মুষ্টি ধূলি খাইতেন ও হাসিতেন।

এই আনন্দ প্রমোদ ভিন্ন রাজা শাস্ত্রালোচনা করিতেন, রাজ্যশাসন ও বিস্তারের নূতন নূতন ফন্দি উদ্ভব করিতেন, শিল্পের উন্নতির জন্য নানারূপ উৎসাহ দিতেন ও ভারতচন্দ্রকে দিয়া তোটক ছন্দে কবিতা লিখাইতেন। বিলাসের এই বিবিধ সস্তারের মধ্যে নির্মল প্রেমের কথা কেহ শুনাইতে গেলে উপহাসাস্পদ হইত; রাজা “কেবল চৈতন্তোপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিবেচন করিতেন” (দ্বিতীয় বংশাবলী ২৯ পৃঃ)। কৃষ্ণচন্দ্র শিব ও শক্তির বিশেষ উপাসক ছিলেন, ভারতচন্দ্র যখন চণ্ডীর দশাবতার বর্ণনা করিয়া লিখিতেন,—“ভারত কহিছে মাপো এই দশ রূপে। দশ দিকে রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র রূপে”। তখন, আমরা কল্পনা নেত্রে দেখিতে পাই, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তিপূর্ণ গলদশ্রুনেত্রে প্রিয়কবির প্রতি অনুগ্রহ-হাস্য বিতরণ করিতেছেন।

এই শাস্ত্র চর্চা, সুকুমার বিদ্যায় অম্বরাগ, কুটনীতি, কুকচি ও বিলাস-প্রিয়তা এই যুগের সাহিত্যকে একরূপ মিশ্রিত ছাঁচে গঠিত করিয়াছে, তাহার দোষ ও গুণ পাঠকের বিচারাদীন করিতেছি।

২। সাহিত্যে নূতন আদর্শ।

বসন্তঃ বাঙ্গলা করিভা এখন আর ‘কবকের গান’ নহে; ইহার উৎস

সংস্কৃত ও ফার্সীর বড় বড় পণ্ডিতগণের মজর পড়িয়াছে, অলঙ্কারের বাহ্যে স্বভাবরূপ ঢাকা পড়িয়াছে; এখন বঙ্গভাষা রাজসভায় অঙ্গুগৃহীতা, পন্নীবাগিনীর সাদা জুইফুলের মত প্রাণটি ইহার আর নাই, সংকুচিত সৌন্দর্য ও মিকাম প্রেমের আবেগ ইহা পন্নীগ্রামে ফেলিয়া আসিয়াছে, রাজসভায় ইহার কামকলাপূর্ণ ক্রীড়ায় দর্শকবৃন্দের চিত্তে উদ্ভূত মদিরার উল্লাস প্রবাহিত হয়, ইহার নীলনিচোলের অসংযত বিক্ষেপে নানী আভরণের জ্যোতি ছুটিয়া উঠে।

কবিগণ এখন বুদ্ধি-সাগর মন্থন করিয়া রূপবর্ণনার উৎপত্তি করেন, যিনি কল্পনার কুহক সৃষ্টি করিতে যত পটু, তিনি তত প্রশংসনীয়; প্রকৃত রূপের আর কে খোঁজ করে! আমরা নৈষধ চরিত হইতে একটি অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি, পাঠক দেখিবেন বঙ্গভাষা কোন্ আদর্শের অনুসরণ করিতেছিল;—“হে রাজন্ দময়ন্তীর চুলের কথা কি বলিব? পশু হরিণ যে চামর খীর পুচ্ছরূপে পশ্চাৎভাগে রাখিয়া তিরস্কৃত করে, সেই চামরের সঙ্গে কি দময়ন্তীর চুলের তুলনা দিতে ইচ্ছা হয়?”, “দময়ন্তীর চক্ষু হরিণের চক্ষু হইতেও স্থল্লর, তাই হরিণ ভূমিভলে সুরাঘাত করিয়া খীর পরাজয় ও ক্ষোভ ঘোষণা করিতেছে।” “বিধাতা চক্ষের ঐক্যভাগ গ্রহণ করিয়া দময়ন্তীর মুখ নির্মাণ করিয়াছেন, এই জন্ত চন্দ্রমণ্ডলে একটা গর্ত হইয়াছে, লোকে তাহাকে কলঙ্ক বলে।” “দময়ন্তীর মুখ দেখিয়া পদ্মগুলি পরাজয় চিহ্ন স্বরূপ জলছপে বাস করিতেছে, অদ্যাপি উঠিতে সাহস পাইতেছেন।” “দময়ন্তীর পূর্বে বিধাতা যত রমণী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শিকানবিসের মস্তের মত, তারপর বেঙলি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তুলনার দময়ন্তীর রূপের ঐক্য দেখাইবার জন্ত।” বহুপত্র ব্যাপিয়া এই ভাবের বর্ণনা চলিয়াছে। বাক্সালী কবি শুধু সংস্কৃতের অনুকরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ফার্সী ও উর্দু হইতেও ইচ্ছাক্রমে সংগ্রহ করিয়াছেন; “তাহার কাল চুল বুদ্ধিমানদিগের বেদ্বি স্বরূপ,” “তাহার নখের জ্যোতিতে সমস্ত মহাবীর মন লগ্ন আছে, তাহা নূতন চক্ষের জ্ঞান,” “তাহার নিতম্ব আঁকা পাহাড়ের জ্ঞান;,” “তাহার কটাক্ষ চুলের জ্ঞান স্ফূর্ত, বরং তাহারও অর্ধেক,” (জেলোখা)। “স্থল্লরী জানান্তে যেন্দীরজিত অঙ্গুলীধারা চুল খারিতেছে, যেন যেন হইতে শুকা বর্ণন হইতেছে” (দময়ন্তী)। এই শেষের কয়েকছত্র পড়িয়া বির্যাপতির—“চিরুয়ে বদল জসঘারা। সেহ বরিনে বেন মোস্তিম হারা।” স্বভাবভংগী বসে পড়িবে। এইরূপ প্রতিপোষিত পড়িয়া পাঠকগণ কবির প্রতি বুদ্ধির অবতীর্ণ প্রশংসা করিবেন কিন্তু কোন স্থল্লরী রমণী দেখিবেন বলিয়া

অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না। উপমার অতিরঞ্জন সৌন্দর্যের বর্ধক নহে, হানিকারক।

বঙ্গসাহিত্যে সৌন্দর্যের আদর্শের ধ্বংসের সঙ্গে করুণ প্রভৃতি রসের ধারা ও স্তিমিত হইয়া পড়িল, ভারতচন্দ্রের রুতি সামান্য গণিকার জ্ঞান কৃত্রিমস্বরে পতি বিয়োগে বিলাপ করিতেছে—“আহা আহা হরি হরি, উহ উহ হরি হরি, হায় হায় গোসাঞি গোসাঞি।” ইহা করুণ রসের বিকল্প ভিন্ন কি বলিব? সুন্দরকে দেখিবার ব্যগ্রতা বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন—“এ নীল কাপড়, হানিছে কামড় যেমন কাল নাগিনী।” গভীর কথায় ভারতচন্দ্র অপটু, অল্পদা মঙ্গল রূপ ধর্মমণ্ডপে তিনি বাই ন্যূচ দেখাইয়াছেন; যে দেশে এক সময়ে গকুল চক্রবর্তী চণ্ডীদাস ও গোবিন্দ দাসের গীত গাইয়া শ্রোতা-কুলকে মোহিত করিতেন—“বঁধু কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুঃখ। তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে স্থখ। সতী বা অসতী তোমাকে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি। কহে চণ্ডীদাস, পাণ পুণ্য সম, তোমার চরণখানি।” ইত্যাদি সরস প্রেমের কথায় মর্শ্বের আবেগ উক্ত হইত, সেই দেশে রামপ্রসাদের “বলে মুহ মুহ মুখে উহ উহ। যেন কোকিল কুম্ভিত কুহ কুহ।” ও তৎপথাবলম্বিত ভারতচন্দ্রের তোটক পড়িতে তরুণ সম্প্রদায় আগ্রহান্বিত হইলেন; যে দেশে প্রেমের স্বভাব করুণায় দেশের সর্ব কলুষ ভাসাইয়া লইয়াছিল, সেই দেশে প্রেমের অভাবে কুলবধুকে স্বামী একটা হরবোলায় জায় প্রেমের পাঠ শিখাইতেছেন, বিদেশে গমনোন্মুখ সাধু স্ত্রীকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন—“বাহিরে পদরাখা জেন কণি কণা পরে। দীপান্তর বাওরা হেন মান অন্তরে। পর পুরুষের রব বজ্রতুলা কাণে। ভাল শয্যা কুস্থল কটক করি মনে।” (জয়নারায়ণের চণ্ডী)।

এস্থলে বক্তব্য এই, বিদ্যাসুন্দরের হীরা, বিহু ব্রাহ্মণী প্রভৃতি কুটনী ও কামিনীকুমারের সোণামুখীর জায় দাসী বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের খাটি চরিত্র নহে; দুর্জলাদাসীর জায় চরিত্র এখনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকি। সম্ভব, কিন্তু হীরার জায় নাগর ধরিবার কল বিদেশের আমদানী; মুসলমানী কেতাবে কুটনীদাসী অনেকস্থলে দৃষ্ট হয়, স্বেচ্ছায় বা দাসী তাঁহাকে বলিতেছে;—“কে তোমাকে ঠকাইয়াছে বল, তোমার কুলের বঁধু হরিয়ার জায় বিবর্ণ কেন? তুমি চন্দ্রের মত দিন দিন ক্ষয় পাইতেছ কেন? আমি বোঝ করি, তুমি কাহারও প্রেমের কাঁদে পড়িয়াছ, বল সে কে? যদি সে আশ্রয়দায়ক

জান হয়, তবে তাহাকে জমিনে ফেলিয়া জোমার নিকট নদী করিব। সে যদি পাহাড়-বাদী দেবতা হয়, তবে মন্ত্রবলে তাহাকে শিথিতে পুরিয়া জোমার নিকট হাঙ্গির করিব। যদি সে রত্নবা হয়, তবে তুমি বাহার দানী হইতে ইচ্ছা করিতেছ, সে আমার কুহকে জোমার দাস হইয়া পদানত হইবে।" (কেলেখা)। লয়ালীমজহুতে পড়িয়াছি— "কুটনী আছিল এক সেই সহরেতে। তেমন কুটনী কেহ না ছিল সেধেতে ॥ মন জুলাইতে সেই কথার কথার। জমিনেতে চন্দ্রসূর্য্য করিত উদয় ॥ (মুসলমানী কেতাব)।

এই যবনীগণের চন্দ্রসূর্য্য ও বাঘের হুধ করায়ত্ত ছিল, ইহার আকাশে ফাঁদ পাতিয়া নাদিকার কামাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিত; এই রমণীগণই হিন্দু সাহিত্যে হীরামালিনী ও সোণামুখী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, পাঠক তাহাদিগকে—নারী ঋষির স্ত্রীসংস্করণ কুজা ও তুর্কলার সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত করিবেন না।

বিদ্যাসুন্দরের সিংহকাটা বিলাসের অভিনয় ও কুটনী সংযোগে গৃহস্থের বাড়ীর কতাকে বশীকরণ—এ সমস্ত সম্ভবতঃ মুসলমানী সাহিত্যের প্রভাবের পরিচায়ক। ফার্সী অমুরাগী ধর্মভীক কবিগণ চণ্ডী পূজার বিষপত্র কাণে গুজিয়া মুসলমানী কেছা শুনাইয়াছেন, তাহাদের বন্ধস্থলে লম্বমান পৈতা, চন্দনচর্চিত ললাট, কর্ণ লগ্ন বিষপত্র ও মুখে "কালি কালি কালি কালি কালিকে। চওমুণ্ডি মুণ্ডখণ্ডি, খণ্ডমুণ্ড মালিকে ॥" প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ শুনিয়া শ্রোতাগণ বিদ্যাসুন্দর পূজামন্ত্রপে গাওয়াইয়াছেন; কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের উপর মুসলমান সাহিত্যের ছায়া বড় স্পষ্ট, চণ্ডীর "চৌতিশায়"ই উহার চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। লারলীর মাতা হইতে বীরসিংহের মহিষী বিদ্যাকে গালি দিতে শিখিয়াছেন, মুসলমানী কেতাব হইতে তুলিয়া দেখাইতেছি—"গোমা মনে লাল আখি, লায়লীকে কহে ডাকি, কাল মুখী হার কি করিলি। এই কি বাসনা তোর, জাত কুল গেল মোর, দেশ মাঝে কলঙ্ক রাখিলি ॥ কি পড়া পড়িতে গেলি, প্রেমে মন মজাইলি, কে শিখাল এমন ব্যাকার ॥ লাঞ্ছন্য গেল তোর, অকাজি হইল মোর; কুলে কালি দিল সবাকার ॥" (লয়লামজহু)।

বিদ্যাসুন্দরের জয়লাভের একমাত্র কারণ ইহার অপূর্ণ শব্দমন্ত্র। "কহু মোর হ'ল হয়, বড় পিরা তত তত্ত্ব, আলাশে দাতিল মন মাতালে নাচাও না। তবে পরাণ ধু কাই নীত বেওরা ॥" প্রভৃতি পদ পড়িতেই সংগীতের স্তার স্রব-বহী, উহাদের জীব চিত্তে উপলব্ধি হইবার পূর্বে কর্ণ মুগ্ধ হইয়া পড়ে। বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্য নৈতিক-জীবনের ভয়-পতাকা, বিজাতীয় আদর্শ ও কুফচি-

লুপ্তিত ; কাচের মূল্যে বিকাইবার যোগ্য, কিন্তু ইহাদের হাচেরা হান্দার সাজিত ভাবার জ্যোতিতে আদর্শের হীনতা পাঠকগণের উপলব্ধি হয় নাই, এক যুগ ভরিয়া এই কাব্যগুলি পাকাসোণার মূল্যে বিকাইরাছে ।

এই অশ্লীল মিষ্টভাষী সাহিত্য যখন রাজ্যভূগ্ৰহে পুষ্ট হইতেছিল, তখন বঙ্গের দূর পল্লীতে সরলভক্তি ও প্রেমাত্মক বিধৃত সংগীত পুনশ্চ আরম্ভ হইয়া শ্রোতার শ্রোণের কামনা পরিতৃপ্ত করিতেছিল, অমুদ্রাস-প্রিয়তা ও কোমলভাষা ব্যতীত কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের অল্প কোন ঋণ সেই সব সংগীত বহন করে না ; তাহারা সামান্য কবিওয়ার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া অশিক্ষিত সমাজকেই বেশী আকর্ষণ করিয়াছিল,—কিন্তু বোধ হয় তাহাদের ভাবের নিখিলতা ও আবেগ—রুচিদ্রষ্ট বৃদ্ধা-শিক্ষাকে ধিকার দিয়া কালে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবে ; আমরা পরে তাহাদিগের কথা সংক্ষেপে লিখিব ।

কাব্যশাখা ।

বিদ্যাসুন্দরই এ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কাব্য ; বররুচি নামক কবি সংস্কৃতে যে কয়েকটি শ্লোক রচনা করেন, তাহা বঙ্গীয় বিদ্যাসুন্দরের ভিত্তি নহে । পল্লীগ্রামের অন্যান্য গল্পের ন্যায় বিদ্যাসুন্দরের গল্পও সম্ভবতঃ বহুদিন পূর্বে প্রচলিত ছিল কিন্তু উহা কবিগণের ক্রমাগত চেষ্টায় বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, এই আকারে উহা মুসলমানী প্রভাব দ্বারা বিশেষরূপে চিহ্নিত । মুসলমান ও হিন্দু দীর্ঘকাল একত্র বাস নিবন্ধন পরস্পরের প্রতি অনেকটা সহানুভূতি প্রদর্শন হইয়াছিলেন, ক্ষেমানন্দ রচিত মনসার ভাসানে দৃষ্ট হয়, লখিন্দরের লোহার বাসরে হিন্দুমানী রক্ষাকবচ ও অন্যান্য মন্ত্রপুত্র সামগ্রীর সঙ্গে একখানা কোরাণও রাখা হইয়াছিল, রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ মুসলমান ফকির সাজিয়া ধর্মের ছবক শিখাইয়া গিয়াছেন,—তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি ; কিন্তু চট্টগ্রামে এই দুই জাতি সামাজিক আচার ব্যবহারে যতদূর সন্নিহিত হইয়াছিলেন, অন্যত্র সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল ; চট্টগ্রামের কবি হামিদুল্লাহ ডেলুয়াসুন্দরী কাব্যে বর্ণিত আছে লক্ষপতি সদাগর পুত্র কামনায় ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিলে, তাঁহারা কোরাণ দেখিয়া অঙ্গপাত করিতে আরম্ভ করিলেন ও সদাগরের পুত্র বাণিজ্যে যাইবার পূর্বে “বেদপ্রদ” পিতৃ

বাঁক্য নাম্য করিয়া “আল্লার নাহ” লইয়া বৃহৎ হইতে বহির্গত হইলেন। ১৫০ বৎসরের প্রাচীন কবি আলোয়াল তাঁহার “আমিন বিলায়াত” কাব্যে নারিকার মিলারামাকে পাতালে প্রেরণ করিয়া মঞ্জুরবির নিকট বর প্রার্থনা করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন ও তাঁহার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে ‘লক্ষণের চক্রকলা’, ‘রামচন্দ্রের সীতা’, ‘বিদ্যাধরি চিত্ররেখা’ ও ‘বিক্রমাসিত্যের ভাস্করমতীর’ সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন * ; হিন্দু ও মুসলমানগণ এইভাবে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের ভাব আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল, সুতরাং বিদ্যাসুন্দরকাব্যে যে অলঙ্কিতভাবে মুসলমানী মন্নার প্রতিচ্ছায়া পড়িবে, তাহাতে বিচित्र কি ? এই সময় নায়ক নায়িকার বিলাসকলাপূর্ণ প্রেমের গল্প উদ্গু ও ফানী বহুবির পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছিল; এই সব পুস্তকে প্রায়ই দেখা যায়, নায়কগণ নায়িকাদের পটে লিখিত মূর্তি দেখিয়াই পাগল হইয়া অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন, তাজি বোড়া সমাকৃত সুন্দরকে নায়িকার খোঁজে বাইতে দেখিয়া আমাদের সেই সব নায়কের কথাই মনে পড়িয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে বিবাহের পূর্বে বরের এইরূপ প্রেমাবেশ আর ইতি পূর্বে বর্ণিত হয় নাই।

পদ্মাবতী।

প্রায় ২৫০ বৎসর হইল কবি আলোয়াল পদ্মাবতী নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। এই কাব্য কৃষ্ণচন্দ্র রাজার বহুপূর্বে রচিত হইলেও ইহাতে এই যুগের মুখ্য-চিহ্নগুলি বিদ্যমান সুতরাং কবিকে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের পথ প্রদর্শক বলা যাইতে পারে, আমরা এজন্যে পদ্মাবতী প্রসঙ্গ দ্বারা কাব্যসাধার মুখবন্ধ করিতেছি। পাঠক দেখিবেন কবি আলোয়াল সংস্কৃতে কিরূপ বুৎপন্ন ছিলেন ও হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার কতদূর অভিজ্ঞতা ছিল। এই পুস্তক পড়িয়া অনেক সময় প্রশ্ন হইবে, মুসলমানের লেখনী এতদূর হিন্দুরানী শ্রিবিলা কিরূপে ? বাঁহারা ৯ জন মুসলমান বৈষ্ণবকবির কবিতা পড়িয়া চমৎকৃত, তাঁহারা কবি আলোয়ালের এই সুস্বাদু কাব্যখানা পাঠ করুন।

২২৭ শালে মীর মহাম্মদ নামক জনৈক কবি হিন্দী-ভাষার পদ্মাবতী

* এই কাব্যের হস্ত লিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে; ইহাতে উৎকৃষ্ট গুণ আর, কামলাটিক হিন্দুকবির ভাষার ভাড়া।

রচনা করেন।—ইহা পদ্মিনী-উপাখ্যান; দিল্লীর আলাউদ্দিন জিহোর-রাজ্যের রূপ-ভূমির যে সমরানল বা কামানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, এই কাব্য তাহারই ইতিহাস। ইহা এক স্থলে ঐতিহাসিক সত্যের বিপর্যয় আছে—জিতোরাধিপ জীমসেন কবিকর্তৃক রত্নসেন নামে অভিহিত হইয়াছেন, পুঁথি শেষে আলাউদ্দিনের পরাজয় লিখিত হইয়াছে; যাহাইকি কবির স্বাধীন কল্পনাকে ইতিহাসের সীমাবদ্ধ তুলনাও দ্বারা মাণ করা উচিত হইবে না। মীর মহাম্মদের এই কাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন—কবি আলোয়াল; সে আমলের অনুবাদ অর্থে অনেক স্থলেই নূতন স্থল।

আলোয়াল কবি কতয়াবাদ পরগণায় (ফরিদপুর) জালালপুর নামক স্থানের অধিপতি সমসেরকুতুবের একজন সচিবের পুত্র ছিলেন; যৌবনারম্ভে ইনি পিতার সহিত জলপথে গমন করিতেছিলেন, পথে হার্মাদগণ (পতঙ্গি জলদস্যু) তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে, কবির পিতা বৃদ্ধ করিয়া নিহত হন। এই সময় হার্মাদগণের অত্যাচারে সমুদ্রের প্রান্তভাগে সর্বদা বিপদাশঙ্কা ছিল, কবিকল্পনচর্চিতে ও আমরা ইহা দেখিয়াছি। কবি পিতৃবিয়োগের পর রোসাকের (আরাকানের) রাজার প্রধান অমাত্য মাগণঠাকুরের শরণাপন্ন হন। মাগণঠাকুর সম্ভবতঃ মগ ছিলেন, সংগীত ও অপরাপর সুকুমার শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ অমুরাগ ছিল; আলোয়ালের উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া তিনি তাঁহাকে মীর মহাম্মদকৃত পদ্মাবতীকেছার বঙ্গানুবাদ করিতে আদেশ করেন, তদনুসারে পদ্মাবতী রচিত হয়; পদ্মাবতী লেখার পর তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু মাগণ ঠাকুর তাঁহাকে আবার বৃদ্ধবয়সে “ছয়কুল মুল্লুক ও বদিউজ্জামাল” নামক ফারসী কাব্য অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করেন। এই পুস্তক কতকদূর রচনার পর মাগণ ঠাকুরের মৃত্যু হয়, গভীর দুঃখে কবি লেখনী ত্যাগ করেন। সহসা আরাকানে এক বোর বিপ্লব উপস্থিত হইল; সুজা বাদশা তখায়

- + এই পুস্তক সম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ‘ভারত-দীপন’ পত্রিকার সম্পাদক কান্দিনিবাসী শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে লিখিয়া পাঠান—“মহাশয়, সাহিত্য দাতক মানিক পুস্তক (১০০১খং) মাঘ মাসের সংখ্যায় ‘মুহম্মদ কবির বাঙ্গলা কাব্য’ দীর্ঘ প্রায় ৩১১ পৃষ্ঠা ২১ পংক্তিতে আপনি লিখিয়াছেন যে মীর মহাম্মদের রচিত হিন্দী পদ্মাবতী পাণ্ডুর দ্বারা নাই। মহাশয়, বঙ্গবাহ পূর্বক জানাইতেছি যে হিন্দী বীরমালিকমহাকবি রচিত পদ্মাবতী কাব্য কান্দী ও লক্ষ্মীতে ছাপা হইয়াছে ও বাজারে পাওয়া যায়।”

আলিয়া আরাকানপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, আরাকানরাজ সুলতার অমৃতচর ওলি বিনষ্ট করেন, মুসলমানগণের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল, মুজা আমক এক চুই লোকের বিখ্যা সাফ্যে কবি আলোয়াল কারাগারে আবদ্ধ হইলেন; কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া কবি নয় বৎসর অতি দীর্ঘ ভাবে কষ্টকর করেন, এই দীর্ঘকালপরে কবির উপর গ্রহগণ পুনরায় স্প্রসন্ন হন; ছৈয়দ মুছা নামক এক সদাশর ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে “ছয়ফুলমুহুক ও বদিউজ্জামাল” পুথির অবশিষ্টাংশ রচনা করিতে আদেশ করেন; তখন কবি ভয়বীণার সুল তার যোজনা করিলেন; কিন্তু তখন তিনি বড় বৃদ্ধ,—বয়ঃ গতে বনিতা বিলাসের গীত কঠে উঠিতে চাহে না, আলোয়াল এই দায়িত্ব গ্রহণে প্রথমত অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু সৈয়দমুছা তাঁহার দেশ বিখ্যাত বশের কথা বলিয়া পীড়াপীড়ি করিলেন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে সুলতার মৃত্যু হয়, তাহার অন্তিম ২০ বৎসর পূর্বে কবির ৪০ বৎসর বয়সে পদ্মাবতী রচনার কাল ধরিলে, তিনি ১৬১৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই রূপ অনুমান করা অত্যন্ত হইবে না; কবি আলোয়াল কবিকঙ্কণ ও কাশীদাসের পরবর্তী কবি।

পদ্মাবতীকাব্যে আলোয়ালের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে; কবি পিতৃলাচার্যের মগণ, রগণ প্রভৃতি অষ্টমহাগণের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন; ষষ্টিতা, বাসকলজ্জা ও কলহাস্তরিতা প্রভৃতি অষ্ট নারিকার ভেদ ও বিরহের দশ অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন, আব্দুরহেদ শাহ লইয়া বড়সরের কবিরাজী কথা শুনাইয়াছেন, জ্যোতিষ-প্রসঙ্গে লগাচার্যের ছায় যাত্রার শুভাশুভের ও যোগিনীচক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; একজন প্রবীণা এরোর মত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারের সুন্দর সুন্দর আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের যত প্রশস্তবাক্যনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোনামে সংকৃত শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন। আলোয়াল “ছয়ফুলমুহুক ও বদিউজ্জামাল” কাব্যে লিখিয়াছিলেন—“আজ পাইয়া রচিলাম পুস্তক পদ্মাবতী। রচক আছিল মোর বুদ্ধির শক্তি।” এই উক্তি অতি সত্য;—তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধিতে যতদূর বেড়

পাইয়াছিল, তিনি পদ্মাবতী কাব্যে তাহার কিছু বাক্য বেনে নাই। তিনি বয়ঃ সন্ধি বর্ণনার একজন রসজ্ঞ বৈষ্ণব কবি, যথা—“লাড় আঁখি বড় দৃষ্ট ক্রমে ক্রমে হয়। কণে কণে লাজে তহু আসি সফরয়। চোয় রূপে অবদ পড়িতে উপজয়। বিরহ বর্ণনা কণে কণে বনে হয়। অন্য সকার অঙ্গে রহু ভদ্র সজ্জা। আঘোষিত পদ্মবন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে। *** আভেদ অঁহিয়ে দুই কমলের কলি। না আঁহিয়ে পরশে কোন ভাগ্যবন্ত অলি।” অন্ততঃ “কুটিল কবরী কুহুম মাঝে। তারকা মণ্ডলে জলদ সাজে। শশীকলা প্রায় সিন্দূর ভালে। বেড়ি বিধুম্ব অলকজালে। হুল্লরী কামিনী। কমল বিমোহে। খঞ্জন গঞ্জন নয়নে চাহে। মদন ধনুক ডুর বিতলে। অপাঙ্গ ইজিত বাঁধ তরঙ্গে। নাসা খণ্ড পতি নহে সমতুল। হরজ অধর বাঁধুলী ফুল। মদন মুকুতা বিজলি হাসি। অমির বরিরে আঁধার নাশি। উরজ কঠিন হেতু কটোর। হেরি মুনি মন বিভোর। হরিকরিকুণ্ড কটি নিতম্ব। রাজ হংস জিনি গতি বিলম্ব। কবি আলোয়ন মধুগায়। মাগন আরতি রহক সগায়।” স্থলে স্থলে কথার বাঁধুনি জয়দেবের মত,—“বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে। বরবালা দুই ইন্দু, প্রবে বেন হুখা বিন্দু, মুহুরন্ত অধরে ললিত মধু হাসে। প্রফুল্লিত কুহুম, মধুরত ঝড়ত, হড়ত পরভূত কুঞ্জে রত রাসে। মলয় সমীর, হুসৌমজ হুশীতল, বিলোলিত পতি অতি রস ভাবে। প্রফুল্লিত বদম্পতি, কুটিল তজাল ক্রন্দ, মুকুলিত চুলতলা কোরক জালে। যুবজন হৃদয়, আনন্দে পরিপূরিত, রক্ত মলিকা মালতি মালে।” অন্ততঃ বিদ্যাপতিকের মনে পড়িবে,—“চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী, খঞ্জন গমন শোভিত।” ঋতু বর্ণনার পদগুলি মন্থন ও ললিত, তাহা আমাদের বৈষ্ণব কবিকুলগুরুদিগের রচনার সঙ্গে গাঁথিয়া রাখার উপযুক্ত—“মিলায় সময় অতি প্রচণ্ড তপন। রৌদ্রজ্বলে রহে ছায়া চরণে শরণ। চলন চম্পক মালা মলয়া পবন, সতত দম্পতি পাশে ব্যাপ্ত মদন।” বর্ষাকালে—“ঘোর শব্দ করিয়া মল্লার রাগ গায়। দজরী শিখিনীরক অতি মনে ভায়। বাসিলকে নানারক নিশি বসি জাগে। চমকিলে বিভাত চমকি কঠে লাগে। বজ্রপাতে কমলিনী জ্বলিত হইয়া। ফরর পতির গীথে অধিক চাপিয়া। কীট কুলকলয়ব কড়ন ঝড়ার। গনিয়া যুবক চিত্তে চমকিত মার।” শরৎকালে—“আসিল শরৎ ঝড়ু নির্মল আকাশে। গেলের চায়র কেশ কুহুম বিকাশে। নরীন খঞ্জন সেখি বড়হি কোতুকে। উপজিত কামিনী দম্পতি বনে হুখ। কুহুমিত খেত শব্দা অতি মনোহর। কুহুম চন্দনে সেপিয়া কলেবর। বাবা আজরন পটাবর পরিধান। যুবকের ময়মে জাগর পঞ্চমান।” শিশিরকালে—“সহজে বদম্পতি মজে শ্রীতের মোহাগে। যেমকান্তি দুই অঙ্গ এক হৈলো লাকে।” হেমন্তে—“শিতলিত বাসে রবি ছরিতে লুকার। অতি দীর্ঘ হুখ নিশি পলকে পোহার। পুশ শব্দা দুই খেলা রিঁজির বসন। বকে বকে এক হৈলে নীত নিবারণ।” আশ্বিনায়াল কবির বারমাস বর্ণনায়ও এই সুন্দর ও নিপুণ ভুলির কর্ম দৃষ্ট হইবে—ভাত্রে—

“ভায়েতে বারিনী ঘোর ভয়ঃ অতিশয়। নানা অস্ত্র আনিবার মদন ক্ষেপয়।”—“আধিন প্রকাশ নিশি নির্মল গগন। গৃহ অন্ধকার নাহি চাঁদের কিরণ। সকলের মতে চন্দ্র, রাহ মোর মতে। মুদিত কমল আঁখি চঞ্জিকা উদিতে।” কার্তিকে—“পরব দেওলি ঘরে ঘরে স্থখ ভোগ। নিম্নপতি বিনে মোর তোপ তেল রোগ।” ফান্তুলে—“মোর অস্ত্র পরশি পবন বধা যায়। তরুণ পত্র ঝরি পড়য় তথায়।” বৈশাখে—“বিলসে মহী অঙ্গণ প্রবলে। জট তেল বায়ু জল বিরহে অনলে। মিত্র হৈয়া কমল না সঙ্গে দিনমণি। পতিবিনে কেমনে সহিবে কমলিনী।” জ্যৈষ্ঠে—“পুষ্প রেণ চন্দন ছিটায় সখিগণ। ভস্মবৎ হয় মোর অস্ত্র পরশন।” মহাদেব বর্ণনায় আলোয়াল কবি শৈবের প্রশংসা পাইবেন,—“শিরে গঙ্গাধারা ঘটা গলে অহিমালা। অস্ত্রে ভস্ম পৃষ্ঠেতে পরণ বাস্র ছালা। কণ্ঠে কালকূট ভালে চন্দ্রমা হুচাস। কক্ষ শিঙ্গা ভূতনাথ করত ডুবুস। শঙ্খের কুণ্ডলী কর্ণে হস্ততে ত্রিশূল। ওড়ের কলিকা জিনি নয়ন রাতুল।” এত-দ্বতীত নানা বিচিত্র বিদ্যামুন্দরী ধূয়া গুলির মত গীত-ভাঙ্গা পদ পুস্তকের সর্বত্র পাওয়া যাইবে। মধ্যে মধ্যে দর্শনাত্মক উচ্চভাবের বিকাশ আছে, তদৃষ্টে বোধ হয় কবি পাণ্ডিত্য ছাড়িয়া দিলে অস্ত্র-দৃষ্টির রাস্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম ছিলেন, যথা—“কান্ত কথা সকল সুগন্ধি ভরপুর। দূরেতে নিকট হয় নিকটেতে দূর। নিকটেতে দূর যেন পুষ্পেতে কলিকা। দূরেতে নিকট মধুমাঝে পিপীলিকা। বনধোও থাকে অলি কমলেতে বশ। নিকটে থাকিয়া ভেক না জনের রস।” এবং ছয়ফলমূলক ও বদউজ্জমালে—“উজ্জল মহিমা নাহি অন্ধকার বিনে। অধর্ম না হৈলে বল উত্তম কেবা চিনে। লবণ কারণে চিনে মিষ্ট জল সীরা। কুপণ না হৈতো কোথা দাতার মহিমা। মতা যে অসত্য দুই মতে হৈলো বত। ভাগি মন্দ ধৈ বলে না কর কর্ণগত। যেই পুঁজি আছে মাত্র স্বয়ং ভাণ্ডার। লাজ ছাড়ি আলোয়াল বাস্তব কর তার।”

পদ্মাবতী কাব্যে মুসলমানীভাব না আছে, এমন নহে; এই কাব্যে কল্পনার কতকটা অস্বাভাবিক আড়ম্বর আছে, যাহা পড়িতে পড়িতে আরব্য ও পারস্যদেশের গল্পগুলির কথা মনে হয়; রত্নসেন শুক মুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, প্রায়ই মুচ্ছিত হইয়া থাকিতেন, শেষে রাজ্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে “বোলশত রাজার কুমার হৈল বোগী।” রাজকুমারীর হৃৎক সংবাদ জানাইতে যে পক্ষী দূত হইয়া চলিল, তাহার বর্ণনায় রাজকুমারীর বিরহ ব্যথার পরিমাণ দস্ত হইয়াছে; —“হৃৎকর সংবাদ লয়ে বিহঙ্গ উড়িল।

সেই দুঃখে জলদস্যবল বর্ণ হৈল ॥ ক্ষুণ্ণ পড়িল উড়ি টানের উপর। অন্তরে ক্রায়ল তহি ভেল
শশব্দ ॥ উড়িতে নারিল পাখা শূণ্ণর উপর। উকা পাত হয় হেন বলে ভারে নর ॥ সমুদ্র
উপর দিয়া করিল গমন। জগনিধি হৈল তঁহু পুণ্ডিত লবণ ॥" যখন মুসলমান
কবিকে পাঠক কিঞ্চিৎ কালের জন্ত হিন্দু কবি বলিয়া ভ্রম করিবেন,
তখনই সহসা কল্পনার আকস্মিক জাঁকাল বিকাশে শৈশবশ্রুত পরীবাসু
কি দানহাসের বৃত্তান্ত স্মরণ পড়িবে, ও পদ্মাবতী কাব্য মুসলমানী
কেছার আকার ধারণ করিবে।

পদ্মাবতীতে প্রথম শ্রেণীর কাব্যের গুণ দৃষ্ট হয় না; পুস্তক আগা-
গোড়া পড়িলে পাঠক মাঝে মাঝে সুন্দর ভাব ও সুন্দর কথা পাইবেন;
কিন্তু সেই সব ললিত ভাব ও শব্দকুসুম দ্বারা মালা গাঁথা হয় নাই,
অপবা গাঁথা মালা ছিঁড়িয়া পড়িলে যেরূপ কোন কুসুম ভূচ্যুত, কোন
কুসুম হুত্রে অর্দ্ধ সংলগ্ন অবস্থায় পাওয়া যায়, আলোয়ালের কবিত্ব-
সূচক অংশগুলিও সেই রূপ গল্পসূত্রে অর্দ্ধ সংযুক্ত, অর্দ্ধ বিযুক্ত অস্তিত্ব
পাওয়া যায়, তাহা সূচক রূপে সধক হয় নাই; সেইরূপ সধক করা, সূতায়
নাশা ফুল উৎকৃষ্ট রচি ও সৌন্দর্য্য বোধ সহকারে গাঁথা—প্রথম শ্রেণীর
শিরীর কর্ম্ম। ইহা ছাড়া প্রথম শ্রেণীর কাব্যে বড় কোন এক আদর্শ
পরিকার রেখায় আঁকা থাকে, সেই আদর্শের চতুর্পার্শ্বে ক্ষুদ্রতর সৌন্দর্য্য-
রাশি পল্লবিত হয়। পদ্মাবতীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যের অভাব নাই,
কিন্তু বড় আদর্শের অভাব; অথচ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে যেরূপ
সর্বত্র সুললিত ভাষা, উজ্জল হাস্য রসের দীপ্তি ও কৌতুকাবহ প্রতিভার
খেলা, পদ্মাবতীর সর্বত্র তাহা নাই, কচিং কচিং সেরূপ আছে ও কচিং
কচিং আলোয়াল ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ। আলোয়াল রচিত “ছয়ফলমূলক
ও বদিউজ্জমাল” পদ্মাবতী হইতে নিকৃষ্ট; কিন্তু এই দুইকাব্যেরই ভাষা
সংস্কৃত-প্রধান বাঙ্গলা, যবনী ভাষার মিশ্রণ অল্প; আলোয়াল কবি
এই হেতু বঙ্গীয় সাহিত্যে হিন্দুকবিগণের সমাজে আদরের সহিত গৃহীত
হইবেন। এই কবি সম্বন্ধে আমাদের শেষ বক্তব্য—চট্টগ্রামের মুসলমান-
গণের প্রথা অনুসারে আলোয়াল এই দুই বাঙ্গলা কাব্য ফারসী অক্ষরে
লিখিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কৃতানভিজ্ঞ প্রকাশক হামিদুল্লাহের কারসী
অক্ষর বাঙ্গলায় প্রবর্তিত করিতে যাইয়া অনেকগুলি গুরুতর ভ্রম

করিয়াছেন,—তাহা সংশোধন করিয়া এই দুই খানা কাব্য উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যিক ;

বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গল ইত্যাদি।

এই যুগের বিশেষ প্রশংসিত কাব্য ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর ; কিন্তু ইহাতে অপ্রশংসার কথা অনেক আছে।

এই কাব্যে হীরামালিনী ভিন্ন অন্য কোন চরিত্র পরিষ্কার রূপে অঙ্কিত হয় নাই।—আদিসের ভূতাপ্রিত নায়ক নায়িকার তোটক-ছন্দাঙ্ক রাত্রিজাগরণ বর্ণনায় তাঁহাদের চরিত্রের কোন অঙ্গ পবিস্ফুট হয় নাই। বিদ্যা ও সুন্দরের কামোন্মত্ততা ক্ষণস্থায়ী ইতর-প্রকৃতি-সুলভ উত্তেজনার ফল,—উহা চরিত্রের বিকাশ দেখায় না। বিদ্যার রূপ বর্ণনায় রূপবতীর রূপ অপেক্ষা কবির লেখনীলীলার দৌড় বেশী প্রদর্শিত হইয়াছে। সুন্দরের রাজ সভায় বক্তৃতায় ও কেবল শব্দ লইয়া ক্রীড়া,—তাহাতে সুন্দরের চরিত্র খুঁজিলে অতিশয়োক্তির একটি নিবিড় ছায়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। মশানে যখন সুন্দরের শিরোর্ধ্বে কোটালের খরশাণ খর্গ উন্মিত, তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে অভিধান খুঁজিয়া চণ্ডী শব্দের প্রতিশব্দ বাহির করিতেছিলেন, অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার এই প্রাণান্ত অমুরাগ দৃষ্টে,—বিপদজালবেষ্টিত গণিতে ঘোর নিবিষ্ট-চিত্ত জ্ঞানপন্থী আর্কমিডাসের কথা মনে হয় ; হর্ষচরিতে পড়িয়াছি, আসন্ন মৃত্যু রাজা জর বিকারগ্রস্ত হইয়া “হারং দেহিমে হরিণি” প্রভৃতি ভাবে কেবল যমক মিলাইতেছেন, শিক্ষা-স্পর্শিত কবিগণ বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইবার ব্যস্ততায় বাহুজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, মশানে পতিত সুন্দরকে দিয়া ও ভারতচন্দ্র সেই রূপ সময়ানুচিত অলঙ্কার শাস্ত্রের অভিনয় করিয়াছেন। সুন্দরের স্তবে ভক্তির কথা দ্রলভ—নিপিশক্তির পরিচয় সুলভ। সুন্দর ধরা পড়িলে বিদ্যা বিনাইয়া কাঁদিতে বসিল, তাহার ক্রন্দনে চকুজল ব্যতীত সকলই ছিল—ছন্দের প্রতি সাবধানতা বিশেষ ; রাম-প্রসাদী বিদ্যা সুন্দরের রাণী ও তাহার গর্ভবতী কথার শ্লেষপূর্ণ উত্তর পড়িয়া বিজয়গুপ্ত বর্ণিত পূর্বদেশীয় বর্করগণের কথা মনে হইয়াছিল—“জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠভায়া সব করে ঠাট্টা। ব্রাহ্মণ সজ্জন তারা বৈসে চর্মকাটা।” রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর হইতে সেই অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি—

‘‘আলো গর্ভের লক্ষণ সর্ব্ব। বিদ্যাবলে বাতাসে কি জন্মে গর্ভ। আলো উদয় ডাগর
তোর। বিদ্যা বলে উদয়ী হয়েছে মোর। আলো স্থানে কেন করে পয়। বিদ্যা বলে
এ রোগে বাচা সংশয়। আলো শয়ন কেন ভুলে। বিদ্যাবলে নিরন্তর দেহ জলে।
আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘৃষ্ম। বিদ্যাবলে নিদাঘ কালের ধর্ম্ম।’’ এই ‘‘মা ও মেয়ে’’
গ্রন্থনের আর অধিক উদ্বাটিত করিতে লজ্জা বোধ হয়।

বিজ্ঞাতীয় আদর্শ অনুসরণ করার দরুণই হউক কি অথ যে কোন
কারণেই হউক, বিদ্যা ও স্বন্দরের চরিত্র অস্বাভাবিক হইয়াছে; কিন্তু
ভারতচন্দ্র হীরামালিনীকে মূর্তিমতী করিয়াছেন, এই চরিত্রের ভাব কত-
কটা তাঁহার স্বীয় প্রতিভার অনুরূপ, বিশেষ হীরা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের
শ্রেষ্ঠ চরিত্র রূপে কল্পিত না হওয়াতে, কবি তাহাকে উপলক্ষ করিয়া
বাক্জাল বিস্তার করা আবশ্যক মনে করেন নাই; শিক্ষিত কবির চেষ্টার
হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া হীরামালিনী স্বভাবের বর্ণে খাড়া হইয়াছেন,
বিদ্যার রূপ বর্ণনায় কবির প্রাণান্ত চেষ্টাজালে খাটি মূর্তি ঢাকা পড়িয়া
গিয়াছে, তৎপার্শ্বে হীরার রূপবর্ণনা স্থাপন করিলে পাঠক তারতম্য
করিতে পারিবেন—‘‘সুখা যায় অন্তঃসিঁরি আইসে ঘামিরা। হেন কালে তথা এক
আইল মালিনী। কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম। দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাশু
অবিরাম। গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে। কাণে কড়ি কড়েরাড়ি কথা কয়
হলে। চুড়া বাঁধা চুল পরিধান সাদা সাদী। ফুলের চূপড়ি কাঁখে দ্বিজে বাড়ী বাড়ী। আছিল
বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে। এবে বুড়া তবু কিছু গুড়া আছে শেষে। ছিটা কৌটা মস্ত তস্ত
জানে কত গুলি। চেষ্টা ভুলায়ে খায় জানে কত ঠুলি। বাতাসে পাতিয়া কাঁদ কোন্দল
ভেজায়। পরসী না থাকে কাছে কোন্দলের দায়। মন্ড মন্ড গতি ঘন ঘন হাত নাড়া।
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সেই পাড়া।’’

নানা দোষ সত্ত্বে ও ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর এত আদরণীয় হইল
কেন, তাহার কারণ আমরা পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি—ভারতচন্দ্রের অপূর্ণ
শব্দমন্ত্র। বাঙ্গলা পৃথিবীর কোমলতম ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু
এই কোমলতার কিরূপ আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর
না পড়িলে সম্যক উপলব্ধি হইবে না; বাঁশীর রবে হরিণ কাঁদে পড়ে,
হাতী কাঁদায় মগ্ন হয়, ভারতচন্দ্রের ললিত শব্দে মুগ্ধ হইয়া এক সময়
বুবকগণ নৈতিক রূপে পড়িয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী আর দুই খানা বাঙ্গলা বিদ্যাসুন্দর পাওয়া

গিয়াছে, তাহাতে ভারতের পদলালিত্য ও অপূৰ্ণ শব্দ মন্ত নাই, কিন্তু দোষগুলি সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান। এই দুই খানা বিদ্যাসুন্দর-প্রণেতা—কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ। প্রাণরাম নামক এক কবি ভারত-চক্রের পর আর এক খানা বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়েকটি কথা আছে—“বিদ্যাসুন্দরের এই প্রশম বিকাশ। বিরচিত কৃষ্ণরাম নিমতা বার বাস। তাঁহার রচিত পুঁথি আছে ঠাই ঠাই। রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই। পরেতে ভারতচক্রের অল্পদা মঙ্গলে। রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে।”

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, এই অবলম্বন অর্থে এক রূপ চৌর্য্য বৃত্তি। কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষে ইহা দোষ নহে, প্রতিভার কণ্ঠের গুঢ় স্রাবিয়া দেখিলে তাহা সংগ্রহ কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়—প্রতিভাবান ব্যক্তি উৎকৃষ্ট সংগ্রাহক নাম বাচ্য। প্রকৃতিতে ও নূতন সৃষ্টি কিছু দেখা যায় না, শুধু পল্লবের স্থলে নূতন পল্লবটির উৎপত্তি হইতেছে—উহা অতীতের পুনরাবৃত্তি মাত্র। পূৰ্ব্ববর্তী বিদ্যাসুন্দর গুলির ভাব ও ভাষা ঘষিয়া মাজিয়া ভারতচন্দ্র সুন্দর করিয়াছেন; দোমেটে মূর্ত্তির পর রং ফিরান মূর্ত্তি বেক্রপ দেখায়, পূৰ্ব্ববর্তী বিদ্যাসুন্দর গুলির পরে ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর ও ঠিক সেইরূপ দেখাইবে—নিম্নে তুলনার জন্ত কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

১। কহে এক মতী, সেই ভাগবতী, সুন্দর এ পতি বার লো ঘটে। ছবর মাঝারে, রাখিয়া ইহারে, নয়ন ছয়ারে কুলুপ দিয়া। রূপ নহে কালো, নিরখিতে ভাল, দেখে সখি আলো আঁখি মুদিয়া। কহে রামা আর, গলে পরি হার, এ হার কি ছার, কেলিলো টেনে। সাধ পুরে তবে, হেন দিন হবে, কোন্ জন কবে ঘটাবে এন। কহে কোন আই, আমি যদি পাই, পালাইয়া বাই, এ দেশ থেকে। নারী কলা কাঁদে, বাধি নানা ছাঁদে প্রাণ বড় কাঁদে, সেনালো ডেকে।” রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর, নাগরী উক্তি।

২। “আহা মরি বাই, লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে। কহে এক জন, লয় মোর মন, এ নবরতন জুবন মাঝে। বিরহে স্রাবিয়া, সোহাগে গুলিয়া হারে মিলাইয়া পরিলো সাজে। আর জন কর, এই মহাশয়, চাঁপা কুলমর ঘোঁপার রাধি। হলুদী জিহ্বা, তমু চিকনিয়া, মেহেতে ছানিয়া কদরে মাখি।” ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর নাগরী উক্তি।

৩। “ছুকিল কুন্তল শিশু মুখেলু হুধায়। লুপ্ত পাত্ত ভ্রমরাজ মেহে দেখা যায়। নাতিপল্ল পরিহারি মস্ত মধু পান। ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ কুন্ত হান। কিবা লোম

রাজি হলে বিধি বিচক্ষণ। যৌবন কৈশোর বয়স করিল ভ্রমণ।” “কোন বা বড়াই কাম পক্ষ শয় তুণে। কত কোটি বর শর সে নয়ন কোণে।” বিদ্যার রূপ বর্ণনা, রামপ্রসাদী বিদ্যাহন্দর।

২। “কাড়ি নিল জগ মদ নয়ন হিন্নোলে। কাঁদে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে। মাতিপদ্মে যেতে কাম কুচশঙ্কু বলে। ধরিল কুন্তল তাঁর রোমাবলী ছলে।” “কে বলে শারদ শশী সে মূর্খের তুলা। পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলি।” “কেবা করে কাম শরে কটাক্ষের সম। কটুতার কোটি কোটি কালকূট কম।” ভারতচন্দ্রের বিদ্যাহন্দর বিদ্যার রূপ বর্ণনা।

৩। উত্তম ঘটক হুন্দরের গাঁথা হার। বর কর্তা কস্তা কর্তা চিত্ত দোহাকার। পুরোহিত হইলেন আপনি মদন। বিদ্যালাপ ছলে বুদ্ধি পড়ালো বচন। উলু দিছে ঘন ঘন পিক সীমন্তিনী। নয়ন চকোর হুখে নাচিছে নাচনী। বরযাত্র মলয় পবন বিশ্ববর। মধুকরনিকর হইল বাদ্যকর।” “উত্তরত কুটুম্বরসনা ওঠাধর। পরস্পর ভুঞ্জে হৃদা মুখেন্দ্র উপর।” “মুপুর কিঙ্কিনী জালে নানা শব্দ হয়। দুই দলে বন্দ যেন চন্দন সময়।” “সজীক আইল কাম দেখিতে কোতুক। দম্পতীরে পক্ষশর দিলেক যোতুক।” গন্ধর্ব্ব বিবাহ, রামপ্রসাদী বিদ্যাহন্দর।

৩। বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার। গন্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার। কস্তাকর্তা হৈল কস্তা বরকর্তাবর। পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পক্ষশর। কস্তা যাত্র বর যাত্র ঐতু ছয় জন। বাদ্যকরে বাদ্যকর কিঙ্কিনী ককন। নৃত্যকরে বেশরে নুপরে গীত গায়। আপনি আসিয়া রতি এয়া হৈল তায়। দিক দিক অধিক আছিল সখী ভায়। নিখাস আতনবাজি উত্তাপে পসায়। নয়ন অধর কর জবন চরণ। দুহার কুটুম্ব হুখে করিছে ভোজন।” গন্ধর্ব্ব বিবাহ, ভারতচন্দ্রী বিদ্যাহন্দর।

৪। “কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিছু চাই। রাজ্যবলে কাট চোরে মশানে বাধাই। আঁখি ঠেরে আরবার করে নিবারণ।” রাজসভার হুন্দর, রামপ্রসাদী বিদ্যাহন্দর।

৪। “চাহে কাটিতে কোটাল চাহে কাটিতে কোটাল। নয়ন ঠারিয়া মানা করে নহীপাল।” ভারতচন্দ্রী বিদ্যাহন্দর।

৫। “অঙ্কুর চন্দন চুরা চাইতে চাইতে। চক্ষু ঠিকরিয়া যায় আছে কি পাইতে। জায় কল লবঙ্গ প্রসাদ মাত্র নাই। আনিয়াছি কিন্তু কিছু বলি আমি তাই।” মালিনীর বেসাতি, কৃষ্ণরামের বিদ্যাহন্দর।

৫। আটপাণে আঁধসের আনিয়াছি চিনি। অস্ত্র লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি। দুর্লভ চন্দন চুরা লজ জায় কল। হস্ত দেখিহু হাটে নাহি যায় কল।” ভারতচন্দ্রী বিদ্যাহন্দর।

৬। “বুঝিয়া বিদ্যার মনে বাড়িল আস্থাদ। হেনকালে সঙ্গ করিল কেবানীর।

হুন্দর কেমন কবি বৃত্তিতে পঞ্জিগী। সখীরে জিজ্ঞাসা করে কি ডাকে স্বপ্ননি।" প্রথম মিলন—কৃষ্ণরামের বিদ্যাহুন্দর।

৬। "হেনকালে ময়ূর ডাকিল গৃহপাশে। কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে।" ভারতচন্দ্রী বিদ্যাহুন্দর।

কৃষ্ণরামের হাতে বিদ্যাহুন্দর এক মেটে, রামপ্রসাদের হাতে দোমেটে ও ভারতচন্দ্রের হাতে বিদ্যাহুন্দরের রং ফিরান হইয়াছিল। কংস সভায় শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিতে গেলে তৎপ্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র লিখিয়াছিলেন— "কংসের গায়ন যারা, যে বীণা বাজায় তারা, বীণা যে গোবিন্দ শুন গায়।" কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বীণায় যে গান উদ্ভিত হইয়াছিল, তদ্বারাও সেইরূপ পদার্পণমাত্র অতুল দৌভাগ্যশালী ভারতচন্দ্রের শ্রুণ কথাই জ্ঞাপিত হইল; পূর্ববর্তী কবিদ্বয় আশ্রয় প্রশংসা বঞ্চিত হইয়া নিঃশব্দে শ্মশানে স্তম্ভ হইলেন ও সমালোচকগণের জন্ত এই নীতি সূত্র ফেলিয়া গেলেন,—ভাগ্য বৃক্ষই সর্বত্র ফল ধারণ করে, পরিশ্রম অনেক সময় কাঁটা বনের আশ্রয় পদতল ক্ষত বিক্ষত করে মাত্র। আমরা এস্থলে কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের জীবন সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কবি কৃষ্ণরাম দাস অনুমান ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতা হইতে চারি ক্রোশের মধ্যে বেলঘরিয়া ষ্টেশনের আধ ক্রোশ পূর্বে নিমতা গ্রামে কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার পিতার নাম ভগবতীচরণ দাস। ১৬৮৬ খৃঃ অব্দে তিনি এক দিবস এক গোয়ালের ঘরে রজনী অতিবাহিত করেন, সেই রজনীতে ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে চড়িয়া দক্ষিণ রায় নামক দেবতা তাঁহাকে তৎসম্বন্ধীয় কাব্য রচনা করিতে স্বপ্নে আদেশ দেন, আমরা "রায় মঙ্গল" হইতে সেই অংশ ৬০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি। এই কাব্য রচনার পর কবি বিদ্যাহুন্দর রচনা করেন, ইহা তাঁহার কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণরাম কবির বিদ্যাহুন্দরের যে হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছেন, তাহা ১১৫৯ সালের লেখা; এই পুঁথি লিখার সময় ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাহুন্দরের রচনা শেষ হয় নাই,—সম্ভবতঃ কৃষ্ণরামের কাব্য ভারতচন্দ্রী বিদ্যাহুন্দরের ৪০।৫০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। কবি কৃষ্ণরাম চৈতন্যোপাসক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, তিনি চৈতন্য বন্দনায় লিখিয়াছেন—“যথায় কীর্তন হয় চৈতন্য চরিত্র। বৈকুণ্ঠ সমান ধাম পরম পরিভ্র। তাহে গড়াগড়ি

দেয় (বেঁা) প্রেমে নৃত্য করে। জীবন স্বকৃতি তার খস্ট দেহ ধরে। হেলায় ঐচ্ছায় জীব
কঠী ধরে স্বত। তাহা সবাকারে মোর প্রণাম শত শত।” *

বৈদ্যবংশোদ্ভব রামপ্রসাদ সেন হালিসহর অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রামে ১৭১৮-
১৭২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম
রামরাম সেন, † রামরাম সেনের দুই বিবাহ; প্রথম পক্ষে নিধিরাম
নামক পুত্র, ও দ্বিতীয় পক্ষে অম্বিকা ও ভবানী নামী কন্যা দুয় এবং রাম-
প্রসাদ ও বিশ্বনাথ পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা নিবাসী লক্ষ্মী-
নারায়ণ দাসের সঙ্গে রামপ্রসাদের দ্বিতীয় ভগ্নী ভবানীর পরিণয় হয়,—
এই ভগ্নীর দুই পুত্র জগন্নাথ ও রূপারামের নাম কবি উল্লেখ করিয়াছেন।
রামপ্রসাদের রামচন্দ্র ও রামমোহন নামে দুই পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও
জগদীশ্বরী নামী দুই কন্যা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কবি তাঁহার পিতামহ
রামেশ্বর ও বংশের আদি পুরুষ কৃতিবাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন;
আমরা তাঁহার কাব্যে আরও জানিতে পাই যে রামপ্রসাদের পূর্ব পুরুষগণ
ধনাঢ্য ও প্রসিদ্ধ ছিলেন;—“শিশুকালে মাতা মৈল রাজা নিল চোরে” বলিয়া
কবি আক্ষেপ করিয়াছেন। কবির প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রালের বংশ ফৌজ
হইয়াছে। দ্বিতীয় পুত্র রামমোহনের পৌত্র ও কবির বৃদ্ধপ্রপৌত্র
বাবু কালীপদ সেন এখনও বর্তমান; কালীপদ সেন উড়িষ্যার অন্তর্গত
আঙ্গুলে ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম করিতেছেন। গত দশ বৎসর হইতে
হালি সহরে কবির জন্মতিথিতে মেলা হইয়া থাকে। রামপ্রসাদ সেন
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের সমসাময়িক, এই গুণজ রাজা ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে
রাম প্রসাদকে ১০০/ বিঘা ভূমি নিষ্কর দান করেন, তাহাতে লেখা আছে,—
“গর আবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ।”
যে বৎসর ইংরেজগণ পলাশীক্ষেত্রে জাতীয় সৌভাগ্যধ্বজ প্রথম উত্তীর্ণ
করেন, তাহার এক বৎসর পরে এই দানপত্র লিখিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র অনেক সময়
কুমারহট্টে আসিতেন, তিনি রামপ্রসাদকে ‘কবিরজন’ উপাধি দিয়াছিলেন
ও তাঁহাকে রাজসভায় আনিতেন আগ্রহ দেখাইতেন, কিন্তু বিষয়-নিম্প্ৰহ

* ত্রিযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের “কবি কুঙ্করাম” শীর্ষক প্রবন্ধ, সাহিত্য ১৩০০ সন,
২য় সংখ্যা, ১১৭ পৃঃ

† “রাম রাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম, সদা যারে সদয় অভয়া। তৎসত্ত্ব রাম
প্রসাদে, কহে কোকনদপদে, কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া।” কবিরজন।

কবি স্বীয় গল্পীতে বসিয়া শ্রামা সংগীত গানে নিজে মুগ্ধ থাকিতেন ও পরকে মুগ্ধ করিতেন, তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের অমুরোধ পালন করেন নাই। কবি লিখিয়াছেন কুমারহট্টে রামকৃষ্ণের মণ্ডপে তিনি সিন্ধি কামনায় যোগ করিতেন কিন্তু কোন দৈব ঘটনা হেতু সম্পূর্ণ সিজিলাভ করিতে পারেন নাই। এবিষয়ে তাঁহার জীব ভাগ্যবল তাঁহার নিজ অপেক্ষা বেশী ছিল বলিয়া কবি বারংবার উল্লেখ করিয়াছে,—“ধন্য দারা, যশে তারা প্রত্যাশে তারে। আমি কি অধম এত বিমুগ্ধ আমারে ॥ জন্মে জন্মে বিকারেছি পাদ পদ্মে তব। কহিবার কথা নহে সে কথা কি কব ॥”

কথিত আছে রামপ্রসাদ জনৈক ধনী ব্যক্তির সেরেস্তায় মুহুরিগিরি করিতেন, জমিদারী সেরেস্তার হিসাবের জঙ্গলে পড়িয়া কবি মধ্যে মধ্যে হিসাব পত্রের ধারে ছোট একটি গান লিখিয়া শ্রম লাঘব করিতেন; একদিন জমিদার মহাশয় সেরেস্তা পরিদর্শনের সময় মুহুরির হিসাবের খাতায়,—“আমায় দে মা তবিলদারী। আমি নেমক হারাম নই শকরী ॥” প্রভৃতি পদ পড়িয়া চমৎকৃত হইলেন, ও কবিকে ৩০ টাকা পেমন্স দিয়া ঘরে যাইয়া শ্রামা সংগীত লিখিতে উপদেশ দিলেন। তদবধি কবি কুমারহট্ট গ্রামে তাঁহার সংগীত মুক্তাবলী ছড়াইতে লাগিলেন, শিকলকাটা পাখীর ন্যায় কবি প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রত্যাভর্জন করিয়া সুধামাধা গানে জগতকে সুধী করিলেন।

প্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন আর একজন ধনী ব্যক্তি তাঁহাকে কাব্য লিখিতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, ইহার নাম রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়; ইনি কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের পিসা শ্রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন। কবি এই রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের আদেশে “কালীকীর্তন” রচনা আরম্ভ করেন; সে কথা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—“শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন। রচি গান মোহাঙ্কের ঔষধ অঙ্গন।” ভারতচন্দ্র ও এই রাজকিশোর মহাশয়ের গুণ জ্ঞাপক এক পংক্তি কথিত। লিখিয়াছেন,—“মুখরাজকিশোর কবির কলাধর।” (অন্নবান্ধব)। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর ৭ বৎসর পূর্বে, যে বৎসর রোহিলাদিগকে উৎসন্ন করিয়া ইংরেজ সৈন্ত প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন, সেই বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়।

কেহ কেহ বলেন রামপ্রসাদের রচিত ‘বিদ্যাসুন্দর’, তাঁহার ‘কালিকা-মঙ্গল’ের অন্তর্গত; এক্ষণ হওয়া বিচিহ্ন নহে, কারণ বিদ্যাসুন্দর কাব্য

সকল কবিই কালী নামাক্তিত মলাটে পুরিয়া শোধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দরের নাম 'কালিকামঙ্গল', ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর 'অন্নদামঙ্গলের' অন্তর্ভুক্ত; এইমত সম্পর্কে আমাদের একমাত্র ও অতি গুরুতর আপত্তি এই যে কালিকামঙ্গল পাওয়া যায় নাই। কালীকীর্তন ও কালিকামঙ্গল এক কাব্য বলিয়া বোধ হয় না; কালীকীর্তন একখানা গীতি কাব্য, ইহার মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের পালার স্থান নির্দিষ্ট থাকি সম্ভাবিত নহে।

রামপ্রসাদ কোন স্থলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কি তাঁহার পেন্সনদাতা জমিদার মহাশয়ের নাম উল্লেখ করেন নাই; রাজকিশোর মুখের আজ্ঞাক্রমে কালী কীর্তন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্মৃতাং বাধ্য হইয়া তাঁহার নামটি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অতি সংক্ষেপে ও অসম্পূর্ণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। যে সময় রায় গুণাকর প্রভৃতি কবিগণ আশ্রয়দাতা-দিগকে করনার স্বর্ণ খটায় স্থাপিত করিয়া স্বর্ণ মর্তের বাবতীয় উৎসাহ উপঢৌকন দিতেছিলেন, সেই সময়ে রামপ্রসাদের নীরব কৃতজ্ঞতা প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

রামপ্রসাদের গানের এক শত্রু ছিল, এই ব্যক্তি আজু গোসাঞি; ইনি রামপ্রসাদী গানের সময়ে সময়ে যে টিপ্পনী করিতেন তাহা বেশ হাস্যরস-কর, যথা রামপ্রসাদের গান "এ সংসার ধোকার টাটী। ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ওরে ক্রিতি বহি বায়ু জল শুষ্টে অতি পরিপাটী।" ইত্যাদি, তদন্তরে আজু গোসাঞির গান,—“এই সংসার রসের কুটী, খাই দাই রাজহে বসে মজা লুটি। ওহে সেন নাহি জ্ঞান, বুঝ তুমি মোটামুটি। ওরে ভাই বরু দারা হত পিড়ি পেতে দেহ দুখের বাটী।”

রামপ্রসাদের সঙ্গে সিরাজোদ্দলার সাক্ষাৎ এবং তাঁহার গান শুনিয়া নবাব বাহাদুরের অমুগ্রহ প্রকাশ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে; ধর্ম সম্বন্ধে কাহারও একটু প্রসিদ্ধি হইলে তৎসম্পর্কে কতকগুলি অমামুখী কাণ্ড কারখানার গুঞ্জব উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। কালী কন্যাক্রমে কবির বেড়া বাধিয়া দিয়াছিলেন, কাশীতে বাইতে অমুমতি দিয়া পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, কালী নাম করিতে করিতে ত্রন্দরদ্ধ ভেদ হইয়া তাঁহার তনুত্যাগ হয়,—এইসব জনশ্রুতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া ছাপাইতে অনেক সময় ও ব্যয়ের আবশ্যক, আমাদের তাহা এখন আরম্ভ নাই।

যাহারা কৃষ্ণচন্দ্র রাজার দ্বিতীয় কচির সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ স্বভাবতঃ ধর্ম প্রবণ সত্ত্বেও কথঞ্চিৎ সংক্রামিত না হইয়া যান নাই,—ইহার সাক্ষী রামপ্রসাদ। আমরা রামপ্রসাদের নিম্নলি ভক্তি বিহীনলতায় দুঃখ, তাঁহার উন্নত চরিত্রের সর্বদা পক্ষপাতী ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দরের বীভৎস কচির সমর্থন করিতে দাঁড়াইব না ; ভারতচন্দ্রের রচনা যে গহিত কচি দোষ ছুট, রামপ্রসাদ তাহার পথ প্রবর্তক। ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদ বীভৎস আদিরসে সৌন্দর্য্য মাখিতে পারেন নাই ; কিন্তু তাহা শান্তির অভাব জন্ত,—ইচ্ছার ক্রটিহেতু নহে।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের অপর নাম কবিরঞ্জন। কবিরঞ্জে রামপ্রসাদের সংস্কৃত বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় আছে, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার উত্তম পরিপাক হয় নাই ; বাঙ্গলা পদগুলির মধ্যে সংস্কৃত কথাস্থলির উত্তম সমন্বয় হয় নাই,—উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি স্থল তুলিতেছি,—“সহজে কলকী সে তবাস্ত সম নহে।” “জলে স্থলে চান্দরীকে।” “ক্ষেপ করে দশদিগু লোষ্ট্র বিবর্জনে।” “পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিবতি চকোর।” কালী কীর্তনে, “বারে বারে ডাকে রাণী জননী জাগৃহি জাগৃহি। আগত ভানু রজনী চলি যায়। উঠ উঠ প্রাণ গোঁরী, এই নিকটে গিরি, উঠগো এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি। হৃত মাগধ বন্দী, কুতাম্বলি কথয়তি, নিদ্রাং জহিহি জহিহি॥” এইরূপ সংস্কৃত পদের টেউ লাগিয়া বাঙ্গলা কাব্য কটু হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও রামপ্রসাদ সংস্কৃতের সাহায্য গ্রহণ করিতে যাইয়া উপহাস জনক অযোগ্যতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু রামপ্রসাদে যে স্থলে শিক্ষার অভিমান ত্যাগ করিয়াছেন,—সে স্থলে তিনি বাগ্‌দেবীর আদরের কবি ; তাঁহার গানে প্রাণের কথা সহজ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে ; এই যুগের শিক্ষিত সমাজের কচি বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইতে ব্যগ্র ছিল, এই ছুট কচির সংক্রামনে যখন রামপ্রসাদের ভ্রাতৃ ভাবপ্রধান কবিকে ও আমরা লোক মনো রঞ্জনার্থ শব্দ লইয়া বিফল ক্রীড়া করিতে দেখি, তখন আমাদের ইডেন গার্ডেনে এডাম এবং ইভের মনোরঞ্জনার্থ হস্তীর চেষ্টা মনে পড়ে—

“The unwieldy Elephant,

To make them mirth, used all his might, and wreathed

His little proboscis.” Paradise Lost Book IV.

রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের ভাষাকে অলঙ্কার পরাইয়া সুন্দরী করিতে চেষ্টা

করিয়াছেন, “গোষুগে গলিত ধারা তুলা নিষ্ঠাগত” প্রভৃতি ভাবের অল্পপ্রাস বন্ধন দেখিয়া মনে হয় যেন উন্নতা রাধিকার * ন্যায় তিনি পদের অলঙ্কার গলে ও কর্ণের দুল চুলে লাগাইয়াছেন, ভারতচন্দ্র সেইসব অলঙ্কার লইয়া ভাষাকে সাজাইয়াছেন, — একটু সাধারণ সৌন্দর্য্য বোধের অভাবে রামপ্রসাদের বিরাট চেষ্টা পণ্ড হইয়া গিয়াছে, সেই পণ্ড শ্রমের শ্রাসনে অদ্য ভারতচন্দ্রের যশোমন্দির উৎখিত হইয়াছে ।

কিন্তু শিক্ষার ধুমপটলের পুঞ্জীকৃত আঁধার ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে রামপ্রসাদ সুন্দর পদ গাঁথিবার পটুতা দেখাইয়াছেন, মেঘ-বিমুক্ত কিরণ-রাশির ন্যায় সেইসব স্থল তৃপ্তিপ্ৰদ ; আমরা, কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন হইতে দুইটি স্থল উঠাইয়া দেখাইতেছি,—

(১) “গিরিবর আর আমি পারি নাহে প্রবোধ দিতে উমারে । উমা কেন্দে করে অভিমান, নাহি করে স্তন পান, নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥ অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শলী বলে উমা ধরে দে উহারে । ক’দিয়া ফুলাল আঁখি মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে ইহা সহিতে কি পারে । আর আর মা মা বলি, ধরিয়া কর অঙ্গনী, যেতে চায় না জানি কোথারে ॥ আমি বলিলাম তার, চাঁদ কিরে ধরা বায়, ভূবণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥” কালীকীর্তন ।

(২) “প্রথম বয়সে রাই রসরঙ্গিণী । ঝলমল তমুরটি হির সৌদামিনী । রাই বদন চেয়ে ললিতা বলে । রাই আমার মোহন মোহিণী । রাই যে পণে প্রমাণ করে, মদন গল য ডরে, কুটিল কটাক্ষ শরে, জিনিল কুহুম শরে । কিবা চাঁচর স্নানর কেশ, সপি বকুলে বানাইল বেশ । তার গন্ধে অলিকুল, হইয়া আকুল, কেশে করেছে প্রবেশ । নব ভাসু ভালোতে বিকাশ । মুগপম্ব করেছে প্রকাশ ॥” কৃষ্ণকীর্তন ।

রামপ্রসাদ বৈষ্ণব বিদ্বেশী ছিলেন, বৈষ্ণব নিন্দায় একটু বিজ্ঞপ শক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,— “খাসা চীরা বহির্দাস রাজা চীরা মাখে । চিকন শুধড়ী গায় বাঁকা কোৎকা হাতে ॥ মুগ্ধ গুগ্ধ ছড়া গলে ঠাই ঠাই ছাব । দুই ভাই ভজে তারা হুটি ছাড়া ভাব ॥ পৃষ্ঠদেশে ঐশ্বর্য্যে বান সাত আট । ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠটি ॥ এক এক জনার ধুমড়ী দুটি দুটি । দুই চক্ষু

* “রাই সাজে, বাঁশী বাজে, না পড়িল উল, কি করিতে কিনা করে সব হৈল ভুল ॥ সুকুর আচরে রাই বাঁধে কেশ ভার, পদে বাঁধে ফুলের মালা না করে বিচার ॥ কয়েতে হুপূর পরে লব্ধ পড়ে তাড় । গসাতে কিঙ্কিণী পরে, কটিতে হার ॥ চরণে কাজল পরে নয়নে আলতা । হিয়ার উপরে পরে বন্ধ রাজশাভা ॥ অবশ্যে করয়ে রাই বেশর সাজনা ॥ নয়ন উপরে করে বেনীর রচনা ॥ বংশীদাসে বলে বাই বলিহারি : রাই অসুখাপের ঝালাই লয়ে নরি ॥”

লাল পাঁজা ধুনিবার কুটি । জুগলাদি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে । রীরভঙ্গ অশেষ
বিষম ডেকে উঠে । সে রসে রসিক নবশাক লোক যত । উঠে ছুটে পার পড়ে করে
দণ্ডবত । সমাদরে কেহ নিরা বার নিজ বাড়ী । ভালমতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি ।
গোষ্ঠীহৃদ খাড়া থাকে বাবাজির কাছে । মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে ।” বিদ্যাসুন্দর ।
কালীকীর্তনে রামপ্রসাদ মহাশয় কালী ঠাকুরাণীকে দিয়া নৃত্য করাইয়াছেন,
তঁাহার রাসলীলা ও গোষ্ঠ বর্ণনা করিয়াছেন ; তঁাহার আরাধ্যা দেবতা যে
কৃষ্ণের মত সকল কার্য্য করিতেই পারেন, কালীকীর্তন দ্বারা তিনি এই
তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; কালীর রাসলীলা ও গোষ্ঠ বর্ণনা পড়িয়া শান্ত
মহাশয়গণ অবশ্যই প্রীত হইয়াছিলেন কিন্তু আজ্জু গোসাঞি এই মধুরভাবে
একটু ঠাট্টার অন্ন নিক্ষেপ করিয়া তঁাহাদের গাঢ় রস সম্ভোগে বাধা
দিয়াছিলেন যথা,—“না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আম সব, মেয়ে হয়ে খেয় কি
চরায় রে । তা যদি হইত, যশোদা বাইত, গোপালে কি পাঠায় রে ।” স্ত্রী লোকের
যদি গোষ্ঠে বাইতে বিধান থাকিত, তবে স্নেহাতুরা যশোদা গোপালের
গোষ্ঠে সম্মত না হইয়া নিজেই বাইতেন । কৃষ্ণ কীর্তন সম্পূর্ণ পাওয়া
যায় নাই, যে ছই পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে তাহা বেশ মধুর ।

কিন্তু রামপ্রসাদের যশ কাব্য রচনার জন্ত নহে, তিনি গান রচনা
করিয়া এক সময় বঙ্গদেশে মাতাইয়াছিলেন, তাহাতে কালীদেবী স্নেহময়ী
নার ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন, কবি মাসম্বল শিশুর ন্যায় মধুর গুণ গুণ
স্বরে কখনও তঁাহার সহিত কলহ করিতেছেন, কখনও মায়ের কর্ণে সুধামাখা
স্নেহ কথা বলিতেছেন ; জননীর ক্ষিপ্ত ছেলের মত কখনও মাকে গালি
দিতেছেন—সেই কপট গালি স্নেহ, ভক্তি ও আত্ম সমর্পনের কথা মাথা,—
এখানে রামপ্রসাদ সংস্কৃত ব্যুৎপন্ন কবি নহেন, এখানে তঁাহার ধূলিধূসর
নেংটা শিশুর বেশ,—শিশুর কথা ; তাহা পণ্ডিত ও কৃষ্ণকের তুল্য বোধগম্য
তাহাদের সরল অশ্রুপূর্ণ আবদারে সাধকের কণ্ঠ প্রতিপন্ন হয় । আমরা
গীতি শাখায় এই গানের বিষয় আবার সংক্ষেপে আলোচনা করিব ।
রামপ্রসাদ তঁাহার বিদ্যাসুন্দরে লিখিয়াছিলেন,—“এই বাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত”
তঁাহার রচিত কাব্য প্রকৃত পক্ষেই ভারতচন্দ্রের দ্বারা ভগ্ন হইয়া আজ
ধূলার গড়াগড়ি বাইতেছে,—তিনি তাহা ফেলিয়া গানে ব্যস্ত হইয়াছিলেন,
বঙ্গের লোকগণ ও কাব্য ফেলিয়া তঁাহার গান গুলি লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিল,—
“বাদশী ভাবনা যত সিদ্ধিভবতি তাদৃশী ॥”

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অনুমান ১৭১২ খৃঃ অব্দে ভূরহুট পরগণা হুগলীর অন্তর্গত পেঁড়ো বসন্তপুরগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণরায় ভূরহুটের জমিদার ছিলেন, তিনি রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। কথিত আছে কোন ভূমি সংক্রান্ত সীমা নির্ণয়ের তর্ক উপলক্ষে নরেন্দ্র নারায়ণ রায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের মাতা মহারানী বিষ্ণু কুমারীর প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করেন। মহারানী এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া আলমচন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্র নামক রাজপুত সেনাপতিদ্বয়কে নরেন্দ্র নারায়ণের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন, তাহারা বহুসৈন্য লইয়া নরেন্দ্র রায়ের অধিকারস্থ ‘ভবানীপুরগড়’ ও ‘পেঁড়োরগড়’ প্রভৃতি স্থান বলশূন্যক দখল করিয়া লয়।

নরেন্দ্র রায় ইহার পর অতি দরিদ্র হইয়া পড়িলেন; ভারতচন্দ্র তাঁহার মাতুলালয় ‘নাওয়াপাড়া’ গ্রামে যাইয়া তাজপুরস্থ টোলে কিছুকাল সংস্কৃত পড়িলেন ও অবশেষে মণ্ডলঘাট পরগণার সারদাগ্রামে কেশরকুনি আচার্য্য-দিগের বাড়ীর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতা মাতা ও ভ্রাতাপণ এই বিবাহে তাঁহার উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন, বিবাহের সময় তাঁহার ১৪ বৎসর মাত্র বয়স ছিল। গুরুজন দ্বারা তিরস্কৃত অভিমানী কবি প্ৰহত্যাগ করিয়া হুগলীর অন্তর্গত দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সী নামক জনৈক ধনাঢ্য কায়স্থের শরণাপন্ন হন, তাঁহার আশ্রুকুল্যে তিনি ফার্সি শিক্ষা করেন; এই মুন্সী মহাশয়ের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজোপলক্ষে পঞ্চদশ বর্ষীয় কবি স্বরূপ ‘সত্যপীরের কথা’ পাঠ করিয়া উপস্থিত শ্রোতাগণকে মুগ্ধ করেন; এই সময় তিনি হুইখানা সত্যপীরের উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একখানা চৌপদী ছন্দে রচিত হইয়াছিল, এই গুণির শেষে সময় নির্দেশ করা আছে,—“ব্রত কথা শাস্ত্র পার সনে রত ডোঙা।” অর্থাৎ ১১৩৪ সাল (১৭২৭ খৃঃ)। ইহার পরে ভারতচন্দ্র পুনরায় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, এবার তাঁহার পিতা মাতা ও ভ্রাতাপণ তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে নরেন্দ্র রায় পুনশ্চ বর্দ্ধমানাধিপতি হইতে কিছু জায়গা ইজারা লইয়াছিলেন, ভারতচন্দ্র রাজস্বাদি যথোপযুক্ত সময়ে রাজসরকারে প্রদান করিতে উপদিষ্ট হইয়া বর্দ্ধমান প্রেরিত হইলেন, কিন্তু তথায় আকস্মিক কোন গোলযোগে পড়িয়া কারাক

হন। কারা হইতে কোশলে উদ্ধার পাইয়া ভারতচন্দ্র ত্রীক্ষেত্রে গমন করেন, তথায় শিবভট্ট নামক সুবাদারের অহুগ্রহে পাণ্ডাগণের কর হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিনা মূল্যে প্রতিদিন এক একটি ‘বলরামী আটকে’ প্রাপ্ত হন; এই সময়ে তাঁহার বৈষ্ণব ধর্মে অনুরাগ জন্মিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু তাঁহার লেখায় সেই অনুরাগ মধ্যে মধ্যে একটি গুণ্ঠচাপা প্লেবে পরিণত হইতে দেখা যায়,—“চল যাই নীলাচলে। বাইয়া এসাদ ভাস্ত, মাথায় মুছিব হাত, নাচিব গাইব কুতুহলে।” এই লেখায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ তীর্থের প্রতি কবির বেশ একটু সম্ভ্রমপূর্ণ পরিহাস খেলিয়াছে। যাহা হউক কবি বৈষ্ণবধর্মের প্রতি এতদূর রূপালু হইলেন যে, তিনি বৃন্দাবন যাইয়া বৈরাগী সাজা ঠিক করিলেন, পথে হগলীস্থিত খানাকুল গ্রামে শ্রাণী-পতির বাড়ী, এই মহাশয় নবীন সন্ন্যাসীকে ফিরাইয়া আনিলেন; অতঃপর বৃন্দাবন না যাইয়া কবি শনৈঃ শনৈঃ পদব্রজে স্বীয় স্বস্তরবাড়ী সারদা গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

কিছুকাল স্বস্তরবাড়ীতে থাকিয়া ও তাঁহার জীকে সেস্থান হইতে নিজ বাটিতে পাঠাইতে নিষেধ করিয়া, কবি ফরাশভান্ডার উপস্থিত হন; তথায় বিখ্যাত দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের শরণাগত হইয়া কতকদিন অতিবাহিত করেন। এই ব্যক্তি ভারতচন্দ্রকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ৪০ টাকা বেতনে সভা কবি নিযুক্ত করেন, এই রাজসভায় তাঁহার উজ্জল প্রতিভার বিকাশ পায়, কিন্তু তাহা ব্যভিচারী হয়—তাঁহার চণ্ডী-পূজার মঠ স্বরূপ বিদ্যাসুন্দরের পালা বিরচিত হয়, ও তাঁহার বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুরাগ কতকগুলি স্নিগ্ধমধুর প্লেষাত্মক ধূয়াতে পরিণত হইয়া যায়। বৃন্দাবনের পথক্ষেপ্তা কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা আরম্ভ করেন, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ পুস্তক শেষ হয়; ইতিমধ্যে রাজা কবিকে মূলাযোড়গ্রাম ইজারা দিয়া তাঁহার বাটী নিৰ্ম্মাণ সজ্জা আশুকূলা করেন, কিন্তু সেইস্থান কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজকে শীঘ্রই বর্দ্ধমান রাজ্যের কর্মচারী রামদেব নাগের নিকট পত্তনি দিতে হয়; এই নাগ মহাশয়ের অত্যাচার সহ্য করিয়া কবি যাত্ৰা সুন্দর নাগাষ্টক রচনা করেন, এই সংস্কৃত কবিতাটির একদিকে হাসি, অপর দিকে কান্না, উহা অন্ন মিষ্ট; কৃষ্ণচন্দ্র উহা পড়িয়া হাসি রাখিতে পারেন নাই

এবং দয়ালু হইয়া কবিকে অননরপুরের গুপ্তে গ্রামে ১০৫/ বিঘা এবং মুলাঘোড়ে ১৬/ বিঘা ভূমি নিষ্কর প্রদান করেন। ৪৮ বৎসর বয়সে ১৭৬০ খৃঃ অব্দে, পলাশী যুদ্ধের তিন বৎসর পরে, মহাকবি ভারতচন্দ্র বহুমুখ রোগে প্রাণত্যাগ করেন; কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ তাঁহার প্রিয় কবিকে “রায় গুণাকর” উপাধি দিরাছিলেন।

রায় গুণাকরের ‘অন্নদামঙ্গল’ তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ; এই অন্নদামঙ্গল তিনভাগে বিভক্ত; প্রথমভাগে দক্ষযজ্ঞ, শিব বিবাহ, বাসের কাশী নির্মাণ, হরিহোড়ের বৃতান্ত, ভবানন্দের জন্ম বিবরণ প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে, দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসুন্দের পালা, ও তৃতীয় ভাগে মানসিংহ কর্তৃক যশোরবিজয়, ভবানন্দ মজুমদারের দিল্লী গমন, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত তর্ক, দিল্লীতে প্রেতাধিকার ও ভবানন্দ মজুমদারের দেশে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। অন্নদামঙ্গল ছাড়া তিনি রসমঞ্জরী, অসম্পূর্ণ চণ্ডী নাটক, ও বহু সংখ্যক হিন্দী বাঙ্গলা ও সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

আমরা ভারতচন্দ্রের কবিতা ভাবের গুরুত্ব হিসাবে অতি নিকৃষ্ট মনে করি; বিদ্যাসুন্দের সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি; অপরূপ কাব্যোৎকর্ষ কবি জীবনের কোন গুঢ় সমাত্মা কি কঠোর পরীক্ষা উদ্ঘাটন করিয়া উন্নত চরিত্র বল দেখান নাই; ‘নিবাত নিষ্কম্পদীপ শিখার’ ন্যায় মহাযোগী মহাদেবকে ভারতচন্দ্র একটা বাদিমার মত খাড়া করিয়াছেন, শিশুগুলি তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে,—“কেহ বলে জটাইতে বার কর জল। কেহ বলে জাল দেখি কপালে অনল। কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া। ছাই মাটি কেহ ঈশ দেয় ক্লোইয়া।” শ্রদ্ধাস্পদ মহাদেব মহাশয়ের এই অবমাননা একজন শিষ্যশক্তি উপাসক কবির যোগ্য হয় নাই। তারপর নারদ ঋষি কলহের দেবতা, ঢেকি বাহণে আসিয়া সাপের মস্ত বকিতেছেন, যে নারদের নাম শুক প্রহ্লাদ হইতে উচ্চে, তাঁহার এই ভূগতি দেখিয়া ভাগবতগণ কবিকে প্রশংসা করিবেন না। মেনকা উমার মা, ইনি বঙ্গের স্বরের আদর্শ জননী; যশোদা ও মেনকার অক্লান্ত অপরূপতা স্নেহে বঙ্গের স্নেহাতুরা মাতাগণের প্রাণের ব্যগ্রতা একটি নির্মল স্বর্ণভাবে উন্নীত হইয়াছে, ভারতচন্দ্রের হস্তে মেনকা চিত্র কি বিকটরূপ ধারণ করিয়াছে দেখুন,—

“যদি গিরে মহাক্রোধে তাজি লাজ ভয় । হাত লাড়ি থলা তাড়ি ডাক ছেড়ে কর ।
ওরে বুড়া অঁটকুড়া নারদ অঙ্করে । হেনবর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে ॥” যাহা
হউক, স্বর্ণের উচ্চ আদর্শের সন্নিহিত না হইলেও ঘরের কতকগুলি দুঃখচিত্র
এইসব দেববর্ণন উপলক্ষে চিত্রিত হইয়াছে ; “উমার কেশ চামর ছটা, আমার
শলা বুড়ার জটা । উমার মুখ চাঁদের চুড়া । বুড়ার দাঁড়ী শনের লুড়া ॥” কিম্বা ‘আমার
উমার দন্ত মুকুতা গঞ্জনা । বায়ে লড়ে ভান্সা বেড়া বুড়ার দর্শন’ প্রভৃতি পাঠ করিলে
মনে হয় দ্বিতীয়ার শশীকলার ন্যায় সুন্দরী কুমারীগণ সামাজিক অত্যাচারে
বুড়া দাঁত লড়া স্বামীর হাতে পড়িয়া যে বিষদৃশ খেলার অভিনয় করিত,
কবির চক্ষে সেই চিত্রের পূর্ণভাব বিরাজ করিতেছিল, তাই তিনি শিব প্রসঙ্গকে
আশ্রয় করিয়া সমাজের এক অধ্যায় উন্মোচন করিয়াছেন । পিতামাতা
কিন্তু অর্থ পাইয়া অনেক সময় “বাঘ ছাল দিয়া বস্ত্র, দিয়া পৈতা কনী” বলিয়া
দাঁত লড়া বরের নব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতেন ।

শিব-পার্বতীর কলহের আরম্ভে,—“ওনি নি বিদ্রোহী জয়া বুড়াটির খোল ।
আমি যদি কই তবে হবে গওঃগাল ॥” হইতে ত্রিশিবের পরাজয়-সূচক—“তবানী
কটুভানে, লক্ষা হৈল কুস্তিবাগে, সুধানলে কলবর দহে ॥ বেলা হৈল অতিরিক্ত, শিল্পে
হৈল থলা তিক্ত, বুদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে ॥” ইত্যাদিরূপ ব্যাপারটিতে দরিদ্র স্বামী
ও পাকাগিল্লির নিত্য গৃহ কান্নার অভিনয় প্লেব ও বিক্রমের বর্ণে ফলিয়া
বড় সুন্দর হইয়াছে । এই ভাবের আরও অনেক দৃষ্ট কবির তুলিতে
উৎকৃষ্টরূপ অঙ্কিত হইয়াছে ; কিন্তু কোথাও ভাবের গুরুত্ব নাই, কোথাও
কবি হৃদয় ছুইতে পারিতেছেন না ; একখানা সুন্দর ছবি দেখিতে চক্ষুর
যে তৃপ্তি, ভারতের কবিতা পাঠে সেইরূপ তৃপ্তিলাভ সম্ভব, কিন্তু চিত্রকর হইতে
কবির উচ্চতর প্রশংসা প্রাপ্য ; চিত্রকরের চিত্র কবির মস্তপুত তুলির
স্পর্শে প্রাণ পায়, ভারতচন্দ্রের তুলি প্রাণদান করিতে পারে নাই । তাঁহার
কাব্যে কোন স্থানেই হৃদয়ের ব্যাকুলতা নাই, হৃদয়ের মর্ম্ম স্পর্শী দুঃখ
কি স্নিগ্ধ স্মৃতিধারা তাঁহার কাব্যের কোন অংশ পবিত্র করে নাই ।

কিন্তু বোধ হয় এই ভাবে ভারতের গুণবিচার করিলে তাঁহার প্রতি
সুবিচার হইবে না ; ভারত-যুগ সতে সাহিত্যে শব্দ-যুগ প্রবর্তিত হওয়া
স্বাভাবিক, ভারতচন্দ্রের ভাব বিচার না করিয়া ভাষা বিচার করিলে
তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে ; তাঁহার মত কথায় চিত্র হরণ করিতে

প্রাচীনকালের অন্য কোন কবি সক্ষম হন নাই। তিনি উৎকৃষ্ট শব্দ-কবি ; এই শব্দময় কি পদার্থ তাহা নিম্নোক্ত পদগুলি পাঠে প্রতিপন্ন হইবে, 'ম'কার, 'ল'কার প্রতিভা কোমল অক্ষর দ্বারা যে বাহু প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা শ্রুতির অমৃত, তাহা পক্ষীর কাকলীর ন্যায় অর্থশূন্য হইয়াও চিত্তবিনোদনে ক্ষমাবান,—

(১) "কল কোকিল, অলিফুল বকুল ফুলে। বসিলা অন্নপূর্ণা মণি পেউলে। কমল পরিমল, লয়ে শীতল জল, পবনে চল চল, উছলে কুলে। বসন্ত রাজা আনি, ছয় রাগিণী রাণী, করিলা রাজধানী অশোক মূলে। কুহমে পুনঃপুনঃ, ভ্রমর গুণগুণ, মদন দিলা গুণ ধনুক হলে। যতক উপবন, কুহমে হুশোভন, মধু মূনিত মন ভারত ভূলে।" অন্নদামঙ্গল।

(২) শুনলো মালিনী কি তোর রীতি। কিঞ্চিৎ হরয়ে না হয় ভীতি। এত বেলা হৈল পূজা না করি। ক্ষুধার তৃষ্ণায় অলিয়া মরি। বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে। কালি শিখাইব মায়ের আগে। বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট। রাড় হৈয়ে যেন বাঁড়ের নাট। রাজে ছিল বৃষ্টি বঁধুর ধুম। এতক্ষণে তেই ভাঙ্গিল ধুম। দেধ দেখি চেয়ে কতক বেলা। মেয়ে পেরে বৃষ্টি করিস ছেলা। কি করিবে তোরে আমার গালি। বাপারে বলিয়া শিখাব কালি। হীরা ধর ধর কাঁগিছে ডরে। বর বর জল নয়নে ঝরে। কাঁদি কহে শুন রাজ কুমারী। ক্ষয় অপরাধ আমি তোমারি। চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা। তোমার কাছে কি আমার হেলা। বৃষ্টিতে নারিষু বিধির ফল। করিষু ডাসরে হইল মল। ভ্রম বাড়িবারে করিষু ভ্রম। ভ্রম বুধা হৈল ঘটিল ভ্রম। বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ। অন্ত গেল রোব উদয় রস। বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার। এ গাঁথনি আই নহে তোমার। পুনঃ কি যৌবন কিরে আইল। কিবা কোন বঁধু শিখারে গেল। হীরা কহে তিতি আঁধির নীরে। যৌবন জীবন খেলে কি কিরে।" বিদ্যাসুন্দর।

(৩) "জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংস দানব ঘাতন। জয় পদ্মলোচন, নন্দ নন্দন, কুঞ্জকাননরঞ্জন। জয় কেশি-মর্দন, কৈটভার্জন, ষোপিকাধ্বজ মোহন। জয় গোপী বালক, বৎস পালক, পুতনা বক নাশন।" অন্নদামঙ্গল।

শেষ পদটিতে ও তদ্রূপ অপরাপর বহুপদে দেখা যাইবে, ভারতচন্দ্রের রচনায় সংস্কৃত ও বাঙ্গলার হয়গৌরী মিলন হইয়া গিয়াছে, এই পরিণয় ঘটাইতে তিনি রামপ্রসাদের ন্যায় গলদ্বন্দ্ব হইয়া পড়েন নাই। হাসিয়া খেলিয়া, বাহা করিয়াছেন, রামপ্রসাদ এত পরিশ্রম করিয়াও তাহা পায়েন নাই। ভারতচন্দ্রের লিপি চাতুর্যের গুণ এই, তাহাতে প্রমজ্জনিত একটি শ্বেদবিন্দু ও পাঠকের নেত্রগোচর হইবে না, শিশুর হাসি ও পাখীর ডাকের

ন্যায় তাহা আয়াস ও আড়ম্বর-শূন্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণনাগুলির মধ্যে স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল প্রতিভা ফুটিয়া ছোট ছোট ঘটনা ও চরিত্র চিত্রের ন্যায় সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাসের কাশী নির্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি, ভবানন্দ মজুমদারের উপাখ্যান, তাঁহার দুই স্ত্রীর স্বামী লইয়া দ্বন্দ্ব—এই সমস্ত ছোট ছোট বিষয় পরিহাসরসে মধুর ও আমোদকর হইয়াছে।

এস্থলে বলা উচিত বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বরঞ্চ চিত্রিত কাব্যে উজ্জয়ণী-নগরে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে; কৃষ্ণরাম ও ঘটনা-স্থান বর্ধমান বলিয়া বর্ণন করেন নাই। রামপ্রসাদ বীরসিংহকে বর্ধমানের রাজা করিয়াছেন, তৎপথাবলম্বী ভারতচন্দ্র ও বর্ধমান স্থির রাখিয়াছেন, এই স্থান নির্দেশে প্রতারণিত হইয়া কেহ কেহ এখনও সন্দেহ দেখিতে বর্ধমান ভ্রমণ করেন। বর্ধমানের বিদ্যার স্রস্তু নির্দিষ্ট হইবার বহু পূর্বে হইতে বিদ্যাসুন্দরের প্রবাদ দেশে প্রচলিত থাকা সম্ভব, আমরা প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে কবি আলোয়ালকে এই স্রস্তুের বিষয় উল্লেখ করিতে দেখিতেছি, যথা ‘ছয়ফলবৃক্ষ ও বদিউজ্জমাল’ পুস্তকে—“বিদ্যার স্রস্তু আদি, সিদ্ধ জগন্নাথ নদী, একে একে সব বিচারিল।” এস্থলে বর্ধমানের উল্লেখ নাই। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মূল ঘটনা ঠিক থাকিলেও কবিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অনেক আছে, কৃষ্ণরাম মালিনীকে বিমলা নামে অভিহিত করিয়াছেন,—সুন্দরের বীরসিংহ নগরীতে প্রবেশ সম্বন্ধে ও তাঁহার গল্প একটু স্বতন্ত্র রকমের, রামপ্রসাদ বিহু ব্রাহ্মণী নামক একটি নব চরিত্র স্রষ্টা করিয়াছেন ও চোর ধরা উপলক্ষে ভারতচন্দ্রের মত উপায় বর্ণন করেন নাই। যাহা হউক এরূপ পার্থক্য অতি সামান্য, মূল গল্পটি একরূপ। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ডিউসাহীর নীলমণি কণ্ঠাভারণ গায়ের কর্তৃক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সর্ব প্রথম গীত হয়। ভারতচন্দ্রের পরে প্রাণারাম চক্রবর্তী নামক জনৈক কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন, এই ব্যক্তি পাগলের ন্যায় নদীর তীরে বসিয়া কুপ ধনন করিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের ছোট ছোট কবিতাগুলির সর্বত্রই কথার বাধুনি প্রশংসনীয় ও পদ মধুমাধা; ‘অহুকুল’ শীর্ষক ক্ষুদ্র কবিতাটি তুলিয়া দেখাইতেছি, ইহা তাঁহার রসমঞ্জরীতে পাওয়া যাইবে,—“ওলো ধনি প্রশংসন, শুন মোর নিবেদন

সরোবরে বাস হেতু বেওনালো বেওনা। বন্যাপি বা বাও তুলে, অতুলে কোমটা তুলে, কমল কানন পানে চেওনালো চেওনা। মখাল 'মুগাল' লোভে, জ্বর কমল কোভে, নিকটে আইলে ভর পেওনালো পেওনা। তোমা বিনে নাহি কেহ, বাসে পাছে গলে দেহ, বায় পাছে তাকি কটি বেওনা লো বেওনা।"

এই বিকৃতিকৃচিও পদলালিত্য কাব্য সাহিত্যের আদর্শ হইল। গীতি কবিতারও একাংশ ব্যাপিয়া বিদ্যাসুন্দরের পালা স্থান লইয়াছে, আমরা যথা স্থলে তাহা আলোচনা করিব। কিন্তু এই সময়ের যতখানা বড় কাব্য পাওয়া যায়, তাহার একখানা ব্যতীত নির্মলভাব কুজাপি দৃষ্ট হয় না। এই সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত, স্বীয় পবিত্রতা গৌরবে স্বতন্ত্র, কঠোর বিষয়-অনুসন্ধিৎসু কাব্যের নাম—"মায়া তিমির চন্দ্রিকা", এই পুস্তক খানা ক্ষুদ্র কিন্তু সমাদরের যোগ্য, আমরা পরে ইহার সম্বন্ধে কিছু লিখিব। ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের আদর্শে যে কয়েক খানা কাব্য লিখিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে "চন্দ্রকান্ত", কালীকৃষ্ণ দাসের "কামিনীকুমার" এবং রসিকচন্দ্র রায়ের "জীবনতারা" এই কাব্যত্রয় লোককৃচির উপর বহুদিন দৌরাণ্য করিয়াছিল। এই কাব্যগুলির ভাষা খুব মার্জিত কিন্তু রচনা এত অশ্লীল যে উহা পাঠে স্বয়ং ভারতচন্দ্র ও চন্দ্র লজ্জাগ্রস্ত হইতেন। অধু কঠোর সমালোচনা করিয়া নিবৃত্ত হইলে উক্ত কাব্য লেখকগণের যথোচিত শাস্তি হয় না, তাঁহারা নৈতিক আদালতের বেত্রাঘাত যোগ্য। এই তিনখানা কাব্যেই কালী নামের মাহাত্ম্য কীর্তিত আছে; কালী নামের সঙ্গে সংশ্রব হেতু আমরাইগের বুদ্ধগণ এইসব পুস্তকের শৃঙ্গাররসের মধ্যেও আধ্যাত্মিকত্ব দেখিয়াছেন, এবং উপাখ্যান ভাগ নিকাম ধর্ম পিপাসার প্রলিপাত পুরঃসর পাঠ করিয়াছেন। দেব দেবীগণ যখন এইভাবে পাপের ঢাকনি হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন পৌত্তলিকতা ভাঙিতে মহাপুরুষ রামমোহনের আগমনের সময় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বর্ণিত নারী চরিত্রগুলিতে হীন প্রকৃতির অসভ্য উল্লাস দৃষ্ট হয়; ফুলরা খুলনাও বেহলার ন্যায় ছুঃখ সহনক্ষম পতিপ্রাণা সুন্দরীগণ সাহিত্যক্ষেত্রে হুস্ত্রাপ্য হইয়াছিল—সহমরণ প্রথা নিবারণার্থ আইন করা প্রয়োজন কেন হইল তাহা সাহিত্যে আংশিক দৃষ্ট হইবে, কারণ সাহিত্যেই সমাজ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। প্রায় একশত বৎসর হইল 'কামিনীকুমার' 'চন্দ্রকান্ত' ও "জীবনতারা"

রচিত হইরাছিল, ইহার। জাতীয় অধোগতির শেষ চিহ্ন, কবি 'উচ্চারণীর' নাম করিতে ইংরেজগণ বেঙ্গল লজ্জা বোধ করেন, এইসব কাব্য প্রণেতা-গণের নাম করিতে আমাদের তেমনই লজ্জা হয়; কিন্তু ইহাদের বিপিনচাতুৰ্য্য মধ্যে মধ্যে ভারতকেও পশ্চাতে ফেলিয়াছে, আমরা সেই হাঁচে ঢালা ভাবার কিছু নমুনা দেখাইয়া ক্ষান্ত হইব। বসন্ত আগমন,—

"হিমালয় হইল পরে বসন্ত রাজন। দলবল লৈয়া আইল করিতে শাসন। প্রথমে সংবাদ দিতে পাঠাইল দূত। আজ্ঞামাত্র চলিলেক মলয়া মারুত। বায়ু মুখে শুনি বসন্তের আগমন। হুসজ্জা করিল বত পুষ্প সেনাগণ। কেতকী করাত করে করিয়া ধারণ। দণ্ডে দাঁড়াইল হৈয়া একদা বদন। শুলহস্তে করি নীত্র সাজিল চম্পক। অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ধরি ধাইলেক বক। গোলাব সেউতি পুষ্প সেনার প্রধান। প্রক্ষুটিত হৈয়া গোহে হৈল আশ্রয়। গন্ধরাজ ধাইলেক পরি ষেতবন। শুভ জবা ধাইলেক ধরি তীক্ষ্ণ অস্ত্র। মল্লিকা মালতী জাতী কাশিনী বকুল। কুল আদি সাজে ডার। হুঙ্কতে অতুল। পলাশ ধমুক হস্তে ধরিয়। দাঁড়ায়। রজন তাহার বাণ হেন অতিপ্রায়। সরস্বতী চাল হয়ে ভাসিল জীবনে। এইরূপে সজ্জা কৈল পুষ্প সেনাগণে। বলয়ার। মুখে শুনি রাজ আগমন। অগ্রগণ্য সেনাপতি সাজিল মদন। শরাসনে সজ্জান করিয়া পঞ্চশর। বিরহী নাশিতে বীর চলিল সত্বর। কোকিল এমরে ডাকি কহিল মদন। দেখ রাজ্যে বিরহিলী আছে কোন জন। প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া দেখ সমাচার। নীত্রগতি কর দিতে বসন্ত বাজার। বিশেষ রাজার আজ্ঞা কর অবধান। যে না দেয় কর তার বধ পরাণ। আজ্ঞা পেয়ে ছুই সেনা করিল গমন। কলঙ্গী মণ্ডলে আসি দিল দরশন। প্রথমে কোকিল গিয়া কহি বৃক্ষোপরে। রাজ-আজ্ঞা জমাইল নিজ কুহবরে। পতি মদে মদে ছিল বডেক বুঝতী। শব্দ শুনি কর তার নিল নীত্রগতি। প্রথমে চুখন দিল প্রণামি রাজার। হস্ত পরিহাস দিল রাজে জবা আর।" কালীকৃষ্ণ দাসের 'কাশিনী কুমার। মধ্যে মধ্যে অস্বাভাবিকতার জন্য বাকী

অংশের অনেক স্থল বিশেষ সুন্দর হইলেও উঠাইতে পারিলাম না। বসন্ত রাজার রাজধানীর একটি সমগ্র সুন্দর চিত্রপট প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে রাজ্যপণের অধিকারশাসন ও কর আদায়ের জন্য যে সব কৌশল অবলম্বিত হয়, তাহার কিছু বাদ পড়ে নাই। কবির হস্ত বেশ নিপুন, সুসঙ্গতভাবে হটক অসঙ্গতভাবে, হটক তাহা পরিপক হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাহার ইতর জ্ঞানের ন্যায় প্রবৃত্তির উল্লেখ সূত্রে তাহাকে ন্যায্য প্রশংসাইব দিতেও ইচ্ছা হয় না। অপর দুইখানা কাব্য বসন্তেও এই সমালোচনা অনেকাংশে প্রযুক্ত হইতে পারে।

কিন্তু বিদ্যাসুন্দরাদি কাব্য ও আলোয়াল কবির পদ্মাবতী ছাড়া বঙ্গদেশের এক প্রান্তে আর তিনখানা কাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহাদের রচকগণ বিক্রমপুরবাসী ও একপরিবারভূক্ত। জয়নারায়ণ সেন ও তাঁহার বিহ্বলী ভ্রাতৃপুত্রী আনন্দময়ী গুপ্তা ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, উভয়ে মিলিয়া ‘হরিলীলা’ নামক কাব্য রচনা করেন; ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনার ২০ বৎসর পরে এই কাব্য রচিত হয়। এই কাব্য রচনার পূর্বে রামগতি সেন “মায়ী তিমির চঞ্জিকা” রচনা করিয়াছিলেন, ও পূর্কোক্ত হই কাব্যের রচনার পরে জয়নারায়ণ কর্তৃক চণ্ডীকাব্য প্রণীত হয়। এই মনস্বী পরিবার বিশেষরূপে শিক্ষিত ছিলেন, তাঁহাদের শ্রাব্যগুলিতে সেই পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। ইহাদের ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

বৈদ্যকুলোদ্ভব বেদগর্ভ সেন পাঠাভ্যাস জন্য নিবাসভূমি বশোর ইতনাগ্রাম ছাড়িয়া বিক্রমপুর আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বিলদায়িনীয়া (রাজনগর) জপসা, ভোজেশ্বর, প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রামের ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়া বিলদায়িনীয়াতে নিবাস স্থাপন করেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ এই বেদগর্ভ সেনের পঞ্চম স্থানীয় বংশধর। যে শাখায় রাজবল্লভ জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার জ্যেষ্ঠ শাখায় উৎপন্ন এবং বেদগর্ভের পঞ্চম স্থানীয় গোপীরমণ সেনের নাম মেঃবেভারিজ সাহেবের বাধরগঞ্জের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। গোপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণরাম “দেওয়ান” ও তৃতীয় পুত্র রামমোহন “কোড়ী” উপাধি প্রাপ্ত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফিপথ্‌রিপোর্টে দেখা যায়, তাঁহারা চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি পরগণার রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত ছিলেন; কৃষ্ণরাম দেওয়ানের ২য় পুত্র “লালারামপ্রসাদ” বিক্রমপুরের সেই সময়ের অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। লালারামপ্রসাদের জ্যৈষ্ঠ স্ত্রী দেবী অতি গুণবতী ছিলেন; ইহাদের পাঁচটি পুত্র জন্মিয়াছিল— ১ম লালারামগতি, ২য় লালারামজয়নারায়ণ, ৩য় লালারামকীর্তিনারায়ণ, ৪র্থ লালারামরাজনারায়ণ ও ৫ম লালারামনরনারায়ণ। রামগতি, বাঙ্গলা ভাষায় “মায়ী তিমিরচঞ্জিকা” ও “যোগ কল্পলতিকা” সংস্কৃতে প্রণয়ন করেন। জয়নারায়ণ “চণ্ডীকাব্য” ও “হরিলীলা” নামক বাঙ্গলা কাব্য রচনা করেন; রামগতি সেনের কন্যা আনন্দময়ী গুপ্তা হরিলীলা প্রণয়নে তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করেন, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। রাজনারায়ণ

‘পার্বতী পরিণয়’ নামক সংকৃত কাব্য গ্রন্থেতা, এই পুস্তক অনিরাপাই নাই।

স্বর্গ জ্যেষ্ঠ রামগতি সেন ৩০ বৎসর অতিক্রান্তে ধর্মব্রত ধারণ করিয়াছিলেন; তিনি যোগাঙ্গীকন্য জন্ম প্রথমে কলিকাতা কালী ঘাটে ও পরে কাশীধামে অবস্থিতি করেন। ৯০ বৎসর বয়স্ক্রে কাশীর মহাশাসনে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হয়, চিরায়ত্তা সহধর্মিণী সেই সঙ্গে অশ্রুভূত হন। বাল্যকালে যে সব ভাষা চতুর্দিকে দৃষ্ট হয়, অজ্ঞাতসারে তাহা চিরকালের জন্য কোমল অন্তঃকরণে মুদ্রিত হইয়া যায়। রামগতি সেন শৈশবে তাঁহার ধূল পিতামহ রঘুনন্দনের বাগানে আম চুরি করিয়া থাইতেন, একদিন জ্ঞপ্তি হইয়া রামগতি আবদার করিয়া বলিয়াছিলেন, “দাদা মহাশয়, এখন আমগুলি আমরাই খাই, তুমি কাশী যাও।” কিন্তু সেই শিশুর আবদার বৃদ্ধের পক্ষে শাস্ত্রের ন্যায় কার্যকরী হইল, রঘুনন্দন এই কথা শুনিয়া মিরুস্তর রাখিলেন; পরদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল, গেরুয়া পরিয়া বৃদ্ধ রঘুনন্দন প্রহর মুখে কাশী যাত্রা করিয়াছেন। ধূল পিতামহের এই গেরুয়া পরা দেবমুখি বালক রামগতির মনে চিরজীবন অঙ্কিত হইয়া রহিল; তিনিও মর্কট বিধি বিষয় নিম্ন লক্ষ্যাদির ন্যায় সংসারপ্রমের কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। কনিষ্ঠ জয়নারায়ণের প্রকৃতি বড় উশ্মল ছিল। তৎকালে তিনি ব্যবহাশাস্ত্রানুসারে ১১১ অংশের মালিক ছিলেন, কিন্তু তিনি সমস্ত সম্পত্তির ১০ আনা হিচা কলিকাতা নিবাসী মণিক বসুর নিকট বিক্রয় করিতে প্রীতিশ্রুত হন। তদ্রূপে তাঁহার কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ বলিলেন, তিনি তাঁহার অংশ হইতে সূচ্যাগ্র তুমিও ছাড়িয়া দিবেন না। অব্যবচক ও অসংস্থিতচিত্ত কবি জয়নারায়ণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে মর্মাহত হইয়া সংসারপ্রম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, তদ্বর্ণনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগতি কনিষ্ঠকে সম্বত করিয়া ভাত প্রীতিজ্ঞা রক্ষার জন্য ১০ আনা অংশ বিক্রয় করিয়াছিলেন।

সেনহাটী, পয়গ্রাম, মূলধর, জপ্পা প্রভৃতি স্থানে রামগতি সেনের বিদ্যুৎ কন্যা আনন্দময়ীর খ্যাতি শুনা যায়। পয়গ্রাম নিবাসী প্রভাকর বংশীয় রূপরায় কবিভূষণের পুত্র অযোধ্যারাম সেনের সঙ্গে ১৭৬১ খৃঃ অব্দে ৯ম বর্ষ বয়সে আনন্দময়ীর পরিণয় হয়। লালারাম প্রসাদ পৌত্রে ও তাঁহার পতিকে যে বৃত্তি প্রদান করেন তাহা কৌতুকহলে “আনন্দীরাম সেন”

বলিয়া অভিহিত হয়; পতি পত্নীর নামের যোগে এই অদ্ভুত শব্দের নামের উদ্ভব হয়। অযোধ্যারাম সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নীর বিদ্যায় ঋত্বাতি তাঁহার বশঃ লোপ করিয়াছিল। রাজনগর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের পুত্র হরिवিনোদলালকার আনন্দময়ীকে একখানা সংস্কৃত শিরপুঞ্জী পত্রটি লিখিয়া দেন, তাহার মাঝে মাঝে অন্তর্নিহিত থাকিতে তিনি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে পুত্রের অধ্যয়ন সম্বন্ধে অনন্যোপায়ী বলিয়া তিরস্কার করেন। রাজবল্লভ ‘অগ্নিষ্টোম’ যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞ-কুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিয়া রামগতি সেনের নিকট পত্র লিখেন, রামগতি সেই সময় পুজায় ব্যাপৃত থাকায় আনন্দময়ী সেই প্রমাণ ও প্রতিকৃতি সহস্রান্তে লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু অরুণচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—“সকলেই তাহা বিশ্বাস করিলেন, কারণ আনন্দময়ীর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে সে সময়ে কাহারও অবিদিত ছিল না, বিশেষতঃ সভাস্থ পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ আনন্দময়ীর অধ্যাপক ছিলেন।” আনন্দময়ীর রচনা হইতে আমরা যে সব অংশ উদ্ধৃত করিব, তাহাতে তাঁহার পণ্ডিত্য সম্বন্ধে পাঠকগণেরও অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকিবে না।

রামগতি সেনের ‘মায়ী তিমির চন্দ্রিকা’ ধর্ম্মের রূপক, উহা সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের পথাবলম্বী; সংসারে মন ইঞ্জির দ্বারা অন্ধ হইয়া নৃত্য কি বস্তু বুঝিতে পারে না, পথ হারা হইয়া নানা করুনা জরুনা শ্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়, বিবেক ও আত্মজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে ধীরে ধীরে চিত্তে বোধের উদয় হয়; তখন কি করিতে বাইয়া কি করিয়াছি, মণি-বলিয়া লোভুখণ্ড আদর করিয়াছি, যাহার জন্ত ভবে জন্ম—সেই লক্ষ্য স্থির না রাখিয়া ভূতের বেগার খাটিয়াছি,—এইসব তত্ত্ব অল্পশোচনার অশ্রুতে পরিচ্ছন্ন হইয়া চিত্তে প্রকটিত হয়,—তখন বানিবানের পথিকের ন্যায় মন এই রাজ্য ছাড়িয়া তরুপথে প্রবিষ্ট হয়; তৎপর উদাসীনের কথা, যোগ বিরুদ্ধে হয় তাহার নানারূপ কুটব্যাখ্যা, সেইসব শব্দের শ্রোতৃলোকা ভেদ-করিতা তবু খবর বুঝিতে পারি, আমাদের একরূপ শক্তি নাই,—আমরা সে ভাবেই ভাবুক নহি। যোগের অবস্থা বর্ণন করিতে বাইয়া কবিগণের কল্পবাহিতা প্রভৃতি শূন্যক হইতে অনেক দুর্ব্বোধ শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন। কবি ‘সকাশ বঙ্গের কথা পেল বরংকাল। কাটিতে না পারিয়ায় মহামায়াকাল’

বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন, মনুষ্যের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া সহায়-
ভূতি ও ভয় কম্পিত কণ্ঠে লিখিয়াছেন,—“জন্মের তুরঙ্গে জীব করি আরোহণ ।
মায়া যুগ লোভে সরা করেন ভ্রমণ ॥” তৎপর ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা, তন্মধ্যে
ক্ষণভঙ্গুর যৌবনের মদগৰ্ব্ব স্মরণ করিয়া কবি কাতরভাবে লিখিয়াছেন,
“দেবন কুহুম সম প্রভাতে বিলীন” এই অনিত্য জীবনে মায়াযুদ্ধ মনুষ্যের
অবস্থা অতি বিষম, একদা সুপ্রভাতে মনের মায়াপাশ কাটিয়া গেল,
তখন নিজের অবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে মনের শক্তি জ্বলিল,
কবি রূপক স্থলে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

“কোপে অতি শীঘ্রগতি মন চুলি যায় । যথা বসে নানারসে সদা জীব যায় ॥ তবু
যার হৃদিতার দিবা রাজধানী । হৃদি তারি রম্যপুরী তথায় আপনি ॥ অহঙ্কার হয় যার
মোহের কিরীটী । দম্পাতে বৈসে ঠাঠে করি পরিপাটী ॥ পুষ্পচাপ উগ্রতাপ লোভ আনিবার ।
ছুই মিত্র হৃচরিত্য বান্ধব রাজার ॥ শাস্তি ধৃতি ক্ষমা নীতি শুভশীলা নারী । মান করি
রাজপুরী নাহি চায় চারি ॥ গতিব্রতা ধর্ম রতা অবিদ্যা মহিষী । পতি কাছে সদা আছে
রাজার হিতৈষী ॥ নারী সঙ্গে রুতি রসে রসের তরঙ্গে । এইরূপে কানকূপে জীব
আছে রঙ্গে ॥”

আমাদের প্রত্যেকের এক বিস্তৃত রাজগী আছে, এই শরীরের বিজোহী
প্রবৃত্তিদিগকে শাসন করিয়া শিষ্টবৃত্তিগুলিকে পালন করার জন্ত আমাদের
দায়িত্ব আছে, তাহা আমাদের সুনির্বাহ হয় না ; কবি পরিষ্কার একটি
রূপক দ্বারা মনুষ্যের অবস্থা প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন, এই প্রতিবিম্ব ক্রমশঃ
আরও পরিষ্কৃত হইয়াছে,—তৎপর যোগের পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন
করিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন । অধ্যায়গুলির শেষ সংস্কৃত কাব্যের
ভাবে করা হইয়াছে, যথা “ইতি মায়া তিসির চন্দ্রিকায়াং জীবচৈতন্ত্যপ্রসঙ্গে
দ্বিতীয় কলা নাম দ্বিতীয়াঃ ॥”

যে সময় দেশ ব্যাপিয়া বিদ্যাসুন্দরের পালায় গান, পচা আদিরসের
শব্দ হেতু যে সময়ের কাব্যগুলি ছুইতে ঘৃণা হয়, সেই সময় জগৎ সা পন্নীর
এই প্রবৃত্তি সংঘম ও কঠোর উপদেশগুলি সাহিত্যের বিবেক বাণীর
জ্বাল উপলব্ধি হয় ।

রামগতি সেন চক্ৰ মুদ্রিত করিয়া যে গৃহে যোগতত্ত্বে বিবর্ত ছিলেন,
সেই গৃহের এক প্রান্তে জয়নারায়ণ কল্পনার ময়ূর উড়াইয়া আদিরসের
রাজ্যে ঘুরিতেছিলেন ; ইনি ভারতচন্দ্রের শিষ্য ; ছন্দাদি ইহার করায়ত্ত ;

নানারূপ ছন্দের সীমাবদ্ধ মণ্ডলীর মধ্যে কবিতা স্তম্ভরী আদিরস ছুট হইয়া ইহার মনস্তৃষ্টি করিতেছিলেন, কিন্তু ইহার লেখনী ভারতচন্দ্র ইহাতে কতকটা সংঘত। জয়নারায়ণের চণ্ডী কাব্যের প্রথম ভাগে শিব বিবাহাদি ব্যাপার, এইস্থলে শিষ্য গুরুর ছবির উপর তুলি ধরিতে সাহসী; ইহাতে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার সাহস ধুটতা নামে বাচ্য হইবার যোগ্য নহে; মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিতে ঋতুরাজ আসিয়াছেন কামদেব সেনাপতি। কবির বর্ণনা এইরূপ;—

“মহেশ করিতে জয় রতিপতি সাজিল। দামামা ভ্রমর রব সমনে বাজিল। নব
কিশলয়েতে পতাকা দশ দিশেতে। উড়িল কোকিল সেনা সব চারি পাশেতে। ত্রিগুণ
পবন হয় যোগ গতি বেগেতে। ফুলধনু পিঠে, ফুলশর কর পরেতে। ভ্রমাইয়া ভাসে
আড় হেরি আখি কোণেতে। কুহুমের কবচ হাতে কিরীট সাজে শিরেতে। বামবাছ
রতি গলে রতিবাহ গলেতে। ভুবন মোহন কর হয় মন মোহিতে। বায়ুবেগে সকলে
উত্তরে হিম গিরিতে। আগমন মদন সকল ঋতু সহিতে। কুহুমে প্রকাশ গিরি বন
উপবনেতে। নানা ফুল ফুটিল, ছুটিল রব পিকেতে। ছুটিল মানিনী মান, লাগিল ধনি
কাণেতে। মৃত তরু জীবিত নবীন ফুল পাতেতে। ধরধর কেতকী কাঁপিছে মুহূর্ত্তে।
অঁকালে অশোক কোটে সেফালিকা-দিনেতে। ললিত মালতী ফোটে বৃষিকার ডালেতে।
বকুল কদম নাগকেশরের পরেতে। মধুকর রব বলি ডাকে মন মদেতে। কুহুরিছে কোকিল
সমুহ পাঁচ শরেতে। নব লতা মাধুরীর নতশির ভূমেতে। পলাশ টগর বেল নত ফুল-
ভারেতে।”

ইহার পর পশু পক্ষীর ক্রীড়ার একটি পূর্ণ আবেশময় চিত্র দেওয়া হইয়াছে,—তাহাতে অশ্লীলতার একটু গন্ধ আছে, এজন্ত উঠাইতে বিরত হইলাম, কিন্তু তাহা এত স্তম্ভর যে আমাদের ইচ্ছা হইয়াছিল সেই অশ্লীলতাটুকু মুছিয়া ফেলিয়া কবির কবিত্ব শক্তি দেখাই; ভাবাবেশে হরিণী গুরুর সঙ্গে যাইয়া মিশিল, গুরুরী হরিণের সঙ্গে খেলিতে লাগিল; স্বীয় শর প্রভাবে এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া—“চর চর রসেতে মোহন বাণ হাতেতে। সকলের ভাব দেখি মনে মনে হাসিতে।”—কামদেব শিবের সমুখে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কবি মহিমান্বিত শিব মূর্ত্তিটিকে ভাঙ্গিয়া একটি স্তম্ভর পুতুল গড়িয়াছেন; তিনি কালিদাসের স্পষ্ট অনুকরণ করিয়াও সেই শিবের মহিমার ছায়া উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এইজন্তই বিশাল দেবদাক্ষ ক্রমবেদিকা ইহাতে তাঁহাকে উঠাইয়া আনিয়া রত্নবেদীর উপরে স্থাপিত

করিয়াছেন,—কিন্তু তিনি, কালিদাসের কুমারসম্ভব এরূপভাবে আরও করিয়াছিলেন যে, অনেক স্থলে তাঁহার পদ কালিদাসের স্লোক ভাষিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, যথা, “নিরখিতে দেবগণ, ডাকে গুন ত্রিলোচন, রক্ত রক্ত হস্তাল দীপেন । বাবৎ এ দেববাণী, শিবকর্ষে হৈল ধ্বনি, আবৎ মদম ভ্রমশেষ ।”

জয়নারায়ণের রতি বিলাপটি ভারতের রতিবিলাপ হইতে সুন্দর, এই রতি-বিলাপ অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে চুরি করা, কিন্তু কবি পাকা চোর, এমন সুন্দরভাবে অপহৃত কথা যোজনা করিয়াছেন, তাহা ধরিবার উপায় নাই, যথা,

“অস্ত নায়িকার ঘরে, নিশিখে বক্সিয়া ভোরে, মোর কাছে এসেছিল। তুমি। খজিতা অখীর। হৈয়া, মন রাগ না সহিয়া, মলকাজ করিছিহু আমি । রঙ্গনের মালা নিয়া, দুহাতে বন্ধন করিয়ে, কর্ণ-উৎপলে তাড়িছিঁল । সে অভিমান মনে, করিয়া আমার সনে, রসরঙ্গ সকলি তাজিলে । আর হুঃখ মনে জলে, একদিন নৃত্যকালে, পদের হুপূর খসেছিল । ঘরা তুমি দিতে পার, বিলম্ব হইল তায়, দিতে দিতে তাল ভঙ্গ হৈল । তাতে আমি মান করি, নৃত্য গীত পরিহারি, বসিয়া রহিমু মৌনী হয়ে । যত সাধ কৈলা তুমি, পুনঃ না নাচিমু আমি, তাতে রৈলে বিরস শুইয়ে ।” ইত্যাদি ।

পুস্তক ভরিয়াই এইরূপ কোমল পদাবলী, কোমল পুষ্প মালিকায় যেন কবি তাঁহার কাব্যপটখানা ছাইয়া ফেলিয়াছেন ; কপট সন্ন্যাসী গোঁরীর মিকিট শিবনিদ্রা করিতেছেন, পাঠক কালিদাসের কবিতা স্মরণ করিতে করিতে বঙ্গীয় কবির এই লেখা পাঠ করণ,—“করেতে বদন হবে তোমার ধরিবে । ঐরাবত শুও কি কমলিনী শোভিবে । বাম উরে বসাইলে শোভিবে তেমন । শিরিষকলিকা হিম গিরিতে যেমন । আলিঙ্গনে শোভা পাবে কুমুদিনী যত । সমুদ্রের মধ্যে অতি তরঙ্গ দ্রুতিত । আভরণে অঙ্গভূষা চিতা ভস্ম হার । সিকি দিতে পারিলে পাইবে মন তার ।”

মূল চণ্ডীকাব্যের বিষয়ে জয়নারায়ণ মুকুন্দরামের চিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ পাল্লা বড় সহজ নহে ; ভাষার জোরে তিনি কবিকঙ্কণকে পদচ্যুত করিতে প্রয়াসী ; এস্থলে কবিকে আমরা নিতান্ত ধুষ্ট বলিব । জয়নারায়ণের চণ্ডীতে স্থলোচনা এবং মাধবের উপাখ্যান জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দীর্ঘ, কিন্তু শব্দ বিস্তারের লালিত্যে এই উপাখ্যান পাঠকের ক্লান্তিকর হয় নাই ; নমুনা স্বরূপ কিছু তুলিতেছি,—“ধরীর থাকিলে লেখা সখার অবস্ত । করল অধরে দেখ তাহার রহস্ত । শিশিরে করল মজি খাৰ্কে হুলস্থল । বর্ষাকালে পাই হয় জীবনে বাসনা । দিমে দিনে লতা বারি ভেলিয়া উঠিয়া । হইয়া কলিকা, সখা সহারে কুটরা । প্রকৃত হইয়া প্রেমে মনের উল্লাস । বিলে আমি পূর্ব-

ভূমি মনে বহু আশ। পুনঃ পশ্বিনীর মনু মধুর গিরে। অবশ্য সে বেগী-বকসি
হই যীরে।”

“হরিলীলা”—সত্যনারায়ণের ব্রত কথা, কিন্তু জয়নারায়ণের হাতে ইহা
ব্রতকথার ক্ষুদ্র সীমা লঙ্ঘন করিয়া একখানা সুন্দর বড় কাব্যে পরিণত
হইয়াছে; আমরা প্রাচীন সত্যনারায়ণের ব্রতকথা অনেকগুলি পাইয়াছি
কিন্তু ইহার সঙ্গে সেগুলির তুলনা হয় না; ইহা বিস্তীর্ণ, নানারস পুষ্ট
বড় কাব্য কথা। এই পুস্তকে আনন্দময়ীর রচনা সন্নিবিষ্ট আছে,—সেগুলিতে
তাঁহার ভণিতা নাই, জীলোকের ভণিতা দেওয়ার রীতি ছিল না; কিন্তু
আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি সেগুলি যে তাঁহার রচনা
তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই। পিতৃব্যের রচনা হইতে আনন্দময়ীর
রচনার আড়ম্বর ও পাণ্ডিত্যবেশী, আমরা তাহা পরে দেখাইব, এখন
জয়নারায়ণের নিজ লেখার কয়েকটি অংশ হরিলীলা হইতে উদ্ধৃত
করিতেছি,—

(১) সভা মধ্যে রত্ন সিংহাসনে নরপতি। শিরে যেত ছত্র ইন্দুকুম জিনি ভাতি।
ধক্ কক্ জলে ভঙ্গ দ্বিপদব ভালে। সিস্ সিস্ বজ্র ভঙ্গ ভঙ্গ মধ্যে জলে। * * *
টল্ টল্ মুকুতা কুণ্ডল কাণে দোলে। ঢল্ ঢল্ গজমতি মালা দোলে গলে। কস্ কস্
কসাতা লটকা কটিতে। বল্ বল্ বকমকে বর্ণ বালবোতে। উগবগ সপ্ত কস্তা চামর
লইয়া। ধীরে ধীরে দোলাইছে রহিয়া রহিয়া। বন্ বন্ লাগে কাণে ককণের ধনি।
বকবক্ চামর নড়েতে জলে মণি।” রাজ সভা বর্ণন।

(২) আঁচলে ধরিয়া টানিছে নাগর, টানিয়া ছাড়ায় সুন্দরী। মান ভঙ্গ করি, সমুখে
আবিল, নাগর বতন করি। সোপার নাগর, নাগরী বন্দ, হেরিয়া কহিল রত্ন। সহ
ভাগেতে করিলা দান, আপসার বর অঙ্গ। কাণে মুখ রাবি, কহিছে নাগর, হৈল নাকি
দান ভঙ্গ।” সারিকার মানভঙ্গ।

(৩) “যোরতর রাজনী অতীত এই মতে। পূর্বদিক রক্ত রিদমর কিরণেতে। আকাশে
নক্ষত্রগণ ভাজি যার মেলা। চক্রবাকী প্রবর্ত পতির প্রেব-খেলা। * * * পানীয়গণ
ইতিউতি নিজ বাস ছাড়ে। বিরলে ডাকিছে কাক কুনে নাহি পড়ে। চন্দ্রভাগ করহু
ধরি স্নেহের। বাই বলি বিদায় মানিছে বার বার। উষা কালে যাত্রা করি নার চক্রভাগ
সজল নয়নে ধনি পাছেতে পরাণ। বতসুর চলে আঁখি চাহে ঝাঁড়াইয়া। সুখার রাজ
ইন্দ্রীর ভাঁড়াইয়া। নিশি ভরি কুমুদিনী কোতুকে আছিল। রবি অবলোকনে যুগ বলিল
হইল।” সুধনিশি প্রভাত।

মিষ্ট শব্দ প্রয়োগ পটু কবি জয়নারায়ণের কাব্যের একটি বৃহৎ দোষ।

আছে,—উহা সেই যুগের দোষ, এ অভিযোগ হইতে ভারতচন্দ্রের ও অব্যাহতি নাই। এইসব কাব্য কেবলই শব্দের কাব্য, তাবের অভাবে শব্দের লাগিত্য অনেক সময়ই নিষ্ফল হইয়া পড়ে। এত বড় কাব্যগুলি সমগ্র পাঠ করিয়াও চক্ষুর কোণে একবিন্দু অশ্রু নির্গত হয় না, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে প্রয়োজন হয় না। কাব্য অর্থ কেবলই বাক্য নহে, “কাব্যঃ রসান্বকং বাক্যং” রসবিহীন বাক্যাবলী চিত্তে কোন স্থায়ীভাব মুদ্রিত করে না, ঘষা মাজা স্তম্ভর শব্দ কর্ণের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে মাত্র, কিন্তু তাহার ধ্বনি মনে পৌঁছে না। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ক্রমে বঙ্গভাষার উপর গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছিল, ভারতচন্দ্রের পরে বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত দ্বারা পুষ্ট করিবার চেষ্টা স্থগিত হয় নাই, বরং ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে,—আমরা আনন্দময়ীর রচনা হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি,—

“হের চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে। সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে। কতি প্রৌঢ়ারূপা ওরূপে মজ্জন্তি। হাসন্তি, খলন্তি, জ্বলন্তি, পতন্তি। কত চারু বস্ত্রা, হ্রবেশ। হৃকেশ। হুহাসা, হুহাসা, হুহাসা, হুভাষা। কত ক্ষীণ মথ্যা, হুভাঙ্গা হ্রবোণ্যা। রতিজ্ঞা, বশীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মনজ্ঞা। দেখি চলন্তানে, কত চিত্ত হারা। নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিতোরা। করে দোড়াদড়ি মদমত্ত প্রোচা। অমুচা, বিমুচা, নবোচা, নিমুচা। কোন কামিনী কুণ্ডলে গও যুগা। প্রহুগা, সচেগা, কেহ ওঠ দগা। অনাক্সত্রভিন্না, কত স্বর্ণবর্ণা। বিকীর্ণা বিনীর্ণা, বিনীর্ণা বিবর্ণা। কারো ব্যস্ত বেগী নাহি বাস বন্ধে। কারো হার কুর্ণা পরিপ্রস্তু কন্ধে। গলভূষণা কেহ নাহি বাস অন্ধে। গলদ্বাগিনী কেউ সান্তিয়া অনন্ধে। কারো বাহুবলী কারো স্বক্কে দেশে। রহিয়া সাধু বাক্য বস্ত্রে প্রকাশে। * * * হৃকক্ষে নিতম্বে উর হেমকুন্তে। এভাবে ও ভাবে হাটিতে বিলম্বে। তাহে নোলিতা লাজভারি ভরেতে। পরে হেলি ছলি অনঙ্গ ছরেতে। স্নেহজ্বাকে কেহ, কেহ চলন্তানে। করে সেক তোরে সবে সাবধানে। হৃহন্তে চালিছে সর্ক বারি অন্ধে। বনত বনত গলত গলত পড়ে নীর অন্ধে। * * * সখী চলন্তানে বলে চাতুরীতে। এরত্বের মালা কাকের গলাতে। শুনি চাতুরী সম্পতি হেট মাধে। ঢলাঢল গলাগল সখী সর্ক ভাতে।” চলন্তান ও স্নেহজ্বার বাসি বিবাহ—(হরিলীলা)। বাঙ্গলা কবিতা এখন আর আপামর সাধাবণের বুঝিবার বিষয় নহে। ইহার অর্থ বোধের জন্ত এখন অধ্যাপক নিবৃত্ত করিতে হয়; এজন্ত সহজ পদ্য রচনার প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার আবশ্যক হইয়াছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের ইংরেজ গুরুগণ উপযুক্ত সময়েরই আসিয়া গদ্য লেখার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন,

তাহা না হইলে সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালিগণ ব্যঙ্গ্য ভাষার ভিতর দিয়া কবিতা
অরম হইয়া এককালে সাহিত্যরসে বঞ্চিত হইতেন বলিয়া আশঙ্কা হয়।

আনন্দময়ীর সহজ রচনার একটু নমুনা দিতেছি,—“আদি দেবহ নরেন।
হীন তবু হৃদয়ের হরেছে জ্বলে। হরেছে পাণ্ডুর লুণ, রক্ত কেশ অতি। ধরে আদি
দেখ নাথ এসব দুর্গতি। রহিয়াছি চির বিরহিণী নীন মনে। অর্পণ করিয়া আশি তোমা
পথ পানে। * * * তা'বি বাই যথা আছ হইয়া যোগিনী। না সহে এতরূপ বিরহ
আশুনি। যে অঙ্গে কুসুম তুমি দিয়াছ যতনে। সে অঙ্গ মাখিব ছাই তোমার কারণে।
যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বাঁধিছ আপনি। তাতে জটাতার করি হইব যোগিনী। শীতল
যে কুঁকড়ে লুকায়েছ নাথ। বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত। যে কণ্ঠ করে দিয়া-
ছিল। কষ্ট মনে। সে কণ্ঠ কুণ্ডল করিয়া দিব কাণে। তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা পাঠ
করি। মনে করি হরি অরি হই দেশান্তরী। তাতে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি।
আর তব স্থাপাধন বিষম গোবন। লুকাইয়া নিয়া কিরি দরিদ্র যেমন।” বিরহিণী যুনেত্রা
(হরিশীলা)। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই রমণীকবির দৃষ্টি শকালঙ্কারের
প্রতি পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছে; অলঙ্কার দেখাইবার স্পৃহা রূপজীর্ণের
স্বাভাবিক, আনন্দময়ী নূতন কোন অপরাধ করেন নাই,—কিন্তু নিম্নোক্ত
রচনা পড়িয়া আনন্দময়ীর অলঙ্কার স্পৃহা পাঠক কি ক্রীলোক জ্বলন্ত রোগ
বলিতে ইচ্ছা করিবেন,—“পতিশোক নাগরে, না দেখিয়া নাগরে, কিরে সেন
নাগরে ডাক ছাড়ি। হইরে জীব শেষা, বিপলিত বেশা, লটগট কেশা কুণে পড়ি।”

জয় নারায়ণের চণ্ডীতে দশ অবতার স্রোতের এই দুইটি পংক্তি আনন্দময়ী
লিখিয়া দিয়াছিলেন;—“জলজ বনঙ্গ হুগ হুগ জিন রান। ধর্ষাকৃতি বৃদ্ধবৈ বকি
সে বিরাম।” এই পংক্তিদ্বয় একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ; বলা বাহুল্য এই
দুই ছন্দেই দশ অবতারের বিষয় সংক্ষেপে দত্ত হইয়াছে।

পূর্বোক্তরূপ শব্দ সাজাইবার কৌশল গিরিধর কৃত গীতগোবিন্দের
অনুবাদেও বিশেষরূপে দৃষ্ট হইবে। এই গীত গোবিন্দানুবাদ শাস্ত্রী
১৭৩৬ খৃঃ অব্দে—ভারতচন্দ্রের অমরদাম্রকলের ১৬ বৎসর পূর্বে সমাপ্ত হয়।
রসময় দাম কৃত এক খণ্ডে পত্রার ছন্দের অনুবাদে আদ্য গীতগোবিন্দের
পদ্যলিঙ্গ্যের দ্বিগু উপলব্ধি হয় না; কিন্তু গিরিধর যথা সম্ভব অনুসরণ্যাবে
জন্মের কৃত পীতগুলির সমোহারিক বাঙ্গলা ভাষায় প্রতিভাত করিয়াছেন;
গীতগোবিন্দের এই অনুবাদে কেবল অনুবাদের মিসগুণি মাই, কিন্তু
শব্দের মিষ্টক বেশ বজায় আছে; চতুর কালনা লেখক, রসভাষাকে কতদূর

সংস্কৃতের মত করা যায়,—তাহা সক্ষম লিপি কৌশলের সহিত প্রমাণিত করিয়াছেন ; আমরা কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম ;—

(১) “তব দন্ত অগ্রে ধরণী রয়, যেন চন্দ্র লীন কলক হয়, জয় জয়দীপ হরি অঙ্কুত শূকররূপ ধরি। হিরণ্যকশিপু ধরিয়া করে, দলিলে ভ্রূঙ্গের মত নখরে, জয় জয়দীপ হরি, অঙ্কুত নরহরি রূপ ধরি।”

(২) এ সম্বন্ধে যুবরাজ যুবতিজনে হরি, নাচত কত প্রকার। পবনে লবঙ্গ লতা, মুছ মিচলিত, শীতল গন্ধ বহায়। কুহ কুহ করি, কোকিল কুল কুঞ্জিত, কুঞ্জের ভ্রমরীগণ পায়। বকুল ফুলে মধু গিয়ে মধুকরগণ, তাহে লম্বিত তরুডাল। পতিদূরে বার, তার প্রতি মনোরথ, মন মথনে হয় কাল। মুখ মদগন্ধে, তমাল পল্লব, ব্যাপিত হইল সুবাস। যুবজন জয় বিদারিতে, কামের নখ কিবা, হইল পলাশ। মদন নৃপের ছত্র হেম নিখিত কি নাগেশ্বর ফুল। শিলীমুখ সদৃশ বাণ নিরমাওল পাটলী ফুল অতুল। দেখি বিলক্ষণ, জগত ফুল হল তরুণ করুণ কিয়ে হাসে। কেতকী কর সদৃশ করি নিরমিল বিরহী বিদারণ আশে।”

(৩) “যমুনতীরে মন্দ বহে মারুত, তাহাতে বসিয়া যুবরাজ। কর অভিসার, করি রতি রস, মদন মনোহর বেশে। পমনে বিলম্বন, না কুরু নিতরিনী, চল চল প্রাণনাথ পাশে। তুয়া নিজ নাম ভ্রাম করি সঙ্কেত, রাজ্যায় মুরলী মুদ্রভাবে। তুয়া তমু পরশি, ধূলিরেণু উড়ত, তারে পুনঃ পুনঃ প্রশংসে। উড়ইতে পক্ষী, বৃন্দল বিচলিতে, তুয়া আগমন হেন মানে। ঐতগতি শেষ করত, পুনঃ চমকই নিরখত তুয়া পানে। শব্দ অধীর, হৃদয় দূরে, রিপূর সদৃশ রতি রঙ্গে। অতিতমপুঞ্জ, কুঞ্জবনে সখি চল, নীল ওড়নি নেহ অঙ্গে।”

এখন আমরা আর একখানী পুস্তকের উল্লেখ করিয়া কাব্য সাধার উপসংহার করিব, এই পুস্তকের নাম ‘গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী’; ‘গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী’—লেখক হুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরাস্তর্গত উলাগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন; ইহার পিতার নাম আব্দারাম মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম অরুন্ধতী; অষ্টমাস ১০০ বৎসর পূর্বে, ‘গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী’ লিখিত হয়। সকল দেবতাই ভাষা কাব্যরূপ বাহনে চড়িয়া বঙ্গীয় গৃহস্থের ঘরে পূজা ধাইতে আগমন করিলেন; বোধ হয় শিবের ক্ষটার কুটিল বাহ ভেদ করিয়া গঙ্গাদেবী যথা সময়ে এ সংবাদ জামিতে পারেন নাই, বহু বিলম্বে তাঁহার ধারণা হইল “ভাষায় আমার থান নাই।” তখন কাল গোণ ন্যূন করিয়া উলাগ্রামে হুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী হরিপ্রিয়ার স্বন্ধে আরুঢ় হইয়া স্বপ্ন প্রচার করিলেন—“তোমার স্বামীকে কহিয়া আমার জন্য কাব্য লিখাও।” কিন্তু

তখন ইংরেজাগমনে দেবদেবীর আকিস বন্ধ প্রায়; যে বৎসর রাজা রামমোহন রায় “হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী” রচনা করেন, সম্ভবতঃ সেই বৎসর জ্যৈষ্ঠ মারফৎ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া হুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় “গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী” লিখিতে প্রবৃত্ত হন। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনীতে মধ্যে মধ্যে রচনার পারিপাট্য আছে; আমাদের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহীগণ যখন যুবতী ছিলেন, তখন তাঁহারা কি কি অলঙ্কার পরিয়া আমাদের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহগণের মন চুরি করিতেন, তাহা নিম্নোক্ত পংক্তি নিচক্ষে দৃষ্ট হইবে;—

“টেঁড়ি, টাপি; মাকুড়ি কর্ণেতে কর্ণকুল। কেহ পরে হীরার কমল নহে তুল। নাসিকাভেদে নখ কারো মুক্ত চুণী ভালো। লবঙ্গ বেশেরে কারো মুখ করে আলো। কিবা গজ মুক্তা কারো নাসিকার কোলে। দোলে সে অপূর্ণ ভাব হাসির হিলোলে। কুল কলিকার মত কারো দস্তপাঁতি। দাড়িঘের বীজ মুক্তা কারো দস্তপাঁতি। মার্জিত মগ্ননে দস্ত মধ্যে কাল রেখা। মনে লয় মদনের পরিচয় লেখা। মুখ শোভা করে কারো মন্দ মন্দ হাসি। সুখার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি। পরিল গলায় কেহ তেনরী সোণার। মুক্তার মালা কর্ণমালা চন্দ্র হার। ধুকধুকি জড়াও পদক পরে হুখে। সোণার কঙ্কণ কারো শব্দের সমুখে। পতির আয়াং চিহ্ন সোহাগ বাহাতে। পরণ বান্ধান লোহা সকলের হাতে। পাতা মল পাণ্ডুলি আনট বিছা পায়। গুজরী পঞ্চম আর শোভা কিবা তায়।”

এইসব অলঙ্কারের অনেকগুলি এখন মুসলমান পাড়ায় খোঁজ করিলে পাওয়া যাইবে।

২য়—গীতি শাখা।

মুসলমানী কেছার কলুষশ্রোতের মুখে পড়িয়া বঙ্গসাহিত্য কলুষিত হইয়াছিল; বিদ্যাসুন্দর, পদ্মাবতী, হরিলীলা প্রভৃতি কাব্যের ভাষা খুব ত্রীসম্পন্ন; কিন্তু চিত্রের পদ্যেতে মধুমক্ষিকার তৃপ্ত হয় না, রসহীন লিপিকৌশলে ও শ্রোতার মন বহুক্ষণ মুগ্ধ থাকিতে পারে না; সাহিত্যের পক্ষ উদ্ধার করিয়া নির্মলভাবের প্রবাহে পাঠকের কামনা পরিতৃপ্ত করিতে, পুনশ্চ প্রতিভাবান লেখকের লেখনীর প্রয়োজন হইল। এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে রাজদরবার ও তৎসংশ্লিষ্ট স্থান সমূহের কলুষিত হাওয়া হইতে অতি দূরে—পল্লীগ্রামের স্বভাবসিদ্ধ ছায়ায় অনেকগুলি কলকণ্ঠী কবির আবির্ভাব হইল। কিন্তু এই গীতিশাখা একবারে নির্দোষ নহে, ইহা একাংশে বিদ্যাসুন্দরাদি কাব্যের নিদনীয় কচি প্রবেশ করিয়াছে,—কিন্তু

অপরূপ অতি সুনির্মল। এই দেশের সাহিত্যে কাব্য অপেক্ষা গীতিই প্রশংসনীয়, কারণ এখানে কব্ধ অপেক্ষা ভক্তিই অধিক ব্যাধিকারী, এই যুগের সাহিত্যেও গীতিরই প্রেষ্ঠত্ব দৃষ্ট হইবে।

বঙ্গদেশের কতকগুলি গজীর প্রাণের কামনা ছিল,—শিশু কন্যার পিতৃ-গৃহ হইতে গমন, হৃৎকের মেঘে অষ্টমবারে গোবী সাজিয়া গৃহ ছাড়িয়া যাইত, তাহার ধূলি খেলা সঙ্গ দিয়া ঘোষটা টানিয়া বুঝতী বউএর অভিনয় করিতে হইত, মাই বিরহে বালিকা ঘোষটা ঢাকা সুন্দর মুখ থান। চক্ষুজলে প্লাবিত করিয়া পথের পানে তাকাইয়া থাকিত ; মার রাত্রিও সুখে প্রভাত হইত না,—কোড়ের শিশু ছাড়া মা স্বপ্ন দেখিয়া পাগলিমীর ন্যায় কাঁদিয়া বলিতেন, “উমা আমার এসেছিল। স্বপ্ন দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, চৈতন্য রূপিণী কোথায় লুকাল।” বহুদিনের অশ্রুসিক্ত এই বিরহ ব্যাপারের পর যখন বালিকা ফিরিয়া আসিত, তখন কত সুখ,—“আমার উমা এলো বলে বাণী এলো কেশে ধার” এইসব গানের মরল কথাই শ্রোতা অশ্রুজলে গলিয়া পড়িতেন, এগুলির প্রকৃত রঙ্গভূমি কৈলাস বা কিয়ালয়পুরী নহে,—প্রতি গৃহস্থের হৃদয় ইহার অনুভূতিক্ষেত্র। এই পরম সুন্দর বাৎসল্যভাবে আমাদের সাধকগণ ধর্মের ছায়ায় স্থান দিয়াছেন, পুত্রের প্রতি মেহ যশোদা চিত্রে ধর্মভাবে পরিণত হইয়াছে। “শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালে। বেন সে চকল চাদে, অকল ধরি কাঁদে, জননী দে ননী, দে ননী বোলে।” প্রভৃতি মেহ-উদ্বেলিত ভাস-মধুর গান গুলিতে শ্রোতার হৃদয় ছুঁইত ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিত—ইহা গৃহস্থের ধূলিমাখা আত্মনার কথা, কিন্তু ইহার অন্তর্লিসঙ্কেত নির্মল স্বর্গের প্রতি,—কারণ স্বার্থশূন্য পবিত্র মেহ পৃথিবীর কথা। ইহাও স্বর্গের কথা ; স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা এই দেশে উন্নত ধর্মভাবাপন্ন ইহা বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে, আমরা বৈষ্ণব-যুগ অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিতভাবে দেখাইয়াছি।

শিশুর প্রতি মার মেহের মাধুর্য্য একদিকে, নির্ভরাধিত শিশুর স্নিক্ত অভিমান পূর্ণ আত্মতার অপর দিকে। মার প্রতি শিশুর সেই গঞ্জনাগুলি বড় মধুর—সেই গঞ্জনার বাহ্যিক কর্তৃত্বেরতা অশ্রুজলে ধৌত হইয়া কোমল হইয়া গিয়াছে। রামপ্রসাদের মার প্রতি কোষ অশ্রুজল গঠিত, উহা মার মাত্র কোষ—উহা নিগূহীত বালকের মেহের সত্ত্ব স্থাপন। প্রাচীন

বঙ্গসাহিত্য প্রেমভক্তির বিশেষ লীলাভূমি। এই প্রেমভক্তিই সময়ে সময়ে অজ্ঞান শলাকার ন্যায় লোক চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় গভীর শাস্ত্রাত্মসন্ধান পূর্বক যে সব ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ নির্মল ভক্তি বিহীনতার তৎপূর্বেই সেন্তলি হৃদয়ে অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি প্রেম-নিষ্ঠ হৃদয়ের অনুভূতির বলে পুস্তকগত বিদ্যার অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া নির্মল সত্যরাজ্যে চুইতে পারিয়াছিলেন। “কি কাজ রে মন বেয়ে কাশী।” “নানা তীর্থ পৰ্যটনে ভ্রম মাজ পথ বেঁটে।” প্রভৃতি বাক্যে তিনি তীর্থযাত্রার সম্বন্ধে লৌকিক আস্থার প্রতি নির্ভীকভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। “ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি যেনে ও কি তা জান না। মাটির মূর্তি গড়িয়ে মন তার করতে চাওরে উপাসনা। বাতু পাষাণ মাটি মূর্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে।” প্রভৃতি কথা তিনি রাজা রামমোহনের পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গানের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের “আবাহন বিসর্জন কর তুমি কার।” প্রভৃতি গান একস্থলে গাঁথা থাকিবার যোগ্য। “যেদে দিল চক্ষু ধূলা বড়দর্শনের সেই অর্ধদুলা” বাক্যে রামপ্রসাদ ভক্তির বলে বলীয়ান হইয়া শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার নির্মল আদৈতবাদ সূচক অসংখ্য পদ দৃষ্ট হয়। যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরের শেষভাগে রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন, রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে গানের অবসান হইয়াছিল, তাহা পুনরায় রামমোহনের কণ্ঠে উথিত হইয়া নব্য সমাজকে মাতাইয়াছিল।

রামপ্রসাদ বিগ্রহ পূজা করিতেন, কিন্তু তিনি সেই বিগ্রহের পদতলে বসিয়া অনন্তরূপের ছায়া অনুভব করিতেন, যে ভোগ সম্ভার তৎ পদপ্রান্তে প্রস্তুত রাখিতেন, তাহা দেখিয়া কখনও ঈর্ষ্য হাজ্জ পূর্বক মনে মনে গাহিয়াছেন,—“অথতক খাওয়াছেন যে মা, হুমধুর খাদ্য নানা। ওরে কোন লাভে খাওয়াইতে চাস তায়, অকাজল আর বুট তিকনা।” কখনও ও ফুল, বেলপাত “পদে দিতে উদ্যোগ করিয়া সেই উৎসর্গ অসম্পূর্ণ জ্ঞানে বসিয়াছেন, “হৃদয় পুষ্প, বেলের পতা, মাকো আর দিক আনার মাখা।”

কারীমূর্তি যে ভাবে তাঁহার মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ হইত; তাহা মহামহিম গুহু রহস্বে ব্যক্ত—অতি হৃদয়; তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি শব্দ ও

উপমার জন্য লাগানিত হইরাছেন; অপ্রকৃত সৌন্দর্য্যাবলী জড়িত হইয়া সেই মূর্ত্তি কণে কণে নবভাবে তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভব হইরাছে,—“চলিলে চলিলে কে আসে কতসন্নি, দলে দানব দলে, ঘরি করতলে গজ পরাসে। কেরে—কালীর পরোক্ষ, কবিরে শোভিছে। কালিনীর বলে কিংবদন্ত ভাসে।” প্রভৃতি গান ভক্তের কণ্ঠে শুনিলে মনের মধ্যে মাধুর্য্যমিশ্র এক ভৈরব ছবি অঙ্কিত হয়।

সংসার স্রষ্টা ব্যক্তিগণ এখনও রামপ্রসাদের গানগুলি অশ্রুশ্রুয়া দিরা ক্রর করিবার যোগ্য মনে করিবেন; আমার মনে পড়ে গৃহ প্রাঙ্গণে বসিয়া শ্রাব সন্ধ্যাকালে যখন চির পরিচিত সুহৃদ কণ্ঠে,—“নিভাষায়ে এদিন কেবল ঘোষনা হবে গো। তারা নামে অসংখ্য কলহ হবে গো”—প্রভৃতি গান শুনিতাম, তখন বাল্যকালের সুকোমল অন্তঃকরণে কত বিবাদ মাথা, মহিমাযুক্ত ভক্তির কথা জাগিয়া উঠিত। রামপ্রসাদের বৈষ্ণব বিষয়ক গানও কোন কোনটি বড় মধুর, একটি এখানে তুলিয়া দেখাইতেছি;—“ওহে নূতন নেয়ে। ভাঙ্গা সোকা চল বেয়ে। দুকুল রইল দুঃ, ঘন ঘন হানিছে চিকুর, কেমন কেমন করেছে বৈরা, দাখ বমুনায় ভাসে খেরা, শুন ওহে গুণনিধি, নষ্ট হোক ছানা দধি, কিন্তু বকে করি এই শের। কাঙারী বাহার হরি, যদি জুবে সেই-তরী, মিহা তবে হইবে হে বৈদ।”

রামপ্রসাদের পর শ্রীমা বিষয়ক সংগীত রচনার আরও কয়েকজন কবি বিলক্ষণ পটুতা দেখাইরাছেন, আমরা এস্থলে সংক্ষেপে তাঁহাদের উল্লেখ করিয়া যাইব।

কবিওলা রামবহু (১৭৮৬—১৮২৮ খৃঃ) কলিকাতার পরপারস্থিত শালিকাগ্রামে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। কবিতা আছে পাঁচবর্ষ বয়ঃক্রম কালেই ইনি পাঠশালার বসিয়া কলাপাতে কবিতা রচনা করিতেন, ষাটশব্দ বয়স্ক কবির রচিত গান ভবানী বণিক নামক কবিওলা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া নিজ দলে গাওয়াইতেন। যে কুলটি অতি শীঘ্র কোটে, তাহা অতি শীঘ্র শুকার; রামবহুর ৪২ বৎসর বয়সে বৃদ্ধা হয়। প্রথম বয়সে ইনি ভবানী বেণে, দীদুঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতির দলে গান বাজিতেন, শেষে নিজেই একদল গুটি করেন। রামবহুর বৈষ্ণব সংগীতগুলিই অধিক প্রচলিত, আমরা হানাতারে তাঁহার উল্লেখ করিব। তাঁহার উমা সংগীতগুলি শু শুভ্রসে উজলিত। যার মনন অসম্বিত এই পবিত্র কবিতাটি দেখুন,—“তুবি যে কোয়েছ আমার গিরিরাঙ্গ, কত দিব কত কথা। সে কথা আছে শেল সম হৃদয়ে রাখা। আমার লক্ষ্যের নাকি, উদরের জালায় কেঁদে বেড়াতে। হোয়ে অতি কুসান্তিক, সোনার কাঞ্চিক, ধুলায় পোড়ে দুটাডো।” পরিবার ভরণ পোষণ অসমর্থ ব্যক্তির হৃদয়ে এইরূপ গান শেলের ন্যায় বিধির কথ, গানের স্বর-ধ্বনি-স্নেহে দরিত্র জোতা ঘরের কাঞ্চিক গুণেশের কথা ভাবিতে থাকিতেন।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য—(১৮০০ খৃঃ অব্দে অধিকাকালনা হইতে বর্ধমান কোটালহাটি নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন; ইনি বর্ধমানাবধি তেজশক্তির মতা যুক্তি ও ভক্ত হইরাছিলেন। ইহার রচিত শ্রাব্য বিবরক পদাবলী রাবপ্রদাদেব গানগুলির মত মধুর।

রামহুসাল রায়—(১৭৮৫—১৮৫১ খৃঃ) জিপুরার অন্তর্গত কানীকান্দে ইহার জন্ম হইল, ইহার কুল উদ্ভাধি নন্দী। কতককাল ইনি নোরাখাদির কলেक्टर হেলিডি সাহেবের সেৱেস্তাদারী করেন ও পরে জিপুরার মহারাজের দেওয়ান হন; ইহার গানগুলিতে বিবাহ, বিরাগ ও ভক্তির কথা আছে, আমাদের হানাতাব, একটি গান হইতে অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি—“ধনাশা, জীবন আশা খেলনা সকলি গেল মা। কৌমার বোবনগত জরা আগমন হল। * * * অন্ধির গেল মা জ্যোতিঃ, শ্রবণের গেল ক্রটি, মনের গেল না স্মৃতি, চরণের গতি। আছে কান্তা অভিশাপ, অদর্শনে জ্বা'সার আশ। পরশনে জরা বলে কি দার হল?”

দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৪০—১৮৩৬ খৃঃ) বর্ধমানই চুপীগ্রাম নিবাসী ব্রজকিশোর রায় কেউরানের পুত্র। ইহার কবিত্ব-শক্তি বেশ ছিল, বর্ধমানরাজ তেজশক্ত বাহাদুরের আদেশে ইনি দিল্লীর অনিষ্ট সঙ্গীতবিহারদিগের নিকট ক্রমশ ও খেয়াল শিকা করেন; ইহার শ্রাব্য বিবরক গানগুলি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ও রামহুসাল রায় প্রণীত গান সমূহের সঙ্গে এক স্থানে রাখার যোগ্য।

বষণ কবিগণ—মুজাহসেন আলি ও সৈয়দ জাফর খাঁ এই দুইজন মুসলমান পীতরতক সম-সাময়িক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নশশালা বন্দোবস্তের কাগজে মুজাহসেন আলির নাম পাওয়া যায়, সুতরাং ইহারা এক শতাব্দী পূর্বের কবি। মুজাহসেন আলি জিপুরার অন্তর্গত বরদাখাতের জমিদার ছিলেন, কথিত আছে ইনি সমারোহ করিয়া কালী পূজা করিতেন। আমরা ৯ জন মুসলমান বৈষ্ণব কবির নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে এই দুই মুসলমান শাস্ত্র কবির কথা বলা ঘাইতে পারে; মুজাহসেন আলির একটি গান এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—“বারে শমন এবার কিরি, এসো না মোর আঙ্গিনাতে। দোহাই লাগে জিপুরারী, যদি কর জোর জবরি, সামনে আছে জজ কাছারি, আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব জিপুরারি। আমি তোমার কি ধার ধারি, শ্রাব্য মায়ের ধাস ভালুক কর্ত করি। বলে মুজাহসেন আলি, বা করে বা জয়কালী, পুণ্যের হয়ে মৃত্ত দিয়ে, পাশ দিয়ে বাত নিভার করি।” এই দুই মুসলমান কবির পাঠে আমরা আর একটি কবির স্থান বিবেচ্য করিব, ইহার নাম এটুনি। ইনি কদমডাঙ্গার কোন বিখ্যাত কদমী ভক্তলোকের পুত্র, কিন্তু পুত্রের ভাষার কথা দেকতারাত বলিতে পারে না এটুনি বৈষ্ণবের এমিষ্ট কবিত্ববদ্য বলিয়া পরিচিতি হইরাছেন। ইহার “পড়েছি বিপদে এবার বা করে মা মাতঙ্গী। ভজন শ্রবণ জানি না যা জাতে আমি কিরিনী” ইত্যাদি গান অকোকেই জানেন।

পুণ্ডরীক কবিশ্রী হাড়। বঙ্গদেশের কদমকদম রাজা মহারাজাও অল্পপ্রাণ পুণ্ডরীক কবিশ্রী

বিদ্যর গানীত রচনা করিয়াছেন। এগুলি গানীত সংগ্রহগুলিতে কৃষ্ণকবিরাজিতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র, শঙ্করচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, বাটোয়ামিশ্রি রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি রচিত বলিয়া অনেক গান বিখ্যিত হইয়াছে।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই সংগীত রচকগণের মধ্যে সকলেই নির্মল রুচির পক্ষপাতী ও স্বল্প পিপাসু ছিলেন না। এই সময় বিদ্যা-সুন্দরাদির পালা যাত্রার দলে গীত হওয়ার জন্য,—কতকগুলি নলিত শব্দ বহুল, কদম্বাভাবপূর্ণ গান, রচিত হইয়াছিল; এইসব গানের সর্বসম্মতিক্রমে গুজ্জরকবি গোপাল উড়ে; ইনি ভারতচন্দ্রের একবিন্দু খননস তরল করিয়া এক শিশি প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এই গান গুলির রচনার ভরী এতাদৃশী যে ইহা পাওয়ার সঙ্গে নাচনা ও চলিতে পারে; হাটে, মাঠে, বাটে এইসব স্থান পর্য্যটন গাছিয়া গাছিয়া পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি এখন মহাশোভনার অহরোহে সে গুলি পুনরায় পড়িয়া গোপালচন্দ্র উড়ে মহাশব্দকে একটি বেল রসিক শৃঙ্খল বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে,—বিদ্যাসুন্দরের প্রধান চরিত্র হীরা মলিনী; সুন্দর ইহাকে “মাসী” বলিয়া সম্বোধন করিতে ইনি ভগ্ন বীণার মত আওয়াজ দিতেছেন,—“শাহ এমন কথা কেন বলি। কোবের বেলা হুকের খনন এমন সময় জায়াদি।” ইনি নিজের রূপের কথা করিয়া বলিতেছেন, যখন বায়ুনপাড়া কুলের ধোপানে গমন করেন, তখন পূজা পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ এই পক্ষেশী রূপবতীকে দেখিয়া,—“রহে কোপাকুণী অমনি ঘরে।” অনেক স্থলেই কেবল শব্দের দ্বারা “বামিনীতে আশ্রিতকুল নিভা সে যায় চোরে” পড়িতে ভাল, গানে শুনিতে ততোধিক, কিন্তু কামিনী কুল ছুইতে পড়িয়া যায় ছোরে লইবে কিরূপে? বিদ্যা হীরাতে দেখিয়া বলিতেছে,—“হুঁড়া কুলে বহুল কুলে ধোপা বেঁধে। প্রেম কি বলিতে তুলেছ।” এইরূপ রচিয়া গাছিয়া কছিরার কথা। হীরা যখন উত্তরে কিছু বলে, তখন জায়া নিজে কড়া মসিকতা হয়; সুমাসীর সঙ্গে বিদ্যার পরিণয় হইবে, এই লইয়া হুঁড়া করিয়া হীরা বলিতেছে,—“ভাল কথা দিবি মো তুলে, এই বাজারি কুলে। অমাসীই হতে রবি অমাসী কোলে। আকড়া ধরি মত থাকি, করিব অমাসীর মত রকম, বাজারে লাগারি মো ঘর, ঘোর কোয়ার বোলে।” কৈলাসচন্দ্র বাজারি ও অমাসীর মধ্যে পার্থক্য এই হইলি ধোপাচন্দ্র দ্বারা উড়ের চেলাগিরি করিয়াছেন, ইহারাই হইল জনৈক অতি ধোপা শিষ্য, কৈলাসচন্দ্রই কবির আবার চুটকি রাখিয়া বিশাইয়া রক্তাবর্ণনা করিবার

হাত বশটুকু ছিল,—ময়ূর। এইরূপ ; “গা জেলেছে দিগি অবসান প্রাণ ; বাব বনে ডাকে ফাক, মালি কাটে কপিশাক, গাধার গিটে কাগড় দিগেরজক বার বাগান ।”

এই প্রতি স্বধকর কিন্তু কুরুচি-ছষ্ট গীত রচকগণের মধ্যে দাশরথি রায় (১৮০৪—১৮৫৭ খৃঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ । জেলাবর্ধমানস্থিত বাদমুড়াগ্রামে দাশরথি রায়ের পিতা দেবীপ্রসাদ রায়ের বাসভূমি ছিল । কিন্তু দাণ্ড শৈশবকাল হইতে পাটুলির নিকটবর্তী পীলা নামক গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে বাস করিতেন । তিনি প্রথমতঃ সাঁকাই নামক স্থানের নীল-কুঠীতে কেরানীগিরি পদ গ্রহণ করেন ; কিন্তু অকাবাই নামী ইতরজাতীয়া কোন রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি চাকুরী ত্যাগ করেন ; অকাবাই এক ওস্তাদী কবির দল সৃষ্টি করে, তন্মধ্যে দাণ্ড রায় গান বাঁধিয়া দিতেন, কিন্তু অপর কোন এক কবির দলের সরকার দাণ্ডকে ছড়া বাঁধিয়া বিশেষরূপ গালি দেন, সেই ভর্ৎসনার কথা তাঁহার মাতা শুনিয়া গুত্রের কাটাঘারে মূনের ছিটা দেন,—মাতার ভর্ৎসনার দাণ্ড প্রতিজ্ঞা করেন, আর কবির দলে গান বাঁধিবেন না ; তদবধি তিনি পাঁচালীর দল সৃষ্টি করেন, এই নৃত্যোজ্ঞ হস্তে দাণ্ড দিগিজরী হইয়াছিলেন । প্রভাস, চণ্ডী, নলিনীভ্রমরোত্তি, দক্ষবজ্র, মানভঞ্জন, লবকুশের যুদ্ধ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি তাঁহার রচিত অনেক পালা এখন ছাপা হইয়াছে ; তাঁহার লেখনীকে একরূপ অবিশ্রান্ত বলিতে হয়,—ইতিপূর্বে যত শব্দকবি জন্মধারণ করিয়াছেন, দাণ্ড তাঁহার দিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষিপ্ত হস্ত । তাঁহার অগ্নীগতা এত জবন্য যে তাঁহাকে অর্ধচন্দ্র দক্ষিণা প্রদানান্তর ভঙ্গলোকের সভা হইতে খেবাইয়া দিতে ইচ্ছা হয়,—কিন্তু হোরেশ, বোকাশিও, বাইরণ ও ভারতচন্দ্র আদর পাইতেছেন,—দাণ্ড ও তজ্জন যশের কতকটা অংশী হইবেন সন্দেহ নাই । দাণ্ডের রচনা ভ্রমরের মত—মুখে মধু, কিন্তু হলে বিষ বহন করে, উহা স্তম্ভের নবোদগত দস্তুর ন্যায়—দর্শনে সুন্দর কিন্তু দংশনে তীব্র ; দাণ্ড যে স্থলে গালি দিবেন,—সেখানে তাঁহার লেখনীসংঘম অত্যাস নাই ; শত্রুর গালে চুন কাণী দিয়া তিনি ভাষাসা মেঝিবেন, বৈষ্ণব মিন্কাটি রেখেন,—“গোয়া ঠাকুরের ভণ্ড চেংহা, যত অকাল কুহণ্ড বেড়া, কি আশা করেছেন হুই হরি । কল গোয় ডাক রসবা, গোর যত উপাদন, নিতাই কল বুতা কল, কলার গড়াপড়ি । গোর বলে আমলে বেড়ে, একত্র তোজর হজির রেতে, বাসীকোয়াল গোপা

কুসুমে, একম সমস্ত। বিদ্যুৎ হবার ফল, যেখানে মারেন চক্কর খুল, কালী দাস শুক্ল
কাণে হস্তঃ * * * কিরা ভক্তি, কি তপস্বী, অপের মালা সেবা দানী, জ্ঞান দুইটী
জাইরি কারের বেড়া। গোলাকিকে পাঁচ শিকে দিয়ে, হেলে শুদ্ধ করেন দিয়ে, ভাতাংশে
কুলীন বড় সেড়া। ভরহরি ঈশ্বাস, বিদ্যাপতি নিতাই দাস, শান্ত ইহাদের অপোচর নাই
কিছু। এক একজন কিবা বিদ্যাবন্ত, করেন কিবা সিদ্ধান্ত, বদরিকাকে বাখা করেন কচু।”

কথিত আছে কালিদাসের উপমা গুণ, নৈবধের পদ লাগিত্য গুণ, ও
ভারবীর অর্থগৌরব গুণ, এইসব কবিগণের গুণের ইয়ত্তা আছে, কিন্তু
দাশু রায়ের গুণের সীমা নির্ধারণ করা যায় না; যখন কবি উপমা
দ্বিতেছেন, তখন দিখিদিব্ জ্ঞান না করিয়া তিনি কথার ঝোকে চলিয়াছেন,
লেখনীর মুখে মনীষিন্দু না শুকাইলে তাঁহার স্থগিত হওয়া নাই—
“পণ্ডিতের ভূষণ ধর্মজানী, মেঘের ভূষণ সৌদামিনী, সতীর ভূষণ পতি। বোণীর ভূষণ
ভ্রম, যুক্তিকার ভূষণ শস্ত, রত্নের ভূষণ জ্যোতি। বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ জল,
জলের ভূষণ পদ্ম। পদ্মের ভূষণ মধুকর, মধুকরের ভূষণ গুণ গুণ ঘর, উভরে উভয়
প্রেম বন্ধ। শরীরের ভূষণ চক্ষু যাতে জগত হয় দৃষ্ট। ভাতার ভূষণ দান করে বলে বাকা মিষ্ট”
করিকে ধাম ধাম বলিয়া পরিজাহি চীৎকার না করিলে এই প্রবাহ
স্থগিত হওয়ার নহে। ‘নলিনী ভ্রমরোক্তি’ নামক ক্ষুদ্র পালা কবির বিদ্রুপ,
কবিত্ব ও ভাবার অধিকারের এক অমর কীর্তি বলা যায়। পদ্মের সঙ্গে
বন্দ করিয়া মধুকর তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, এ পালায় তাহার বর্ণনা,—
“চলিলেন পদ্মিনী দ্বারী, বেশ শুকনোব গোদারী, ডাকলে কথা কন না কার সনে।”
এইভাবে কবি কুসুম ও ভ্রমর জগত উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার ভ্রায় নায়ক ও
অকাবাইএর ভ্রায় নায়িকার রসকোন্ডল উন্মোচন করিয়াছেন, রুচিও
পবিত্রতার অহরোধে বলিতে হয়, এই চিত্র ঢাকা থাকাই উচিত ছিল,
কিন্তু কবিত্বের আকর্ষণে তৎপ্রতি মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়।

ঐনতিক প্রস ছাড়িয়া দিয়া দাতকে সাহিত্যের তুল্যদণ্ডে ধরিলে
যেখা বাইবে, শব্দের বাধুনির জন্য যেরূপ প্রশংসাই দাতুর প্রাপ্য হউক
না কেন, তাঁহার বিষয় ও চরিত্র বর্ণনের কৌশল আদৌ নাই। দাতুর
এসব অপ্রসন্ন জ্ঞান নাই, সর্বত্রই ইনি ‘দত্তকচি কৌতুহী’ দেখাইয়া তাঁহার
হাসি হাসিতেছেন; ‘প্রভাব-মিলন’ পড়িয়া দেখুন,—যে প্রভাব মিলনের
কথা শুনিয়া কুম, দুবা, বালক এক স্থানে বসিয়া কাঁদিয়া বিভোর হইয়াছেন,
যে প্রভাব মিলনের সঙ্গে হিন্দুর সুখ চাংখের কত উদারকর ভয় ভঞ্চিত,

দাঁত তাহা বর্ণনা করিতে বাইরা একটি নিঃস্বল ব্রাহ্মণ তত্ত্বলমকে কুকের নিকটে ডিকা চাহিয়া ক্রীড়ে গলধাক্ষা বাইরাছিল এইরূপ একটি বৃদ্ধ গল্প দ্বারা প্রবন্ধ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। দাঁতের পাগল প্রতিভা প্রসঙ্গ-প্রসঙ্গ গণ্য করে না। পাঁচালী পড়িতে পড়িতে স্বতঃই মনে হয়, বেক্ষ বহুসংখ্যক ইতর ও অর্ধ শিক্ষিত লোক মণ্ডলীর মধ্যে দাঁত গাহিয়া বাইতেছে; যে কথা শুনিয়া শ্রোতৃগণ বিমুগ্ধ হইতেছে, দাঁত প্রসঙ্গ ভুলিয়া সেই দিকেই গল্পের শ্রোত বহাইয়া দিতেছে,—অপেক্ষাকৃত ভাবুক শ্রোতা মূল গল্প শুনিতে উৎসুক হইয়া মনে মনে সা, ঞ, গ, মা বাধিয়া সুর দিতেছেন এবং কোন্ সময় কবি মূল সুর ধরবেন, তাহার অপেক্ষা করিতেছেন,—ইতিমধ্যে দেখিলেন পালা শেষ হইয়া গিয়াছে।

দাঁতের রুচি, দাঁতের জীবন ও সাহিত্যের প্রতিভা আমাদের কাছে জার্মান কবি স্কেবার্ডের কথা মনে করিয়া দেয়।

কবির মৃত্যুর পর তাঁহার “ভাই তিন কড়ি” ও ব্রাত্ম্পুত্রের কিছুকাল তাঁহার দল রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ‘পাঁচালীর’ দল তাঁহার মৃত্যুর পরে আর প্রতিপত্তি লাভ করে নাই—বাহারা তাঁহার অনুকরণ করিয়া পাঁচালী লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে শ্রীরামপুরের নিকটস্থ বড় গ্রামনিবাসী কায়স্থ কুলোত্তম রসিক চন্দ্ররায়ের নাম উল্লেখ যোগ্য।

এই কদম্বা আদি রসের শ্রোত হইতে দূরে নির্মল বৈষ্ণব সংগীতের দ্বারা পুনঃ বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই সংগীত প্রাণের কামনা ও নিঃস্বার্থতার আবেগপূর্ণ; এই গীতগুলি বাহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত চামার, নীলমণি পাটুনি, নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভোলানাথ ময়রা, মধুসূদন কিসর, গোজলা গুঁই, রঘুনাথ দাস তত্ত্বলম প্রভৃতি কবিগণ নিরন্তরী হইতে উদ্ধৃত হন। বস্তুতঃ কবিওরালাগণের বহু-সংখ্যক গীতি রচকই হিন্দু সমাজের অধস্তন স্তর হইতে উৎপন্ন; বহু বড় বড় রাজাগণ, সম্রাট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ভক্তলোকগণ বঙ্গসাহিত্যকে কৃত্রিম সৌন্দর্য দ্বারা জীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ও বিলাসের পক্ষ দ্বারা ইহাকে কাব্য পিপাসুর অসেব্য করিয়া ভুলিয়াছিলেন, তখন নিরন্তরী লোকগণ তাহার বিপত্ততা ও রুচির নির্মলতা রক্ষা করিতে দাঁতাইরাছিলেন ইহা কম আশ্চর্যের বিষয় নহে। বৈষ্ণব বর্ণ নিরন্তরী

করোই বিশেষ কার্যকর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই—যে দেশের সামাজিক পদবীতে নিতান্ত ঘৃণ্য ও অসম্মত ব্যক্তিগণ একরূপ উৎকৃষ্ট মিকাম প্রেমের কথা বলিতে পারে—সে দেশ কোম একরূপ সত্যতার উচ্চ আদর্শ আয়ত্ত করিরাছে, স্বীকার করিতে হইবে।

বৈষ্ণব সংগীত রচকগণের সর্বক্কে আলোচনার পূর্বে আমরা রামনিধি রায়ের উল্লেখ করা উচিত মনে করি। ইনি ১৭৪১ খৃঃ অব্দে পাণ্ডুরার নিকট চাঁপাতা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, পরে কলিকাতা কুমার টুলি আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ইনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে কার্য করিতেন ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ২৩ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। রামনিধি রায়ের গানগুলি সাধারণতঃ ‘নিধুর টপ্পা’ বলিয়া খ্যাত। প্রাচীন সাহিত্যে কবি নিরুরাঘ বতস পঞ্চাবলম্বী, ইনি প্রেমসংগীত রচনা করিয়াছেন, অথচ রাধা কৃষ্ণ কি বিদ্যাসুন্দর এসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাই, নিজের ভালবাসা ও মনের বাধা স্বাধীনভাবে গাহিয়াছেন, ইহা বঙ্গসাহিত্যে তৎকালে নূতন প্রথা। তাঁহার প্রেম সংগীতে সঙ্গত রুচি ও আত্ম সম-পনের কথা অধিক,—“ভাল বাসবে বলে ভাল বাসিনে। আমার বচাব এই তোমা বই আর জানিনে।” “ছরতি গরবে কে তব তুলনা হবে, আপনি আপন সন্তবে, যেমন গঙ্গা পুলা পুলা জলে।” “তোমার নিরহ সয়ে বাচি যদি দেখা হবে। আমি মাত্র এই চাই, বরি তাহে ক্ষতি নাই, তুমি আমার স্তখে থাক, এসেহে সকলি সবে।” “বেও বেও আশনাথ প্রেম নিমন্ত্রণ, নয়ন জলে রান করাব, কেশেতে মুছাব চরণ।” বিদ্যাসুন্দরাদির পঙ্কিল স্রোত হইতে সমুখান করিয়া পাঠক এই নিঃস্বার্থ উচ্চ অঙ্গের প্রেমের রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্তম্ভী হইবেন সন্দেহ নাই।

আমরা এখন সংক্ষেপে কবিওলাগণের বৈষ্ণব সংগীতের আলোচনা করিয়া বাইতেছি।

রামবহু—ইহার বিপর্যয় পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। রামবহুর রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক গানগুলিই বিশেষ প্রশংসনীয়। রাধা জলে প্রতিবিম্বিত শ্রীকৃষ্ণের মিকরূপ দেখিয়া বিমুগ্ধা, অজ্ঞানেই করযোড়ে সেইরূপ দেখিতেছেন ও মবীষণকে বলিতেছেন,—“কেউ দিও না কেউ এ জলে’ বলে কিশোরী। হরণনে রাধা মিলে হবে পাতকী।” এই কৃত্ত হৃদয় উপরুক্ত। রামবহুর বিরাহে বস বহুর প্রেম পূর্ণ ললাজ ছন্দটি অঙ্কিত হইয়াছে, বাক্যগী জানেন এ বেশে সেই ছব্বরের দাব নাই। “বধন হাসি হাসি সে আসি বলে। সে হাসি দেখি ভাসি বরন জলে।” তাঁহার বিহারের সময়ের এই নিষ্ঠুর হাসি দেখিয়া বত দুঃখ হইয়াছিল, তাহা রাসিনী লক্ষ্যার জাদাহিতে পাবেন নাই। “তারি মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদিলাস স্বপরি। অনারনে এরাসে সেল সে গুণবনি।” সে হাসিতে হাসিতে অনারনে চলিয়া যেন—কিন্তু বীরব প্রকৃতি একধারা হৃদয় দুঃখ এবং বুকতাল লক্ষ্য ও বিরহের একধারা জীমসল হৃদয় হাসি পারে খেলিয়া যেন। শ্রীকৃষ্ণের গুণ তব রাসিক আবার কবিত্তে—

“দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও আগনাখ বহন ঢেকে বেও না। * * তুমি চক্ষু মুদে আমার ক্রোধ দিও না।” পৃথিবীর উচ্ছ্রান্তে অন্নকাল শ্রুত চন্দ্র স্বর্গবাসী পাখীর মধুর স্বরের স্নায়ু এইসব কবির গীত সহসা মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে। রামবহুর গানে মধ্যে মধ্যে অমুশ্রাসের লীলা আছে, যথা—“এত ভূমি নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছে শ্রীমতীর কুলে, গুণ গুণ করে কেন অলি, শ্রীরাধার শ্রীপদে গুঞ্জে।”

হর ঠাকুর (হরে কৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি) ইনি ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতা সিমুলিয়ার জন্ম গ্রহণ করেন। হর ঠাকুর প্রথমতঃ রঘুনাথ দাস নামক একজন তত্ত্বাবধানের নিকট কবিতা রচনা শিক্ষা করেন। কবিতা আছে একদিন হর ঠাকুর মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে এক পেশাদারী কবির দলে সথ করিয়া গাহিতেছিলেন, রাজা তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একজোড়া শাল প্রদান করেন, হর ঠাকুর অপমান বোধ করিয়া সেই শাল জোড়া তৎক্ষণাৎ চুলির মন্তকে নিক্ষেপ করেন। হর ঠাকুর রামবহুর স্তায় প্রতিভাপন্ন না হইলেও সিদ্ধ ও মধুর কথা রচনার দক্ষ,—একটি গান এইরূপ “হরি নাম লইতে অঙ্গ হও না, রসনা বা হবার তাই হবে। ঐহিকের স্থখ হল না বোলে, কি ঢেউ দেখি তরী ডুবাবে।” ১৮১৩ খৃঃ অব্দে হর ঠাকুরের মৃত্যু হয়।

রাহু ও নৃসিংহ—ইঁহার দুই সহোদর, ফরাসডাক্তার, নিকট কোন গ্রামে বাস করিতেন। ইঁহার সখী সংবাদ গান রচনা করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। অমুমান ১৫০ বৎসর পূর্বে ইঁহার সংগীত রচনা করেন। রচনার নমুনা যথা—“শ্রাম, তোমার চরিত, পথিক যেমত, হোয়ে শ্রান্তিহীন বিশ্রাম করে। শ্রান্তি দূর হলে, যায় পুন চলে, পুন নাহি চার ফিরে।” এতদ্ব্যতীত প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বের কবি গোঁজলা শুই রচিত অনেকগুলি গান পাওয়া যাইতেছে। নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী (১৭৫১ খৃঃ—১৮২১ খৃঃ) চন্দন নগরবাসী ছিলেন, ইনিও একজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ারী ছিলেন। তাঁহার দলের কোন কোন গান বড় যিষ্ট, যথা—“বঁধুর বাঁশী বাজে বিপিনে। শ্রামের বাঁশী বুঝি বাজে বিপিনে। নহে কেন অন্ন অবস হইল, স্থখ বরদিল অবশে। কৃষ্ণ ডালে বসি, পক্ষী অশ্রুপিত, জড়বৎ কোন কারণে। যমুনার জলে, বহিছে তরঙ্গ, তরঙ্গ হেলে বিনে পবনে।”

আমাদের আর স্থানে কুলাইতেছে না, হতরাং কৃষ্ণচন্দ্র চর্যকার (কুট্টে মুচি), লালু নন্দলাল, নীলমণি পাট্টনি, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, সাত্তার, গদাধর মুখোপাধ্যায়, জয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর দাস চক্রবর্তী, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরকনাথ, নবাই ঠাকুর, গৌর কবিরাজ প্রভৃতি বহুবিধ কবিওয়ারীর গান উদ্ধৃত কবিত্তে পারিলাম না। কিন্তু এখানে যজ্ঞেশ্বরী মারী রসকী কবি রচিত একটি সখী সংবাদ গানের কতকংশ তুলিয়া দেখাইতেছি,—“কর্ণ ক্রমে আশ্রমে সুখ হলে বসি অধিষ্ঠান। হেরে মুখ, গেল হৃৎ, মুটো কথার কথা বলি প্রাণ। আশ্রম কলী করি প্রেমে, এখন আশ্রম হলে যে ক্রমে ক্রমে, গিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে। আশ্রি কুলকলী নদী, শক্তি এই আশ্রমনিবনে। এখন আশ্রমী বলিয়া দিবে নাহি চাও;

ঘরের ধন কেলে প্রাণ, পরের ধন আঙুলে বেড়াও। নাহি চেন ঘর বাসা, কি বসন্ত
কি বরষা, সতীকে করে নিরাশা, অসতীর আশা পুরাও।”

আমরা ভোলা মররা কবির নাম একবার উল্লেখ করিয়াছি; ইনি হর ঠাকুরের চেলা
ছিলেন, তাঁহার নাম মাত্রে শিবজ আরোপ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী দল-বাদ করাতে, ভোলা
গালি খাইয়া বলিতেছে—“আমি যে ভোলা নাথ নই, আমি সে ভোলা নাথ নই; আমি
মররা ভোলা, হরর চেলা, শ্রামবাজারে রই, আমি যদি সে ভোলানাথ হই, তোরা
সবাই, বিলুদলে আমার পূজলি কই।” পূর্বোক্ত কবিগণ ছাড়া মধুসূদনকিন্নর-রচিত
রাধা কৃষ্ণ বিদ্যক অনেকগুলি পদ পাওয়া যায়।

এই সময় পূর্ববঙ্গের বহুসংখ্যক কবিওয়ালা উৎকৃষ্ট গান রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার
পূর্বোক্ত কবিগণের পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্য, আমরা আপাততঃ তাঁহাদের উল্লেখ করিতে
পারিলাম না, সংগ্রহ কার্য সম্পূর্ণ হইলে, পরে তাহা পাঠকগণের বিদিত করিতে
ইচ্ছা রহিল। পূর্ববঙ্গের কবিওয়ালা রামরূপ ঠাকুর কৃত একটি সখী সংবাদ গান মাত্র
এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—(চিতান) “শ্রাম আসার আশা পেয়ে, সখীগণ সঙ্গে নিয়ে,
বিনোদিনী। যেমন চাতকিনী পিপাসার, তৃষিতা জল আশার, কুঞ্জ সাজার তেত্রি কমলিনী ॥
তুলে জাঁতি বুধি কুটারাজ বেলি, গন্ধরাজ ফুল কৃষ্ণ কেলী, নবকলি অর্ধ বিকশিত, যাতে
বনমালী হরবিত, সাজাল রাই ফুলের বাসর, আসবে বলে রসিক নাগর, আশাতে হয়
যামিনী ভোর, হিতে হ'ল বিপরীত। ফুলের শয্যা সব বিকল হল, অসময়ে চিকন কাল,
বাঁশী বাজায়। রঙ্গদেবী তার বারণ করে ঘরে গিয়ে। (ধূয়া) ফিরে যাও হে নাগর,
প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে কাতর, আছে বুমাইয়ে। ফিরে যাও শ্রাম তোমার সম্মান নিয়ে।
(পর চিতনে) ছিলে কাল নিশিখে যার বাসরে। বঁধু তারে কেন নিরাশ করে, নিশি
শেবে এলে রসময়। বঁধু প্রেমের অমন ধর্ম নয়। তুমি জানতে পার সব প্রত্যক্ষে, দুই
প্রেমতে যে জন দীক্ষে, এক নিশিতে প্রেমের পক্ষে, দুইএর মন কি রক্ষা হয়। প্যারী
ভাগের প্রেম করবে না, রাগেতে প্রাণ রাখবে না, এখন মরতে চায় যমুনা প্রবেশিয়ে।”

কবিওয়ালাগণের সঙ্গে যাত্রাওয়াল দলেরও উল্লেখ আবশ্যক। সখী-
সংবাদগান ওপেরার স্থায়, কিন্তু যাত্রাগুলি দেশীয় নাট্যভিনয়,—এদেশে
শ্রীকৃষ্ণ যাত্রাই প্রথম অভিনীত হইত বলিয়া বোধ হয়,—শ্রীকৃষ্ণ যাত্রার
সাধারণ নাম ছিল ‘কালিয়দমন’, কিন্তু এই যাত্রা নামের অর্থ মাত্রে
সীমাবদ্ধ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রকার লীলাই এই ‘কালিয়দমন’ যাত্রার
অভিনীত হইত। আমরা এখানে প্রাচীনকালের বড় বড় যাত্রাওয়াল
অধিকারী মহাশয়দিগের নাম উল্লেখ করিয়া যাইব; গোপালচন্দ্র দাস
উড়ের নাম আমরা পূর্বে লিখিয়াছি। যাত্রাগুলির সর্বমো “গৌরচন্দ্র”

পাঠ হইত, তাহাতে বোধ হয় মহাপ্রভুর পরে যাত্রা সমূহ বর্তমান আকারে প্রবর্তিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ যাত্রার,—বীরভূম নিবাসী পরমানন্দ অধিকারীর নাম সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তৎপর শ্রীদাম স্তবল অধিকারী কৃষ্ণলীলা বিষয়ে যশ অর্জন করেন। এই কবির সম সাময়িক লোচন অধিকারী অজুর সংবাদ ও নিমাই সন্ন্যাস গাহিয়া শ্রোতাগণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন, কথিত আছে ইনি কুমারটুলির বিখ্যাত বনমালী সরকার ও মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে গাহিয়া তাঁহাদিগকে এরূপ মত্তমুগ্ধ করিয়াছিলেন, যে তাঁহারা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া কবিকে অপরিমিত সংখ্যক মুদ্রা দান করেন। করুণ রসে বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় কলিকাতার অল্প কোন ধনী ব্যক্তি ইঁহাকে গান গাইবার জন্ত আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই। জাহাঙ্গীরপাড়া কৃষ্ণনগর নিবাসী গোবিন্দ অধিকারী ও কাটোয়াবাসী পীতাম্বর অধিকারী, শ্রীকৃষ্ণ যাত্রার পরসময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পাতাই হাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী, আনন্দ অধিকারী ও জয়চন্দ্র অধিকারী রামযাত্রার লক্ষ প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। কলাসড়ার গুরুপ্রসাদ বল্লভ চণ্ডীযাত্রা ও বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশ নিবাসী লাউসেন বড়াল ‘মনসার ভাসান’ পালা গাইতেন ও দুই জনেই স্ব স্ব বিষয়ে অদ্বিতীয় বর্ণনায় ছিলেন।*

পূর্ববঙ্গ কৃষ্ণ যাত্রার এক বিশেষ অভিনয়ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এই সকল কবির নাম ও গ্রন্থাদির উল্লেখ আমরা এখন করিতে পারিলাম না,—কিন্তু পর সময়ে যিনি পূর্ববঙ্গের যাত্রাগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তিনি পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন না। এই গীতি-কাব্য-শাখায় আমরা যে সব কবির নাম উল্লেখ করিলাম, কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁহাদিগের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে কৃষ্ণকমলের ত্রায় পদ কর্তা আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই—তিনি এই বৈষ্ণব গীতি সাহিত্যের পুনরুত্থান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর বৈদ্যবংশীয় সদাশিব কবিরাজের বংশোদ্ভব; বংশাবলী এইরূপ, ১ম সদাশিব, ২। পুরুষোত্তম, ৩। কানাই ঠাকুর, ৪। বংশীবদন, ৫। জনার্দন, ৬। রামকৃষ্ণ, ৭। রাধাবিনোদ, ৮। রামচন্দ্র, ৯। মুরলীধর, ১০। কৃষ্ণকমল। সুখসাগর ইঁহাদিগের আদিম বাসস্থান ছিল, পরে যশোহর বোধখানা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন; বোধখানা গ্রাম হইতে এক শাখা নদীয়া ভাজনঘাট গ্রামে উপনিবিষ্ট হন, কৃষ্ণকমলের পিতা মুরলীধর ভাজনঘাট বাসী ছিলেন। এই বৈষ্ণব

* ভারতী, মাঘ, ১২৮৮,—দেখুন।

বৈষ্ণবংশের এক বিশেষ শাখার বিষয় এই,—পুরুষোত্তম গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর জামতা মাধবাচার্য্যের গুরু ছিলেন সুতরাং ইঁহার নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর স্বামী ও সন্তান সন্ততির গুরুকুল।

কৃষ্ণকমল ১৮১০ খৃঃ অব্দে ভাজনঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার মাতা যমুনাদেবী পর ছুঃখ কাতরা আদর্শ সাধবী রমণী ছিলেন। ৭ বৎসর বয়স্ক বালককে মাতৃকোড় বঞ্চিত করিয়া মুরলীধর ঠাকুর বন্দাবনে লইয়া যান। সেইখানে কৃষ্ণকমল ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করেন,—কথিত আছে তথাকার এক নিঃসন্তান ধনকুবের বালকের স্নিগ্ধরূপ ও হরি ভক্তির উদ্ভাম ভাবাবেশ দৃষ্টে তাহাকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া পোষ্য রাখিতে ইচ্ছা করেন। মুরলীধর এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতির জন্য পুত্রসহ পলাইয়া গৃহে আগমন করেন। ৬ বৎসর পরে মা যমুনাদেবী পুনরায় শিশুর মুখ চুসন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণকমল নবদ্বীপের টোলে পাঠ সাধু করিয়া ‘নিমাই সন্ন্যাস’ যাত্রা রচনা করেন ও তাহী অভিনয় করিয়া নবদ্বীপবাসীদিগকে মুগ্ধ করেন। ইঁহার পর তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়; পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে কৃষ্ণকমল হুগলীর সোমরা বাঁকিপুর গ্রামে স্বর্ণময়দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। বিবাহের পর তিনি বদান্য শিষ্য রামকিশোরের সঙ্গ্রে ঢাকায় আগমন করেন। এই সময় হইতে তাঁহার কবিত্বের বিকাশ পাইতে থাকে; সেই সময় ঢাকা সংগীত চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, যাত্রার নানাদল তথায় প্রতিযোগীতা করিতেছিল, কৃষ্ণকমলের “স্বপ্নবিলাস” রচিত হওয়ার পর সেইসব প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সকলেই নূতন কবির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিল। বৈরাগীগণ সারস্ব লইয়া স্বপ্ন বিলাসের গান বাজাইতে লাগিল, বালকগণ পথে পথে চিৎকার করিয়া “এষর হতে ওষর যেতে, অঞ্চল ধরি সাধে সাধে, বলত দে মা ননী খেতে, সে ননী অবনীতে পড়ে র’ল গো” প্রভৃতি গাইতে লাগিল; স্বপ্নবিলাস রচিত হওয়ার পর প্রায় ৩৫ বৎসর অতীত হইয়াছে, এখনও পূর্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সেইসব সংগীত গাহিয়া প্রেমিকগণ নীরবে অশ্রুপাত করেন, সেই নির্মল স্বার্থশূন্য দৈববাণীগুলি মর্ত্যধামের ছুঃখ পীড়িত লোকের মনে উৎকৃষ্ট শিক্ষার প্রভুতির উদ্রেক করিয়া দেয়। আবদুল্লাপুর গ্রামে ‘স্বপ্নবিলাসের’ প্রথম অভিনয় হইয়াছিল, তৎপর কবি ‘রাই উম্মাদিনী’, ‘বিচিত্র বিলাস,

‘ভরত মিলন’ ‘নন্দ হরণ’ ‘জ্বল সংবাদ’, প্রভৃতি পালা রচনা করেন। বিচিত্র বিলাসের ভূমিকায় কবি ‘রাই উম্মাদিনী’ ও ‘স্বপ্নবিলাসের’ কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—“বোধ হয় ইহাতে সাধারণেরই আঁতি সাধিত হইয়াছিল, নতুবা অন্য কিম্বদন্তি মহত পুস্তক বহুদিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা কি?” ডাক্তার নিমিকান্ত চট্টোপাধ্যায় স্বপ্নবিলাস, রাই উম্মাদিনী ও বিচিত্র বিলাস স্বর্ণেন্দ্রী, রাসিয়া প্রভৃতি দেশে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন ও লণ্ডন হইতে এই তিন পুস্তক অবলম্বন করিয়া “The Popular dramas of Bengal” নামক সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করেন।

শেষ জীবন কৃষ্ণকমল ঢাকায় অসামান্য প্রসিদ্ধির সহিত কৰ্ত্তন করেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার সিমসন্ সৰ্বদা তাঁহাকে দেখিতে বাইতেন ও ‘পণ্ডিত গৌসাই’ বলিয়া ডাকিতেন,—“বড় গৌসাই” বলিলে ঢাকাবাসীলোক কৃষ্ণকমলকে বুঝিতেন; অশ্র গদগদকণ্ঠে যখন “বড়গৌসাই” ভাগবত পড়িতেন, তখন তাঁহার করুণ বাখ্যায় কঠিন হৃদয় দ্রব হইত। জীবনে তিনি অনেক পাষণ্ড কোমল করিয়াছিলেন।

কবির বৃদ্ধ বয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যগোপাল গোস্বামীর মৃত্যু হয়, এই শোকে ও নানারূপ জটিল ব্যাধিতে তাঁহার শরীর ভগ্ন হয়—১৮৮৩ খৃঃ ১২ই মাঘ ৭৩ বৎসর বয়সক্রমে চুচুড়ার নিকট গঙ্গাতীরে তাঁহার লীলার অবসান হয়। তাঁহার পুত্র নিত্যগোপাল গোস্বামী এখনও ঢাকায় আছেন, ও তাঁহার পৌত্র কামিনীকুমার গোস্বামী অল্প দিন হয় কলিকাতা হইতে কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলীর এক নব সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে ১৮৯৪ সনের মার্চ মাসের ন্যাসনেল ম্যাগাজিনে ও পৌষ মাসের সাহিত্যে আমরা বিস্তারিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।

কৃষ্ণকমল গোস্বামীর “রাই উম্মাদিনীই” বিশেষ প্রশংসনীয় কাব্য। এই পুস্তকের প্রতি পদেই চৈতন্যদেবকে মনে করিয়া দেওয়ার বিষয় আছে। ঈহারা “চৈতন্য চরিতামৃত” প্রভৃতি পুস্তক পড়েন নাই, তাঁহারা “রাই-উম্মাদিনীর” স্বাদ ভাল করিয়া পাইবেন না,—অঙ্কিত চিত্রখানা বৃন্দাবনের উম্মাদের নামে নবদ্বীপের উম্মাদের। কৃষ্ণকমল পুস্তকের সূচনায় বলিয়াছেন,—“বাদিতে নিজ মাধুরী, * * * নাম ধরি গৌরহরি, হরি বিরহেহে হরি, কাঁদি বলে হরি হরিণ”। আমরা নরসিকাসের ভায় আয়রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ দিয়া থাকি, বাদি-

যের বস্তুতে কে কবে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। বাহিরের বস্তু উপলক্ষ করিয়া আমরা স্বীয় আদর্শরূপেরই সত্ত্বা অনুভব করিয়া থাকি; এইরূপের আদর্শ ব্যক্তিগত, রূপ বস্তুগত হইলে সুন্দর ফল কি নিম্ন পল্লবটি দেখিয়া মাহুষের ন্যায় ইতর প্রাণীগণ ও যুদ্ধ হইত, জাতিগত হইলে চীনদেশের ক্ষুদ্র পদ দেখিয়া আমরা সুখী হইতাম, সমাজগত হইলে দুই প্রতিবাসীর কুচি স্বতন্ত্র হইত না। আমরা প্রত্যেকে ‘নিজের মাদুরী’ দেখিয়া পাগল, সুতরাং ভালবাসাকে একার্থে আত্মরমণ বলা যাইতে পারে, নিজের কামনার প্রতিবিম্বই রূপ ধারণ করিয়া আমাদেরকে অনুসরণ করিয়া থাকে,* গৌর অবতারে এই প্রেম-লীলা অতি পরিশুদ্ধ—নিজকে দুই ভাবিয়া এই প্রেমের উদ্ভব, তখন—“দুটি চক্ষে ধারা বহে অনিবার, দুঃখে বলে বারে বার, স্বরূপ দেখারে একবার,—নতুবা এবার মরি। ক্ষণে গৌরাচাঁদ হৈয়ে দিব্যোন্মাদ, উদ্দীপন ভাবে ভেবে কালাচাঁদ, ধরতে যায় করিয়া দৈন্ত।” (রাই উদ্গাদিনী)। কৃষ্ণকমলের চক্ষে এই বিরহী গৌরচন্দ্রের মধুর মূর্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাই তিনি “রাই উদ্গাদিনী” রূপ উৎকৃষ্ট-রূপক চিত্রে পরিণত করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল এই প্রেমবিশুদ্ধ গৌরা রূপের তুলনায় অল্প সমস্ত রূপ অপকৃষ্ট মনে করিয়াছেন—“চাঁদে যে কলক আছে। ছি, ছি, চাঁদ কি গৌরাচাঁদের কাছে।” প্রেমিক নিজেই পূর্ণ—তবে বিরহ কেন? গোস্থামী মহাশয় বলিয়াছেন,—“তবে যে গোপীকর হয় এতই বিবাদ। তার হেতু প্রোষিতভর্তৃকা রসাবাদ। ক্ষুণ্ণরূপে মূর্তি যখন দেখেন নয়নে। তখন ভাবেন বৃষ্টি এল বৃন্দাবনে। অদর্শনে ভাবেন কৃষ্ণ গেছে মধুপুরী।” (রাই উদ্গাদিনী)। এই মিলন বিরোধী পঙ্খের অন্তরায় যমুনা, যাহা অদ্বৈত ভাবটিকে বৈতণ্যভাবে বিধগু করিয়া বিরহের সৃষ্টি করিতেছে,—তাহা আত্মবিশ্বাসি মাত্র। চৈতন্য চরিতামৃতের আদি খণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই কথার ভাল করিয়া আলোচনা আছে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে কৃষ্ণকমলের রাধিকা—চৈতন্যদেবের ছায়া। তাঁহার প্রেমের আবেগ—নির্মল, নিষ্কাম ও আত্মবিশ্বাসি পূর্ণ। রাধিকা এই প্রেমের আবেশে জড় জগতের স্তরে স্তরে কৃষ্ণ সত্ত্বা অনুভব করিতেছেন, •

* লর্ড বাইরনের পদে এই তথ্যের আভাস দৃষ্ট হয়।—“It is to create and in creating live a being more intense, that we endow with form our fancy, gaining as we give the life we enjoy.”

তাঁহার প্রেম-বিলাপ প্রলাপের ভ্রান্ত অসম্বন্ধ, মধুর ও আশ্চর্য-বিহ্বলতার কারুণ্য মাথা। কবি প্রেম চিত্রের মোহিনী-মুগ্ধ, রাধিকাকে তিনি কৃষ্ণ প্রেমে স্তম্ভী করিয়া গড়িয়াছেন। তাঁহার প্রেম-মাথা কণ্ঠধ্বনি ও প্রেমাত্ম-উদ্বেলিত চক্ষুর সৌন্দর্য্য বুঝাইতে কল্প কি কমলের তুলনার আবশ্যক নাই। চন্দ্রাবলী মূর্ছাপন্ন রাধিকার রূপ দেখিয়া বলিতেছে,—“যখন বঁধুর বামে ঝাঁড়াইত, আবার হেসে হেসে কথা ক’ত, তখন এই না মুখে—মুখের কতই যেন শোভা হ’ত—তা নৈলে এমন হবে বা কেন, বঁধু থেকে আমার বক্ষস্থলে, কেঁদে উঠত রাধা বলে।”—“বঁধু থেকে কুহুম শযায়, হৃদয়ে রাখত বার, সে-ধন আজ ধূলায় গড়াগড়ি যায়।”—“অতুল রাহুল কিবা চরণ দুখানি। আলতা পরাত বঁধু কতই বাখানি—একোমল চরণে যখন চলিত হাটিয়ে—বঁধুর দরশন লাগি গো অনুমাগে। হেন বাধা হ’ত যে পাতিয়ে দেই হিয়ে।” পাঠক দেখিবেন চন্দ্রাবলী রাধিকার কৃষ্ণে প্রীতিই তাঁহার একমাত্র সৌন্দর্য্য বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, কোনও রূপ শারীরিক শোভার বাহ্যলোভ প্রতী তাঁহার দৃষ্টি নাই।

দিব্যোন্মাদের যে স্থলে বিরহিণী রাধিকা কুঞ্জকাননের কুন্দ যুথি লতিকার নিকট হুঃখ কথা কহিতেছেন,—সে স্থলটি কবিস্বমন,—“এই কদ-বের স্থলে, নিয়ে গোপকুলে, তাঁদের হাট মিলাইত। সেরূপ র’য়ে র’য়ে মনে পড়ে গো।” ইত্যাদি স্মরণ করিয়া পাগলিনী মিলনের সুখ গাহিতেছেন; নানা অতীত সুখের কথা মনে হইতেছে, একদিন কৃষ্ণ চম্পককুহুম দর্শনে রাধাকে স্মরণ করিয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন, দুপ্রহরে রাধা স্বেদ সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিলেন,—“সেখি নীলগিরি ধূলায় পড়ে, অগ্নি তুলে নিলাম ধূলা ঝেড়ে, রাগিলাম শ্রাম হিয়ার উপরি। কত যতন ক’রে গো। আমার পরশে চেনন পেয়ে, বলে আমার মুখ চেয়ে, কোন্‌ আমার পরাণ কিশোরী, স্বেদ বলয়ে। কইলাম আমি তোমার সেই দাসী, আমার বুঝি চিন নাই নাথ,—অগ্নি হৃদয়ে ধরিল হাসি, বঁধু কতই বা হুঃখ।” তার পরে কিরূপে তপস্কার ফলে শ্রীকৃষ্ণ লাভ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছেন,—“প্রেম করে রাখালের সনে, কিরূপে হবে বনে বনে, ভুঞ্জস কষ্টক পক্ষ মাঝে—সখি আমার যেতে যে হবে গো, রই বলে বাজিলে বাঁশী,—অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অভি পিছল, চলাচল তাহাতে করিতেন, সখি আমার চলতে যে হবে গো, বঁধুর লাগি পিছল পক্ষে। হইলে আঁখার স্নান, পথ মাঝে কাঁটা পাতি, গতাগতি করিয়ে শিথিতেম, সদা আমার কিরূপে যে হবে গো, কষ্টক কানন মাঝে।” ইহা কি নিষ্কাম দেব-আরাধনার কথা নহে! শ্রীকৃষ্ণ কত আদর করিতেন, এখন তাঁহার

উপেক্ষা কি সহ্য যায়,—“আচরি চিকুর বানাইত বেণী, সখি সে বেণী সবরি,
বানিত কবরী, সালতীর মালে বেড়াইঙ গো। কত সাজে সাজাইত, মুখ পানে চেয়ে
র'ত, বঁধুর বিধু বদন তেঙ্গে যেত দুটি নয়নের জলপুঞ্জে। এই বিলাপাত্মক গীতির
স্তরে স্তরে আসন্ন মূর্ছার মূর্ছনা ; এই অবস্থায় সহসা পাখীর স্বরে কি
মেঘোদয়ে মন উত্থালা হইয়া পড়ে,—উদ্ভাস্ত চক্ষের নিকট মেঘ কৃষ্ণ
প্রাপ্ত হয় ও পাখীর স্বর রাধা নামে সাধা বাঁশীর ধ্বনিতে পরিণত হয় ;
রাধা মেঘকে কৃষ্ণ মনে করিয়া যুক্ত করে বলিতেছেন, “ওহে তিলক দাঁড়াও,
দাঁড়াও হে, অমন করে যাওয়া উচিত নয়। যে বার অরণ লয় নিঠুর বঁধু, তারে কি
বধিতে হয়, হেথা থাকতে যদি মন না থাকে, তবে বেও সে থাকে, যদি মনে
মনরত, না হয় মনের মত, কাঁদলে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে। তাতে যদি
মোদের জীবন না থাকে, না থাকে না থাকে, কপালে যা থাকে তাই হবে ; বঁধু
যথা যে না থাকে, তারে আর কোথা কে, ধরে বেঁধে কবে রেখে থাকে।”
উন্মাদিনী কাদিয়া কাদিয়া বিনাইয়া বলিতেছেন,—“নেত্রপলকে বে নিলে
বিধাতাকে এত ব্যাজে দেখা সাজে কিহে তাকে, বাহৌক দেখা হ'ল মুখ দুই
গেল—এক গত কথায় আর নাই প্রয়োজন” গত কথা বলিতে কৃষ্ণের নির্ভুরতার
কথা আসিয়া পড়ে, সে কথায় তাই ক্রমাশীল বলিতেছেন “গত কথায় আর
নাই প্রয়োজন।” তারপর আবার “বঁধু আমার মতম তোমার অনেক রমণী, তোমার
মতন আমার তুমি গুণমণি, যেমন দিনমণির অনেক কমলিনী, কমলিনীগণের ঐ একই
দিনমণি”—“বঁধু আমার হৃদয় কমলে রাবিয়া জীপদ, তিল আধ বস বস হে জীপদ”
পাগলিনীর এই ভ্রমময়, কৃষ্ণ প্রীতিতে মগ্ন বিহ্বলতার আদত চিত্র পাঠক
নিকে দেখিবেন। এই অবস্থায় ভ্রমেও কিছু সুখ আছে, উহা স্বপ্নে মিলনের
আর, কিন্তু চৈতন্য হইলে এই সুখটুকু লুপ্ত হয়। রাধা এইভাবে কাদিয়া
কাদিয়া মেঘের অদর্শনে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ; সখীগণ এই মুষ্টিমতী
পবিত্রতা—সাক্ষাৎ বিরহরূপিণী রাধিকার প্রেমোক্ত মিজিত প্রেমোক্তি শুনিয়া
বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছিল ; চৈতন্য প্রকুর উন্মত্তাবস্থার বিলাপ শুনিয়া
এইভাবে গদাধর, সুরারি প্রভৃতি পার্শ্বচরগণ দাঁড়াইয়া থাকিত ; এই ছবি
এত সুন্দর ও স্বর্গীয় বলিয়া বোধ হইত, যে তাঁহারা জগতের কথা বলিয়া
তাঁহাকে নির্মল বিশ্বস্তির সুখ হইতে জাগাইতে সাহসী হইত না। রাধিকার
“নিখাসে না যহে কমলের আস” এবং “গোবিন্দ বলিতে চাহে বারে বারে, মুখে নাহি
করে, শুধু ধো ধো করে, বিষমুখ হেরি পরাণ বিদরে।” আজ বুঝি রাধারে বাচান না যায়।”
এই চিত্রের সঙ্গে আর একখানা চিত্র দেখুন—“প্রেমাবেশে মহাপ্রভু পরমর বন।

নাম সমীকরণ করি করে জাগরণ। * * * সর্বরাজি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ।
 ঘো গো শব্দ করে স্বরূপ শুনিল। তখন, টে, চ, অন্ত ১৯ পঃ। মিলাইরা
 না পড়িলে সম্পূর্ণ সুখ উপলব্ধি হইবে না। রাধার সঙ্গে সখীগণ কাঁদিয়া অজ্ঞান
 হইল, তখন চন্দ্রাবলী আদিয়া সেই মুদিত পদ্মসংকুল তড়াগের
 ভ্রাম্য নীরব কুঞ্জবন দেখিয়া বলিতেছে—“মন্দির একি সর্বনাশ আজ বিগিনে, এসব
 কণক পুতলী, পড়িয়াছে চলি, যিহীন বিহারী জীহরি বিনে, গজোৎখাতে যেন কমল
 কানন, মহাবাতে যেন হেম রত্নাবন।” ইত্যাদি। রাধাকে চন্দ্রাবলী চিনিত, কারণ
 চন্দ্রা তাঁহার প্রতিদ্বন্দী,—ভ্রাম্য পর শত্রু আজ রাধার প্রেম দেখিয়া বলিতেছে,
 “মরি যে রাধার রূপ বাঞ্ছে জীপার্কতী, যার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে অরকতী” এতুল চৈতন্য-
 চরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের একটি অংশের পুনরাবৃত্তি।

মুর্ছা ভঙ্গে রাধা ক্ষীণ গলদশ্রু কণ্ঠে আধ ভাঙ্গা স্বরে বিশাখাকে বলিতেছেন,—
 “কো কো কো কোথা গো, বি বি বি বিশাখে, দে দে দে দেখা, সে ব ব ব বঁধুকে।
 নানা নানা দেখে বিবি বিধু মুখে। প প পরণ যে যা যা যায় দুঃখে।” চন্দ্রা মথুরা
 হইতে দাস খতের সর্ভানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া আনিবেন নলাতে,
 প্রেম-বিহ্বলা রাধিকা তাহাই বিশ্বাস করিয়া বলিতেছেন “বঁধ না তার কমল
 করে, ভঁরেনা ক’র না তারে, মনে যেন নাহি পায় দুঃখ। যখন তারে মন্দ কবে, চন্দ্রমুখ
 মলিন হবে, তাই তেবে কাটে মোর বুক।” এইরূপ নিঃস্বল আত্ম-ত্যাগপূর্ণ প্রেমের
 কথা কৃষ্ণকমল গাহিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থাবলীর কথা সাক্ষ করিয়া
 আমরা এই পুস্তকের প্রথম ভাগের উপর পটক্ষেপ করিলাম।

৯য় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

কবিওয়ালাগণের মধ্যে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১১ খৃঃ—১৮৫৮ খৃঃ)
 নাম উল্লেখ করি নাই। তাঁহার লেখা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজীর প্রভাব বর্জিত
 নহে—এজন্য দ্বিতীয়ভাগ পুস্তকই তাঁহার গ্রন্থাদি আলোচনার উচিত স্থল
 হইবে। বিমল সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে “হিন্দুস্থানী রেবিলেস” আখ্যা প্রদান
 করিয়াছেন * ; ইনি অনেকগুলি সখী সঙ্গদ গান রচনা করিয়াছেন, কিন্তু
 বোধ হয় সখী সঙ্গদ গানাপেক্ষা ব্যঙ্গ কবিতা রচনায়ই কবি সুপণ্ডিত
 ছিলেন। তাঁহার ব্যঙ্গগুলি কোন শ্রেণীবিশেষ কি ব্যক্তি বিশেষে সীমাবদ্ধ

* “Ishwar Chandra Gupta, a sort of Indian Rabelais.” Beames Comparative Grammar Vol I. P. 86.

ছিল না,—পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যের উপর সেই ব্যঙ্গের জুররশ্মি নিপতিত হইয়াছে,—লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে লইয়া ব্যঙ্গ, * আইনের স্ত্রী লইয়া ব্যঙ্গ, † ইংরেজের বিবি লইয়া ব্যঙ্গ ‡। তাঁহার এই প্রথর ব্যঙ্গরাশি ও সখী-সম্বাদগীতি কালে সাহিত্যের অধঃস্তরে পড়িয়া বিস্মৃত হইবে—কিন্তু তাঁহার অধ্যবসয়ের চির অরণীয় কীর্তি প্রাচীন কবিগণের জীবন-সংগ্রহ বিলুপ্ত হইবার নহে। আমরা এই পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগে ঐশ্বরচন্দ্রের বিষয় পুনরায় আলোচনা করিব।

এই যুগের বঙ্গসাহিত্যে নানারূপ সংস্কৃত ছন্দ অনুকৃত হইয়াছিল। কুন্তিবাস, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণের সময় হইতে সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গলাতে প্রবর্তিত করার চেষ্টা দেখা যায়। এই অধ্যায়ের সাহিত্যে সেই চেষ্টার পূর্ণ পরিণতি দৃষ্ট হয়। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে বিবিধ ছন্দের কিছু কিছু নমুনা দেখাইতেছি;—

বৃন্তগন্ধী (Hemistich)

“কোটার কি আছে দেখ খুলিয়া। থাকিয়া কি কল বাই চলিয়া ॥ বিদ্যা খোলে কোটা কল ছুটিল। শর হেন ফুলশর ফুটিল ॥” বি, স্ত্র (ভারতচন্দ্র)।

ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী।

“থাক থাক, থাক কাটাইব নাক, আগেতে রাজারে কহি। মাথা মুড়াইব, শালে চড়াইব, ভারত কহিছে সহি।” ঐ

ভঙ্গ ত্রিপদী।

“ওরে বাছা ধুমকেতু, মা বাপের পূণ্য হেতু, কেটে কেল চোরে, ছেড়ে দেহ মোরে, ধর্মের বাধহ সেতু।” ঐ

দীর্ঘ ত্রিপদী।

“কালীয়দহের জলে, কুমারী কমল দলে, গজ গিলে উগারে অঙ্গনা।” ক, ক, চ।

* “লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে। কিছুমাত্র স্তম্ভ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে ॥ যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে। নিজে থাক, খেতে দাও সাধ্য অনুসারে ॥ ইথে যদি কমলার সন নাহি সরে। প্যাঁচা লয়ে বাউন মাতা কৃপণের ঘরে ॥”

† বিধবা বিবাহের আইন সম্বন্ধে—“সকলেই এইরূপ বলাবলি করে। ছুঁড়ির কল্যাণে বেন বুড়ি নাহি ভরে ॥ শরীর পড়েছে ফুলি চুলগুলি পাকা। কে ধরাবে সাহু তাকে কে পরাবে শাখা ॥”

‡ “বিড়ালাকী বিশ্বম্ভরী মুখে গন্ধ ছুটে।”

দীর্ঘ চৌপদী ।

“এক কাণে শোভে কণিমণ্ডল, এক কাণে শোভে মণি কুণ্ডল, আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি
ধবল, আধই গন্ধ কস্তুরীয়ে ।” অ, ম ।

লঘু চৌপদী ।

“আহা মরে যাই, লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই, ভঙ্গি উহারে । বোগিনী হইয়া, উহারে
লইয়া যাই পলাইয়া সাগর পারে ॥” ভা, বি, হ ।

মাল কাপ ।

“কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি পড়ে । প্রাণসহে, কত সহে, নাহি রহে ধড়ে ॥”
কবিরঞ্জন, বি, হ ।

একাবলী—একাদশাক্ষরাবৃত্তি ।

“বড়র পীরিতি বাসির বাধ । কণে হাতে দড়ী, কণেকে চাঁদ ।” ভা-বি, হ ।

একাবলী—দ্বাদশ অক্ষরাবৃত্তি ।

“নয়ন যুগলে সলিল গলিত । কনক মুকুরে মুকুতা খচিত ।” কবিরঞ্জন বি, হ ।

তুণকছন্দ ।

“রাজাখণ্ড, ল৩৩৩, বিষ্ণু লিঙ্গ ছুটিছে । হলধূল, কুলকুল, ব্রহ্মডিঘ কুটিছে ॥” অ, ম ।

দিগক্ষরাবৃত্তি ।

“মুহুমল দক্ষিণ পবন, হুশীতল হৃগন্ধি চন্দন, পুষ্পরস রত্ন আভরণ, আজু কেন হৈল
হত্যাশন ।” আলোয়াল ।

তরল পয়ার ।

“বিনা হৃত, কি অকৃত, গাঁথে পুষ্পহার । কিবা শোভা মনো লোভা, অতি চমৎকার ॥”
কবিরঞ্জন বি, হ ।

হীনপদ ত্রিপদী ।

“হর হর নম দুঃখ হর । হর রোগ হর তাপ, হর শোক হর পাপ, হিমকর শেখর শঙ্কর ॥”
অ, ম ।

মাত্রা ত্রিপদী ।

“খন খন কঙ্কণ, নুপুর রণ রণ । ঘুম ঘুম ঘুমুর বোলে ।” ভা—বি, হ ।

মাত্রা চতুষ্পদী ।

“হে শিব মোহিনী, শুভ নিহাদনি, দৈত্য বিঘাতিনি দুঃখ হরে ॥” অ, ম ।

তোটক ।

“রমণী মণি নাগর রাজ কবি । রতি নাথ বিনিমিত চাক ছবি ॥” কবিরঞ্জন,—বি, হ ।

ভূজঙ্গ প্রয়াত ।

“তনুরে মহারত্ন ডাকে গভীরে । অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥” অ, ম ।

পূর্বোক্ত পদগুলিতে আমরা নানারূপ ছন্দের কিছু কিছু নমুনা মিলিলাম। সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গলাতে অনেক স্থলে খাটিয়াছে ও পদ বিন্যাস সংস্কৃতের জায়গাই স্থানিপূর্ণ ও প্রতিমধুর হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বিধান সর্বত্রই নূতনকালের উপযোগী নহে, ঠিক সংস্কৃতের নিয়মামুসারে গুরু ও লঘু উচ্চারণে আবদ্ধ রাখিয়া বাঙ্গলা পদবিন্যাস করিতে গেলে শব্দগুলি সর্বত্র স্থললিত হয় না; ভারতচন্দ্রের রচনায় ছন্দোভঙ্গের দৃষ্টান্ত অল্প, কিন্তু একবারে না আছে এমন নহে;—যথা তোটক ছন্দে “ওনি হুন্দর হুন্দরীয়ে কহিছে।” এখানে “রী” গুরু হওয়া উচিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র ভিন্ন অন্যান্য কবির রচনায়, ছন্দোভঙ্গের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে, যথা রামপ্রসাদের কবিতা-সুন্দর; তোটকছন্দে,—“ধনি মুখ চিবুক ধরে বন্ধন।” পদে “মু” ও “বু” লঘু হইয়াছে, এই দুই স্থলে উচ্চারণ গুরু হওয়া আবশ্যক; হরিলীলার ভূজঙ্গপ্রকৃতছন্দে—“বসিলা হুবর্ণে পীঠে হাসিছে। প্রবাসাধরে মল মল ভাসিছে।” “হাসিছে” ও “ভাসিছে” র “সি” র গুরু উচ্চারণ রাখা উচিত। আর অধিক উদাহরণ দেওয়ার স্থান নাই; সংস্কৃতের ছন্দানুকরণ এখনও শেষ হয় নাই, আধুনিক সময়ে মাইকেলের সম- সাময়িক কবি বলদেব পালিত রচিত ভর্তৃহরি কাব্য এই চেষ্টার পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়, আমরা কিঞ্চিৎ নমুনা না উঠাইয়া পারিলাম না। মলিনীছন্দঃ—“কুল সম হুমারী, দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী। অচপল তড়িতাভা হুন্দরী গোরকান্তি। মধুর নবকলকা পদ্মিনী অগ্রগণা। যুবক নয়ন লোভা কামিনী কাম শোভা।” বংশস্থবিল,—“তথার ভীমাসিত-বর্ষ ভূষিত। প্রচণ্ড আভাসয় চক্রে মন্তকে। সবিন্দুতাপি প্রলয়োন্মুখব্রবৎ। কৃপাণ পাণি প্রহরি ব্রজে ভূমে।” এখন সংস্কৃতের পস্থা হইতে তির্য্যক গমন করিয়া নব নব ভাবুকগণ নূতন ছন্দে কবিতা লিখিতেছেন, তাহা আমাদের পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে আলোচ্য।

প্রথম ভাগ ইতিহাসে আমরা পদ্য সাহিত্যেরই আলোচনা করিলাম। গদ্য রচনার নমুনা একবারে না আছে এমন নহে, কিন্তু তাহা একরূপ নগণ্য। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে আমরা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ দেখাইবার পূর্বে যাহা কিছু প্রাচীন গদ্য রচনা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা উচিত মনে করি,—সেই ক্ষুদ্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গদ্য রচনাগুলি নব সাহিত্যের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

আমরা পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের 'গদ্য পদ্যময়' রচনার উল্লেখ পাইয়াছি, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের মতে—এই 'গদ্য রচনা' পদ্যেরই এক প্রকার রূপভেদ। এইমত নিঃসন্দিক্ধ ভাবে গ্রহণ করা উচিত কি না বলিতে পারি না। চৈতন্যপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর রূপ-গোস্বামী-বিরচিত 'কারিকা' নামক ক্ষুদ্র গদ্যপুস্তক পাওয়া গিয়াছে * ; প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বের বাঙ্গলা গদ্য বেশ প্রাঞ্জল ও গুরুতর বিষয় রচনার সর্বস্বতোভাবে উপযোগী ছিল বলিয়া বোধ হয়, দুইটি স্থল তুলিয়া দেখাইতেছি—প্রারম্ভ-বাক্য "শ্রীশ্রীরাধা বিনোদজয়। অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয়। শব্দ গুণ গন্ধ গুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শ গুণ এই পাঁচ গুণ। এই পঞ্চ গুণ শ্রীমতী রাধিকাতে ও বসে। শব্দ গুণ কর্ণে গন্ধ গুণ নাসাতে রূপগুণ নেত্রে রসগুণ অধরে ও স্পর্শগুণ অঙ্গে। এই পঞ্চগুণে পূর্বরাগের উদয়। পূর্বরাগের মূল দুই; ইঠাৎ অবণ ও অকস্মাৎ অবণ।" ইত্যাদি। শেষ অংশ—“আগে তারে সেবা। তার ইঙ্গিতে তৎপর হইয়া কার্য্য করিবে আপনাকে সাধক অভিমান ত্যাগ করিবে। ইতি।”

আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত “রাগময়ীকণা” নামক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা পদ্যগ্রন্থ, কিন্তু যে স্থলে কোন স্থত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সবস্থল গদ্যে লিখিত ; একটা অংশ এইরূপ—“রূপ তিন কি কি রূপ—শ্রীমতঃ ষেতং গৌরোধ্যান কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণ জিউর পঞ্চনাম। গুণ তিনমত হয়ে কি কি গুণ। ব্রজলীলা ১। দ্বারকালীলা ২। গৌরলীলা ৩। দশা তিন কি কি দশা।” ইত্যাদি। বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নরোত্তম দাস রূত একখানি বাঙ্গলা গদ্যগ্রন্থ পাইয়াছেন (১০ই আশ্বিন ১৩০১, বঙ্গবাসী) তাহার ভাষা এইরূপ তাহার রূপ কি। স্বরূপ প্রকৃতিতে জড়িত। বাহ্যজ্ঞান রহিত। তেঁহ নিত্য চৈতন্য। তাহাকে জানিব কেমনে। তেঁহ আপনাকে আপনি জানে। যে জন চেতন সেই চৈতন্য। অতএব স্বরূপ এক বস্তু হয়। * * * তেঁহ প্রথম পুরুষ। তাঁর নামাঙ্কে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়; স্মৃতিকল্পদ্রুম নামক ৥ নিজ বাটীতে প্রাপ্ত একখানি প্রাচীন বাঙ্গলা গদ্য গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং 'মহামহোপাধ্যায়' শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে (সেরপুর) প্রাপ্ত অপর একখানি বাঙ্গলা গদ্যে রচিত স্মৃতি গ্রন্থের বিষয়

* বর্তমান রয়না নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ এই পুস্তকের কথা প্রথম প্রকাশ করেন। বাক্য ১২৮৯ সন, অষ্টম সংখ্যা, ৩৬৯ পৃঃ।

জানাইয়াছেন । * আমরা রাজা পৃথীচন্দ্রের রচিত পৌরী-মঙ্গল কাব্যে “স্মৃতি ভাষা কৈল রাধা বল্লভ শৰ্মণ ।” পদে স্মৃতির যে অনুবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা খুব সম্ভব গদ্য গ্রন্থ ।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিদর্শন দ্বারা বোধ হয় দুর্জয় স্মৃত্তের ব্যাখ্যা সাধারণের বোধযোগ্য করিতে যাইয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গলা গদ্যগ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে । কিন্তু ধারাবাহিক গদ্য রচনার অনুশীলন হইতেছিল, বলিয়া বোধ হয় না ।

আমরা দেব-ডামরতন্ত্রে ভূতের মন্ত্রের ন্যায় কতকগুলি বাঙ্গলা গদ্যের নমুনা দেখিয়াছি । এই তন্ত্র, খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়, বাঙ্গলাটি বোধগম্য হইল না, একটি ছত্র এইরূপ, “গোসাই চেলা সহস্র কামিনী ডোমা চাঁড়াল পাই মুই আকাটান বিষ হাতে এ গুয়া পান খাইয়া ।” বেং গং হস্ত লিখিত পুঁথি ।

স্মৃত্তের ব্যাখ্যায় সহজ বাঙ্গলার নমুনা দৃষ্ট হয়; বৈষয়িক পত্রাদির ভাষাও বেশ সহজ; আমরা কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের সময়ে লিখিত কতকগুলি পত্র দেখিয়াছি, তাহার রচনা আধুনিক পদ্ধতি হইতে বিভিন্ন হইলেও সহজ, এবং ভাব-প্রকাশে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া বোধ হয় । ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে নন্দকুমার মহারাজ কনিষ্ঠ রাধাকৃষ্ণ রায়ের ও ‘দীননাথ সামন্তজীউ’র নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাওয়া গিয়াছে; মে, বেভারিজ সাহেব ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ন্যাসনাল মেগাজিন পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই পত্র জুইখানার ভাষা সহজ কিন্তু মধ্যে মধ্যে উর্দুর সহিত মিশ্রিত, যথা—“অতএব এ সময়ে তুমি কমর বাদিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার, তবেই যে ইউক, নচেৎ আমার নাম লোপ হইল, ইহা মকররর, মকররর জামিবা । নাগাদি ওরা ভাত্র তথাকার রোয়দাদ সমেত, মজুমদারের লিখন সম্বলিত মহুবা কালেশ এখা নৌছে তাহা করিবা, এ বিষয়ে এক পত্র লক্ষ্য হইতে অধিক জানিবা ।”

রাজ দরবারে উর্দু ও সংস্কৃত মিশিয়া একরূপ বিকৃত বাঙ্গলাগদ্য গঠন করিয়াছিল; এখন ও “কস্য কর্জ পত্রমিদং কাব্যাকাংগে,” “টাল মটালে টাকা আদাম না করাতে,” “ভয়াবা কার্তিক মাসে টাকা পরিশোধ করিব” প্রভৃতি দলিল-প্রচলিত ভাষার সেই বিকৃত রূপের নমুনা বিদ্যমান আছে । আমরা পাঠ্য পুস্তক ও উপন্যাসের ভাষা সংশোধনার্থ ঘোর কোলাহল করিতেছি, কিন্তু সরকারী কাচারী ও জমিদারের সেরেস্তার প্রাচীন জটিল গদ্য বন্ধমূল

হইয়া রহিয়াছে, সেখানে সংস্কারের বীজ এখনও স্থানে পাইতেছে না। আমরা নিম্নে ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্য প্রদত্ত একখানা তাম্র শাসনের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিতেছি,—“৭ স্বান্তি শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য দেব কিম্বদন্ত-বিজই মহা মহাদয়ি রাজনামদেশোহয়ং শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে হনতে রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগনে মেহেরকুল মৌজা বোলমল অজ হামিলা জমা ১৮ আটার কাশি ভূমি শ্রীনরসিংহ শর্মার ব্রহ্মউত্তর দিলাম এহার পাঠা পক্ষক ভেট বেগার ইত্যাদি মানা যুখে ভোগ করোক। ইতি সন ১০৭৭ তে ১৯ কার্তিক।” ৭৮ পৃষ্ঠার ফুটনোটে উদ্ধৃত অনন্তরাম শর্মার গদ্য রচনার কিছু অংশ দেখাইয়াছি, তাহাও প্রায় এই সময়ের রচনা। এই উর্দু মিশ্র ভাষাকে যথা সাধ্য সহজ করিয়া ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এইচ, পি, ফর্টার সাহেব কতকগুলি আইনের তর্জমা করেন, তাহা দ্বিতীয়ভাগে আলোচনা করিব। সেই তর্জমার ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও অঘষ ইংরেজীর অনুকরণে সম্পাদিত হইয়া দুর্বল হইয়াছে, তাহাতে কর্ম, কর্তা, ও ক্রিয়ার যথেষ্টাচার সন্নিবেশ হেতু ছত্রগুলির ঘাটামুণ্ড ঠিক পাওয়া যায় না।

যে ভাষায় টেকচাঁদ ঠাকুর “আলালের ঘরের দুলাল” রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই প্রবর্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে, কিন্তু অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে “কামিনীকুমার” রচক কালীকৃষ্ণ দাস “গদ্য ছন্দের” যে নমুনা দিয়াছেন, তদৃষ্টে “আলালী ভাষা” তাঁহার সময়ও প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। আমরা “কামিনীকুমার” হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

রাম বল্লভের তামাক সাজা।

গদ্যছন্দ ॥ সদাগর অতিকাতরে এইরূপ পুনঃ পুনঃ সপথ করাতে সন্দরী ইবৎ হাস্য পূর্বক সোনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেক। ওহে চোপদার এই চোর এতাদৃশ কটুদিব্য বারম্বার করিছে ও নিতান্ত শরণাগত হইয়া আশ্রয় বাচিঙ্গা করিতেছে অতএব শরণাগতে নিগ্রহ করা উচিত নহে বরং নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দেওয়া যেন বিধি সম্মত বটে। আর বিশেষত আপনাদি অধিক ভৃত্য সঙ্কেতে নাই অতএব অস্ত ২ কর্ম উহা হৈছে বড় হউক আর না হউক কিন্তু এক আখ ছিলিম তামাক চাহিলে ও তো সাজিয়া দিতে পারিবেক। তাহার আর তো কোন সম্বন্ধ নাই তবু যে অনেক উপকার। সোনা কহিলেক হী ক্ষতি নাই তবে থাকে থাক। কামিনী এইরূপ সোনার সহিত পরামর্শ করিয়া সদাগরকে কহিতেছে। শুন চোর ভূমি যে অকর্ম করিয়াছ তাহার উপযুক্ত ফল তোমাকে দেওয়া উচিত কিন্তু তোমার নিতান্ত স্তূনতা ও বিনয়ে কাকতি মিনতি এবং কঠিন শপথে এ যাত্রা ক্ষমা করিলাম। এইক্ষণে আমার সর্বদা আজ্ঞাবারী হইয়া

ধাকিতে হইবেক আমি যখন বাহা কহিব তৎক্ষণাৎ সেই কর্ম করিবে তাহাতে সন্তোষ করিলে তদণ্ডে রাজার নিকট প্রেরণ করিব তাহার আর কথা নাই কিন্তু যদি কর্মের দ্বারায় আমাকে সন্তোষ করিতে পারহ তবে তোমার পক্ষে শেষ বিবেচনা করা যাইবেক । সদাগর এই কথা শুনিয়া মনে ২ বিবেচনা করিলেক যে, রাম বাঁচা গেল আর ছয় নাই পরে কৃতজ্ঞলী পূর্বক কাশিনীর সম্মুখে কহিতেছে মহাশয় আপনি যে ঘোর দায় হৈতে এদাসের প্রাণ রক্ষা করিলেন ইহাতেই বোধ হয় আপনি জগদ্বাস্তুরে এদিনের কেহ ছিলেন তাহার তোন সন্দেহ নাই নতুবা এমত উপকার পর পরের যে তো কখন করেন না সে বাহা হউক আজি হৈতে কর্ত্তা তুমি আমার ধরম বাপ হইলে যখন যে আজ্ঞা করিবেন এই ভূতা কৃত সাধা প্রাণ পনে পালন করিব । কামিনী কহিলেক ওহে চোর তুমি আমার আর কি কর্ম করিবে কেবল হুকুম কর্মে সৰ্কদা নিযুক্ত থাকহ তার এক কথা তোমাকে চোর চোর বলিয়া সৰ্কদা বা কাঁহাতক ডাকি আজি হৈতে আমি তোমার নাম রামবল্লভ রাখিলাম । সদাগর কহিলেক যে আজ্ঞা মহাশয়, এইরূপ কথোপ কথনান্তে অনেক বিলম্বে কামিনী কহিলেক ওহে রামবল্লভ একবার তামাক সাজ দেখি রামবল্লভ যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তামাক সাজিয়া আসবোলা আনিয়া ধরিয়া দিলেক এই প্রকার রামবল্লভ তামাক সাজ কর্মে নিযুক্ত হইলেন পরে ক্রমে ক্রমে তামাক সাজিতে সাজিতে রামবল্লভের তামাক আজার এমত অভ্যাস হইল যে রামবল্লভ যদ্যপি ভোজনে কিছা শয়নে আছেন ও সেই সময়ে কামিনী যদি বলে ওহে রামবল্লভ কোথায় গেলেহে রামবল্লভের উত্তর আজ্ঞা তামাক সাজিতেছি । কালীকৃষ্ণ দাস বলে পশ্চাৎ রামবল্লভের এমনি কন্ত হইল যে কামিনীকে আর পষ্ট রামবল্লভ বলিতে হয় না রাম বলিবা মাত্রই রামবল্লভ তামাক সাজাইয়া মজত ।

এক শতাব্দী পূর্বে যে ভাষায় কথা বার্ত্তা চলিত, তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান কালের কথিত ভাষার বড় একটা বৈষম্য হয় নাই । কালীকৃষ্ণ দাস ঠিক কথিত ভাষায় উদ্ধৃত অংশ রচনা করিতে উহার মধ্যে সেকেলে গন্ধ বেশী বর্ত্তে নাই । কিন্তু বাঁহারা বাঙ্গলা গদ্য ইংরেজীর ছাঁচে ঢালিতে চেষ্টা করিলেন, তাঁহাদের ভাষা কালীকৃষ্ণ দাসের ভাষার ন্যায় সহজবোধ্য হয় নাই । রাজা রামমোহন রায়ের ভাষায় শব্দাডম্বর নাই, তথাপি তাহা সহজ বোধ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা । কিন্তু বাঁহারা বাঙ্গলা গদ্যে পাণ্ডিত্য খাটাইতে ইচ্ছুক হইলেন, তাঁহারা শব্দ পরম্পরায় ভাষার শ্রী সম্পাদন করিতে যাইয়া বাঙ্গলা রচনাকে নিতান্ত বিশ্রি করিয়া তুলিয়াছিলেন । প্রাচীন এক খানা শিঙবোধকে স্থায়ী ও দ্রীর পরম্পরের নিকট পত্র লিখিকার যে সাদৃশ্য প্রদত্ত হইরাছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ।

শিরোনাম। “ঐহিক পারত্রিক নিস্তার কর্ত্তক ভাবার্ণব নাবিক জীযুক্ত আশেখর মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদ্মবাস্তব প্রদানের ।”

“শ্রীচরণ সরসী দিবানিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী প্রণম্য শিবধর প্রাণেশ্বর নিবেদনাকাদৌ মহাশয়ের শ্রীপরমরোহিত স্বরূপমাত্র অত্র শুভবিশেষ । পরম মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চিরকাল কাল বাপন করিতেছেন, যে কালে এদাসীর কালরূপ লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছেন, সে কাল হরণ করিয়া দ্বিতীয়কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সাধনা করা হুই কালের সুখকর বিবেচনা করিবেন । * * * অতএব জাগ্রত নিদ্রিতার আয় সংযোগ নকলন পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীচরণ যুগলে স্থানং প্রদানং কৃত্ব নিবেদন মতি ।”

স্বামীর উত্তর—শিরোনাম, “প্রানাদিকা স্বধর্মপ্রতিপালিকা শ্রীমতী মালতী মঞ্জরী দেবী সাবিত্রীধর্মপ্রতিবেদু”

পরম প্রণয়্যারব গভীর নীর তীর নিবসিত কলেশরাসসম্মিলিত নিত্যন্ত প্রণয়্যাপ্রিত শ্রীঅনঙ্গমোহন দেব শর্দনঃ ঝটিত যটিত বাহিত্তান্তকরণে বিজ্ঞাপনকাদৌ শ্রীমতীর শ্রীকর-কমলাকিত্ত কমলপত্রী পটিতমাত্র অত্র শুভবিশেষ । বহুদিবসাবধি প্রতাবিধি নিরববি প্রয়াস প্রবাস নিবাস তাহাতে কর্ম ফাঁস বাতিরিক্ত উত্তলান্তকরণে কাল বাপন করিতেছি । অতএব মন নয়ন প্রার্থনা করে যে সর্বদা একতা পূর্বক অপূর্ব সুখোদ্ভব মুখারবিল্ল যথ্যযোগ্য নধূকরের আয় যথুমানাদি আশাদি পরিপূর্ণ হয় । প্রয়াস বীমাংসা প্রণীতা শ্রীশ্রীঈশ্বরেচ্ছা শীতান্তে নিত্যন্ত সংযোগ পূর্বক কালবাপন কর্তব্য, বিভোগার্জন তদর্থে তৎসম্বন্ধীয় কর্তব্যক দুঃখিতা এতাদৃশ উপাঞ্জন প্রয়োজন নাই হির সিদ্ধান্ত করিয়াছি । জ্ঞাপনামিতি । অনুপ্রাস বাহুল্যকেতু প্রাচীন গদ্যলেখা স্থলে স্থলে ঢকানাদেয় আয় প্রতিকটু ও প্রহলিকার আয় দুর্কোধ্য হইয়া পড়িত যথা—“রে গাবও বও এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মও কাণ্ড দেখিয়াও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া বকাণ্ড প্রত্যাশার নায় লঙভও হইয়া ভও সম্বাসীর নায় ভক্তিভাও ভঞ্জন করিতেছ এবং গবা পণ্ডের আয় গণ্ডে জন্মিয়া গণ্ডকীহ গণ্ড শিলার গণ্ড না বুঝিয়া গণ্ডগোল করিতেছে ?” অনুপ্রাস এস্থলে ভাবার অলঙ্কার হয় নাই, গলগণ্ড হইয়াছে । পূর্বোক্ত রচনার পার্শ্বে “কোকিল কালানাপ্ত বাচাল বে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাতাচ্ছ নিব্বারান্তঃ কণাছয় হইয়া আসিতেছে ।” (প্রবোধ-চক্রিকা) প্রভৃতি উৎকট গদ্য সন্নিবেশ করা যাইতে পারে । আমরা দ্বিতীয় ভাগে গদ্য সাহিত্যের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব ।

আমরা এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় বঙ্গাকর সম্বন্ধে লিখিয়াছি, সেন-রাজগণের তাম্রশাসনের অক্ষর বাঙ্গলা । ১১৬৫ শকে (১২৪৩ খৃঃ) চন্দ্র-বংশীয় নীমোদর নামক রাজা পৃথীধর শর্মা নামক যজুর্বেদী এক ব্রাহ্মণকে ৫ দ্রোণ ভূমি প্রদান করিয়া যে তাম্রশাসন প্রচার করেন, তাহা চট্টগ্রামের স্রদর টেশনের অদূরবর্তী নসিরাবাদ নামক স্থানে পুষ্করিণী ধননকালে প্রাপ্ত

হওয়া দিরাছে। এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্যালে * এই তাম্রশাসনের প্রতিলিপি ও সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক কোলকাতা সাহেবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—“এই তাম্রশাসনের প্রায় সমস্তই অক্ষরই আধুনিক বঙ্গলার মত, কয়েকটি মাত্র ত্রিহতে অক্ষরের স্থায়।” †

বল্লাল সেন, লক্ষণ সেন ও কেশব সেন প্রদত্ত তাম্রশাসনগুলি পূর্বোক্ত তাম্রশাসন হইতে ও প্রাচীন। মহারাজ লক্ষণ সেন শ্রীদীপ্বর শর্ম্মাকে ভূমি দান করিয়া যে তাম্রশাসন প্রচার করেন, ওয়েষ্টমেকট সাহেব তাহার প্রতিলিপি ও বিবরণ এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্যালে প্রকাশিত করেন। ‡ দিনাজপুরের অন্তর্বর্তী দেবকোট নামক গওগ্রাম হইতে কিছুদূরে “তর্পন-দীঘির” পক্ষোদ্ধারকালে এই তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসন ও লক্ষণ সেনের পুত্র কেশব সেন প্রদত্ত তাম্রশাসনের অক্ষর সম্বন্ধে ওয়েষ্টমেকট সাহেব বলেন,—“এই উভয় তাম্রশাসনের অক্ষরকেই দেবনাগর না বলিয়া সাদলা বলা বাইস্তে পারে।” §

লক্ষণ সেন মহারাজের অপরাপর তাম্রশাসন ও তাঁহার পিতা বল্লাল সেনের তাম্রশাসনের অক্ষর সম্বন্ধেও এই বক্তব্য প্রযুক্ত। বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন ৯৩০ শকের (১০০৮ খৃঃ) হস্তলিখিত একখানা কাশীখণ্ড তিনি পাইয়াছেন তাহা বঙ্গাক্ষরে লিখিত, কিন্তু তিনি সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার (১৩০৩ সাল ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ) সেই কাশীখণ্ডের অক্ষরের যে প্রতিলিপি দিয়াছেন, তাহা তত প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। সেই গ্রন্থ প্রকৃতই ৯৩০ শকের হস্তলিখিত হইলে বোধ হয় প্রতিলিপি যথার্থরূপে উঠে নাই।

এইসব অক্ষরের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ৮০০ বৎসর ও ততো-ধিক কালের প্রাচীন সাদলা অক্ষরের যেরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা মূলতঃ আধুনিক বঙ্গাক্ষরের সূক্ষ্ম ও এক সংজ্ঞায় বাচ্য হওয়ার সম্পূর্ণ

* Journal Asiatic Society Vol XLIII, No. 4 (1874)

† “The character agrees nearly with that now in use in Bengal ; but some of the letters bear a close resemblance to the writing of Tribhut.”
Do. P. 318.

‡ Journal Asiatic Society Vol XLIV. No. I (1875)

§ Both are a type rather Bengali than Dev Nagri—J. A. S. Vol XLIV. No. I. P. 2 (1875).

যোগ্য। আমরা ইতিপূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি ত্রিহতের ‘ব’ এর নীচে শূন্য দিয়া ‘র’ এর মত লিখার পদ্ধতি ও অন্যান্য কোন কোন বিষয়ে ত্রিহতের অনুকৃতি আমরা অনেকগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গলা পুঁথিতে দেখিয়াছি। কলরিজ সাহেব ও লক্ষণ সেন এবং কেশব সেনের তাম্রশাসনের অক্ষর সম্বন্ধে সেই কথা বলিয়াছেন। এই প্রাচীন অক্ষরগুলির ক্রম পরিবর্তন অতি কৌতূহলকর দৃষ্ট। সেইসব তাম্রশাসন ও পরবর্তী প্রাচীন পুঁথিগুলি অক্ষর ক্রমে কিরূপে আধুনিকভাবে গঠিত হইয়াছে—আমরা তাহা দেখিয়াছি, কিন্তু একান্ত অভিপ্রায় সত্ত্বেও নানারূপ অনুবিধার জন্য একটি ধারাবাহিক অক্ষরপ্রতিলিপি উঠাইয়া পাঠকগণকে দেখাইতে পারিলাম না।

কেহ কেহ বলেন বঙ্গাক্ষর মাগধী হইতে উদ্ভূত। এক সময়ে মগধের সভ্যতা সমস্ত ভারতবর্ষের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছিল, কিন্তু তজ্জন্যই যে বঙ্গাক্ষর মাগধী অক্ষর হইতে উদ্ভূত কিম্বা বঙ্গাক্ষর অপেক্ষা মাগধী অক্ষর বেশী প্রাচীন তাহার প্রমাণ কি? ললিত বিস্তরে দৃষ্ট হয়, বুদ্ধদেবের পূর্বে হইতে বঙ্গাক্ষর প্রচলিত ছিল। মগধ বাঙ্গলা দেশের নিকটবর্তী, এইজন্য ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানের প্রচলিত অক্ষর হইতে মাগধী অক্ষরের সঙ্গে বাঙ্গলা অক্ষরের বেশী সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

প্রায় শতাব্দী পূর্বে যে সব শব্দ বঙ্গসাহিত্যে খুব প্রচলিত ছিল, তাহাদের কোন কোনটির ব্যবহার ক্রমে ক্রমে উঠিয়া বাইতেছে। পুছিল, পেখিল, মেনে (এই শব্দ চণ্ডীদাসের কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত বহু কবির রচনায়ই পাওয়া যায়, শেষোক্ত কবিদ্বয়ের পুস্তকে ইহার বিশেষ ছড়াছড়ি, কিন্তু অনেক স্থলেই এই শব্দের কোম অর্থ দৃষ্ট না,—পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়) নেহারে, ঘরগী, দৌহে, (ছইজন), আচম্বিত, এখায়, এবে, এড়িল, প্রভৃতি শব্দের গদ্য সাহিত্যে এখন আর স্থান নাই, ইহাদের কোন কোনটির প্রভাব পদ্য সাহিত্যেও অন্তগামী।

সংস্কৃত শব্দের অর্থ কোন কোন স্থলে বাঙ্গলায় পরিবর্তিত হইয়াছে, সংস্কৃত “প্ৰীতি” শব্দ বলিতে বাহা বুঝায় বাঙ্গলা “পীরিত” শব্দে বোধ হয়, তাহা

বুঝায় না। সংস্কৃত ‘রাগ’ শব্দ বাঙ্গলায় সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু চৈতন্যপ্রভুর সময়েও রাগ অর্থ ক্রোধ ছিল না,—গোবিন্দ দাসের করচাম “রাগে ডগমগ শুভু দেয় সম্ভরণ। পাড়ে দাড়াইয়া দেখে যত ভক্তগণ।” অংশে রাগ শব্দ সংস্কৃতের অর্থ বিচ্যুত হয় নাই, এখন রাগ এবং অনুরাগ! বাঙ্গলায় দুই ভিন্নার্থবোধক শব্দ। ভর্তা হইতে যে শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বাঙ্গলায় কেবল মাত্র অর্থ হ্রষ্ট হয় নাই, বোধ হয় একটু অম্লীল হইয়াছে। ভাগুরী নামে পরিচয় দিতে এক সময়ে মহারাজ হুর্ঘ্যোধন ও কুন্তিত হন নাই, এখন ইহার অর্থ তজপ গৌরবজনক নাই। দেব শব্দ হইতে ‘দে’ শব্দ উৎপন্ন হইয়া এখন ইহা ভাষায় নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াছে, একটু মর্যাদা বিশিষ্ট হইলে “দে’ গণ ‘দাস’ আখ্যা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন। ‘দেব’ গণের বংশধর ‘দাস’ হইতে ও হীন হইয়াছেন। মহুয্যের ভাগ্যচক্রের জায় শব্দগুলির ভাগ্যচক্র ও পরিবর্তনশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। “মহোৎসব” শব্দের অর্থ বাঙ্গলায় সীমাবদ্ধ হইয়াছে, বৈষ্ণবগণ এই শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত করিয়াছেন। মহোৎসবের জায় বোধ হয় “সঙ্কীর্ণ” শব্দ ও তাহাদের দ্বারা সঙ্কুচিত অর্থ হইয়াছে। যাহা হউক এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার উচিত স্থল হইবে।

পূর্বে যাত্রাওয়ালা ও কবিওয়ালাগণের বিষয় আমরা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছি। “খেউর” গানে গালাগালির চূড়ান্ত করা হইত; দেড়শত বৎসর পূর্বে নদে ও শান্তিপুর ‘খেউর’ গানের জন্ম প্রসিদ্ধ ছিল। বিদ্যা সুন্দরকে বর্ধমানের ভুলাইয়া রাখিবার জন্য প্রলোভন দেখাইতেছেন,—“নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব। নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব।” (ভা. বি)।

কৃষ্ণনগরের পুতুল, ও শান্তিপুরের ধৃতির বিষয়ও ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা জয়নারায়ণের কাশীধোঁৱের পরিশিষ্টে দেখিতে পাইয়াছি, নবদ্বীপের কারিকরগণ পাথরের মূর্তি গড়িতে বিশেষ পটু ছিল, কাশীধামে ও তাহাদের আদর ও প্রতিপত্তি ছিল। ভক্তিরত্নাকরে আমরা হালিসহর নিবাসী নয়ন ভাস্কর নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ভাস্করের উল্লেখ পাইয়াছি—(“নয়ন ভাস্কর হালি সহর গ্রামে ছিল” ভক্তিরত্নাকর, ১০ তরঙ্গ)। জয়নারায়ণ সেনের চণ্ডীতে দৃষ্ট হয়, বঙ্গদেশে শ্রীহট্টের ঢাল,

লাহোরী কামান, কাশ্মিরী কুঙ্কম, মুলতানের হিজ, চিনের পুতুল ও দক্ষিণ দেশের গুবাক, বিশেষরূপ আদৃত ছিল। এতদ্ব্যতীত “কাশ্মীর দেশের জাল শাল গঙ্গাজলি” উক্ত পুস্তকে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। দেশীয় বণিকগণ বাণিজ্য করিয়া বিপুল ধনোপার্জন করিতেন; শ্রীপতি, লক্ষপতি, ধনপতি,—প্রভৃতি নাম ধনের মর্যাদা বাজক। রাজপুত্র কি সদাগরের পুত্রকে নায়ক রূপে বরণ করিয়া নিত্য নব উপাখ্যানের সৃষ্টিকরা হইত,—আমরা শৈশবকালে সেই সব উপাখ্যান শুনিয়া রাজপুত্র এবং সদাগরের পুত্র উভয়কে প্রায় তুল্যরূপে সম্মাননীয়ই জ্ঞান করিতাম। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য চণ্ডী ও মনসার গীতের নায়ক নায়িকা—সদাগর কুলোদ্ভব। এখন বণিক সম্প্রদায় যুরোপে সম্মানিত, আমাদের দেশে নিগ্রহ ভাজন।

এই সময়। সংস্কৃত ও পার্শী শিক্ষার বঙ্গদেশ শীর্ষ স্থান লাভ করিয়াছিল। শিশুবোধকে স্বামীর নিকট স্ত্রীর পত্র লিখিবার যে আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে,—তদ্বারা এই মত প্রচার করা যাইতে পারে, যে স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কেহ কেহ সেইরূপ আদর্শ অনুকরণে পত্র লিখিতে পারিতেন;—রচনার ভাব অসার ও উপাহাসাস্পদ হউক, কিন্তু রমণীগণ ঐরূপ ভাষায় পত্রাদি লিখিতে সক্ষম থাকিলে, তাহাতে অন্তঃপুর শিক্ষারপ্রবাহ স্তিমিত ছিল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না; আনন্দময়ী গুপ্তার যেরূপ রচমাপারিপাট্যের উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহাকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ধারিণী শিক্ষিতা মহিলাগণের অন্ততঃ সমকক্ষ গণ্য করিতে হইবে। অধ্যায়ভাগে আমরা যজ্ঞেশ্বরী নামী এক রমণীর রচিত গানের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। বিক্রমপুর অঞ্চলে গঙ্গানামী এক রমণী কবি এক শতাব্দী পূর্বে অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি এখনও তদ্রূপে বিবাহোপলক্ষে গীত হইয়া থাকে।

রমণীমহলে লেখা পড়ার এতদূর চর্চা হইতেছিল পুরুষগণের অনেকেই যে সরস্বতীর বরপুত্র হইতে লালসিত হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি। বাঙ্গলাভাষায় পার্শী ও সংস্কৃত এই দুই পদ মধ্যে মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল, আমরা রামপ্রসাদের কবিতায় সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলার সংযোগ চেষ্টা দেখাইয়াছি; সলিলে তৈলবিন্দুর মত উক্ত কবির কাব্যে এই দুই পদ ভালরূপ মিশ্রিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র, কবি আলোয়াল প্রভৃতি এই বিষয়ে কৃতিত্ব

দেখাইয়াছেন ; ভারতচন্দ্র একস্থলে লিখিয়াছেন, “মানসিংহ পাতসার হইল যে বাণী। উচিত যে পারশী, আরবী, হিন্দুস্থানী। পড়িয়াছি সেইমত বর্দিবার পারি। কিন্তু সে সকল লোক বুঝিবারে ভারি। না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যবনী মিশাল।” কেবল যবনী মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। স্থলে স্থলে বিদ্যার দৌড়। দেখাইতে যাইয়া সংস্কৃত, পার্শী, বাঙ্গলা হিন্দী এই চতুর্বিধ উপকরণে এক বীভৎস অবয়ব প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা যজ্ঞান্তে পুনর্জীবিত দক্ষমূর্তির ত্রায় উৎকট,—যথা, “শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর, বারদকে গোয়দ রুবর, কাতর দেখে আদর কর কাহ মর রো রোয়কে। বঙ্কং বেদং চল্লমাঃ চুলালা চে রেমা, জেখিত পর দেও কমা মেট্টমে কাহে শোয়কে।” এই শিক্ষার চেউএ নিমন্ত্রিষ্ট সভাগৃহ আন্দোলিত হইত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কিভাবে বিচার করিতেন, জয়নারায়ণ সেন তাঁহার চণ্ডীকাব্যে তাহা অতি সূচ্যাক্রভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা সেই অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক ইহাতেই সে সময়ে কি কি পুস্তক পাঠ হইত, তাহারও একটা তালিকা দেখিতে পাইবেন।

“ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে, পাইয়া পত্র নিমন্ত্রণে, উপনীত সভা আরোহনে। কেবল অধিষ্ঠানমাত্র, দান নিতে নহে পাত্র, ধর্ম সংস্থাপন কারণে। ভেজসপুঞ্জ স্বকিরণ, গুরুবর্গ স্ববসন, ভালোতে গঙ্গা স্রুতিবা পল্লবী। শুভ যজ্ঞোপবীতে, রক্তভোট আসনেতে, বসিতেহি বিচারের ঘট। প্রমথান প্রত্যক্ষেতে, পরস্পর সম্মুখেতে, ভাবিক ঘটর নানা তর্ক। প্রমাণ কুহুমাজ্জলী নিয়মতে ব্রহ্মবলি, একে আর সূচ্য সম্পর্ক। পদপদার্থ বিচারেতে, এক দণ্ড সমাসেতে, কাম কত নিবিশিত ঘটায়া। বৈয়াকরণিয়া সবে, বিচার করুশ রবে, গোপীনাথ পরিশিষ্ট হইয়া। মধুর বাক্যের বর্ণনা, অসংকার শুনি ধনি, একদিগে কহিছে রসেতে। ধনি কাক কয়ে কয়ে, ব্রহ্মজিহ্বা লয়ে, কাব্য প্রকাশ উদাহরণেতে। নানা ছন্দে শ্লোক পাঠ, সাহিত্যে বিচার ঠাট, কতমত বর্ণনা ভাবের। রসিক বিবৃথগণে, মধ্যস্থ পণ্ডিত মানে, রত্নট্ট মাঘ নৈবধের। ধৌরগিক পণ্ডিতে, নানামত প্রসঙ্গেতে, বিচার করিছে ভাবি মনে। বশিষ্ঠাদি বেদ জ্ঞানে, জ্ঞানক ভাবগণে, অস্ত্র প্রত্যস্তর লিখি। দশা বিদশা বসতি, জ্ঞানায় সাধুর প্রতি, স্বর্ঘ্য সিদ্ধান্তের মত দেখি। সকলেতে ব্রহ্মময়, বেদান্তে এমত কর, পাপ পুণ্যায় নিরঞ্জন। শত্রু মিত্র ময় তিনি, জ্ঞান ভেদে ভিন্ন মানি, শঙ্করাচার্যের এ লিখন, পড়িলে বিশক্তি কালে, দাব যদি ঘটে বলে, ধর্মশাস্ত্র মতে পাপ নহে। স্মৃতি শাস্ত্রে যথা এই, শূল পাণি মত এই, মুক্তকণ্ঠ হৈয়া মনু কহে।”

পণ্ডিতগণ পরকালের তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছিলেন, রাজপুত্রগণ এক হস্তে তুচ্ছ পক্ষী ও অপর হস্তে রস কথ্য পূর্ণ কাব্য লইয়া—বিলাস কলায় দীক্ষিত

হইতেছিলেন,—এই সময় ভারতবর্ষের ভবিষ্যত নবভাবে গঠিত হইতেছিল ; তাঁহাদের শাস্ত্র কথা ও রস কথা যে হঠাৎ প্রবল এক রাজনৈতিক ব্যাপটা বাতাসে স্থগিত হইয়া পড়িবে, ইহা তাঁহারা মনেও করেন নাই।

ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, পারিবারিক জীবনে নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে ; নূতন আদর্শ, নূতন উন্নতি ও নূতন অভিপ্রায়ের সঙ্গে সমগ্র জাতি অভ্যুত্থান করিয়াছে। সাহিত্যে এই নবভাবের ফলে গদ্যসাহিত্যের অপূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, বাঙ্গালী এখন বাঙ্গলা ভাষাকে মাত্র করিতে শিখিতেছে, এবড় শুভ পূর্বলক্ষণ ; ক্রীড়াশীল শিশু যেরূপ সমুদ্রতীরে খেলা করিতে করিতে একান্ত মনে গভীর উর্ধ্বরাশির অক্ষুট ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক লইয়া বাল্যক্রীড়া করিতে করিতে আমি ও সেইরূপ বঙ্গসাহিত্যের অদ্রবর্তী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা কল্পনা করিয়া সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হই-
মাছি। অষ্ট শতাব্দীতে বঙ্গীয় গদ্য যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশা অন্ধিত না হয়! আমরা দ্বিতীয় ভাগে নবভাবে ক্ষুণ্ণপ্রাপ্ত নব আশা দৃষ্ট বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিশীল চিত্র আঁকিয়া দেখাইব, আশা রহিল।

সম্পূর্ণ।

